প্রথম অধ্যায়

[এই অধ্যায়ে পূর্ব বাংলার মাওবাদী আন্দোলনের লাইনগত সারসংকলনের কয়েকটি মূল দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সর্বপ্রথমেই দেয়া হয়েছে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত "নতুন থিসিস" নামে পরিচিত দলিল থেকে "ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক পর্যালোচনা"– অংশটি। এই অংশটিতে পূর্ব বাংলার মাওবাদী আন্দোলনের, বিশেষত আমাদের পার্টির সূচনা পর্বের লাইন– যা এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তার একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা ও সারসংকলন পাওয়া যাবে।

নতুন থিসিসের অন্যান্য অংশগুলোতে পার্টি-ইতিহাসের পরবর্তী পর্বগুলোর অগ্রগতি ও বিচ্যুতি-দুর্বলতার সারসংকলন ছাড়াও বর্তমানে মৌলিক লাইন-প্রশ্নাবলীতে আমাদের অবস্থান বিবৃত হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলন এবং বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতেও পার্টির মতাবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনের অংশটি পরের অধ্যায়ে এসেছে। অন্য অংশগুলো এই খণ্ডে দেয়া হলো না।

এরপরেই যুক্ত করা হয়েছে "পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা লে)-র সংগ্রাম ও সমস্যা" নামের দলিলটি। এই সুপরিসর দলিলটি হলো এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের অপর একটি প্রধান ধারার লাইন ও কার্যক্রমের একটি বিস্তৃত সমালোচনা, যা কার্যত ঐ ধারাটির একটি তাত্ত্বিক-লাইনগত সারসংকলন দলিলে পরিণত হয়েছে।

সবশেষে যুক্ত করা হয়েছে "বাংলাদেশে মাওবাদ অনুশীলনের অভিজ্ঞতা এবং মাওবাদ রক্ষা ও বিকাশের সমস্যা" শীর্ষক দলিলটি। এটি একটি ফরমায়েশী রচনা। পার্টির অতীত লাইন-অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ও সারসংকলনের প্রক্রিয়ায় নতুন শতাব্দীতে পার্টি যখন সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ব্যাপক আলোচনা করছে সেই সময়ে নেপালের মাওবাদী পার্টির অনুরোধে দলিলটি লেখা হয়েছিল। নেপাল পার্টির ইংরেজী মুখপত্র "দি ওয়ার্কার"-এর ১০নং সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। দলিলটি রিম-কমিটির দ্বারা প্রকাশিত রিম-অভ্যন্তরের দুই লাইনের সংগ্রাম পরিচালনার পত্রিকা "স্ট্রাগল" ৭নং সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়েছিল।

– সম্পাদনা বোর্ড]

ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক পর্যালোচনা

মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা ও প্রথম পর্ব–
৬০/৭০-দশক (ভিত্তি পর্ব)

(নভেম্বর, ২০১১)

৬০-দশকের প্রথমার্ধে সোভিয়েত-ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান মাও-এর নেতৃত্বাধীন চীনা পার্টির মতাদর্শগত মহাবিতর্কের প্রভাবে এদেশে সর্বপ্রথম মাওবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। দশকের শেষার্ধে মাও সেতুঙের নেতৃত্বে সূচিত ও পরিচালিত চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব (জিপিসিআর) এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নক্সালবাড়ী এলাকায় কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে মাও চিন্তাধারা অনুসারী বিপ্লবী সশস্ত্র কৃষক-অভ্যুত্থান– এই দু'য়ের প্রভাবে এদেশে মাওবাদী আন্দোলনের স্বতন্ত্র বিকাশের সূত্রপাত ঘটে। সে সময় পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল, যা সরকারিভাবে "পূর্ব পাকিস্তান" নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক আদি কমিউনিস্ট পার্টির (ইপিসিপি'র) প্রধান নেতৃত্বদের দ্বারা সোভিয়েত-ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ করায় তার বিরুদ্ধে আন্তরিক কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এক মহান বিদ্রোহের সূচনা করেন। ষাট-সত্তর দশকে এই সংগ্রামের ন্যায্যতা ও সঠিকতা, এবং পাশাপাশি তার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতিসমূহ মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বের যাবতীয় লাইন, সংগঠন ও সংগ্রাম জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল। এটাই বিগত শতকের তথা প্রথম যুগের মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সে কারণে এই ভিত্তি-পর্বের আলোচনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা কিনা আমাদেরকে বিগত প্রথম যুগটির সামগ্রিক সারসংকলনের কাজে সক্ষম করে তুলতে পারে।

এই সংগ্রামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক ছিল এই যে, এই সংগ্রাম সর্বহারা শ্রেণির মতবাদ হিসেবে তার সর্বশেষ বিকশিত স্তর বা তৃতীয় স্তর, অর্থাৎ, মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে (মাওবাদকে) এ দেশে নিয়ে আসে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে– শুধু তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই নয়, জনগণের বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামের গাইড হিসেবেও।

মাও চিন্তাধারা দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এই আন্দোলন বিপ্লবের স্তর হিসেবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কৃষক ও গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করা, সংসদীয় পথকে বর্জন করা, বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তিকে বর্জন করা, এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে আঁকড়ে ধরা– এই মৌলিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনকে মূলত প্রতিষ্ঠিত করে।

রাজনৈতিক লাইনের এই সঠিকতাগুলোর ভিত্তিতেই ষাট-সত্তর দশকে এক মহান বিপ্লবী উত্থান মাওবাদীদের নেতৃত্বে এদেশে ঘটেছিল, যা কিনা '৭০ থেকে শুরু ক'রে '৭৪– কম/বেশি এই পাঁচ বছর ধরে ব্যাপ্ত ছিল। ৭০-দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে চলা এই

বিপ্লবী আন্দোলন এ দেশের সমগ্র আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে জনগণের সবচেয়ে বিপ্লবী, সবচেয়ে সঠিক, সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত শ্রেণি ও জনগণ আশ্রয়ী মুক্তি সংগ্রামের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। যাকে প্রায়শই এদেশের অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিহাসে জনগণের বিভিন্ন অংশের দ্বারা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব দ্বারা চালিত বিবিধ প্রগতিশীল, সংস্কারমূলক, জাতীয়তাবাদী বা এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের একতরফা ও বিকৃত, শাসকশ্রেণিয় ও মধ্যবিত্ত সংস্কারবাদী বর্ণনা দ্বারা এবং মিথ্যাচার, মূর্খতা ও অজ্ঞতা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়। সুতরাং কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষত মাওবাদী আন্দোলনের একটি প্রধানতম দায়িত্ব হলো ইতিহাসের এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সার্বিক ভূমিকা রাখা। এই আন্দোলনের প্রধানতম নেতৃত্বদেরকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। যার মাঝে প্রধানতম সারিতে ছিলেন কমরেড সিরাজ সিকদার, বাদল দত্ত, মনির-উজ্জামান তারাসহ আরো অনেক নেতৃত্ব। যাদের মাঝে কমরেড সিরাজ সিকদারকে সামগ্রিক বিবেচনায় সারির শীর্ষে রাখতে হবে বলেই আমরা মনেকরি।

একইসাথে সেসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ও খুবই নির্ধারক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে পথচ্যুত হয়েছেন বা এমনকি অধপতিত হয়েছেন এমন বহু নেতৃত্বেরও তৎকালীন মাওবাদী বিপ্লবী অবদানকে স্মরণে রাখতে হবে, এবং তাকে আমাদের আন্দোলনেরই সম্পদ বলে বিবেচনা করতে হবে। সর্বজনাব হক-তোয়াহা-সুখেন্দু দস্তিদার, মতিন-আলাউদ্দিন-আমজাদ হেসেন-টিপু বিশ্বাস, রণো-মেনন, দেবেন শিকদার-বদরুদ্দিন উমরসহ আরো অনেক জাতীয় পরিচিতি সম্পন্ন নেতৃত্বগণ মাওবাদী আন্দোলনকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করায়, অথবা তার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনে এই প্রথম উত্থান পর্বে স্বল্প বা কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য, কিছুটা বেশি বা অল্প করে হলেও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন। মাওবাদ সম্পর্কে ধারণার দুর্বলতা ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ঝড়ঝাপ্টায় এদের প্রায় সবাই আগে বা পরে কার্যত মাওবাদকে অনুশীলনে নিতে ব্যর্থ হন, একসময়ে তাকে বর্জন করেন, এমনকি এদের একাংশ সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতেও অধপতিত হন। কিন্তু এই নেতৃত্বগণের মাওপন্থী থাকার সময়কালকে এবং বিপ্লবী বা প্রগতিশীল ভূমিকাকে একইসাথে তাদের পরবর্তীকালের অধপতিত ও ভুল রাজনীতির ফসল অথবা ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বলার কোন কারণ নেই। ইতিবাচক ইতিহাসের এই পুনরুদ্ধার প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস মোকাবেলায় আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। একে কোনক্রমেই বর্জন করা যাবে না।

* এই পর্বের দেশীয় আন্দোলন আলোচনায় কমরেড চারু মজুমদারের (CM– সিএম) মহান ভূমিকার বিষয় কিছুটা হলেও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এদেশের নয়, বরং ভারতের মাওবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এর কারণ হলো, নক্সালবাড়ী আন্দোলনটি ছিল আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনের সম-সাময়িক হলেও কিছুটা পূর্বসূরী। ফলে তার এক বিপুল প্রভাব পড়েছিল এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে। এমনকি আমাদের পার্টি ছাড়া অন্য ধারাগুলোর অনেকগুলোই কম/বেশি সময়ের জন্য সিএম-শিক্ষাকে নিজ নিজ পার্টির প্রায় তাত্ত্বিক ভিত্তির মত ক'রে

অনুসরণ করেছিল। পূবাকপা[১]-ধারাটি বিগত শতক জুড়েই এটা করেছে। তাই, সিএম-আলোচনা ব্যতীত এই পর্বের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

কমরেড সিএম-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাঝে ছিল জিপিসিআর-এর শিক্ষাকে আত্মস্থ করার সংগ্রাম গড়ে তোলা, অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা, কৃষি-বিপ্লবের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসা, গোপন বিপ্লবী পার্টি গঠনের এক সম্পুর্ণ নতুন ধারার প্রতিষ্ঠা করা, এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শকে বিপুল উচ্চতায় উন্নীত করা। তিনি ভারতের মত এক বৈরী দেশে বিপ্লবী ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"। কমরেড সিএম দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রাজনীতি ও গেরিলা যুদ্ধের রণনীতিকে আঁকড়ে ধরে শূন্য থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার বিপ্লবী লাইন গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছিলেন। এসমস্ত দ্বারাই আমাদের দেশের বিপ্লবী মাওবাদীরা বিরাটভাবে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত হয়েছিলেন। গণযুদ্ধের বিপ্লবী রাজনীতি ও গেরিলা যুদ্ধের সামরিক লাইন প্রয়োগের জন্য তিনি "খতম লাইন" নামে সমধিক পরিচিত যে লাইন প্রণয়ন করেন ও প্রয়োগ করেন তা-ও কম/বেশি পরিমাণে এদেশের সকল বিপ্লবী মাওবাদী ধারাই গ্রহণ করেছিল– স্বীকৃতি দিয়ে বা না দিয়ে, সচেতন বা অসচেতনভাবে। গণযুদ্ধের রাজনীতি ও গেরিলা যুদ্ধের সামরিক লাইন সংসদীয় পথকে চুরমার ক'রে কৃষকের বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ, তথা গণযুদ্ধ আরম্ভ করায় ভারত ও পূর্ব বাংলায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল। যদিও সিএম-প্রণীত "খতম লাইন"-এর সফলতার পাশাপাশি তার নিজস্ব দুর্বলতা ও সমস্যাও ছিল, যা আমরা পরে আলোচনা করবো। তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়ন আমরা এখানে করতে পারবো না। কিন্তু কমরেড সিএম-কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই তার মৌলিক অবদানগুলো সম্পর্কে আন্দোলন ও জনগণের মাঝে সচেতনতা প্রয়োজন, কারণ, ৭০-দশকের মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম উত্থান পর্বকে কমরেড সিএম-এর আলোচনা ছাড়া, তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ব্যতীত করা সম্ভব নয়।

* কিন্তু এই সব সফলতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন যে খুব দ্রুতই সামগ্রিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তার কারণ শুধু শত্রুর বর্বর দমনের মাঝে খুঁজলে চলবে না। বরং সেটা সে সময়কার লাইনের ভুলসমূহের মাঝেও নিহিত ছিল। আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মাওবাদী আন্দোলন তার এ শৈশবাবস্থায় অনেক ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাযুক্ত থাকা স্বাভাবিক ছিল। আন্দোলন ছিল অপরিপক্ক। মাওবাদ আত্মস্থ করার সময় সে পেয়েছিল খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্বলতা ও বিচ্যুতি– তা যে কারণেই ঘটুক না কেন, তা আন্দোলনকে ক্ষতি করতে বাধ্য, এবং তা জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে কাজ করতে বাধ্য। তাই, আমাদের উচিত হবে কোনরকম মোহগ্রস্থ না হয়ে নিষ্ঠুরভাবে আমাদের আন্দোলনের সে সময়কার সমস্যাগুলোকে উদ্ঘাটন করা।

** সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামে মৌলিকভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও ষাট-সত্তর দশকের এ সংগ্রামে গুরুতর অনেক দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল। ক্রুশ্চভীয়/

ইপিসিপি[২] সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামকে আমাদের আন্দোলন সৃজনশীলভাবে এদেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারসংকলনের সাথে মিলিয়ে একটি সামগ্রিকতায় পরিণত করতে পারেনি এবং তাকে বাস্ড়বে সম্পূর্ণ করতে পারেনি। এটাই প্রথমত তাকে অক্ষম করে তোলে একটি সামগ্রিক ও সঠিক মাওবাদী লাইন বিনির্মাণে। এটা মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক– সবক্ষেত্রেই তার প্রভাব রাখে। যা কিনা বিগত শতকের আন্দোলনে সমস্ড় পর্যায়েই ধারাবাহিকভাবে কম/বেশি প্রভাব রেখেছে। আমরা এখন সেগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক আলোচনা করবো। কারণ, এই দুর্বলতা ও বিচ্যুতিকে কাটানোর উপরই নির্ভর করবে এখনকার এক নতুন যুগে একটি সামগ্রিক সঠিক লাইন বিনির্মাণ কাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়া।

মতবাদিক/মতাদর্শিক ক্ষেত্র

ক) মতবাদের ৩য় স্ড়রে বিকাশ প্রশ্নে উপলব্ধিতে ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা ঃ

আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলন শুর“ থেকেই মতবাদের তৃতীয় স্ড়র হিসেবে মাওচিন্ড়াধারাকে গ্রহণ করলেও তার উপলব্ধিতে গুর“তর অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা ছিল, যার একাংশ ছিল ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা উদ্ভূত।

জিপিসিআর-এর সূচনাতেই বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরবর্তী মাওবাদের তৃতীয় স্ড়রে উন্নীত হলেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমগ্রকাল জুড়ে তা আরো বিকশিত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে বা ভারতেবর্ষে যখন মাওবাদী আন্দোলন শুর“ হয় তখনো জিপিসিআর মাত্র তার প্রথম লড়াইটি, অর্থাৎ লিউ শাওচি-বিরোধী সংগ্রামটি সংঘটিত করেছে। এর দ্বিতীয় প্রধান লড়াই, অর্থাৎ, লিনপন্থার বির“দ্ধে সংগ্রামটির তাৎপর্য বুঝে উঠবার আগেই সিএম শহীদ হন। সিএম-এর বিপ্লবী ধারাকে এগিয়ে না নেয়ার কারণে আমাদের দেশেও তার তাৎপর্য আত্মস্থ হয়নি। আমাদের পার্টিতে কমরেড সিরাজ সিকদারের শহীদ হবার অল্প আগে লিন-বিরোধী সংগ্রামের আলোচনা শুর“ হলেও সেটা তেমন কোন গভীরতা অর্জন করবার সময় পায়নি। আর তেংবিরোধী শেষ লড়াইটি শুর“ই হয় এই আলোচিত প্রথম পর্বটির সার্বিক বিপর্যয়ের পরে। সুতরাং জিপিসিআর কালের সমগ্র শিক্ষাগুলো সমৃদ্ধ আকারে তখনকার মাওবাদী আন্দোলনের পক্ষে গ্রহণ করার প্রশ্ন ছিল না।

কিন্তু যা কঠিন হলেও সম্ভব ছিল তাহলো স্ট্যালিনের সারসংকলনকে আয়ত্ব করা, যা মাও ইতিপূর্বেই সম্পন্ন করেছিলেন। বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে আজ যা প্রায় প্রতিষ্ঠিত বিষয় তাহলো মাও কর্তৃক স্ট্যালিনের সারসংকলন, যা কিনা মাওবাদ নির্মাণের পথে এক অপরিহার্য উপাদান ছিল। বাস্ড়বে এর উপরই দাঁড়িয়ে ছিল মতবাদের মাওবাদে উল্লম্ফনের বিষয়টি। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বল আন্ড়র্জাতিকতাবাদী যোগাযোগ মাওবাদের এই সব উপাদানকে হাতে পাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিল। যে

কারণে, সামগ্রিকভাবে মাও-এর নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকালের অবদানগুলোই প্রধানত এদেশে তখন এসেছিল, যাকে ভিত্তি ক'রে সংশোধনবাদের বির“দ্ধে বিদ্রোহ সঠিক ছিল বটে, কিন্তু তা আবার সেই সংগ্রামকে দুর্বল করেও গড়ে তুলেছিল। আমাদের মাওবাদী আন্দোলনের গোড়াতেই এই সীমাবদ্ধতা মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তিকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করে দেয়, যা বিগত শতকের গোটা পর্যায়টিতে বিভিন্ন ধারার মাঝে বিভিন্ন মাত্রায় বিরাজ করেছিল। শুর“ থেকে আমাদের মাওবাদী আন্দোলনের দুর্বলতাগুলোর সাথে মতবাদের এই অসম্পূর্ণ ও দুর্বল উপলব্ধির গুর“তর সম্পর্ককে না বুঝলে চলবে না।

খ) আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট সারসংকলন করার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদের সাথে পরিপূর্ণ রাপচার করতে না পারা ঃ

ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের যে লেজুড়বৃত্তি করার মধ্য দিয়ে ইপিসিপি (মনিসিং নেতৃত্বাধীন) অতিসত্বর সংশোধনবাদে অধপতিত হয়ে যায়, তা হঠাৎ করে ঘটেনি; তার ভিত্তি আদি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই বিরাজমান ছিল। কিন্তু আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন, আর ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ হুবহু একই জিনিষ ছিল না; তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নতুন ধারায় স্থাপিত করার জন্য ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদকে সংগ্রাম করার পাশাপাশি আদি আন্দোলনের একটি মৌলিক, সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ সারসংকলন প্রয়োজন ছিল, যাকিনা তার সাথে বিপ্লবী রাপচারকে সম্পূর্ণ করতে পারতো। এই প্রশ্নে নবউদ্ভূত মাওবাদী আন্দোলন গুর“তর দুর্বলতা দ্বারা চালিত হয়েছে।

মাওবাদ-পূর্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, যাকে আমরা আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন বলছি, তার সাথে বিপ্লবী বিচ্ছেদ ব্যতীত কোন বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। বিশেষত যখন তা মধ্য-পঞ্চাশ দশক থেকে আন্ড়র্জাতিক সংশোধনবাদের লেজুড়ে পরিণত হলো তখন তাকে পরিপূর্ণ বর্জনের প্রশ্ন আক্ষরিকভাবেই সঠিক ছিল। কিন্তু সংশোধনবাদের লেজুড় হবার পূর্বে যখন পর্যন্ড় সে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ৩য় আন্ড়র্জাতিক বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্ড়র্ভুক্ত ছিল তার গুর“তর লাইনগত ত্র“টি, এমনকি বহুবিধ সংশোধনবাদী উপাদান সত্ত্বেও, তার সাথে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদী ধারার একটা মৌলিক পার্থক্যরেখা টানা গুর“ত্বপূর্ণ ছিল– যা নব্য মাওবাদী আন্দোলন করেনি, এবং কার্যত এ দুটোকে একাকার করে ফেলেছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে, আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবাচক ঐতিহ্যের রক্ষা এবং তার ভুল লাইন, বা এমনকি সংশোধনবাদী উপাদানসমূহের সুনির্দিষ্ট প্রকাশগুলোকে নির্দিষ্টভাবে বর্জনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে একটি নতুন উচ্চতর জায়গায় উন্নীত করবার সংগ্রাম ব্যাপকভাবে দুর্বল থেকে যায়। আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক ইতিবাচক ঐতিহ্যকেও এভাবে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের অনুসারীদের পকেটে তুলে দেয়া হয়। এবং যা বেশি গুর“ত্বপূর্ণ তা হলো, আদি আন্দোলনের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের এক সুগভীর বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে একটি গুর“তর দুই লাইনের সংগ্রাম বিকশিত করার বদলে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ বর্জনের ও

মাওবাদ গ্রহণের একটি সরল পথ অনুসৃত হয়।

* আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন একটি প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। পূর্বাপর মূলত একটি অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী ধারায় তা আটকে ছিল। লেনিনের "কী করিতে হইবে?" মতবাদ কখনই এই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আত্মস্থ করতে পারেনি। ঠিক এ কারণেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে এ পার্টি সর্বদাই দূরত্বে ছিল। তাই, কৃষকের আশু আন্দোলন যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র পথে বিকশিত হয়ে ওঠে, এবং বহু অঞ্চলে নিজেদের বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা কার্যত দখল করে ফেলে (তেলেঙ্গানায়, অংশত তেভাগা আন্দোলনে), তখন পার্টি তাকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থই শুধু হয় তা নয়, তাকে কার্যত বর্জন করে।

এ পার্টি এমনকি ৩য় আন্তর্জাতিকের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের লাইন অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত ভারতবর্ষে কৃষক সমস্যাকে আঁকড়ে ধরা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যাকে আঁকড়ে ধরা এবং বড় ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের বিপ্লবের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার কাজও করতে পারেনি। তারা একটি শ্রমিকবাদী লাইন অনুসরণ করে গেছে, যা কার্যত শ্রমিক শ্রেণির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাঝে নিজেদেরকে আটকে ফেলে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ও সমাজ রূপান্তরের বিপ্লবী আন্দোলন, তথা ভারতবর্ষের বিশালায়তন কৃষকের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের কেন্দ্রীয় সমস্যাকে উপলব্ধি করতেই ব্যর্থ হয়। তারা একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে একাকার করে ফেলেছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক স্তরে বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্যের নামে বড় বুর্জোয়াদের (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের) লেজুড়বৃত্তির লাইন অনুসরণ করে গেছে।

২য় বিশ্বযুদ্ধকালে এ পার্টি ফ্যাসিবাদবিরোধিতার নামে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসী মুৎসুদ্দি রাজনীতির সেবা করে। ৩য় আন্তর্জাতিকের অপর এক প্রধান পার্টির নেতৃত্বে ৩০ ও ৪০-দশকের চীন বিপ্লবের অগ্রগতি থেকে শিক্ষা নিতে এই পার্টি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এভাবে এ পার্টি এ ধরনের দেশে নয়া গণতন্ত্র, কৃষি বিপ্লব ও গণযুদ্ধের রাজনীতি আবিষ্কার করতে-যে ব্যর্থ হয় শুধু তা-ই নয়, বহু পরিমাণে সংশোধনবাদী উপাদানে সে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলে। যার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে আন্তর্জাতিক পরিসরে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ আসামাত্র এ পার্টি তার এক প্রধানতম লেজুড় ও সমর্থনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। যাকে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় নেতৃত্ব দিয়েছিল মনিসিং-মোজাফ্ফর-মতিয়া চক্র।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবাচক অবদানগুলোকে এক কথায় বাতিল করে দিলে চলবে না। এই পার্টিই ভারতবর্ষের মত পশ্চাদপদ কৃষি-প্রধান বিশাল এক দেশে কমিউনিজমের মতবাদকে নিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, তাকে রাজ-নীতির এক নতুন ধারায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। মার্কসবাদকে, মহান লেনিন ও স্ট্যালিনকে, রুশ বিপ্লবকে, ফ্যাসিবিরোধী কমিউনিজমের মহান সংগ্রামকে, শ্রমিক-কৃষকের স্বতন্ত্র রাজনীতি-মতবাদ-ক্ষমতা-রাষ্ট্র ও বিপ্লবের বাণীকে উপমহাদেশে তা অতি অল্প সময়ে

বিপুল জনপ্রিয় করতে পেরেছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি থেকে এক বিপুল পরিমাণ বিদ্রোহী, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী তরুণকে এ পার্টি মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী মতবাদের বলয়ে টেনে এনেছিল। এবং তেলেঙ্গানা (ও এদেশে তেভাগা)-র মহান সংগ্রামসহ বহু ধরনের শ্রমিক, শ্রমজীবীদের আন্দোলন ও একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এইসব ঐতিহ্য তার রাজনৈতিক দুর্বলতাসহ আমাদেরই ঐতিহ্য, যা আমরা অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারি না, তার উপর সংশোধনবাদীদেরকে ভাগ বসাতে দিতেও পারি না। কিন্তু একইসাথে তার সাথে বিপ্লবী রাপচার না ঘটিয়ে আমরা এক পা এগুতেও পারি না।

নব্য মাওবাদী আন্দোলন এইভাবে না এগোনোর ফলে তার দ্বারা ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের সাথে বাস্তবে একাকার করা আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সরল বর্জন যতটা হয়েছে, ততটাই হয়নি তার সাথে লাইনগত সংগ্রাম গভীর করার মধ্য দিয়ে তার সাথে বিপ্লবী রাপচার। ফলে পরবর্তীকালে মাওবাদী আন্দোলনে আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ এবং জাতীয়তাবাদের বিরাট প্রভাব থেকে যায় যা অন্যান্য রূপে নিজেকে প্রকাশ করে– যে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো।

* আদি পার্টির যে গুরুতর বিচ্যুতিগুলোর কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত কিছু অংশ– যেমন, ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের নামে বৃটিশের লেজুড়বৃত্তি, তৎকালীন অগ্রসরমান চীনা বিপ্লব থেকে না শেখা, কৃষিবিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরা ও দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধকে রণনীতি হিসেবে গ্রহণ না করা– প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্ট্যালিন ও তাঁর নেতৃত্বে ৩য় আন্তর্জাতিকের বিরাট ভূমিকা ছিল– সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। সুতরাং ভারতীয় ও পূর্ব পাকিস্তানী আদি কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক ভুলের পেছনে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভূমিকার সারসংকলন ব্যতীত এই টুএলএস গভীর ও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। মাও সম্পূর্ণত না হলেও মৌলিকভাবে জিপিসিআর প্রস্তুতিকালে– ৬০-দশকের প্রথমার্ধেই স্ট্যালিনের সাথে এই রাপচার ঘটান। এই অভিজ্ঞতা আমাদের মাওবাদী আন্দোলনে আদৌ পৌঁছেনি বললেই চলে। বরং বহু ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলন স্ট্যালিনকেই অনুসরণ করে, যদিও তারা তত্ত্বগতক্ষেত্রে মাওচিন্তাধারার কথা বলেছে। এভাবে কার্যত মাওবাদের দুর্বল ও অসম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকেই মাওবাদী আন্দোলন এদেশে যাত্রা শুরু করেছিল। যা সূচনাতেই তার বহুধা বিভক্তির অন্যতম কারণও বটে, যদিও তার নিজস্ব অন্যান্য কারণও রয়েছে।

গ) <u>টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে লাইন বিনির্মাণ ও পার্টি-গঠনকে উপলব্ধি না করা ও প্রয়োগ করতে না পারা</u> ঃ

ক্রুশ্চভীয়-মনিসিং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটি সঠিক সর্বহারা বিপ্লবী লাইন বিনির্মাণ, তার ভিত্তিতে একটি প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং সে পার্টির নেতৃত্বে একটি সফল বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলা।

ষাট-দশকের শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী টালমাটাল বিপ্লবী পরিস্থিতিতে মাও যখন সংশোধনবাদের সাথে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ কার্যকর করার জন্য আহ্বান জানালেন

"হেডকোয়ার্টারে তোপ দাগাও"– তখন সেই মহান আহ্বান এদেশেও প্রকৃত বিপ্লবীদের অন্তরে এসে আছড়ে পড়ে বিদ্রোহের ঢেউ জাগিয়ে তুললো। তারা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা ন্যায্যভাবেই সংশোধনবাদী ইপিসিপি থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটালেন। কিন্তু এই বিচ্ছেদ সাংগঠনিকভাবে যতটা সম্পূর্ণ ছিল, মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের পরিসরে ততটা সম্পূর্ণ বা গভীর হতে পারেনি।

এর অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল বিপ্লবীদের ভুল বা সংশোধনবাদী উপাদান, এবং পূর্ণাঙ্গ কোন সংশোধনবাদের মধ্যকার পার্থক্যকরণ এবং সেসবের সাথে সংগ্রামের পদ্ধতিশাস্ত্রগত (Methodology) সমস্যা। শুরু থেকেই এই সংগ্রামে একতরফাবাদ, বিভেদপন্থা ও সংকীর্ণতাবাদের ত্রুটি থেকে গেল। আন্তরিক বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যকার সংগ্রামকেও সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম বলে বৈরীভাবে গড়ে তোলা হলো। বৃক্ষকে অরণ্য বলা হলো। টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে লাইন-বিনির্মাণ ও পার্টি-গঠনকে আঁকড়ে না ধরে আত্মগতভাবে একেকটা আংশিক, খণ্ডিত লাইন নিজেকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে দাবি করলো এবং বিরোধী অন্য সমস্ত লাইনকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিল। এটা একদিকে যেমন একটি নবউদ্ভূত বিপ্লবী লাইন বিনির্মাণকে পঙ্গু করে দিল, অন্যদিকে এটা প্রকৃত সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামকেও দুর্বল করে দিল। নিজেদের মধ্যকার সংগ্রাম, আর সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম একাকার হয়ে গেল।

এর ফলশ্রুতিতে অতিদ্রুত মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই অনেকগুলো কেন্দ্র এদেশে গড়ে উঠলো। যা মাওবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরস্থ লাইন-সংগ্রামে সকল পক্ষকে গুরুতর সংকীর্ণতা, অগভীরতা, আত্মগতভাব, একতরফাবাদ ও বিভেদপন্থায় চালিত করলো। যা পরবর্তীকালে মাওবাদী আন্দোলনের সকল পর্যায়ে তাকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

* আদর্শগত সংগ্রামের দীর্ঘসূত্রতা, উত্তরণকালের স্বাভাবিক দ্বৈততা, এবং সামগ্রিকতা ও অংশের দ্বন্দ্ব ও ঐক্যকে মাওবাদী আন্দোলন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এ সময়ে ও তার প্রক্রিয়ায় পরবর্তী ৩/৪ বছরের মধ্যে আঃ হক নেতৃত্বাধীন ইপিসিপি/এমএল, মতিন-আলাউদ্দিন নেতৃত্বাধীন পূবাকপা/মালে, এসএস নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি, এবং তোহা-সুখেন্দু নেতৃত্বাধীন বিএসডি/এমএল– এই চারটি প্রধান ধারায় মাওবাদী আন্দোলন বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরো বেশ কিছু সংগঠন ও কেন্দ্র এ সময়ে গড়ে ওঠে যারা উপরোক্ত ৪টি ধারার মত দৃঢ়ভাবে মাওবাদকে গ্রহণ না করলেও নিজেদেরকে মাওচিন্তানুসারী বলে প্রকাশ করে। এই সবগুলো ধারা, উপধারা, কেন্দ্র, সংগঠন– টুএলএস-কে গভীর করতে কম/বেশি ব্যর্থ হয়, প্রধানত এই কারণে যে, প্রায় প্রথম থেকেই সবগুলো কেন্দ্র শুধু নিজেদেরকেই সঠিক মাওবাদী দাবি ক'রে অন্যদেরকে সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করে দেয়।

সংশোধনবাদ একটি সামগ্রিক চরিত্র ধারণ করলে পরেই তার সাথে মার্কসবাদের সম্পর্ক সামগ্রিক বিচ্ছেদ ও বিভেদের হতে পারে। নতুবা সংশোধনবাদ বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় পার্টিতে সর্বদাই থাকে। তাই বলে পার্টি সর্বদাই সংশোধনবাদী হয়ে থাকে না,

বা ভিন্নমতগুলোর ত্রুটি সত্ত্বেও ভিন্নমতধারীদের সার্বিক চরিত্র সংশোধনবাদী হয় না। পার্থক্য মাত্রই সংশোধনবাদ-মার্কসবাদ দ্বন্দ্ব, এবং সংশোধনবাদ মানেই তার সাথে বিভেদের সংগ্রাম পরিচালনা– এই অনুসৃত ধারাটির মৌলিক সমস্যা হলো বস্তুর সামগ্রিক চরিত্র আর আংশিক দিককে একাকার করে ফেলা। মাও যাকে বলেছেন, বৃক্ষকে অরণ্য বলা। বাস্তবে পার্টিতে এইসব মতপার্থক্যের মধ্যকার সংগ্রামই পার্টির অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তি রূপে কাজ করে। এটা আমরা মাওবাদ থেকে শিখেছি। কিন্তু স্ট্যালিনীয় ধারায় পার্টিকে একস্তম্ভী মনে করার ভুল দার্শনিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা একে বুঝতে ও সঠিকভাবে মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের দেশে শুরু থেকেই মাওবাদী আন্দোলন কার্যত এই স্ট্যালিনীয় ভুলকে অনুসরণ করেছে ও মাওবাদ আত্মস্থ করতে ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এভাবে মাওবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে একটি বৈরী বিভেদাত্মক সংগ্রাম পরিচালনার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, যাকে কিনা সংশোধনবাদবিরোধী মহান সংগ্রাম বলেও গর্ব করা হয়েছে, এবং এটা মাওবাদী আন্দোলনে লাইন বিনির্মাণ ও পার্টি গঠনে বিশাল ক্ষতি সাধন করেছে।

এমনকি সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামেরও একটি প্রক্রিয়া রয়েছে– যা টুএলএস-কে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। সামগ্রিক বিচ্ছেদ ও ন্যায্য বিভেদ এ লাইন-সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি মাত্র। সঠিক ও সুগভীর টুএলএস-ই সংশোধনবাদকে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচন করে, সঠিক লাইনকে বিকশিত করে এবং আন্তরিক কর্মী-জনগণ, এমনকি নেতৃত্ব পর্যায়েও ইতিবাচক রূপান্তর ঘটায়।

বিপ্লবী পার্টিতে ও আন্দোলনে সর্বদাই মতপার্থক্য থাকে, তা টুএলএস-এ পরিণত হতে পারে। এই টুএলএস আংশিক, খণ্ডিত, এমনকি সামগ্রিক চরিত্র বিশিষ্ট কিন্তু এখনো সামগ্রিক নয় এমন হতে পারে। আন্দোলন অভ্যন্তরস্থ সংগ্রাম সবই এক চরিত্রের নয়। বরং ব্যাপকভাবে তা তার অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, যাকে আমরা তার অন্তঃসংগ্রাম বলে চিহ্নিত করতে পারি। সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের থেকে এই অন্তঃসংগ্রামের চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। এটা হলো সামগ্রিকতা ও অংশের পার্থক্য, শ্রেণি চরিত্রের পার্থক্য,বিপ্লব বর্জন ও বিপ্লবী থাকার পার্থক্য।

কিন্তু অন্তঃসংগ্রামেও ভুলটা ভুলই, সেটা সঠিক নয়। এবং ভুল মত/পলিসি/কৌশল/লাইন সর্বহারা শ্রেণিকে সেবা করে না। ফলত তা অসর্বহারা চরিত্র ধারণ করে। কিন্তু কোনটা ভুল আর কোনটা সঠিক সেটা প্রায়ই দীর্ঘ সামাজিক অনুশীলন এবং ধৈর্যশীল, নমনীয় ও সুগভীর তত্ত্বগত বিতর্ক ছাড়া নির্ধারণ করা কঠিন, প্রায়শ অসম্ভব। টুএলএস-এর তত্ত্বগত/লাইনগত সংগ্রাম, এবং অনুশীলন– এই দু'য়ের মধ্য দিয়ে সঠিক/বেঠিক বেরিয়ে আসে। সুতরাং এধরনের সংগ্রামকে সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে গুলিয়ে ফেলাটা ভয়ংকর। যা কিনা সূচনাতেই মাওবাদী আন্দোলনকে গ্রাস করে। এভাবে লাইন বিনির্মাণ ও পার্টিগঠন দুটোই শুরু থেকেই সঠিক দিশা হারিয়ে ফেলে।

এর ফলে প্রকৃত সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম, যার কেন্দ্র তখন ছিল মনি-মোজাফ্ফর চক্রবিরোধী সংগ্রাম, সেটাই গুরুতরভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং

লাইন-বিনির্মাণকে গুর“তরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

ঘ) <u>মতাদর্শগত সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে গুলিয়ে ফেলা</u>

উপরে আলোচিত অন“ড়্গমাওবাদী সংগ্রামে বিভেদ শুধু এ জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। সংশোধনবাদবিরোধী আদর্শগত/মতাদর্শগত সংগ্রাম আর রাজনৈতিক সংগ্রামকে কার্যত গুলিয়ে ফেলা হয়।

"সংশোধনবাদী মানেই প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবী বা শত্র“"– এই ধরনের সূত্র মাওবাদী আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি গুর“ত্বপূর্ণ স্ড়ম্ভে পরিণত হয়। এর ফলশ্র“তিতে যে মাওবাদী কেন্দ্রগুলো একে অন্যকে সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করলো, তারা কার্যত পরস্পরকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবী হিসেবেও মূল্যায়ন করে বসলো। স্বভাবতই যারা মূলত মাওবাদী নয়, কিন্তু মাওকে তুলে ধরতো, এমনকি মাওচিন“ড়্গধারার বিভিন্ন অমাওবাদী ব্যাখ্যা দিত, অথবা নিজেদেরকে মার্কসবাদী দাবি করতো এমনসব ক্ষুদে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগঠন-কেন্দ্রকেও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মূল্যায়ন করলো। এভাবে দ্বন্দ্বের দুই প্রকৃতিকে গুলিয়ে ফেলার গুর“তর ভুল করা হয়। যা যুক্তফ্রন্ট গঠনের কাজকেও গুর“তরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। যদিও '৭৪-সাল পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত মাওবাদী আন্দোলনের এই ১ম পর্বের সময়কালে আমাদের পার্টিসহ বিভিন্ন কেন্দ্র বিভিন্ন সময়ে খ“ খ“ভাবে দ্বন্দ্বের প্রকৃতিকে এভাবে গুলিয়ে ফেলার গুর“তর ভুল পথ থেকে বের“বার প্রয়াশ পেয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত ভুল লাইন থেকে কখনোই বিচ্ছেদ ঘটেনি। তত্ত্বগত পরিসরে অস্পষ্টতা থেকে বের হতে না পারার কারণে অন“ড়ত তত্ত্বগতভাবে 'প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবী' লেবেল করার মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ধারা থেকে এ সময়কার মাওবাদী আন্দোলন বের“তে ব্যর্থ হয়।

* একটি সংগঠন/কেন্দ্র নিজেকে মতবাদিকভাবে কোন ধারার অনুসারী বলে দাবি করছে সেটা তার সাথে আমাদের সম্পর্কের একটা গুর“ত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তার সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামের ও সম্পর্কের জন্য মূল বিষয় এটা নয়। এটা নির্ধারিত হয় তার প্রকৃত শ্রেণি চরিত্র ও প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা।

আজকের যুগে যখন নিপীড়িত শ্রেণি/জাতির কাছে পুঁজিবাদের মতবাদ তার গুর“ত্ব হারিয়েছে তখন এইসব জনগোষ্ঠী নিজেদের মুক্তি আন্দোলনে বেশি বেশি করে মতবাদিকভাবে মার্কসবাদের দ্বারস্থ হয়। বিশেষত গত শতকে ষাট/সত্তর দশকের বিশ্বব্যাপী গণউত্থানের সময়কালে সারা বিশ্বজুড়েই সংগ্রামরত বহুবিধ শ্রেণি/গোষ্ঠী নিজেদেরকে মার্কসবাদী, এমনকি মাওবাদী দাবি করতে থাকে। এটা কোন খারাপ বিষয় নয়, বরং কমিউনিস্ট আদর্শেরই এক জগতজোড়া ইতিবাচক অগ্রগতির ফল। এটা এখনো বিশ্বের সব জায়গাতেই দেখা যাবে। যা বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রগতি ও গণসংগ্রামের জোয়ারের সময়ে আরো বেড়ে যাবে।

স্বাভাবিকভাবে একটি সংগঠন/কেন্দ্র নিজেকে কমিউনিস্ট/মাওবাদী দাবি করলেই সে মাওবাদী হয়ে যাবে– এটা কেউ আশা করবে না। বিপুল পরিমাণে সংগঠন সর্বহারা

শ্রেণির মতবাদকে গ্রহণ করা বা আত্মস্থ করা, এবং বিশেষভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মাওবাদ থেকে দূরেই থেকে যায়। তারা বিপ্লবী সর্বহারা পার্টি হবার বদলে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী, বা বিপ্লবী গণতন্ত্রী, অথবা সংস্কারবাদী ধরনের গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবেই থেকে যায়– যারা কিনা মার্কসবাদ/মাওবাদের প্রভাবে প্রভাবিত এবং তার অনেক উপাদান নিজেদের মতাদর্শ ও রাজনীতিতে মিশিয়ে দেয়। তবে এটাও সত্য যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের নিজেদের চক্রান্ড়ের অংশ হিসেবে এ জাতীয় কিছু সংগঠন খুলে দিতে পারে। কিন্তু সেটা সামগ্রিকভাবে সুপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ড় একটা পার্টিকে আমরা তার ঘোষিত ও অনুশীলিত রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা মূল্যায়ন করতে এবং তার ভিত্তিতেই আমরা তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধ্য। কোন রকম আত্মগত মূল্যায়ন দ্বারা চালিত হয়ে এই সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করলে তা আমাদের রাজনৈতিক লাইনে বড় সমস্যা আকারে উপস্থিত হবে। এ ধরনের সংগঠন তাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক/প্রগতিশীল/এমনকি মধ্যবিত্ত বিপ্লবী লাইন দ্বারা বিপুল সংখ্যক সংগ্রামী জনগণকে নিজেদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে– যারা সর্বহারা পার্টির মিত্র হিসেবে– আংশিক বা সামগ্রিক, সাময়িক বা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী– কাজ করতে পারে।

এই ধরনের সংগঠন নিজেদেরকে মার্কসবাদী দাবি করায়, এমনকি অনেকে মাওবাদী পার্টি দাবি করায় তারা যদি মূলত ক্ষুদে বুর্জোয়া মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনকে উপস্থাপন করে, তাহলে তারা সারবস্তুগতভাবে সংশোধনবাদকেই নিয়ে আসতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে তাদের এই সংশোধনবাদের সাথে একটা দীর্ঘস্থায়ী মতাদর্শগত/তাত্ত্বিক সংগ্রামের প্রয়োজন অবশ্যই থাকবে, থাকবে রাজনৈতিক সংগ্রামও, কারণ, সংশোধনবাদের প্রভাব তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য, কম বা বেশি করে। কিন্তু এ সংগ্রাম সব মিলিয়ে জনগণের মধ্যকার সংগ্রাম, এ দ্বন্দ্বকে অবৈরী দ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখতে হবে।

সংশোধনবাদ হলো মার্কসবাদবিরোধী মতবাদ। তাই, তা প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ, অসর্বহারা মতবাদ। এ কারণে সর্বহারা মতবাদ/মতাদর্শ তার সাথে মিলমিশ করে নিতে পারে না। মার্কসবাদকে আদর্শগত ও তত্ত্বগতক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী একরোখা সংগ্রাম সংশোধনবাদের সকল রূপের বির“দ্ধে অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তার সাথে রাজনৈতিক সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপে সর্বদাই বৈরী। এটা নির্ভর করে প্রতিটি সংগঠনের নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর।

অবশ্যই মতবাদিক প্রশ্ন ও রাজনৈতিক প্রশ্ন বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু সম্পর্কটা সরলরৈখিকও নয়। যাকিনা মাওবাদী আন্দোলন মূলত মনে করেছে।

– ষাট-সত্তর দশকে সংশোধনবাদের প্রধানতম কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হবার কারণে র“শ সংশোধনবাদবিরোধী মতাদর্শগত সংগ্রাম সেসময়ে একইসাথে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে মিলে গিয়েছিল। তাই, শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্যই নয়, আমাদের মত সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশে র“শ সংশোধনবাদ বিপ্লবের শত্র“র ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু একারণে মতবাদিক সংগ্রামের সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামকে

একাকার করে ফেলা যায় না।

যেমন, ৭০-দশকের পরে হোক্সাপন্থা কট্টর মাওবাদবিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কট্টর মাওবাদবিরোধিতা তাদের রাজনৈতিক লাইন ও কর্মসূচিকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য। কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদেরকে সর্বত্র ও সর্বদা বিপ্লবের শত্রুর কাতারে ফেলে দেয় না। তা নির্ভর করে সবকিছু মিলিয়ে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি নির্দিষ্ট সময়ে কী রাজনৈতিক কর্মসূচি ধারণ ও প্রয়োগ করছে তার উপর।

আমাদের মত পশ্চাদপদ দেশ, যেখানে বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিক, সেখানে এই প্রশ্নের গুরুত্ব খুবই বেশি। কারণ, এখানে বহু বিভিন্ন বুর্জোয়া মতবাদিক রাজনীতির সাথে সর্বহারা পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের কাজ করতে হবে। কিন্তু এর গুরুত্ব যে শুধু বিপ্লবের এই স্তরের জন্য তা নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এর গুরুত্ব থাকবে। বহু মতবাদিক সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে পরিচালনা করতে হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট, অবৈরী সম্পর্ক, সমঝোতা– ইত্যাদি সেখানে থাকতে হবে। কেউ যদি সারমর্মে মাওবাদী না হয়, সারমর্মে সমাজতন্ত্রী না হয়, কিন্তু নিজেকে দাবি করে মাওবাদী বা সমাজতন্ত্রী, তাহলে তার ঘাড় ধরে আমরা দাবি করতে পারি না যে সে নিজেকে মাওবাদী দাবি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা তার সাথে কোন অবৈরী বা সমঝোতামূলক সম্পর্কে যাবো না। তেমনি কেউ যদি আদর্শগতভাবে মাওবাদকে ভুল মনে করে, তার বিরোধিতা করে, তাহলেও আমরা তার সে অবস্থান পরিত্যাগ না করলে তার সাথে কোন সম্পর্কে যাবো না বলে পণ করতে পারি না। রাজনৈতিক শক্তির সাথে, সে যে-ই হোক, সম্পর্ক সর্বদাই নির্ধারণ করতে হবে সবমিলিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তার রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে, তার শ্রেণি চরিত্রের ভিত্তিতে। কেউ নিজেকে যা-ই দাবি করুক না কেন, যদি বিপ্লবের শত্রুদের ষড়যন্ত্রচক্রান্তের সাথে তার সম্পর্কযুক্ত থাকার অকাট্য প্রমাণ আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা তার শ্রেণি চরিত্র ও রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে তাকে মূল্যায়ন করবো এবং সম্পর্ক নির্ধারণ করবো। কিন্তু আমরা মতাদর্শগত সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে একাকার করে ফেলে তখন গুরুতর ভুল করেছি যার ফল বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি ডেকে এনেছে এবং বুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরাট উপকার করেছে।

– উপরোক্ত ভুলের কারণে ষাট-সত্তর দশকে মাওবাদীরা অন্য বহু সংখ্যক মাওবাদী বা কমিউনিস্ট দাবিদার মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রসম্পন্ন, কিন্তু বাম প্রগতিশীল দলের সাথে সম্পর্ক কার্যত বৈরী করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ভিন্ন-ধারার প্রকৃত মাওবাদীদেরকেও সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করার ফলে তাদেরকেও প্রায় শত্রুর কাতারে ফেলে দিয়েছে। এটা একটা বড় মৌলিক কারণ যে, কেন '৭১-সালের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী বহু বামপন্থী ও মাওপন্থী সংগঠন ও শক্তি খণ্ড খণ্ডভাবে যে সংগ্রাম করেছিল তা পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে ও আওয়ামী-ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একটা জোটে আসতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও নিজেদের মাঝে সংকীর্ণতাবাদী বৈরী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বারও উপক্রম হয়। '৭৪-পর্যন্ত

যে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণআন্দোলন সারা দেশকে প্লাবিত করেছিল, তার প্রধানাংশ মাওবাদী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও কেন তা একটা জোটবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। তা যদি হোত, তাহলে '৭১-সালে বা তার পরে এদেশের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারতো। এমনকি তা বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছে আসার প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যকার লাইনগত সংগ্রামকেও গভীর করার শর্ত সৃষ্টি করতে পারতো এবং একটি সঠিক লাইন বিনির্মাণ এবং একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনে তা ভূমিকা রাখতে পারতো। দুঃখজনকভাবে এই পর্বে-তো সেটা হয়ইনি, পরবর্তীকালে এর জের মাওবাদী আন্দোলন বিগত শতক জুড়েই বহন করেছে– কম বা বেশি করে– যা এমনকি এখনো তার কুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

* উপরোক্ত সমস্যাবলীর কারণে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই একটা সামগ্রিক সঠিক লাইন বিনির্মাণের সঠিক প্রক্রিয়া থেকে এই আন্দোলন বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষুদ্র ও ক্ষণিকস্থায়ী সংগঠন ছাড়াও এ আন্দোলন '৭১-সালের মধ্যে প্রধান যে চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল সেগুলোর থেকে বিভিন্ন সময়ে ছোট/বড় বিভিন্ন অংশ ছিটকে আন্দোলন থেকে বেরিয়ে গেলেও এই চারটি ধারা মূলত '৭৪-সাল পর্যন্ত এই প্রথম পর্বের সার্বিক বিপর্যয় দৃশ্যমান না হওয়া অবধি মাওবাদী বিপ্লবী শিবিরের মধ্যে সক্রিয় থাকে।

এই চারটি ধারা এদেশে সর্বহারা শ্রেণির মতবাদ হিসেবে মাওবাদকে প্রতিষ্ঠা করায় বিভিন্নমুখী ও মাত্রার ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তারা ক্রুশ্চভ-ব্রেজনেভ সংশোধন-বাদ ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিকে সংগ্রাম করে, জিপিসিআর-কে তুলে ধরে, নয়া গণতন্ত্রকে তুলে ধরে, সংসদীয় ধারার মুখোশ উন্মোচন করে, এবং সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করে। এভাবে তারা বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও ধারার বিপরীতে এক বিপ্লবী গণমুখী রাজনীতির ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে, এজন্য বিপুল ত্যাগ ও অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করে, অসংখ্য নেতৃত্ব ও কর্মী-জনগণ এর জন্য অতুলনীয় বিপ্লবী দৃঢ়তায় জীবন বিসর্জন দেন এবং গণবিপ্লবী সংগ্রামের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন।

কিন্তু উপরেই আলোচিত হয়েছে যে, এই মাওবাদী ও বিপ্লবী কাঠামোর মধ্যে এই সময়কার আন্দোলন ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও সমগ্র আন্দোলনেই রাজনৈতিক লাইনে বিভিন্ন বিচ্যুতি কাজ করেছে যা একদিকে মাওবাদী আন্দোলনকে বিভক্ত রেখেছে, অন্যদিকে বিপ্লবী সংগ্রামকে আরো এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। এবং একটি ঐক্যবদ্ধ একক শক্তিশালী মাওবাদী পার্টি গঠনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে।

আমরা এখন মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নাবলীতে আন্দোলনের এই প্রথম পর্বের ত্রুটিগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবো।

রাজনৈতিক সমস্যাবলী

১। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা

মাওবাদী আন্দোলন সমগ্রভাবে তার সূচনাতেই আমাদের দেশকে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত একটি কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করেছে, যেখানে সামন্ড়তান্ত্রিক সম্পর্কগুলো ব্যাপকভাবে বিরাজমান। একইসাথে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি যেখানে বিকাশ লাভ করেছে। এই ধরনের সমাজকে সাধারণভাবে আধা/নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আধা-সামন্ড়তান্ত্রিক সমাজ বলে চিহ্নিত করাটাও সে সময়ে সঠিক ছিল। সেকারণে সঠিকভাবেই মাওবাদী আন্দোলন বিপ্লবের স্ড়রকে নয়া গণতান্ত্রিক বলে নির্ধারণ করতে পেরেছিল। এবং শ্রেণি বিশ্লেষণ ও শত্র-মিত্র নির্ধারণ রণনৈতিকভাবে মূলগতভাবে সঠিক ছিল।

কিন্তু সমাজ-বিশ্লেষণে অনেকগুলো গুর"তর সমস্যা তখন থেকেই মাওবাদী আন্দোলনে গড়ে উঠেছিল, যা মাওবাদী আন্দোলনকে বিভক্ত করতে ও বিভক্ত রাখতে শুধু শর্ত জুগিয়েছে তা নয়, বরং পরবর্তী সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে তার কোন ইতিবাচক মীমাংসাও হয়নি। বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক) <u>একদিকে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি, অন্যদিকে জাতীয় সমস্যার বিশেষত্বকে না বোঝা ও গণ-আকাংখাকে ধরতে না পারা</u>

* মাওবাদী আন্দোলন শুর" থেকেই সমাজ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ও রূপের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাকালে পূর্ব বাংলা (বর্তমানের বাংলাদেশ) তৎকালীন অখ" পাকিস্ড়ানের অংশ ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে এবং পাকিস্ড়ানের দুই অংশের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার বাস্ড়ব কারণে শুধু পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে মাওবাদী আন্দোলন বিকশিত হয়। এটা একটা বাস্ড়ব কারণ ছিল বটে, কিন্তু একটি আন্ড়র্জাতিকতাবাদী পার্টি হিসেবে শুর" থেকেই সমগ্র পাকিস্ড়ান রাষ্ট্র ভিত্তিক কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার নীতি ও বাস্ড়ব পদক্ষেপসমূহ না নিয়ে শুধু পূর্ব বাংলাভিত্তিক লাইন হাজির করার মাঝে শুর"তেই জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি কাজ করেছিল। পূর্ব বাংলাভিত্তিক লাইন হাজির করার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্ড়ানী জাতীয় নিপীড়ন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পেক্ষাপট গুর"তর বাস্ড়ব শর্ত সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু সেটা সর্বহারা আন্ড়র্জাতিকতাবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারাকে যুক্তিযুক্ত করে না ।

* মাওবাদী ধারাগুলোর মাঝে এই প্রথম পর্বে আমাদের পার্টির রাজনৈতিক লাইনে পূর্বাপর জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি কাজ করেছে। কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি তার পৃথক সত্তা গড়ে তোলার একটা প্রধানতম তাত্ত্বিক ভিত্তি পেয়েছিল

এই জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি থেকে। পার্টি পূর্ব বাংলার অতীত সমাজ বিশ্লেষণেও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি দ্বারা চালিত হয়। পার্টি মূল্যায়ন করেছিল যে, বৃটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বটি একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব ছিল, এবং এর দ্বারা পার্টি বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে ভারতবর্ষের বিভক্তির পক্ষে একটি ন্যায্যতা খুঁজে পায়। এটা কার্যত তৎকালীন মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে সৃষ্ট একটি বিচ্যুতি ছিল, যার উৎস ছিল বস্তুর সারমর্মকে না দেখে তাকে উপরি উপরি দেখার মধ্যবিত্ত প্রয়োগবাদী সমস্যা।

* দৃষ্টিভঙ্গির এই সমস্যাই ষাটের দশকের শেষার্ধে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনায় পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্ড়ানী জাতীয় নিপীড়নের সমস্যাকে দেখার ক্ষেত্রে কার্যত লেনিনবাদ থেকে সরে যায়। এই অভ্যন্ড়রীণ জাতীয় সমস্যাকে পার্টি ঔপনিবেশিক সমস্যা আকারে চিহ্নিত করে, যার সমাধান আকারে পার্টি পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতার কর্মসূচিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি আকারে হাজির করে। এটা সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঔপনিবেশিক সমস্যার সাধারণ সমস্যার সাথে রাষ্ট্রের অভ্যন্ড়রস্থ জাতীয় সমস্যাকে প্রায় একাকার করে ফেলে এবং এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে বড় বিতর্ক ও বিভক্তির জন্ম দেয়।

যদিও '৭১-সালের ১লা মার্চে পাকিস্ড়ানী শাসক গোষ্ঠীর নতুন ষড়যন্ত্রের মুখে সমগ্র জাতি ও জনগণ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কর্মসূচিতে নতুন এক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন, এরই ফলশ্র"তিতে শেখ মুজিব-আওয়ামী লীগের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব চরম সংকটে পড়ে, এরই এক পর্যায়ে ২৫ মার্চে ফ্যাসিস্ট পাকিস্ড়ানী বাহিনী পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির আকাংখা ও সংগ্রামকে দমনের জন্য সমগ্র জাতি ও জনগণের উপর এক সার্বিক গণহত্যা নামিয়ে আনে, এবং ২৫ মার্চের পর শেখ মুজিবের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরাও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কর্মসূচি আনতে বাধ্য হয়, সেরকম এক বিশেষ অবস্থায় মাওবাদীদের পক্ষ থেকেও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অধীনে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতার কর্মসূচি আনাটাই সঠিক ছিল, এবং মাওবাদী আন্দোলনের অন্য ধারাগুলোও বেশিরভাগ সেটা বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এনেছিল, কিন্তু কেউই একে সঠিক মার্কসবাদী-লনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্থাপন করতে পারেনি। যে কারণে আন্ড়র্জাতিকতাবাদী সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাখ্যা করতে না পারায় জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি বিভিন্ন রূপে সমগ্র আন্দোলনে বিরাজমান থাকে। এই মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিরই একটা নিকৃষ্ট ও বিপরীতধর্মী বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আঃ হক নেতৃত্বাধীন ইপিসিপি/এমএল-এর মূল নেতৃত্বের একটি অংশ দ্বারা ভারত-সোভিয়েতের আগ্রাসনকে বিরোধিতার ন্যায্য অবস্থান থেকে পাকিস্ড়ান রক্ষার প্রতিরোধ যুদ্ধ-লাইন আনবার ভয়ানক ভ্রান্ড়ির মধ্য দিয়ে। যা কিনা পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় সমস্যাকে গুর"ত্ব সহকারে দেখতে ব্যর্থই শুধু হয়নি, তা থেকে উদ্ভূত জনগণের ন্যায্য আকাংখা ও ন্যায্য বিদ্রোহের তাৎপর্য বুঝতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

* '৭১-সালের শেষ দিকে যখন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মদদে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায় বাঙালী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা

রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়, এবং একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে "বাংলাদেশ" রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, তখন মাওবাদী আন্দোলনের প্রধানতম অংশই পুনরায় জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির আরেকটি নবঅধ্যায়ের সূচনা করে। এসবই পরবর্তীকালে সার্বিক বিপর্যয়সৃষ্ট প্রতিকূল সময়ে একটা প্রধানতম অংশের দ্বারা রুশ-ভারত অক্ষের বিপরীতে শাসক শ্রেণির মধ্যকার মার্কিনের দালালদের ক্ষমতা দখলকে সমর্থন করে এবং তার সাথে যুক্তফ্রন্টের নামে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে বিলীন হবার ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল।

* অবশ্য পূবাকপা ধারাটি উপরোক্ত ধরনের জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করার রাজনৈতিক লাইন কখনো আনেনি। এমনকি আমাদের পার্টি ব্যতীত অন্য কোন ধারা '৭১-পূর্বকালে আমাদের মত ক'রে ঔপনিবেশিক সমস্যা বলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করবার জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিপূর্ণ রাজনৈতিক লাইনও আনেনি। কিন্তু অপরাপর ধারাগুলো সবাই একদিকে পূর্ব বাংলাভিত্তিক লাইন পেশের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির সমস্যায় একইভাবে আক্রান্ড় হয়, অন্যদিকে তারা পূর্ব বাংলার জাতীয় সমস্যার বিশেষত্বকে কার্যত গুরুত্বহীন করে বা এড়িয়ে চলে। বড় জোর তার তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দিয়ে তারা বাস্ড়ব কর্মসূচিতে তাকে কার্যত উহ্য করে দেয়। এভাবে চীন বা ভারতের মত একটি আধাঔপনিবেশিক আধাসামন্ড়তান্ত্রিক সমাজের থেকে পূর্ব বাংলার সমাজের তৎকালীন প্রধানতম বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং গোঁড়ামিবাদীভাবে অবিকল চীন বা ভারতের মত করে সমাজের বিশ্লেষণ হাজির করে, যা তাদেরকে '৭১-সালের জটিল রাজনৈতিক অবস্থায় লেজেগোবরে পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত করে। সমগ্র জাতি যখন পাকিস্ড়নী ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে প্রতিরোধ করছিল, তখন তাদের একটা অংশ (যেমন, পূবাকপা ধারা) সামন্ড়বাদ প্রধান ক'রে সংগ্রামের লাইন হাজির করে। কেউ কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ চালায়। কেউবা রুশ-ভারতের আগ্রাসন ও চক্রান্ড়ের বিরুদ্ধে পাকিস্ড়ন-রক্ষার প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাবার গণ-আকাংখাবিরোধী লাইনে পরিচালিত হয়। এভাবে সমাজের গোঁড়ামিবাদী বিশ্লেষণ তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

– একইভাবে তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিশেষ চরিত্র বুঝতেও ব্যর্থ হয়। ভারত যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়, তাই, তারা দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে ভারতের বিশেষ আগ্রাসী সমস্যাকে স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করে। এবং তাকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের তৎপরতার নিছক নির্দেশ পালনের মত করে গুরুত্বহীন করে দেয়। অন্যদিকে আমাদের পার্টি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে, এবং '৭১-সালে ও পরবর্তীকালে তার সম্প্রসারণবাদী ভূমিকাকে কার্যত সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক সমস্যার সাথে একাকার করে ফেলে।

* এভাবে মাওবাদী আন্দোলনে সমাজের বিশেষত্বকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ও সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে না বোঝার থেকে উদ্ভূত যান্ত্রিক ও বাস্ড়ববিচ্ছিন্ন লাইন ও মূল্যায়ন সার্বিকভাবে সঠিক একটি আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন

হাজিরে ব্যর্থ হয়। যা কিনা মাওবাদী আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক হিসেবে, এবং পরবর্তীকালে অনেক রাজনৈতিক অধপতনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

খ) <u>ভূমি সমস্যা ও শ্রেণির রূপান্ড়র/শ্রেণি বিশ্লেষণ</u>

মাওবাদের অনুসরণে কৃষি অর্থনীতিকে আধা সামন্ড়তান্ত্রিক মূল্যায়ন করা এবং "খোদ কৃষকের হাতে জমি"– এই নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী ভূমি-সংস্কারের কথা বললেও পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, বিশেষত কৃষি অর্থনীতির উপর মূর্ত-নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ও আলোচনা আনতে মাওবাদী আন্দোলন কার্যত ব্যর্থ হয়।

পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পরপরই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন শুরু হয়। এটা একইসাথে গ্রামাঞ্চলের তথা সমগ্র সমাজের শ্রেণি সজ্জাতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে।

এই রূপান্ড়রকে যথেষ্ট গভীরভাবে আলোচনা দূরের কথা, তার সাধারণ স্বীকৃতিও মাওবাদী আন্দোলনে পাওয়া যায় না। আমাদের পার্টিতে কমরেড এসএস আমলের শ্রেণি বিশ্লেষণ দলিলে এমনকি জমিদার শ্রেণির উল্লেখও দেখা যায় যাকিনা এসেছিল কার্যত চীনা সমাজের শ্রেণি বিশ্লেষণকে প্রায় হুবহু অনুকরণ করার থেকে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ও বুর্জোয়া ধারা থেকে কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের উপর বেশ কিছু লাইন ও বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে বাস্ড়ব তথ্য-উপাত্ত সহকারে এবং তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দ্বারা তেমন একটা খন্ড়ন মাওবাদী আন্দোলন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলন যতটা বিতর্ক করেছে রাজনৈতিক লাইন দ্বারা, ততটাই কম আলোচনা করেছে অর্থশাস্ত্রের উপর। এটা মাওবাদী আন্দোলনের একটি গুরুতর দুর্বলতা ছিল যাকে কখনই সে কাটাতে পারেনি। বরং সেটা কাটাতে পারার আত্মগত সামর্থ্য মাওবাদী আন্দোলনের দিন দিন কমে এসেছে।

গ) <u>আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির বিকাশ</u>

একই ধরনের দুর্বলতা আমরা পাবো আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির বিকাশ ও অবস্থান আলোচনা করার ক্ষেত্রেও।

পূর্ব বাংলার সমাজে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ ও তার স্থান সম্পর্কে কোন গভীর আলোচনা ও মূল্যায়ন মাওবাদী আন্দোলন করতে পারেনি।

সাম্রাজ্যবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্ড়বাদ– এই তিন মৌলিক শত্রুকে একদিকে 'এক ও অবিভাজ্য' বলা হয়, অন্যদিকে এর বিরোধিতা করতে গিয়ে এই তিন মৌলিক শত্রুর পরস্পর জড়ানো ও নির্ভরশীল সম্পর্ক এবং আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির স্বতন্ত্রতাকে অবহেলা করা হয়।

কম.এসএস মাওকে অনুসরণ ক'রে তাঁর রচনায় 'আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার কোন ভাল আলোচনা আমাদের পার্টিসহ কোন কেন্দ্রই সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে করেনি। বরং সমস্ড় ধারাগুলোই অভ্যন্ড়রীণ শত্রু শ্রেণি হিসেবে 'সামন্ড় শ্রেণি'-কে গুরুত্ব দেয়।

এ কারণেই মৌলিক দ্বন্দ্বগুলোর আলোচনায় কোথাও আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে। বিপ্লবকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লব। আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিকে এখানে দেখানো হয় না। যদিও মাওবাদীরাই এদেশে সর্বপ্রথম আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণিকে বিপ্লবের শত্রু শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং জাতীয় বুর্জোয়াকে তার থেকে পৃথক করেছে। মাওবাদীরাই তিন শত্রু বা ছয় পাহাড়– এ জাতীয় সূত্রায়ন দ্বারা আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াকে চিহ্নিত করেছে।

– সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশীয় অভ্যন্তরীণ শত্রু শ্রেণি হিসেবে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তার ভূমিকার ভাল কোন আলোচনা মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে তেমন একটা হয়নি। বরং তার চেয়ে জোরালো হয়ে উঠে এসেছে সামন্তশ্রেণির কথা, যাকিনা চীনের মত হুবহু দেখার একটা প্রবণতা শুরু থেকে মাওবাদী আন্দোলনে বিরাজ করছিল। এটা বাস্তব সম্মত ছিল না, যদিও গ্রামাঞ্চলে সামন্তশ্রেণির আলোচনাটা দরকারী অবশ্যই ছিল।

২। বিপ্লবী রাজনীতি

আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষত ক্রুশ্চভীয়-মনিসিং সংশোধনবাদের সুদীর্ঘকালীন সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদ এবং সংসদীয়বাদের বিপরীতে মাওবাদী আন্দোলন শুরু থেকেই বিপ্লবী বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিল। শুধু তাই নয়, তারা মাওবাদী দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথকেও গ্রহণ করেছিল। পাশাপাশি তারা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিপ্লবী রাজনীতিকেও গ্রহণ করে। এরই অনুসরণে কিছু আগে বা পরে সবগুলো মাওবাদী ধারাই গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে বাস্তব সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার পথেও এগিয়ে যায়, যদিও এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার উপলব্ধি ও প্রয়োগের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য ও অসমতা ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে '৭৪-পর্যন্ত বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক মহান জোয়ার সারা দেশকে প্লাবিত করে।

কিন্তু এই বিপ্লবী রাজনীতিকে গ্রহণ করলেও এ সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবেই বিভিন্ন দুর্বলতা ও বিচ্যুতি মাওবাদী আন্দোলনে বিরাজ করছিল। খোদ বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে উপলব্ধির এই দুর্বলতা এ সময়কার বিপ্লবী আন্দোলন, তথা গণযুদ্ধকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ক) <u>কৃষক সমস্যা, তথা কৃষি বিপ্লব ঃ</u>

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব গ্রহণ করার কারণে মাওবাদী আন্দোলনের সকল ধারাগুলোই কৃষক সমস্যার কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে ও কৃষি বিপ্লবকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অনুশীলনে সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা তার বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুতর সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত ছিল। এভাবে বিপ্লবী রাজনীতিকে বেশ পরিমাণে দুর্বল করে তুলেছিল।

আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ে ভুলভাবে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করার কারণে

কৃষি বিপ্লবের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব লাইনগতভাবেই কমে গিয়েছিল। আমাদের পার্টিতে শ্রেণি লাইনের বিচ্যুতির কারণে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভিত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তা কৃষক সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল। ইপিসিপি-উদ্ভূত অন্য ধারাগুলোতে কৃষক সমস্যাকে দেখা হয়েছিল অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমাদের পার্টি ও পূবাকপা গণযুদ্ধকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং বিপ্লবী ক্ষমতা দখলকে সঠিকভাবেই গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু কৃষকের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির প্রশ্নটিতে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এসব কারণেই "খোদ কৃষকের হাতে জমি"– এই মূল কর্মসূচিটিকে উল্লেখ করলেও কৃষকের প্রকৃত সমস্যাবলী ও তার ভিত্তিতে কর্মসূচিগুলোতে গভীরভাবে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। কৃষি-বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরাটিই এর মূল কারণ। যার ফলে সমগ্র আন্দোলনেই বিপ্লবী রাজনীতি দুর্বল থাকে, যা আমাদের আন্দোলন ও গণযুদ্ধ কাংখিত মাত্রায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারার একটা বড় কারণ।

খ) <u>বিপ্লবী রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমার্থক মনে করা ঃ</u>

দীর্ঘকালীন সংসদীয়বাদ ও অহিংস অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে গ্রহণ করার মাধ্যমে বিপ্লবী রাজনীতির প্রশ্নে মৌলিক ইতিবাচক উল্লম্ফনমূলক অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু এটা সংগ্রাম ও সংগঠনের রূপের ক্ষেত্রে যতটা স্পষ্ট ছিল, মৌলিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। ফলে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে অতীতের সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদের সাথে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের বদলে সংগ্রামের রূপের উপর অধিক গুরুত্ব পড়ে। এর ফলে মাওবাদী আন্দোলন বিপ্লবী রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমার্থক মনে করার এক নতুন বিচ্যুতিতে ভুগতে শুরু করে।

এর দ্বিমুখী কুফল আমরা লক্ষ্য করি গোটা মাওবাদী আন্দোলনে। এক ঃ যেকোন সময়ে সশস্ত্র সংগ্রাম না করলেই তাকে বিপ্লবী রাজনীতি থেকে খারিজ করে দেয়ার সংকীর্ণতাবাদী ভুল। ফলত গণযুদ্ধের বিপ্লবী প্রস্তুতির গুরুত্বকে না বোঝা। এবং বিভিন্ন বিপ্লবী শক্তি, যারা এখনো সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েনি, তাদের সাথে একটি সংকীর্ণতাবাদী বিভেদাত্মক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া। দুই ঃ সশস্ত্র সংগ্রাম করলেই তাকে বিপ্লবী রাজনীতি মনে করা। ফলত সশস্ত্র সংস্কারবাদের সাথে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম, তথা গণযুদ্ধের রাজনীতিগত পার্থক্য করতে না পারা।

বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে এই অপরিপক্ক উপলব্ধি ব্যাপকভাবে মাওবাদী আন্দোলনের রাজনীতিকেই দুর্বল করে ফেলেছে। যা আমরা পরবর্তীকালে আরো যান্ত্রিকভাবে বিকশিত হতে দেখবো।

গ) <u>সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ ঃ</u>

উপরোক্ত কারণেই আন্দোলনে একটা সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতি শুরু থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষত ইপিসিপি/এমএল ধারার মাঝে আদি অর্থনীতিবাদের ব্যাপক প্রভাবের কারণে, ও তার সাথে বিপ্লবী বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ না হওয়ায়

এই ধারা থেকে উদ্ভূত কেন্দ্রগুলো সশস্ত্র সংগ্রামে নামলেও গণলাইনের নামে, কৃষকের আশু/অর্থনৈতিক ইস্যুর আন্দোলনকে তারা যতটা গুর"ত্ব দেয় (অবশ্যই এখন সশস্ত্র ধারায়), ততটাই কম গুর"ত্ব দেয় রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য গণযুদ্ধকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে।

পূবাকপা/সিএম-পন্থী ও পিবিএসপি[৩] ধারায় উপরোক্ত ধরনে আদি অর্থনীতিবাদের ধারাবাহিকতার প্রভাব কম থাকলেও তাদের দ্বারা গৃহীত খতম-লাইনের নেতিবাচক বিকাশ, এবং ঘাঁটি-প্রশ্নে অস্বচ্ছতা ও বিচ্যুতি ভিন্ন ধরনে সশস্ত্র সংস্কারবাদ/অর্থনীতিবাদের জন্ম দেয়। খতম ক্রমান্বয়ে প্রতিশোধবাদ বা খারাপ লোক উচ্ছেদের এ্যাকশনবাদ রূপে গড়ে উঠতে থাকে এবং বিপ্লবী ক্ষমতাদখলের রাজনীতিকে দুর্বল ক'রে দেয়। আর ঘাঁটি থেকে বিচ্যুতি বিপ্লবী ক্ষমতা দখলকে দূরবর্তী, বা দেশব্যাপী বিস্ড়তির শর্তাধীন ক'রে ফেলে। এভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করা সত্ত্বেও বিপ্লবী রাজনীতির স্থলে সংস্কারবাদ গড়ে উঠতে থাকে।

ঘ) <u>শীর্ষ তত্ত্ব</u>

সারবস্তুতে অর্থনীতিবাদী এই লাইনটি মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে প্রধান ধারাগুলোর মাঝে দৃশ্যমান ছিল না, কারণ, প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েছিল, কম/বেশি সচেতন বা অসচেতনভাবে। কিন্তু এই প্রধান ধারাগুলোর বহির্ভূত কিছু কিছু অংশের মাঝে তখনো তা বিরাজমান ছিল, যাকে কিছুদিন প্রতিনিধিত্ব করতো জাফর-রনো-মেনন, উমর, দেবেন-বাসার– ইত্যাদি গ্র"পগুলো।

এই ধারাটি কার্যত গণযুদ্ধকে পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগ্রামকে পর্যায়ক্রমে সশস্ত্র পর্যায়ে নেয়া– এ জাতীয় বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের লাইনটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম যে, গণআন্দোলন একটা পর্যায়ে গড়ে তোলার পর তার শীর্ষে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুর" করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের সমস্যাটা এখানে ছিল না যে, সশস্ত্র সংগ্রাম/গণযুদ্ধ শুর" করার জন্য কিছু রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন– এটা মনে করা। বরং তাদের আসল সমস্যাটি ছিল বিপ্লবী রাজনীতিকে উপলব্ধি না করায়, লেনিনের "কী করিতে হইবে"-কে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে না পারায়। ফলে বিপ্লবী রাজনীতিকে আরোপ করার বদলে তারা এক্ষেত্রে একটি অর্থনীতিবাদী ধারাকে গ্রহণ করেছিল।

১ম পর্বের উত্থান যখন বিপর্যস্ড় হয় তারপর তার সারসংকলনকে কেন্দ্র করে আরো অনেক কেন্দ্র গড়ে ওঠে যারা এই ধারায় বক্তব্য রাখে। বাস্ড়ব এটা তখন প্রধান ধারায় পরিণত হয়ে ওঠে। এই ধারানুসারীরা প্রায় সবাই পরবর্তীকালে আন্ড়র্জাতিক মহাবিতর্কের ঝড়ঝাপ্টায় মাওবাদ থেকে সরে পড়ে। তবে মাওবাদী শিবিরের অভ্যন্ড়রে এটা থেকে যায়, যা আমরা বিএসডি/এমএল[৪] ধারার মাঝে শেষ পর্যন্ড় দেখতে পাই।

৩। গণযুদ্ধ

ক) <u>ঘাঁটি প্রশ্ন</u>

মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনাতেই দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথকে গ্রহণ করার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়ার কথা ব্যক্ত করেছিল। তারা গ্রামে ঘাঁটি গড়া এবং গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর রণনীতিকে সঠিকভাবেই তুলে ধরেছিল। কিন্তু বাস্ড়বত ঘাঁটি প্রশ্নটিকে বিগত শতকের মাওবাদী আন্দোলন কখনই সাধারণ তাত্ত্বিক স্বীকৃতি ব্যতীত মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে কাজে প্রয়োগের জন্য আঁকড়ে ধরেনি। ফলে এরসাথে যুক্ত একঝাঁক রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক ও মতাদর্শগত সমস্যা দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলন আচ্ছন্ন হয় যার দীর্ঘস্থায়ী খারাপ প্রভাব আন্দোলনে পড়ে।

এর কারণ হিসেবে কাজ করেছে গণযুদ্ধের লাইনে ঘাঁটির গুর"ত্বটিকে আমাদের আন্দোলনের ধরতে না পারার সমস্যা ।

– "ঘাঁটি হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু"– এই মাওবাদী/মাওবাদ-সম্মত সূত্রটি মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে প্রথমে পের"র পার্টি, এবং পরে 'রিম'[৫]-এর মাধ্যমে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলন এ শিক্ষাটিকে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করেনি। তাকে সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেও তাই ব্যর্থ হয়।

প্রথমদিকে মাওবাদী আন্দোলনে তাত্ত্বিক স্বীকৃতির সাথে ঘাঁটি-প্রশ্নের যতটাও গুর"ত্ব ছিল, বাস্ড়ব অনুশীলন এগিয়ে যাবার প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট বিশেষ নীতিগুলো গড়ে ওঠার কালে তা থেকে বরং দূরে সরে পড়া হয়। অন্য দুটো ধারা– ইপিসিপি/এমএল ও বিএসডি/এমএল– যারা ততটা গুর"ত্ব সহকারে কখনই গণযুদ্ধকে উপলব্ধি করেনি ও আঁকড়ে ধরেনি তাদের ক্ষেত্রে-তো প্রশ্নই আসে না, কিন্তু পিবিএসপি ও পূবাকপা– যারা গণযুদ্ধকে তুলনামূলক শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল, তারাও বরং মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বেই কার্যত ঘাঁটি-প্রশ্ন থেকে দূরে সরে যায়। আমাদের পার্টি এসএস-নেতৃত্বাধীনে এদেশের বিশেষ অবস্থার কথা বলে ঘাঁটিকে গণযুদ্ধের সারবস্তু না ক'রে তাকে আঁকড়ে ধরার বদলে বরং দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম ছড়ানোকে আঁকড়ে ধরে, এবং ঘাঁটিকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভবিষ্যতের বিকাশের হাতে ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে পূবাকপা "অসংখ্য ছোট ছোট সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি" তৈরির কথা বলে বাস্ড়বে খতম-লাইনে সশস্ত্র সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ ও ঘাঁটিকে একাকার করে ফেলে, এ্যাকশন এলাকা গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটির পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং একইভাবে দেশব্যাপী খতম-সংগ্রাম/সশস্ত্র সংগ্রামকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিকাশ করাকে আঁকড়ে ধরে।

ফলত এই রাজনৈতিক ভ্রান্ড়ি সমগ্র সাংগঠনিক ও সামরিক পরিকল্পনাকে এবং কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রণনৈতিক পরিকল্পনা ও কাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার নীতি

কার্যত বর্জিত হয়।

আমাদের দেশের কিছু বিশেষ অবস্থা ঘাঁটি-প্রশ্নের রাজনৈতিক ও সামরিক উপলব্ধির দুর্বলতা সৃষ্টিতে বিশেষ শর্ত দিয়েছে সন্দেহ নেই। সমতলভূমি, ছোট দেশ, ঘনবসতি, পাহাড়-জঙ্গল না থাকা (পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অঞ্চলটি বাদে)– এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিঃসন্দেহে সামরিক রণনীতি-রণকৌশল নির্ধারণে গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু যে মূল রাজনৈতিক প্রশ্নটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, গণযুদ্ধ/সশস্ত্র সংগ্রাম ক্ষমতাদখলকে ঘিরে আবর্তিত যদি না হয়, যার রূপকে অবশ্যই হতে হবে আগে অনুকূল জায়গায় ক্ষমতা দখল ক'রে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা, যাকিনা আমাদের মত দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের দেশে গুণগতভাবে পৃথক তাৎপর্যসম্পন্ন, তাহলে তা বিপ্লবী রাজনীতিকে দুর্বল করে দেবে। তাই, গণযুদ্ধ যে দেশে যে সময়েই যে শক্তি নিয়েই শুরু করা হোক না কেন, তাকে অনুকূল রাজনৈতিক-সামরিক-ভৌগোলিক অঞ্চলে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে ঘিরেই আবর্তিত হতে হবে। এটা ভবিষ্যতে আপনাআপনি গড়ে ওঠার বিষয় নয়, বরং যুদ্ধের একেবারে সূচনা থেকে, এমনকি তার প্রস্তুতি পর্যায় থেকে এই কর্তব্যকে কেন্দ্রে রেখে যাবতীয় রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে যাবতীয় তৎপরতা পরিচালনা করতে হবে।

'৭১-সালের বিশেষ অবস্থায় আমাদের পার্টি বরিশালের পেয়ারাবাগান অঞ্চলে খুব অল্প একটি সময়ের জন্য ছোট একটি এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। অন্যান্য মাওবাদী ধারাও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এভাবে ছোট/বড় ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল বৈ কি। কিন্তু একে অতিরঞ্জিত করা যায় না। কারণ, এটা ঘাঁটি প্রশ্নে সাধারণ স্বীকৃতির একটা বিশেষ অবস্থার প্রয়োগের চেয়ে খুব একটা উচ্চতর কিছু ছিল না। এটা পার্টিগুলোর লাইনকে কোনভাবেই বিকশিত করেনি। বরং আমাদের পার্টির ক্ষেত্রে তা নেতিবাচকভাবে বিকশিত হয়েছিল।

'৭১-এর বিশেষ অবস্থায় যখন রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে পড়েছিল, তখন ক্ষমতার শূন্যতার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য শুধু মাওবাদীরাই নয়, বহু শক্তিই পদক্ষেপ নেয়। এমনকি আওয়ামী ধারার কাদের সিদ্দিকী বা এ জাতীয় কেউ কেউ পর্যন্ত তাদের মত করে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। '৭১-সালে এই সব সাময়িক ঘাঁটির তাৎপর্য অবশ্যই কম ছিল না। কিন্তু এটা মাওবাদী গণযুদ্ধে ঘাঁটির গুরুত্বের সঠিক রাজনৈতিক উপলব্ধির দিকে, এবং সে অনুযায়ী সামরিক-সাংগঠনিক পরিকল্পনার দিকে বিকশিত হতে ব্যর্থ হয়। আমাদের পার্টিতে দেখা যায় যে, শত্রুর দমন বৃদ্ধি পেলে পেয়ারাবাগান থেকে পশ্চাদপসরণের পর– যা সঠিক ছিল– বরং দেশব্যাপী ছড়ানো অনেকগুলো ছোট ছোট গেরিলা অঞ্চল/এ্যাকশন এলাকা হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা স্পষ্টতই ঘাঁটি চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চলব্যাপী শক্তি কেন্দ্রীকরণ, একক রাজনৈতিক ও সামরিক কমান্ড গড়ে তোলা, এবং বিস্তৃত গেরিলা অঞ্চল গড়ে তুলে তাকে উপযুক্ত সময়ে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠায় উল্লম্ফন দেয়া– এভাবে আগানো হয়নি। বরং পেয়ারাবাগান থেকে সরে আসার ও ছড়িয়ে পড়ার সঠিক পদক্ষেপটি ঘাঁটি-লাইন থেকে বিচ্যুত হবার যুক্তি হিসেবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যা

পরবর্তীকালে, '৭৩/'৭৪-সালে আরো নেতিবাচকভাবে বিকাশলাভ করে। এটা না করলে '৭১-সালে, এবং '৭৪-সালে এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারতো।

খ) <u>খতম লাইন</u>

মাওবাদী গণযুদ্ধের এদেশীয় ইতিহাসে খতম লাইন একটা বড় স্থান দখল করে রয়েছে। আন্দোলনের উত্থানের ইতিহাসে এর অবদানকে উপেক্ষা করা যাবে না।

এই লাইন আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের মাওবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিএম। তিনি বলেছিলেন খতম হলো একইসাথে শ্রেণি সংগ্রামের উচ্চ পর্যায় এবং গেরিলাযুদ্ধের সূচনা, যদি গেরিলা কায়দায় সে খতমটা করা হয়।

আমাদের দেশেও গেরিলা যুদ্ধ সূচনার জন্য খতম লাইনকে গ্রহণ করা হয়েছিল। যদিও আমাদের পার্টি কমরেড এসএস-এর নেতৃত্বে এদেশে খতম লাইন আসবার একেবারে সূচনাকালে অন্যবিধ উপায়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিল। '৭০-সালের ৫ মে পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে তা সূচিত হয়। কিন্তু শিগগিরই তিনি অন্যদের মত খতম লাইন গ্রহণ করে নেন। এবং '৭০-সাল থেকেই খতম লাইনে যুদ্ধ শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনা বা এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিতে বেশ কিছু স্বতন্ত্রতা থাকলেও খতম লাইন মূলত এখানে কার্যকর ছিল। পূবাকপা ধারা খতম লাইনকে, সিএম-শিক্ষার অংশ হিসেবে বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করে। অন্য দুটো ধারাও তাদের সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী সংগ্রামের আওতায় খতম-এ্যাকশনকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করে। এক কথায় কিছু কিছু বিভিন্নতা বা স্বতন্ত্রতা থাকলেও এদেশের মাওবাদী আন্দোলন গণযুদ্ধ/সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার জন্য খতম লাইনকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিল এটা বললে ভুল হবে না।

শূন্য থেকে বাহিনী গঠন ও সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার জন্য, বিশেষত কৃষকদের নিয়ে, এ্যাকশন হিসেবে খতম একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষত দীর্ঘকালীন সংসদীয় শান্তিপূর্ণ সংস্কারবাদী সংশোধনবাদী পথ থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রকৃত বিপ্লবী ধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খতম লাইন এদেশে ও ভারতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

– কিন্তু খতম লাইনের অন্তর্গত কিছু সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতি ছিল যা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বড় সমস্যা আকারে আবির্ভূত হতে থাকে।

প্রথমত খতম লাইনকে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার একটি সাধারণ লাইন হিসেবে আনাটা ভুল ছিল। অবশ্য আমাদের পার্টি অল্প কিছু দিনের জন্য খতম লাইন গ্রহণের পূর্বে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার জন্য গেরিলা এ্যাকশনের অন্যবিধ রূপ প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু পরে কার্যত একে সাধারণ লাইনের মতই সবাই গ্রহণ করে ও প্রয়োগ করে, যদিও তার ব্যাপকতা বিভিন্ন ধারার মাঝে বিভিন্ন রূপের ছিল।

খতম-লাইনের এই ত্রুটি (সূচনার সাধারণ লাইন) সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার অন্যান্য রূপকে আড়াল/দুর্বল করে দেয়। শুধু তাই নয়, একবার খতম শুরু হবার পর তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব এসে পড়ে, তাকে রণনৈতিক লাইনের মত প্রয়োগ করা হয়–

যা পূবাকপা ধারার মাঝে আমরা দেখতে পাই, বিশেষত পরবর্তীকালে। আমাদের সহ অন্যান্য ধারাতেও খতমের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়।

অবশ্যই একে স্বীকৃতি দিতে হবে যে, খতমের এই আধিক্য সত্ত্বেও, এবং লাইন-গতভাবে খতমের একটি স্ড়্রকে ভুলভাবে গ্রহণ করে নিলেও এ্যাকশনের অন্যান্য রূপগুলোকে সৃজনশীলভাবে আবিষ্কার করা ও প্রয়োগ করা, এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে সর্বব্যাপী বিস্ড়ৃত করার ক্ষেত্রে এই পর্বে কমরেড এসএস সবচেয়ে সৃজনশীল গতিশীল ও সাহসী অবদান রেখেছিলেন, যা এখনো পর্যন্ড় সবচেয়ে উন্নত মাত্রাকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু একেও স্বীকৃতি দিতে হবে যে, কমরেড এসএস ধারাও খতম-লাইনের এই ত্র"টির বাইরে ছিল না। যাকিনা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত বাস্ড়ব ও আত্মগত পরিস্থিতিতে পার্টির সামরিক বিকাশে গুর"তর খারাপ ফল রাখে।

দ্বিতীয়ত, খতম লাইন শুধু সূচনার সাধারণ লাইনটি আনে তা নয়, একটি স্ড়্র পর্যন্ড় একেই এ্যাকশনের একমাত্র রূপ হিসেবে নিয়ে আসে। এ লাইন অবশ্যই রাষ্ট্রযন্ত্রকে আক্রমণের কথা বলে, কিন্তু তা বলে খতমের পর, তার প্রক্রিয়ায়। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র উচ্ছেদ, তথা তার প্রধান উপাদান রাষ্ট্রবাহিনীর বির"দ্ধে যুদ্ধকে কেন্দ্রীভূত করণের বিপ্লবী কর্তব্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করায় রাজনৈতিক-মতাদর্শগত বাধার সৃষ্টি হয়, বিশেষত যখন আমাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এটা একটা পর্যায়ক্রমিক বিকাশের অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতিকেও বিকশিত করে তোলে।

তৃতীয়ত, খতম শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা উচ্ছেদে এবং গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার একটা পদক্ষেপ হিসেবে আনার কথা বললেও অবধারিতভাবে এটা অত্যাচারী ও খারাপ লোককে উচ্ছেদ করবার সংস্কারবাদী/প্রতিশোধবাদী বিচ্যুতির পথকেও খুলে দেয়। এই সংস্কারবাদী বিচ্যুতি নৈতিক অধপতনের দিকেও যেতে থাকে, যখন কিনা ঘাঁটি-প্রশ্নে বিচ্যুতি থেকে উদ্ভূত কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনে দুর্বলতার কারণে পার্টির নেতৃত্বে ও বাহিনীর শক্তিতে জনগণের ক্ষমতার বদলে পার্টি-বাহিনীর ক্ষমতা গড়ে ওঠার খারাপ ধারা গড়ে উঠতে থাকে। মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বেই এ ধরনের বিচ্যুতি দেখা যায়, আমাদের পার্টিতেও, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধারা-উপধারার মাঝে ভয়াবহরূপে বিকশিত হয়েছে বলে দেখা যায়।

গ) <u>বাহিনী গঠন ও যুদ্ধের বিকাশ</u>

মাওবাদী আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরলেও বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নপর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটাতে মূলত ব্যর্থ হয়। এটা অবশ্যই যুদ্ধ বিকাশের সাথে জড়িত। কিন্তু বাহিনী গঠনের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতার অভাবও এতে ক্রিয়াশীল ছিল। পক্ষান্ড়রে আবার বাহিনীর এ বিকাশ না হতে পারায় তা যুদ্ধের বিকাশকে নেতিবাচ-কভাবে প্রভাবিত করেছে।

শূন্য থেকে বাহিনী ও সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার কারণে '৭১-এর বিশেষ অবস্থা বাদে এই প্রথম পর্বের বাহিনী সংস্থান সাধারণভাবে ছিল অনিয়মিত গেরিলাদের বিক্ষিপ্ত সংগঠন আকারে। *(বাহিনী, গণসংগঠন, যুক্তফ্রন্ট, কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন প্রভৃতি প্রশ্নে*

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ও জঙ্গল এলাকায় '৭৪ সালে ও পরবর্তী কিছু সময়জুড়ে আমাদের পার্টির অনুশীলনে কিছু বিশেষ ধরনের অগ্রসরতার চিত্র ছিল। সে বিষয়ে আমরা পরে উল্লেখ করবো। এখানে যা আলোচনা করা হচ্ছে তা মূলত সমতল-ভূমির অনুশীলনের উপর করা হয়েছে)। এ ধরনের বাহিনী দিয়ে রাজনৈতিক কেডারদের নেতৃত্বে খতম করা যায়, এবং এই প্রথম পর্বে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রবাহিনীর উপরেও আক্রমণ করা হয়, বিশেষত আমাদের পার্টিতে। এটা সফলতা ও জোয়ার আনে, সশস্ত্র শিক্ষাকে কিছুটা এগিয়ে দেয়, গেরিলা কায়দাকে কিছুটা আয়ত্বে আনে। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রধান বাহিনী হিসেবে নিয়মিত গেরিলাদের ইউনিট (নিগেদ) গড়ে তোলার উপর মনোযোগ না দিয়ে তাকে পরবর্তী স্ড়রের, পরবর্তীকালের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়। এভাবে যদিও সংগ্রামের স্বাভাবিক বিকাশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিগেদ গড়ে তুলছিল, কিন্তু তাকে সচেতনভাবে আঁকড়ে ধরে শক্তিশালী করে তোলা হয় না। বরং আমাদের পার্টি মূলত বিপরীত দিকে হাঁটে। দেশব্যাপী কাজ বিকাশের স্বার্থে আমাদের পার্টিতে এই প্রক্রিয়াটিকে '৭৪-সালে এসে দুর্বল করে ফেলা হয়। ঘাঁটি-প্রশ্নে সমস্যার কারণে রণনৈতিক অঞ্চলে শক্তি কেন্দ্রীকরণের অভাব এক্ষেত্রে সামর্থ্যের দুর্বলতা আকারেও প্রকাশিত হয়। নিগেদ বিকাশ না হওয়ার কারণে বাহিনীর চলমানতা গড়ে ওঠে না। সামরিক আত্মরক্ষা বিকশিত না হয়ে তা সাংগঠনিক আত্মরক্ষায় পর্যবসিত হয়। ঠিক একই কারণে শত্র"র দমনে পাল্টা আক্রমণের শক্তিও ভালভাবে গড়ে ওঠে না। ফলে খতম বা রাষ্ট্রবাহিনীর উপর এক/দু'টি আক্রমণের পরবর্তীতে নেমে আসা রাষ্ট্রীয় দমনে প্রাথমিকভাবে আত্মরক্ষা সম্ভব হলেও কিছু পরেই সেটা আর ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সশস্ত্র সংগ্রাম বিপর্যস্ড় হয়ে যায়।

নিগেদ গঠনের কোন উদ্যোগ বা তৎপরতা বা সচেতনতা যে সেসময়ে ছিল না তা নয়। সশস্ত্র সংগ্রাম-এর বিকাশ ও শত্র"র দমন অনিবার্যভাবেই পার্টির সক্রিয় উপাদানদেরকে সশস্ত্র ইউনিটে একত্রিত ও সংগঠিত করছিল। এটা কিছুটা সচেতনভাবে ও পরিকল্পিতভাবে এবং কিছুটা স্বতস্ফুর্তভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতৃত্বে দেশের বহু জায়গাতেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেয়া হয়নি।

'নিগেদ' ভালভাবে গড়ে না ওঠাটা রণনৈতিক অঞ্চলে ঘাঁটির লক্ষ্যে শক্তি কেন্দ্রীকরণ না করার সাথে যুক্ত একটি সমস্যা আকারে আবির্ভূত হয়। ফলে প্রচুর অস্ত্র থাকলেও তা অব্যবহৃত পড়ে থাকে। প্রচুর সার্বক্ষণিক কর্মী থাকলেও তাদেরকে বাহিনীর উচ্চতর সংগঠনে বিকশিত করার বদলে আরো আরো জায়গায় ছড়িয়ে দেবার উপর গুর"ত্ব দেয়া হয়। প্রচুর কৃষক ও ছাত্র-তর"ণ গেরিলা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সার্বক্ষণিক গেরিলা হিসেবে দ্র"ত টানা হয় না। ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশ ও বিপরীতে শত্র"র ভয়ানক আক্রমণের সাথে পাল্লা দিয়ে নিগেদ-গঠন বহু পিছিয়ে পড়ে। এমনকি আমাদের পার্টিতে প্রথমদিকে সচেতনভাবে যেটুকু গড়ে উঠেছিল তাকেও ছড়ানো সাংগঠনিক/সামরিক কাজের স্বার্থে বলি দেয়া হয়। এভাবে বাহিনী গঠনে গুর"তর সমস্যা দেখা দেয়।

এটা যুদ্ধ বিকাশে মারাত্মক খারাপ ফল দেয়। নিগেদ গঠন এবং বাহিনীর কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দমনরত শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা ও তার উপর আক্রমণ চালাতে আমরা ব্যর্থ হই। ব্যর্থ হই বাহিনীকে সেকশন থেকে প্লাটুন, বা আরো উচ্চতর স্তরে বিকশিত করতে। ব্যর্থ হই দমনরত শত্রুর চলমান ইউনিটের উপর এ্যামবুশ করতে, তাকে মাইনে পর্যুদস্ত করতে, তার ক্যাম্পগুলোতে রেইড আক্রমণ করে তা পূর্ণভাবে দখল করতে বা তার ১/২/৪টি সেনাকে হত্যা/জখম করে তার অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে শত্রুর উপর আতংক ছড়িয়ে দিতে, ব্যর্থ হই শত্রুর ছোট ছোট ইউনিটে কমান্ডো আক্রমণ ক'রে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার ধারা সৃষ্টি করতে। এভাবে যুদ্ধকে উচ্চতর স্তরে বিকশিত করতে আমরা ব্যর্থ হই, যার বিপুল সম্ভাবনা সেসময়ে সৃষ্টি হয়েছিল।

* বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে আরেকটি দুর্বলতাকেও আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। তাহলো, যদিও এ পর্বে আমাদের বাহিনীর ব্যাপক অধিকাংশ ছিল অনিয়মিত গেরিলাদের বিক্ষিপ্ত সংগঠন; বড় জোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মিত স্কোয়াড/ইউনিট গঠন করা হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব গেরিলাকে ইউনিট-ভুক্ত করা এবং গণলাইন বিকাশের প্রক্রিয়ায় গণমিলিশিয়া গড়ে তোলা। গ্রাম/পাড়া ভিত্তিক কৃষক-জনগণের গণমিলিশিয়া হলো আমাদের বাহিনীর ভিত্তি যা অবিরত নিগেদ-এর নিয়মিত গেরিলার জোগান দেবে এবং নিগেদ-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান ও লড়াই পরিচালনা করবে। নিগেদ কার্যক্রম সেভাবে বিকশিত না হওয়াতে এই গণমিলিশিয়ার কাজটিও সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি। যা আমাদের বাহিনী গঠনকে দুর্বল করে দেয়, কারণ, এদুটো একটি অন্যটির বিকাশের শর্ত সৃষ্টি করে, এবং একটি অপরটির পরিপূরক।

বাহিনী গঠনের এই সমস্যা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সাথে যুক্তভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। যেমন, আমাদের পার্টিতে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে মূল শ্রেণির মাঝে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন-গরীব কৃষক, কৃষি মজুর ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্যে সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা, গণলাইন-গণভিত্তির সমস্যা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমস্যা– যা কিনা আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে ডান বিচ্যুতি, ঘাঁটি প্রশ্নে ডান বিচ্যুতি, পার্টি-গঠন ও যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি প্রভৃতি রাজনৈতিক সমস্যার থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অন্যান্য কিছু ধারার ক্ষেত্রে এটা উদ্ভূত হয়েছিল খোদ গণযুদ্ধের রাজনীতিকে সঠিকভাবে আঁকড়ে না ধরে কার্যত সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী ধারাকে ব্যাপকভাবে ধারণ করার কারণে। এসব কারণে সবগুলো ধারা বাহিনী গঠনে প্রচেষ্টা চালালেও সেক্ষেত্রে ব্যাপক বাস্তব বাধা গড়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে কাংখিত সফলতা অর্জিত হয়না।

ঘ) <u>রণনৈতিক পরিকল্পনার অভাব</u>

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে ঘাঁটি প্রশ্নে দুর্বলতার কারণে শুরু থেকেই বাছাইকৃত রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহকে আঁকড়ে ধরা, অঞ্চলসমূহের সংযুক্তি,

অঞ্চলগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ভিত্তিতে নয় বরং রণনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বিভক্ত ক'রে তার রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের সমস্যার সমাধান করা– এসবের কোন রণনৈতিক পরিকল্পনা মাওবাদী আন্দোলনে ছিল না।

কিন্তু এছাড়া যুদ্ধ বিকাশের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুরু করা এবং শুরুর পর তাকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নেবার জন্য রণনৈতিক পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাওবাদী আন্দোলন যুদ্ধকে ঠিক এভাবে কখনই পরিচালনা করতে পারেনি।

শুধুমাত্র কমরেড এসএস 'বর্ষাকালীন রণনৈতিক আক্রমণ' নামে একটি রণনৈতিক পরিকল্পনা করেছিলেন '৭৩-সালে, যা রচিত হয়েছিল খতমের স্তর থেকে রাষ্ট্রবাহিনীর উপর আক্রমণের স্তরে যুদ্ধকে বিকশিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। যদিও এতটা স্বচ্ছভাবে ও কেন্দ্রীভূতভাবে তখনও বিষয়টিকে উত্থাপন করা হয়নি। তা সত্ত্বেও মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তোলা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ছিল। আমাদের দেশে গণযুদ্ধ বিকাশে বর্ষাকালীন সুবিধাগুলোকে বিবেচনা করার এই চেতনাও একটি সৃজনশীল বিকাশকেই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কিন্তু তার সমস্যা ছিল এই যে, একে 'বর্ষাকালীন আক্রমণ' ও 'শীতকালীন আত্মরক্ষা'– এভাবে যান্ত্রিক বিভক্তিকরণ করা হয়েছিল। বাস্তবে বর্ষাকাল ছাড়িয়ে শীতকালেও এই আক্রমণাভিযান চলতে থাকে। এবং পরবর্তী বর্ষাকালেই বরং শত্রুর আক্রমণের মুখে তা পর্যুদস্ত হওয়া শুরু করে।

এই রণনৈতিক পরিকল্পনার আরো দুর্বলতা ছিল এই যে, '৭৩-সালে তার আশাতীত সাফল্যের পরও '৭৪-সালে একই ধারায় একই শিরোনামে একই পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা হয়, এবং নতুন উচ্চতর কোন পরিকল্পনা করা হয় না। এভাবে রণনৈতিক পরিকল্পনা রচনার একটা প্রাথমিক সূচনা হয়েও সে চেতনাকে বিকশিত করা যায়নি। ফলে '৭৪-সালে বাহিনী ও যুদ্ধ গুণগতভাবে আর এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, এই অভিযানকালেই তা শত্রুর দমনে বিপর্যস্ত হওয়া শুরু করে।

ঙ) <u>গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম</u>

মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে সশস্ত্র সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে একতরফাবাদী বিচ্যুতির কারণে গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে মাওবাদী প্রত্যেকটি ধারাই গুরুতরভাবে দুর্বল করে বসে। যদিও এর মাত্রা বিভিন্ন ধারার মাঝে বিভিন্ন ধরনের ছিল, কিন্তু মৌলিক সমস্যাটি প্রত্যেকেরই একই ছিল। তা ছিল, গণসংগঠন ও ফ্রন্টের কাজ বিকাশ করতে না পারা, সচেতনভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নকে কার্যকর করতে না পারা, খণ্ড বা আংশিক সংগ্রামকে কার্যত বর্জন করা, প্রকাশ্য কাজকে মূলত বর্জন করা, এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য কৌশলগত কোন কর্মসূচি আনার চিন্তা না করা।

পূবাকপা ধারাটি সিএম-এর অনুসরণে গণসংগঠন-গণআন্দোলনকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক মনে করেছে, এবং শুধুমাত্র বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ও তার সংস্থা হিসেবে গণসংগ্রাম ও গণকমিটির কথা মনে রেখেছে, যা আশুভাবে যুদ্ধের নিম্নপর্যায়ের কারণে তারা কখনো প্রয়োগ করার জন্য উদ্যোগ নিতে পারেনি। ইপিসিপি ও বিএসডি ধারা সশস্ত্র কৃষক গণসংগ্রামকে গুরুত্ব দিলেও এইসব আশু অর্থনৈতিক (সশস্ত্র)

আন্দোলন আর গণযুদ্ধের পার্থক্য করতে তারা কার্যত ব্যর্থ হয়। পিবিএসপি ধারা বিভিন্ন সময়ে গণসংগ্রাম, গণসংগঠন ও আশু আন্দোলনের কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে তার কোন প্রকাশ ছিল না, এবং এসব আলোচনা গোঁড়ামিবাদী ধরনে মার্কসবাদী কিছু প্রতিষ্ঠিত সত্যের উত্থাপনেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তবে আমাদের পার্টির এই ধারা তার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিপ্লবী সশস্ত্র গণআন্দোলনকে হরতালের মাধ্যমে পরিচালনা করেছিল, যা অবশ্যই গুর"ত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এর বাইরে আর কোন গণসংগ্রামগত তৎপরতা পার্টি গড়ে তুলতে পারেনি।

বাস্ড়বে গণআন্দোলনের স্বীকৃতি সত্ত্বেও কীভাবে বিপ্লবী গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়, এবং কীভাবে আর সব অসংখ্য ধরনের গণআন্দোলনকে গণযুদ্ধের সাথে সমন্বিত করা যায় সে প্রশ্নে অস্পষ্টতাই এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

তবে গণআন্দোলন শুধু নিরস্ত্র নয়, সশস্ত্র হতে পারে, হওয়া উচিত, এবং তা গণযুদ্ধের অংশ হতে পারে, সেটা এই প্রথম পর্বে উপরোক্ত সংগ্রামগুলোর মাধ্যমে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার খুবই গুর"ত্ব রয়েছে।

কিন্তু সশস্ত্র ছায়ায় গণসংগ্রামের প্রধান রূপ হলো ক্ষমতা দখল ও বিপ্লবী কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের জন্য সংগ্রাম। সেজন্য জনগণের বিভিন্ন গণসংগঠন থাকতে হবে, যার কেন্দ্রীয় বিষয় হবে ক্ষমতার সংস্থা। এ ধরনের গণসংগঠন এবং তার মাধ্যমে বিবিধ বিপ্লবী গণসংগ্রাম গড়ে তোলায় মাওবাদী আন্দোলন এ পর্যায়ে মূলত সচেতন ছিল না। বিক্ষিপ্তভাবে ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিভিন্ন ধারার নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু এ জাতীয় তৎপরতা গড়ে উঠলেও তা একটা সামগ্রিক সুসংহত চেতনা ও কর্মধারা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি। এ সমস্যাটি ঘাঁটি-প্রশ্নে সামগ্রিক বিচ্যুতি ও তা থেকে উদ্ভূত কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন ও জনগণের ক্ষমতা দখলের কার্যক্রম গড়ে না তোলার সমস্যার সাথে যুক্ত ছিল।

কিন্তু তা ছাড়া অন্যবিধ গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামের গুর"ত্বও খুবই বেশি। সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠার পূর্বে এর যেমন গুর"ত্ব রয়েছে, তা গড়ে উঠলে পরে তার বিকাশের স্বার্থে ও টিকে থাকবার জন্যও এর গুর"ত্ব রয়েছে। যুদ্ধের অঞ্চলগুলোকে ঘিরে সারা দেশজুড়ে এ ধরনের বহুবিধ গণসংগঠন ও গণআন্দোলন গণযুদ্ধকে টিকিয়ে রাখা ও বিকাশের জন্য খুবই নির্ধারক এক শক্তি। বিশেষত শহরাঞ্চলে এই ধরনের বহুবিধ গণসংগঠন গণসংগ্রাম এবং জাতীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যতীত গড়ে ওঠা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা ও বিজয়ের দিকে পরিচালনা করা আজকের পর্যায়ে এক অসম্ভব কাজ। যদি আমরা আমাদের দেশের ভৌগোলিক, জাতিগত, এবং বর্তমানের আর্থ-সামাজিক বিশেষত্বগুলোকে মনে রাখি তাহলে এর গুর"ত্ব বিশেষভাবে বেড়ে যাবে। এইসব সংগঠন সংগ্রাম হতে পারে যেমন আদর্শগত ও বিপ্লবী কর্মসূচিভিত্তিক, তেমনি হতে পারে চলতি ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া কেন্দ্রীক। গণযুদ্ধের সমর্থনে, তার বিভিন্নমুখী সহ-ায়তায় সংহতিমূলক অনেক গণসংগ্রাম করতে হলেও এ ধরনের ভিত্তি পার্টিকে গড়তে হবে, এবং তাতে অভ্যস্ড় হয়ে উঠতে হবে। অসংখ্য ধরনের বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক/

অর্থনৈতিক/আশু/আংশিক/খ"িত আন্দোলনের সংগঠন সংগ্রামের বহুবিধ নিরাপত্তা-জালের মধ্যেই শুধু পার্টি ও বাহিনীকে নিরাপদে সংরক্ষণ করা ও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

– তাসত্ত্বেও এটা উল্লেখ করা উচিত যে, মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম নিঃসন্দেহেই ব্যাপক জনগণের সমর্থনধন্য ছিল এবং তার ভাল গণভিত্তি ছিল। কিন্তু তার সংগ্রামী জোয়ারের তুলনায় ব্যাপক সমর্থক জনগণকে সে কার্যকরভাবে সংগঠিত করতে পারেনি। এবং সর্বক্ষেত্রে সর্বমুখী গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্মিলিত এক ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। এটা সশস্ত্র সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে তাকে সামরিকভাবে বিপর্যস্ড় করায় শত্র"কে বিরাট সুবিধা করে দিয়েছে, যা এসময়কার গণযুদ্ধের ব্যাপকতম ঢেউটির পরাজয়ের একটি বড় কারণ ছিল।

চ) <u>গণযুদ্ধের প্রস্তুতি</u>

ষাট-সত্তর দশকে যে উত্তাল দেশীয়-আন্ড়র্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলন সূচিত হয় এবং বিপ্লবী সংগ্রামের রূপ হিসেবে গণযুদ্ধ শুর" করা হয় তাতে আশুভাবে তখন গণযুদ্ধের প্রস্তুতির প্রশ্নটি লাইনগত ও অনুশীলনগতভাবে তেমন কোন গুর"ত্ব পায়নি। বরং সেসময় "প্রস্তুতি হয়নি" বক্তব্য দ্বারা একটি অর্থনীতিবাদী গণসংগঠনবাদী লাইন বিভিন্ন মধ্যপন্থী কেন্দ্রের তরফ থেকে উত্থাপিত হয়, যার সাথে রাপচারের মাধ্যমে অবিলম্বে গণযুদ্ধ শুর" করার বিশেষ গুর"ত্ব ছিল। এর বিপরীতে বিপ্লবী ধারাগুলো "শূন্য থেকে গণযুদ্ধ শুর" করা", "গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক-জনগণকে জাগরিত করা"– ইত্যাকার মাওবাদী তত্ত্বগুলোকে তুলে ধরেছিল, যা সঠিক ছিল।

কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে, গণযুদ্ধের সামগ্রিক লাইনে "প্রস্তুতি"র প্রশ্নটি যথেষ্ট গুর"ত্ব ধরে। বিশেষত এই পর্বের গণযুদ্ধ যখন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ড় হয়ে পড়েছিল তখন থেকে এ প্রশ্নটি আরো জোরালোভাবে উঠে আসতে থাকে। একইসাথে আর্থ-সামাজিক যে রূপান্ড়রগুলো পরবর্তীকালে ঘটেছে (সাম্রাজ্যবাদের আরো অনুপ্রবেশ, পুঁজিবাদের বিকাশ, যাতায়াত যোগাযোগ ও প্রযুক্তির বিকাশ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিগুলোতে) তার প্রেক্ষিতে গণযুদ্ধের লাইনের বিকাশের সাথে সাথে প্রস্তুতির প্রশ্নটির গুর"ত্ব আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু মাওবাদী আন্দোলন তার প্রথম যুগের এ দুর্বলতাকে অব্যাহত রেখে গণযুদ্ধের লাইনের ত্র"টিগুলো কাটাতে ও তার বিকাশ সাধন করতে বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি হয়। বিশেষত আন্দোলন কিছু তাত্ত্বিক সমস্যার সম্মুখীন হয় যা এই শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ড় আন্দোলন কাটিয়ে তুলতে পারেনি, বরং পূর্বতন দুর্বলতাকে বিচ্যুতির পর্যায়ে বিকশিত করে তোলে বিভিন্ন কেন্দ্র।

"শূন্য থেকে গণযুদ্ধ"– এই সঠিক মাওবাদী তত্ত্বকে গুর"তর একতরফাবাদী ও যান্ত্রিকভাবে আন্দোলন গ্রহণ করেছিল। ফলে গণযুদ্ধের জন্য যুদ্ধপূর্ব প্রস্তুতিকে আন্দোলনের পক্ষ থেকে গণযুদ্ধ বর্জন, বিপ্লবী রাজনীতি বর্জন, তথা মাওবাদ বর্জন বলে চিহ্নিত করার দিকে এগিয়ে নেয়া হয়। ফলত যুদ্ধের প্রস্তুতির নামে যারা প্রকৃতই মাওবাদ

বর্জিত, গণযুদ্ধের রাজনীতি বর্জিত সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদ নিয়ে আসতে চেয়েছিল তাদের মূল রাজনৈতিক সমস্যায় লাইন-সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করার বদলে তাদের বির"দ্ধে লাইন-সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হয় তাদের সংগঠন ও সংগ্রামের রূপের বির"দ্ধে। এটা সশস্ত্র সংগ্রামের অভ্যন্ড়রে বিপ্লবী রাজনীতি সংক্রান্ড় সচেতনতাকে দুর্বল করে দেয় এবং সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ/সশস্ত্র সংস্কারবাদ গড়ে তোলে। অন্যদিকে গণযুদ্ধের বিপ্লবী প্রস্তুতির প্রশ্নটিকে ছুড়ে ফেলে দেয়। গণযুদ্ধসহ বিপ্লবের লাইন-বিনির্মাণের ও তত্ত্বগত কাজের গুর"ত্বকে তা অবহেলা করে। প্রাথমিক হলেও শক্তিশালী পার্টি গড়ে তোলার গুর"ত্বকে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

একইভাবে "গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক-জনগণকে জাগরিত করা"র মাওবাদী তত্ত্বটিকেও যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়। এবং এভাবে একটি সফল গণযুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ অন্যান্য ধরনের সংগ্রাম, বিশেষত কৃষকের গণসংগ্রাম-গণসংগঠনের কাজ, এবং অন্যান্য সকল ধরনের আংশিক ও খ"িত সংগ্রামের গুর"ত্ব বুঝতে ব্যর্থতা ডেকে নিয়ে আসে। এমনকি জর"রী রাজনৈতিক সংগ্রামগুলোকে গুর"ত্বহীন করে ফেলা হয়। এসব কিছুকে কার্যত বিপ্লব-বর্জনের কাতারে ফেলা হয়। বিগত শতকজুড়ে সবগুলো বিপ্লবী মাওবাদী ধারাই কার্যত এ ধরনের সমস্যায় ভুগতে থাকে। যদিও এই ধরনের সমস্যা থেকে আমাদের পার্টি বেরিয়ে আসবার পথে ধাপে ধাপে অগ্রগতি ঘটাতে থাকে, কিন্তু সামগ্রিক রাপচার না হওয়ায়, এবং পাশাপাশি গণযুদ্ধের লাইনটিকে সামগ্রিকভাবে ও সঠিকভাবে উত্থাপন করতে না পারায় এই পুরনো সমস্যা থেকে আমাদের পার্টিও বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়, যার ফলশ্র"তিতে আমাদের পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে এটা উল্লেখ করতেই হবে যে, এই পুরনো সমস্যায় সবচেয়ে বেশি আচ্ছন্ন থাকে সমগ্র পূবাকপা ধারা এবং আমাদের পার্টি থেকে বিভক্ত হয়ে সৃষ্ট নতুন কেন্দ্র এমবিআরএম [৬]।

এ সবই পরিবর্তিত ও প্রতিকূল বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতিতে গণযুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিকাজকে এবং শক্ত পার্টি গড়ার কাজকে গুর"তরভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় করে। এই প্রস্তুতি-লাইনটি শুধু গণযুদ্ধের পূর্বেই যে শুধু গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা নয়; সূচিত গণযুদ্ধকে রক্ষা করা, বিস্ড়ৃত করা ও শক্তিশালী করার কাজেও এর বিশেষ গুর"ত্ব রয়েছে। কারণ, এর সাথে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত সংগ্রাম-সংগঠনের বিভিন্ন রূপকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর প্রশ্ন। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর গুর"ত্ব না বুঝলে আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রেক্ষিতে গণযুদ্ধকে দেশব্যাপী বিস্ড়ৃত করা, টিকিয়ে রাখা এবং তাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই, প্রস্তুতির লাইনটিকে গণযুদ্ধের লাইনের একটি অপরিহার্য অংশ বলে গ্রহণ করতে হবে।

পার্টি-গঠনের সমস্যা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনা থেকেই অন্ড়ত

প্রধান ৪টি ধারায় বিভক্ত ছিল, যা পরে আরো বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের মৌলিক বহু প্রশ্নে সামগ্রিক সঠিক লাইন নির্মাণ করতে না পারাটাই এর অন্ড়র্নিহিত কারণ ছিল। যে লাইনের একটা অতি গুর"ত্বপূর্ণ অংশ ছিল পার্টি-গঠনের প্রশ্ন।

* সকল প্রকৃত মাওবাদীদের একটি ঐক্যবদ্ধ ও একক কেন্দ্র গঠনের প্রশ্নটি পার্টি-গঠনের প্রধানতম একটি বিষয়। মাওবাদী ঐক্যের ইচ্ছা বা আকাংখা, এবং সেজন্য কোন প্রচেষ্টা এ সময়ে মাওবাদীদের মাঝে ছিল না, বা বিভক্তিগুলো ছিল নেহায়েত ভুল বোঝাবুঝিজনিত বা নেতৃত্বের কোন্দল উদ্ভূত– বিষয়টা আদৌ এরকম ছিল না। কিন্তু নিজেকে একমাত্র সঠিক বলে দাবি করা, এই সঠিকতাকে প্রায় সার্বিক ও সামগ্রিক মনে করা, একে বিকাশমান একটা প্রক্রিয়া হিসেবে না দেখা, বিশেষত তার প্রাথমিক পর্যায়ে, এবং বিপরীতে অন্য কেন্দ্রগুলোকে সংশোধনবাদী মনে করা, এমনকি প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা বা সেভাবে আচরণ করা– এসবের মাঝে এই বিভক্তির একটা গুর"ত্বপূর্ণ মতাদর্শগত-রাজনৈতিক উৎস নিহিত ছিল।

আগেই এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লাইন ও পার্টির বিকাশ সাধনকে আঁকড়ে ধরা হয়নি। পার্টি/কেন্দ্রগুলো দুই লাইনের সংগ্রাম যে করেনি তা নয়। কিন্তু আন্ড়মাওবাদী বিতর্ক ও সংগ্রামগুলো চালিত হয়েছে সংশোধনবাদবিরোধী বৈরী সংগ্রাম আকারে। ফলে এগুলো লাইনের বিকাশ ও ঐক্যের বিকাশের বদলে নিজ পার্টিগত বিশুদ্ধতাবাদকে বিকশিত করে এবং অন্যদের সম্পর্কে বিভেদাত্মক সংগ্রাম, অনেক সময় বিষোদ্গার ও আত্মগত প্রচারে, এমনকি অপপ্রচারে পর্যবসিত হয়েছে। সমস্ড় কেন্দ্রগুলোই কম/বেশি এটা করেছে। তত্ত্বকে ব্যবহার করা হয়েছে অন্য মতকে পরাজিত করার জন্য, বিতর্ককে বিকশিত করা ও সত্য অনুসন্ধানে তত্ত্বের প্রয়োজনীয় প্রয়োগ বা তার গভীরতা অর্জনের জন্য নয়।

– এই মতাদর্শগত-রাজনৈতিক চেতনা প্রতিটি পার্টির নিজ অভ্যন্ড়রেও প্রযুক্ত ও অনুশীলিত হয়েছিল। পার্টি-প্রশ্নে মাওবাদের বিকাশকে মূলত বোঝা হয়নি। লেনিনবাদী পার্টি, বা পার্টির বলশেভিকীকরণের নামে কার্যত স্ট্যালিনীয় পার্টিধারা গড়ে ওঠে– যা বস্তুত স্ট্যালিনীয় পার্টির চেয়ে গুণগতভাবে ছিল নিচু স্ড়রের, কার্যত অমার্কসবাদী।

লেনিন পার্টি-প্রশ্নে মার্কসবাদের গুণগত বিকাশ ঘটিয়েছিলেন মেনশেভিকবাদী উদারনৈতিক বুর্জোয়া মতাদর্শকে বিরোধিতা ও সংগ্রামের মাধ্যমে। তিনি উপদলের স্বাধীনতার বিপরীতে কঠোর শৃংখলাবদ্ধ এককেন্দ্রীক পার্টি-ধারণাকে তুলে ধরেন, যা কিনা পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির ভিত্তিতে। এই লেনিনীয় নীতিকেই মাও চারটি সাংগঠনিক মূলনীতি দ্বারা প্রকাশ করেন, যথা– ব্যক্তি সংগঠনের অনুগত, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুর"র অনুগত, নিম্নস্ড়র উচ্চস্ড়রের অনুগত, এবং সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুগত। এ ধরনের স্বেচ্ছামূলক ও কঠোর শৃংখলাধীন পার্টি ব্যতীত সুতীব্র শ্রেণি সংগ্রামের ঝড়তরঙ্গে সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। লেনিন-পরবর্তীকালে আরো বহু রাজনৈতিক মতাদর্শিক গুণাবলীসহ পার্টি-প্রশ্নে এ ধরনের

রূপান্ড়রই পার্টির বলশেভিকীকরণ নামে পরিচিতি পায়। বলশেভিক ধরনের পার্টি বলতে এটাই বোঝায়। লেনিন-পরবর্তীকালে স্ট্যালিন এ নীতিকে সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন এবং কার্যকর করেন।

মাও সেতুঙ দ্বন্দ্ববাদের বিকাশের প্রক্রিয়ায় পার্টি-প্রশ্নটিকেও এর আলোকে দেখেন ও ব্যাখ্যা করেন। যা জিপিসিআর-এর প্রস্তুতিকালে ও সময়ে মাও গুণগতভাবে এগিয়ে নেন। মাও দেখান যে, পার্টিও একটি দ্বন্দ্ব। এতেও সর্বদাই দুই মত, নীতি, কৌশল, পদ্ধতি ও লাইন থাকে। আমরা চাই বা না চাই, এটা হলো বস্তুগত নিয়মের অধীন একটি বস্তুগত বাস্ড়বতা। প্রকৃত কমিউনিস্টদের দায়িত্ব হলো পার্টির অভ্যন্ড়রীণ দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করা নয়, বরং এর সঠিক পরিচালনা করা ও সঠিক মীমাংসা করা। কখনো এই দ্বন্দ্ব সারবস্তুগতভাবে বৈরী, কখনো-বা অবৈরী। অবৈরী দ্বন্দ্বকে অবৈরীভাবে মীমাংসা করতে হবে, যা সঠিকভাবে পরিচালনা না করলে তা বৈরীদ্বন্দ্বে পরিণত হয়ে পার্টি ও বিপ্লবের নিদারুণ ক্ষতি করতে পারে। ঠিক এটাই ঘটেছে বিগত শতকের মাওবাদী আন্দোলনে, যাকিনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেনিনীয় পার্টি শৃংখলা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে ঘটেছে। এমনকি সারবস্তুগতভাবে বৈরী দ্বন্দ্বগুলোও একটা পর্যায় পর্যন্ড় অবৈরীভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে, এবং তার অবৈরী মীমাংসাও হতে পারে। পার্টি-অভ্যন্ড়রস্থ এই দ্বন্দ্ব হলো পার্টি বিকাশের পরিচালিকা শক্তি। একে সঠিকভাবে পরিচালনার মধ্য দিয়ে একদিকে মূলত সঠিক লাইন/অবস্থান বিকশিত হয়ে ওঠে– নিজ সীমাবদ্ধতা-দুর্বলতা-অসম্পূর্ণতা ও বিচ্যুতিগুলো কাটানোর মাধ্যমে, অন্যদিকে ভুল লাইন/অবস্থান-গুলোর পুনর্গঠন ঘটে। এভাবে উচ্চতর সঠিক মতাবস্থান গড়ে ওঠে এবং তার ভিত্তিতে পার্টিতে উচ্চতর ঐক্য সৃষ্টি হয়। অসচেতন কমরেডগণ সচেতন হয়ে ওঠেন, বিভ্রান্ড় কমরেডগণ বিভ্রান্ড়ি কাটিয়ে তোলেন, পার্টি-ঐক্য দৃঢ়তর হয়ে ওঠে, এবং সচেতন ও অসংশোধনীয় উপাদান থাকলে তা চিহ্নিত হয় ও বর্জিত হয়। এভাবে লাইন ও মতাবস্থান এবং ঐক্য এগিয়ে চলে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে।

সুতরাং মাওবাদী পার্টি-ধারণা লেনিনবাদকে গুণগতভাবে এগিয়ে নেয়, যা কিনা টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে পার্টির বিকাশ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপন করে পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে একদিকে টুএলএস-এর নামে বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাকে সংগ্রাম করার কর্তব্যও উপস্থিত হয়, যেমন কিনা অন্যদিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে মনোলিথিক পার্টি-ধারণাকে সংগ্রাম করার দায়িত্ব আসে। আমাদের মাওবাদী আন্দোলন এ উভয় প্রকার বিচ্যুতি দ্বারাই আক্রান্ড় ছিল। আমাদের পার্টির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, শৃংখলার নামে পার্টি তার এ প্রথম পর্বে সম্পূর্ণতই একটি মনোলিথিক ধরনের পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 'চক্র' নির্মূলের নামে বৈরীভাবে তার মোকাবেলা এবং এমনকি মৃত্যুদন্ডদানের মত গুরুতর অমার্কসীয় ধারাও এ সময়ে পার্টিতে গড়ে উঠেছিল, যাকিনা এসএস-মৃত্যুর অব্যবহিত পর পার্টির মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি হবার মত নিকৃষ্ট ধরনের লাইন আকারেও বিকশিত হয়ে ওঠে। বাস্ড়বে

এমন একটি লাইনের ভিত্তি আগেই পার্টিতে বিরাজমান ছিল বলেই প্রতিকূল অবস্থায় ও অপরিপক্ক নেতৃত্বের অধীনে তা এতটা খারাপভাবে বিকশিত হতে পেরেছিল।

* পার্টি-গঠনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার লেনিনীয় নীতিমালাকেও মাওবাদী আন্দোলনে এ সময়ে ব্যাপকভাবে লংঘন করা হয়। এসএস আমলেই আমাদের পার্টির ইতিহাসে এক সময়ে একসদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি বজায় রাখা (যদিও সাময়িকভাবে) এরই একটি খুব খারাপ দৃষ্টান্ড়– যাকিনা এসএস-পরবর্তীকালের সামগ্রিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে বর্ধিত মাত্রা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এ সময়ে পার্টি মূলত পরিচালিত হয়েছে পার্টি কমিটি দ্বারা নয়, ব্যক্তি পরিচালক দ্বারা।

যদিও একটি গোপন বিপ্লবী পার্টিতে প্রাথমিকভাবে সদস্যপদ প্রদান, পার্টি-শাখা গঠন, কমিটি নির্বাচন, যৌথ নেতৃত্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা সহজ নয়। অনেক সময় তাকে সেজন্য একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতেই হয়। কিন্তু একে যদি পার্টি গঠন ও পরিচালনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় তাহলে এ প্রক্রিয়াটি পার্টিতে অনুসৃত হতে থাকবে। কিন্তু আমাদের পার্টিতে তার সর্বোচ্চ বিকাশ কালেই এই প্রক্রিয়াগুলো প্রায় ধসে গিয়েছিল এবং ব্যক্তি পরিচালনার একটা অশুভ রীতি পার্টিতে গড়ে উঠেছিল। এটা কোন শক্তিশালী পার্টির লক্ষণ নয়, যাকিনা প্রধান ব্যক্তি-নেতৃত্ব এসএস-এর শহীদ হবার সাথে সাথেই পার্টিতে বিশালভাবে ধস নেমে যাবার একটা বড় কারণ ছিল।

* পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণির অগ্রযোদ্ধা বাহিনী। অবশ্যই পার্টি শ্রমিক শ্রেণির কোন সাধারণ সংগঠন নয়। এটা হলো তার বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন। এর অর্থ হলো শ্রমিক শ্রেণির যে চলমান বিপ্লব তাকে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক সংগঠনই হলো পার্টি। তাই, আমাদের মত দেশে যেখানে বিপ্লবের স্ড়র নয়া গণতান্ত্রিক– যা কিনা সারবস্তুতে কৃষি বিপ্লব– যে বিপ্লবে কৃষক হলো প্রধান শক্তি, গ্রাম হলো কাজের প্রধান ক্ষেত্র, সেখানে এ পার্টি স্বভাবতই গড়ে উঠবে প্রধানত গ্রামীণ সর্বহারা-আধা সর্বহারা শ্রেণি, অর্থাৎ, ভূমিহীন-গরীব কৃষক ও কৃষি মজুরদের মধ্য থেকে। এবং নাগরিক শিল্পীয় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যকার কাজ ও সংগ্রাম হবে তার চেয়ে গৌণ।

কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, এই বিপ্লবের নেতা হলো শ্রমিক শ্রেণি। শ্রমিক শ্রেণি অবশ্যই তার নেতৃত্ব প্রয়োগ করবে তার রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে, যাতে বহু বিভিন্ন শ্রেণির বিপ্লবী উপাদানরা জড়ো হন শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শ ও রাজনীতিকে গ্রহণ ক'রে; কিন্তু খোদ শ্রমিক শ্রেণির নিজেকে অবশ্যই সে পার্টিতে শারিরীকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ, পার্টি হলো শ্রমিক শ্রেণির পার্টি।

আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি নগরকেন্দ্রীক এবং শিল্পকারখানা ভিত্তিক। আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের অপ্রতুলতার কারণে এই ধরনের শিল্প কারখানার শ্রমিক সংখ্যায় কম, এবং তাদের একটা অংশ ক্ষুদে বুর্জোয়া চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে– লেনিন যাকে বলেছেন সেরকম "অভিজাত শ্রমিক" হিসেবে গড়ে উঠেছেন। কিন্তু অপরদিকে অভিজাত শ্রমিকের বাইরে এক বিরাট প্রকৃত সর্বহারা-আধাসর্বহারা শ্রমিক রয়েছেন যারা সর্বহারা রাজনীতির নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে প্রস্তুত। এই শ্রেণিতে ভর্তি হতে প্রস্তুত সর্বহারা,

আধাসর্বহারা শ্রেণির সংখ্যা আরো বিপুল। যাদের নিজস্ব পার্টি হিসেবে পার্টিকে গড়ে না তুললে পার্টি তার শ্রেণি চরিত্র থেকে দূরে সরে যাবে।

মাওবাদী আন্দোলন কৃষি বিপ্লব, কৃষক, গ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম আঁকড়ে ধরতে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যকার কাজ থেকে মৌলিকভাবে ও গুর"তরভাবে পিছিয়ে পড়ে। শহরাঞ্চলে ও শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্নমুখী গণসংগঠন, অর্থনৈতিক/আশু আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম কার্যত মাওবাদী আন্দোলন এ সময়কালে বর্জন ক'রে বসার কারণে শ্রমিক শ্রেণিকে কার্যত ছেড়ে দেয়া হয় সংশোধনবাদী ও প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে। এ কারণে এক সময়কার কমিউনিস্ট দ্বারা সৃষ্ট শ্রমিক আন্দোলন দখল করে নেয় বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা। আমাদের পার্টির জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভিত্তি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে চলে, যা শ্রমিকদের মধ্যকার কাজ থেকে আমাদেরকে আরো দূরে সরিয়ে নেয়। এটা মাওবাদী আন্দোলনে বিপুল পরিমাণে ক্ষুদে বুর্জোয়া মতাদর্শ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয়, তার নিজ শ্রেণিকে ছেড়ে দেয়া হয় সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়াদের হাতে, যে সমস্যা পরবর্তীতেও মাওবাদী আন্দোলন কার্যকরভাবে কাটিয়ে তুলতে পারেনি। এই গুর"তর ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে মাওবাদী আন্দোলনের নিরলস দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

* সর্বহারা শ্রেণির পার্টি যেহেতু একটি বিপ্লবী পার্টি, নিছক সাধারণ কোন শ্রেণি সংগঠন নয়, তাই, এটা সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত নিগৃহীত শোষিত শ্রেণি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়– যারা বিপ্লবে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে, যে গোষ্ঠীর তৎপরতা বিপ্লবের জন্য খুবই প্রয়োজন– তাদের মাঝে গুর"ত্ব দিয়ে কাজ গড়ে তুলতে বাধ্য। তা না হলে বিপ্লবকে সমগ্র সমাজে ব্যপ্ত করা ও সমাজের সমস্ড় অগ্রসর জায়গা থেকে বিপ্লবের শক্তি আহরণ করা, এবং বিশেষত সবচেয়ে ত্যাগী অগ্রসর উপাদানদেরকে পার্টিতে টেনে এনে পার্টিকে সত্যিকার একটি অগ্রসর বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গঠন করা সম্ভব নয়।

এই দৃষ্টিকোণ ও প্রয়োজন থেকে নারী সমাজ, আদিবাসী, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার কাজকে বিশেষ গুর"ত্বদান করা ও সেখানে পার্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলনে তেমন কোন সচেতন প্রয়াস দেখা যায়নি।

এসএস-নেতৃত্বে আমাদের পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মাঝে ভাল ভিত্তি গড়তে সক্ষম হলেও সেটা যতনা নিপীড়িত আদিবাসীদের রাজনৈতিক গুর"ত্ব থেকে এসেছিল, তার চেয়ে বেশি এসেছিল সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে– পাহাড়-জঙ্গল এলাকার গুর"ত্ব থেকে। তথাপি এই কাজ অবশ্যই রণনৈতিক তাৎপর্যমি"ত ছিল।

নারী সমাজে পার্টি গড়ে তোলার মৌলিক প্রশ্ন হলো নারী প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি– যা সমগ্র আন্দোলনে গুর"তরভাবে দুর্বল/বিচ্যুতিসম্পন্ন ছিল। নারী-প্রশ্নের সাথে যুক্ত বিশেষ সমস্যাগুলোকে গুর"ত্ব দিয়ে আঁকড়ে ধরা হয়নি– যেমন, বিয়ে-পরিবার-যৌন প্রশ্নে সামাজিক মূল্যবোধ থেকে আন্দোলন খুব একটা অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি। আমাদের মত পশ্চাদপদ সমাজে নারীদের মধ্যকার কাজে কিছু বিশেষ সমস্যা থাকলেও নারী-প্রশ্নের বিপুল গুর"ত্বকে বোঝা হয়নি। নারীদেরকে প্রায়ই সমস্যাসংকুল বা সমস্যা

সৃষ্টিকারী বলে মনে করা হয়েছে। বিবাহ ও সম্ড়নাদির প্রশ্ন, অথবা সমাজে রেখে আসা পারিবারিক প্রশ্নগুলোকে সঠিকভাবে ধরা হয়নি। প্রেম ও যৌন প্রশ্নগুলোকে বিশুদ্ধতাবাদীভাবে দেখার কারণে, একাম্ড় ব্যক্তিগত প্রশ্নকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ও অতিরঞ্জিতভাবে শৃংখলার আওতায় আনার কারণে বাস্ড়বে বিপ্লবী স্বার্থ বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে। এসবের ফল স্বরূপ কোন না কোনভাবে পুর"ষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে আন্দোলনে বজায় ছিল।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের অগ্রসরদের একটা অংশ অবশ্যই সরাসরি কৃষি-বিপ্লবে অংশ নেবেন, এবং পার্টির নেতৃত্ব পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু তাদের নিজ কাজের ক্ষেত্র, যেমন– সাংস্কৃতিক কাজ, পত্রিকার কাজ, তত্ত্বগত ও তথ্যগত গবেষণামূলক কাজ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আলোকপ্রাপ্ত উচ্চবিত্ত অংশকে পার্টির পক্ষে টেনে আনবার কাজের বিপুল পৃথক গুর"ত্ব রয়েছে। মাওবাদী আন্দোলন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে, ব্যক্তিকেন্দ্রীক কিছু তৎপরতা চালালেও এই সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলোকে কার্যত বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এভাবে পার্টি গঠনে, পার্টির বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রসরতা সৃষ্টিতে, সকল নিপীড়িত ও আলোকপ্রাপ্ত অংশকে পার্টির বলয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এভাবে পার্টি-গঠনের মৌলিক কাজ অসম্পূর্ণ, নিম্নমানের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, যা কিনা পরবর্তীকালে পার্টির নেতৃত্বসারির বিভিন্নধর্মী লসের প্রক্রিয়ায় প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে উপনীত হয়েছে।

* পেশাদার বিপ্লবী গড়ে তোলা পার্টির গঠনের জন্য একটি মৌলিক প্রশ্ন, যার সঠিক মীমাংসা প্রয়োজন। লেনিন এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

পেশাদার বিপ্লবী গঠনের সাথে দুটো বিষয় যুক্ত। এক ঃ সার্বক্ষণিক বিপ্লবী কর্মী যারা পুরোপুরিভাবে পার্টির ও বিপ্লবী কাজের জন্য নিবেদিত। দুই ঃ সর্বহারা শ্রেণির পার্টি হিসেবে তার নেতৃত্ব কাঠামোকে ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার পরিচালনা থেকে অব্যাহতভাবে মুক্ত করার প্রক্রিয়া রাখা।

মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম উত্থান পর্বে মূলত তর"ণ ও নবীন বিপ্লবীরা তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক জীবন ত্যাগ ক'রে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যারা তখনো অধিকাংশই কোন ব্যক্তিমালিকানায় জড়িত নন, স্ত্রী/স্বামী বা সম্ড়নের সমস্যা থেকে মুক্ত। ফলে এ সমস্যার সাথে জড়িত জটিলতাগুলো সেসময়ে তেমন একটা গুর"তরভাবে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু যখনই কৃষকের মাঝে পার্টি ভিত্তি গাড়তে শুর" করে, এবং সেখান থেকে প্রচুর বিপ্লবী বের হবার প্রক্রিয়া শুর" হয়, তখন এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাধারণভাবেও পেশাদার বিপ্লবীর ক্ষেত্রে বহু সময়ই ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণিউদ্ভূতদের ব্যক্তিগত সম্পদের প্রশ্ন, পরিবারের প্রশ্ন উঠে আসে, যার সাথে তাদেরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা ও পার্টিগঠনকে এগিয়ে নেয়াটা জড়িত।

এই গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়টি এ পর্বে সমগ্র আন্দোলনেই খুব কম আলোচিত হয়েছে। ফলে তা মীমাংসিত হয়নি। এর কুফল হিসেবে পরবর্তীকালে আন্দোলন যখন বয়ঃপ্রাপ্ত

হয়েছে তখন বহু কমরেড ব্যক্তিগত/পারিবারিক ভরণপোষণের জন্য ব্যক্তিগত পেশায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন এবং কার্যত বিপ্লব থেকে ঝরে গেছেন।

– সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির একটি শক্তিশালী বিকাশমান ফান্ড গড়ে তোলা, সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়মিত আয়ের সংস্থান সৃষ্টি, পেশাদারদের ব্যক্তিসম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পিত ব্যবহার প্রভৃতি এক্ষেত্রে খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। যদিও যাবতীয় বৈষয়িক প্রশ্নে স্বার্থত্যাগ ও উদ্বুদ্ধকরণই মূল বিষয়, যাকে অবশ্যই কখনো দুর্বল করা উচিত নয়।

যুক্তফ্রন্ট প্রশ্ন

পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্ট– এ তিনটি হলো মাও-বর্ণিত বিপ্লবের তিন যাদুকরী অস্ত্র (ম্যাজিক উইপন)। এই মাওবাদী সূত্রকে মাওবাদী আন্দোলন সূচনা থেকেই তত্ত্বগতভাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ফ্রন্ট-লাইনের বাস্ড়ব প্রয়োগে গুর"তর দুর্বলতা ও বিচ্যুতি আমরা মাওবাদী আন্দোলনে লক্ষ্য করি যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তার এ প্রথম পর্বেই। বিপ্লবের ব্যর্থতার এটা একটা বড় মৌলিক কারণ হয়ে রয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট হলো আন্দোলন ও বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা। যুক্তফ্রন্টের মৌলিক বিষয় হলো পার্টির নেতৃত্বে সরাসরি জনগণের বিভিন্ন মিত্র শ্রেণিকে সংগঠিত করা, যারা বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করবেন এবং বিপ্লবী ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট শুধু বিপ্লবী আন্দোলন নয়, সব ধরনের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যও কাজ করে বটে। সুতরাং সরাসরি বিপ্লবী ক্ষমতার সাথে যুক্ত নয়, এমন বহুসব প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যও যুক্তফ্রন্ট প্রয়োজন। অবশ্য সে সব আন্দোলনই বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসেবেই কাজে লাগাতে হবে, এবং তার অধীনেই তাকে রাখতে হবে। এ বিষয়গুলোতে মাওবাদী আন্দোলনে তেমন একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

একটা প্রবণতা ছিল এই যে, বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা আকারেই শুধু একে গড়ে তোলা যায়, এমনকি ক্ষমতা অর্জিত হবার পরে মাত্র (পূবাকপা)। এতে একদিকে ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ড় ফ্রন্টের কাজকে পরবর্তীকালের কাজ হিসেবে ফেলে রেখে শুধু দুই অস্ত্র– পার্টি ও বাহিনী নিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। এটা মাওবাদ থেকে সরে গিয়েছিল। পার্টির নেতৃত্বে গণসংগঠন গড়ে তোলার নীতি/পদ্ধতি গড়ে না ওঠাও, কার্যত গণসংগঠনের কাজকে বর্জন করাও, এই প্রশ্নে বাস্ড়ব সাংগঠনিক কার্যক্রম গড়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও রাজনৈতিকভাবে কেউ যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তাকে বাদ দেয়নি।

আমাদের পার্টি এসএস-নেতৃত্বে '৭৩-সালে উপর থেকে যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল কাগুজে ও গোঁড়ামিবাদধর্মী। এমনকি, বিভিন্ন গণসংগঠনের যে ঘোষণা তখন দেয়া হয়েছিল সেটাও নিছক কাগুজে ছিল। বাস্ড়বে গণসংগঠনের কোন কার্যক্রম গড়ে তোলার নীতি/পদ্ধতি আমাদের পার্টি তখন গড়ে তুলতে পারেনি। বিশেষত ঘাঁটি-প্রশ্নে বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় কর্মসূচি

বাস্ড়বায়ন ও ক্ষমতা দখলের সমস্যা, এবং একই কারণে ও শ্রেণিলাইন-গণলাইনের দুর্বলতা ও গণসংগঠনের নীতি/পদ্ধতির অভাবে আমরা শক্তিশালী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলা সত্ত্বেও এমনকি প্রাথমিক ধরনের গেরিলা অঞ্চলগুলোতেও জনগণের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন গণসংগঠনে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হই। অন্যদের ক্ষেত্রেও কম/বেশি একই সমস্যা ঘটেছিল।

– কিন্তু আরো সমস্যা হয়েছে যুক্তফ্রন্টের কাজকে শুধু পার্টির সরাসরি নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ করে ফেলার কাজের ধারা থেকে। বিপ্লবের এক সামগ্রিক জোয়ার আসার পূর্ব পর্যন্ড় পার্টির সশস্ত্র অঞ্চলগুলো বাদে পার্টির সরাসরি নেতৃত্বের বাইরেই অধিকাংশ জনগণ সংগঠিত থাকেন। তাদের সচেতন অংশ সংগঠিত থাকেন অন্যান্য গণতন্ত্রী ও বিপ্লবী সংগঠনে, তাদের একটা বড় অংশ সংগঠিত থাকেন বিভিন্ন ধরনের সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদী সংগঠনে। মাওবাদী আন্দোলনে প্রথম পর্বের সময়কালটিতে এটা ব্যাপকভাবে ছিল, কারণ, তখন দেশে ও বিশ্বে একটা উত্তাল বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

যুক্তফ্রন্টের লাইন পার্টিকে সক্ষম ক'রে তোলে এইসব জনগণের সাথে যৌথ আন্দোলন-সমঝোতা-মিত্রতা ও নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে, তাদেরকে সচেতন ক'রে তুলতে, বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণের ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে, যা কিনা বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে বিভিন্নভাবে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। যুক্তফ্রন্ট প্রশ্নে মাওবাদী আন্দোলন এই ধরনের পদক্ষেপ থেকেও প্রায় দূরেই সরে ছিল, যদিও খুব মাঝে মাঝে খুব খ"িত ও সাময়িক কিছু কিছু উদ্যোগ বিভিন্ন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এসেছিল।

– আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই এমনকি মাওবাদী কেন্দ্রগুলো পরস্পরকে সংশোধনবাদী বলার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী বলার মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি এক ধরনের বৈরী বিভেদাত্মক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। মাওবাদী বহির্ভূত বিভিন্ন সশস্ত্র সংগ্রামী বা গণআন্দোলনপন্থী কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে এটা আরো বেশি প্রযোজ্য ছিল। এটা যুক্তফ্রন্টের কাজে যে এক গুর"তর বাধার সৃষ্টি করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

– মাওবাদী আন্দোলন প্রকাশ্য গণআন্দোলন-গণসংগঠন মূলত বর্জন করেছিল। ৬০/৭০-দশকের এ সময়টাতে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের পাশাপাশি যে বিরাট ও ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনসহ বহুমুখী গণআন্দোলনের জোয়ার এদেশে বয়ে যায় তাতে মাওবাদী আন্দোলন তার সামর্থ্যের তুলনায় খুবই কম ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। আন্দোলনের এই সেক্টরে যুক্তফ্রন্ট-লাইনের যে বিশাল গুর"ত্ব ছিল তা কার্যত কোন প্রয়োগেই যায়নি।

* রণনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান গুর"ত্বের সাথে রণকৌশলগত যুক্তফ্রন্টের প্রশ্নটিকে সমন্বিত করা হয়নি। ফলে তা রণনৈতিক যুক্তফ্রন্টের কাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।

পার্টির সরাসরি নেতৃত্বে রণনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণকে সংগঠিত করার কাজ হলো একটি স্থায়ী ও দীর্ঘসূত্রী কাজ। এমনকি বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন পার্টি-বহির্ভূত শক্তির জোট গঠনটিও দীর্ঘস্থায়ী কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ইস্যুভিত্তিক অসংখ্য ধরনের সাময়িক বা অস্থায়ী জোট গড়ে উঠতে পারে– বিশেষত গণআন্দোলনে, জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে, প্রকাশ্য কাজে– যার গুর"ত্ব অপরিসীম। এধরনের কাজে আংশিক সংগ্রাম, বা কৌশলগত কর্মসূচির গুর"ত্বকে না বোঝার কারণে এ ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের লাইনকেও প্রয়োগের প্রশ্ন আসেনি। অথচ পার্টির একক নেতৃত্ব ও উদ্যোগের বদলে এ ধরনের যৌথ আন্দোলন, এমনকি যুগপৎ আন্দোলন– যুক্ত ফ্রন্ট লাইনেরই বিভিন্ন প্রয়োগমাত্র। এরা একে অন্যকে এগিয়ে দেয়। এর সুচার" সংযুক্তকরণ ব্যতীত "যাকেই সম্ভব তাকেই ঐক্যবদ্ধ কর"– এই মাওবাদী নীতিকে আমরা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হবো, যা এ সময়কালে গুর"তরভাবে ঘটেছে।

বরং বিপরীতে যুক্তফ্রন্ট-লাইনের এই ধরনের দুর্বলতা ও বিচ্যুতির কারণে গণতন্ত্রী শক্তির সাথে বা আন"ঙ্কমাওবাদী বৈরী সংঘর্ষেও মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়তে বা তার উপক্রম হতে দেখা গেছে, যা বিপ্লবী সংগ্রামকে দুর্বল করেছে, জনগণকে হতাশ করেছে ও বিভক্ত করেছে।

* জাতিগত আন্দোলনগুলোর সাথে রণকৌশলগত যুক্তফ্রন্টের বিশাল গুর"ত্ব রয়েছে। এটা জাতি সমস্যার সঠিক উপলব্ধির সাথে জড়িত বিষয়। জাতিগত আন্দোলনগুলো ক্ষুদে বুর্জোয়া বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত। ফলে স্বভাবতই সেগুলোতে বিপুল পরিমাণে সংকীর্ণতাবাদ এবং কম/বেশি প্রতিক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান। কিন্তু একই সাথে তা প্রধান শত্র" রাষ্ট্রযন্ত্রের বির"দ্ধে যুদ্ধরত/সংগ্রামরত বলে তার সাথে আমাদের যুক্তফ্রন্ট গঠন হতে পারে, অথবা সে লাইন থেকে তাদের প্রতি আমাদের ইতিবাচক আচরণ থাকতে হবে। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মাঝে পার্টির স্বতন্ত্র কাজ বিকাশের গুর"ত্বের পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের এই প্রশ্নটিকেও গুর"ত্ব সহকারে প্রয়োগ করতে হবে।

এসএস-নেতৃত্বাধীন আমাদের পার্টি পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের একাংশের মাঝে ভাল কাজ গড়তে সক্ষম হলেও এক্ষেত্রে সঠিক নীতি দ্বারা চালিত হতে পেরেছিল সেটা বলা যাবে না। বরং বিপরীতে আমাদের মাঝে পার্টিজান সংকীর্ণতাবাদ ছাড়াও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর আন্দোলনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হতে আমরা ব্যর্থ হই। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি সঠিকভাবে উত্থাপন করলেও আমাদের পার্টিসহ সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, তথা বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

** এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে '৭৪-সাল ও পরবর্তী কিছু সময়জুড়ে বিশেষ অগ্রসর কিছু অনুশীলনের বিষয়ে আমাদের অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। সেখানে এ সময়ে নিগেদ গড়ে উঠেছিল, পার্টির নেতৃত্বে জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের গণসংগঠন

ও গণক্ষমতার ভ্রূণ হিসেবে গণকমিটি ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল এবং এভাবে বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের কাজে অগ্রগতি ঘটেছিল। ফলে গণযুদ্ধকে বিকশিত করা ও ঘাঁটির লক্ষ্যে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে এখানে ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু সে সময়ে আমাদের পার্টি এই গুর"ত্বপূর্ণ অগ্রগতিগুলোর বিপুল তাৎপর্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, তাকে সেভাবে আঁকড়ে ধরা হয়নি এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে সাধারণ নীতি-পদ্ধতি গড়ে তুলে পার্টি-লাইনকে বিকশিত করতে পারেনি। বিশেষত ঘাঁটি-সংক্রান্ড় লাইন ও পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও বিচ্যুতির থেকে এটা উদ্ভূত হয়েছিল। এ কারণেই পার্বত্য-কাজের এসব অগ্রসরতাকেও ভালভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা যায়নি। পরবর্তীতে এসএস-এর মৃত্যুর পরই পার্টি ভেঙে যায়, এবং আরো অনেক কারণে এই সংগ্রাম আরো কিছুটা এগিয়ে বিপর্যস্ড় হয়ে যায়।

*** উপরে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা ও তার প্রথম পর্বের উত্থানকালের আলোচনাটি কিছুটা বিস্ড়তভাবে করা হয়েছে, কারণ, এটাই আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে শুধু দেশীয় আন্দোলনই নয়, সমগ্র বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বিপর্যস্ড় হয়ে পড়ায় এবং একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আন্দোলন পাড়ি দেবার কারণে আন্দোলনের এমনিতর জোয়ার আর কখনো সৃষ্টি হতে পারেনি। এই উত্থান পরাজিত হবার পর ব্যাপকতম অংশ অধপতিত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পর্বে নতুন ক'রে এ আন্দোলন গড়ে উঠলেও তার মাঝে এই ভিত্তিগুলো থেকে যায় কম/বেশি ক'রে। সুতরাং আজকে যখন একটা সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা হয়েছে– শুধু দেশীয় নয়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও, তখন এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের এই ভিত্তিতে যে মৌলিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলো কাজ করেছে তার সুস্পষ্ট উদ্ঘাটনই প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ কাজ। এর উপলব্ধির সাথে বিগত শতকের সমগ্র যুগের সাথে প্রকৃত রাপচার ঘটানোর সফলতা জড়িত। যাকিনা একটি নতুন যুগের নতুন কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রথম কাজ।

– এখানে গুর"ত্বসহকারে যা মনে রাখা দরকার তাহলো, উপরে আলোচিত কিছু ত্র"টি অবশ্যই ছিল ঐতিহাসিক– যা সে সময়কার মতবাদ বিকাশের ও তার উপলব্ধির অনিবার্য দুর্বলতা থেকে সৃষ্ট। কিন্তু পাশাপাশি ত্র"টিগুলোর অনেক কিছুই ব্যাপক আকারে ছিল ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণি-চরিত্র উদ্ভূত এবং মালেমা'র উপলব্ধিগত দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত একতরফাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের সমস্যা থেকে সৃষ্ট। কিন্তু ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা বা ত্র"টি যে কারণেই ঘটুক না কেন, ভুল ভুলই। সেটা তার ছাপ রেখে গেছে সংগ্রামের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। সুতরাং তার সুস্পষ্ট ও নির্মম উদ্ঘাটন ব্যতীত বিপ্লব বিকশিত হতে পারে না।

এই প্রথম পর্বের উত্থান সামগ্রিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয় '৭৪-সাল থেকেই। আমাদের পার্টিসহ বিপ্লবী সংগ্রামগুলো বিপর্যস্ড় হতে শুর" করে। কমরেড এসএস-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের এই বিপর্যয় গুণগতভাবে এগিয়ে যায় বললে ভুল হবে না। পার্টিগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। নতুনতর বিভক্তি আন্দোলনকে গ্রাস

করে। আন্দোলনে ব্যাপক নেতৃত্ব শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সামগ্রিক এক হতাশা, ঝরে পড়া, সুবিধাবাদিতা, বিভ্রান্তি, ও এমনকি পথভ্রষ্টতা, অধপতন ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম হয়।

এটা ঘটে এমন এক সময়ে যখন মাত্র অল্প পরেই ১৯৭৬-সালের ৯ সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যান মাও-এর মৃত্যু এবং চীনের তেংপন্থা ও আলবেনিয়ার হোক্সাপন্থার বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনও এক সার্বিক বিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন রুশ-বিপ্লব পরবর্তী ৬০ বছর পর এই প্রথম তার ঘাঁটি এলাকা হারিয়ে ফেলে, একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বিহীন হয়ে পড়ে, একটি আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইনের অভাবে ভুগতে থাকে। স্বভাবতই দুনিয়াজোড়া জনগণের বিপ্লবী উত্থানও বিপর্যস্ত হয়ে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমন এক সামগ্রিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এ দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা মাওবাদী আন্দোলন-এর সংকট সুগভীরভাবে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এরই মাঝে এই বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসবার নতুন উদ্যোগ আন্দোলনের মধ্য থেকেই জাগরিত হতে থাকে। সেটা হলো এক নতুন অধ্যায়ের শুরু– দেশে ও বৈশ্বিক পরিসরে, উভয় ক্ষেত্রেই। ❑

আন্দোলনের মতাদর্শগত সমস্যাবলী

মতবাদিক লাইনের সাথে মতাদর্শগত বিষয়াবলী ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিন্তু মতবাদিক লাইনের আলোচনায় আসে না এমন মতাদর্শিক কিছু বিচ্যুতি/ধারা/প্রবণতাকে আমাদের আলোচনা করতে হবে পৃথকভাবে। আন্দোলনের এই মতাদর্শিক পুনর্গঠন ছাড়া মতবাদিক লাইনকে আত্মস্থ করাও কঠিন, যদিও একে অন্যের পরিপূরক। হতে পারে এইসব মতাদর্শগত সমস্যা শুধু আমাদের দেশেরই সমস্যা নয়, স্ট্যালিন-পরবর্তী একটি গোটা পর্যায়ের বিশ্বব্যাপী সাধারণ সমস্যার অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয়ের সাথে এগুলো জড়িত। সুতরাং মতাদর্শগত এইসব প্রবণতার আলোচনা বিশ্ব-আন্দোলনের আলোচনাতেও কোন না কোন জায়গায় কোন না কোন মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মাওবাদী আন্দোলনের সবগুলো ধারার মতাদর্শগত প্রবণতা একইরকম ছিল না। তবে সমগ্রভাবে কিছু সাধারণ সমস্যা/দুর্বলতা/বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় যার কোনটা কোন পর্বে কোন ধারায় শক্তিশালী ছিল, আর অন্য কোনটি হয়তো ভিন্ন পর্বে ভিন্ন ধারায় জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছিল। আজকের এক নতুন যুগসন্ধিক্ষণে নতুনতর সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে বটে। কিন্তু বিগত সুদীর্ঘ যুগব্যাপী সমস্যাগুলোকে ভালভাবে চিহ্নিত না করলে আমরা বর্তমানের নতুনতর সমস্যাগুলোকেও ধরতে পারবো না।

সমস্যাগুলো নিম্নরূপ–

১। প্রয়োগবাদ ঃ

সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন জুড়ে, বিশেষত তার বিপ্লবী ধারায় প্রয়োগবাদ একটি

গুরুতর মৌলিক সমস্যা আকারে বিরাজমান ছিল। মাও-এর 'অনুশীলন সম্পর্কে' তত্ত্বকে খুবই যান্ত্রিকভাবে ও একপেশেভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এর বিভিন্নমুখী প্রকাশ ও রূপ আমরা দেখতে পাই– যার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো।

ক) <u>এ্যাকশনবাদ</u>

প্রয়োগবাদের একটা বিশেষ রূপ হিসেবে সশস্ত্র আন্দোলনে এ্যাকশনবাদ গড়ে ওঠে। এ্যাকশনই সব, লাইন বা মতাদর্শ-রাজনীতি তেমন একটা বড় বিষয় নয়, অথবা সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ও তত্ত্বের কচকচি– এ ধরনের চেতনা গুরুতররূপে বিকশিত হয় গণযুদ্ধের পরিমণ্ডলে, যা আমরা প্রত্যক্ষ করি বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলনের সবগুলো ধারার মাঝেই। পরবর্তীকালে পূবাকপা ও এমবিআরএম-এর মাঝে এ সমস্যা গুরুতররূপে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখি।

খ) <u>সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ</u>

প্রয়োগবাদ অবধারিতভাবে সংকীর্ণ অভিজ্ঞাতাবাদে নিজেকে প্রকাশ করে। সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাই যে সত্য নয়, সত্যে উপনীত হবার জন্য যে অনুশীলন ও তত্ত্বের, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার অনেকগুলো আবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়– তা ব্যাপকভাবে বাতিল হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার সারসংকলনকে তত্ত্ব ও নীতির সাথে সংযুক্ত না করা সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য, যা মাওবাদী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে দেখা গেছে।

গ) <u>তত্ত্বের গুরুত্বহীনতা</u>

মাওবাদী আন্দোলনে তত্ত্বের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে অবনমিত হয়ে যায়। অথবা তাকে মূলতই মাও-অধ্যয়নে সীমিত করে ফেলা হয়, যদিও এ সময়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাও-অধ্যয়নের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। এমনকি আমাদের পার্টিতে গোঁড়ামিবাদ বিরোধী সংগ্রামের নামে এক পর্যায়ে পার্টি-সাহিত্যের বাইরে মালেমা'র বিজ্ঞান অধ্যয়ন, আত্মস্থ করা ও আলোচনার গুরুত্ব গুরুতরভাবে কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। তত্ত্ব ও অনুশীলনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, কখনো কখনো তত্ত্ব/লাইনের প্রাধান্য– ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রায় ভুলে যাওয়া হয়।

২। ব্যক্তিতাবাদ ঃ

ক) <u>লিন-পন্থার প্রভাব</u>

ব্যক্তিতাবাদ হলো বুর্জোয়া/ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণিবৈশিষ্ট্য যা শ্রেণি, লাইন, পার্টি ও জনগণের চেয়ে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

এর একটি বিশেষ প্রকাশ ছিল লিনপন্থার মাঝে। জনগণ নয়, ব্যক্তিই ইতিহাস সৃষ্টি করে– এই হলো লিনপন্থার সূচনাবিন্দু। পরবর্তীকালে পেরু-পার্টিতে উদ্ভূত 'জেফেতুরা' তত্ত্বও এরই একটা বড় বহিঃপ্রকাশ ছিল।

ইতিহাসে ও বিপ্লবে ব্যক্তির অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যাকে তুলে ধরা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তি তার লাইনগত/রাজনৈতিক ভূমিকা দ্বারাই নেতৃত্বের মর্যাদা পান।

তাই, 'মহান নেতৃত্ব' বা 'কর্তৃত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব'– এ জাতীয় শব্দমালার মধ্য দিয়ে লাইনের ঊর্ধ্বে তাকে স্থাপন, পার্টির ঊর্ধ্বে তাকে স্থাপন বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার বাইরে স্থাপন– এসবই লিনপন্থার বিভিন্নমূখী প্রকাশ, যা জিপিসিআর-এর প্রথম পর্বে মাওবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

'চিন্ড়াধারা' বা 'শিক্ষা'– এ জাতীয় সূত্রের মাধ্যমে তাকে মতবাদের স্ড়রে নিয়ে এসে নেতৃত্বের অবদানকে মতবাদের ঊর্ধ্বে নিয়ে আসা এই ধরনের ব্যক্তিতাবাদকেই প্রকাশ করে। আমাদের দেশে আমরা এর গুর"তর প্রভাব দেখি এসএস-আমলে আমাদের পার্টিতে, পূবাকপা ধারার মধ্যে এবং পরবর্তীকালে এসএস-চিন্ড়াধারার তত্ত্ব তুলে ধরার মধ্য দিয়ে।

খ) <u>মতাদর্শগত সংগ্রামের নামে ব্যক্তিগত শুদ্ধিকরণ সংগ্রাম পরিচালনা ভাল কমিউনিস্ট হবার লিউ শাওচী-পন্থার প্রভাব</u>

ব্যক্তিতাবাদী এই সমস্যা আমাদের পার্টিতে ব্যাপকভাবে বিরাজমান ছিল ও রয়েছে। মতাদর্শগত সংগ্রাম, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা পার্টির ও কমরেডদের অসর্বহারা চিন্ড়াধারা ও কর্মপদ্ধতি কাটিয়ে তোলার জন্য পার্টির মধ্যে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। কিন্তু এর নামে প্রায়শই পার্টি-অভ্যন্ড়রস্থ ব্যক্তি সংগ্রাম সামনে চলে আসে। এটা রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক প্রশ্নকে দুর্বল করে দিয়ে ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে আসে। উপরন্তু ব্যক্তির ছিদ্র অন্বেষণের মধ্য দিয়ে এটা কমরেডদের মধ্যকার ঐক্যকে বিনস্ট করে, নবীন কমরেডদের হীনমন্য করে ফেলে। এটা প্রকারান্ড়রে ব্যক্তিশুদ্ধিকরণের লিউশাওচী-পন্থী মতাদর্শকে পার্টিতে নিয়ে আসে।

৩। অভ্যন্ড়রীণ ও দুই লাইনের সংগ্রামকে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে কেন্দ্রীভূত না করা ঃ

পার্টিকে দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিকশিত হতে হয়। কারণ, পার্টি অভ্যন্ড়রে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মতের উদ্ভব ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, যা হলো একটি বস্তুগত বাস্ড়বতা। একইসাথে, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিভিন্নরূপী সংশোধনবাদের বির"দ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু এ সমস্ড় সংগ্রাম প্রায়শই লাইন তথা রাজনৈতিক প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হয়নি। মতাদর্শ ও রাজনীতির মাঝে মতাদর্শ হলো প্রথম– এই সূত্র দ্বারা যান্ত্রিকভাবে চালিত হয়ে মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রায়ই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়, রাজনীতিক প্রশ্ন পিছিয়ে পড়ে, এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম প্রায়ই লাইনগতভাবে না হয়ে মতাদর্শগত শুদ্ধির ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যক্তিতাবাদী সংগ্রামে পর্যবসিত হয়।

বিপ্লবে ভাল মানুষ, ত্যাগী মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, সাহসী মানুষ ও দক্ষ মানুষ অবশ্যই দরকার। কিন্তু সর্বোপরি দরকার বিপ্লবী রাজনীতিতে সজ্জিত মানুষ। এবং এটা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল– কিন্তু পরেরটা হলো প্রধান। পার্টি হলো প্রথমত রাজনৈতিক সংগঠন। সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐকমত্য হলো পার্টি-ঐক্যের ভিত্তি। যাকে আরো

সঠিকভাবে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইন বলা যেতে পারে।

এ প্রশ্নে স্পষ্টতার অভাব ও অনুশীলনগত ত্র"টি আমরা দেখতে পাই লাইনকে, তথা মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনকে প্রাধান্য না দিয়ে টেকনিক্যাল প্রশ্নে গুর"ত্বদান/অতি জোর প্রদানের মধ্যে। এটা আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনে পার্টি-অভ্যন্ড়রের সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। টেকনিক্যাল বিষয়ের মতপার্থক্যসহ সব কিছুকেই লাইনগত সংগ্রাম বলে কার্যত প্রকৃত লাইনের প্রশ্নকে ঝাপসা করে দেয়া হয়েছে।

৪। বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের নামে নীতি থেকে বিচ্যুতি, এবং নীতির নামে সৃজনশীলতা প্রয়োগে ব্যর্থতা ও গোঁড়ামিবাদ ঃ

এ উভয় সমস্যাই মাওবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন সময়ে প্রভাব বিস্ড়ার করেছিল।

আমাদের পার্টির ইতিহাসে প্রথম ধরনের বিচ্যুতির প্রাধান্য ছিল। বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ ছাড়া মার্কসবাদ হয় না। এটা হলো মার্কসবাদের জীবন্ড় আত্মা। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এর নাম করেই নীতি থেকে বিচ্যুতিও ঘটে থাকে। আমাদের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি আসবার ক্ষেত্রে, ঘাঁটি-প্রশ্ন থেকে বিচ্যুতির ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালের 'সস পর্যায়' লাইনসহ বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ বিচ্যুতিগুলো এই সমস্যা থেকেই ঘটেছিল।

অন্যদিকে নীতির নামে বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণকে বাদ দেয়ার মধ্য দিয়ে গোঁড়ামিবাদী বিচ্যুতিরও বিস্ড়র উদাহরণ পাওয়া যাবে।

৫। জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি, এবং বিদেশী পার্টি/লাইনের অসৃজনশীল লেজুড়বৃত্তি ঃ

মাওবাদী আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল একটা আন্ড়র্জাতিক-বিহীন অবস্থায়। মাও-এর জীবিতকালে তৃতীয় আন্ড়র্জাতিক বিলুপ্তকরণের সারসংকলন হয়নি এবং নতুন কোন আন্ড়র্জাতিক গঠনের উদ্যোগও নেয়া হয়নি। যদিও মাও-নেতৃত্বাধীন চীনা পার্টি আন্ড়র্জাতিক সাধারণ লাইন বিনির্মাণে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সারসংকলনে যুগান্ড়কারী ভূমিকা রেখেছিল এবং ব্যাপক আন্ড়র্জাতিকতাবাদী ভূমিকা রেখেছিল, কিন্তু 'আন্ড়র্জাতিক' গড়ে না ওঠা আন্ড়র্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শগত ধারায় একটা বড় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই।

কমিউনিস্ট আন্ড়র্জাতিক বিলুপ্ত করে দেবার পর থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির একটা বিশেষ রূপ গড়ে ওঠে। যে যুক্তিগুলোর ভিত্তিতে আন্ড়র্জাতিক বিলুপ্ত করা হয়েছিল, সে সব সমস্যার বাস্ড়বতা থাকলেও এই সিদ্ধান্ড় কিছু ভুল প্রবণতা ও বিচ্যুতিকে গড়ে তোলে। প্রতিটি দেশের পার্টি স্বাধীন, পার্টিগুলোর সম্পর্ক ভ্রাতৃপ্রতিম, সমান সমান, গুর"শিষ্যের নয়; একটি একক কেন্দ্র

থেকে বিভিন্ন দেশের বাস্ড়বতা বোঝা ও বিপ্লবের গাইড করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন পার্টি একে অন্যের অভিজ্ঞতা বিনিময় শুধু করবে, কেউ কাউকে মূল্যায়ন করাটা নর্মবিরোধী; প্রতিটি দেশের লাইন নির্মাণের দায়িত্ব সে দেশের সর্বহারা শ্রেণির, 'বাইরে' থেকে কিছু বলাটা সঠিক নয়– ইত্যাকার ভুল চেতনা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় আন্ড়র্জাতিকের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো থেকে এসমস্ড় চেতনা গড়ে উঠবার শর্ত পেলেও সারবস্তুতে এসব চেতনা সর্বহারা আন্ড়র্জাতিকতাবাদকে দুর্বল করে দিয়েছিল। আন্ড়র্জাতিকের গঠন ও পরিচালনার নীতি/পদ্ধতিকে গুণগতভাবে উন্নত করার সঠিক পথের বদলে তাকে বিলুপ্ত করে দেবার ভুল পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির একটি নতুন রূপের উদ্ভব ঘটে। এটা সর্বহারা শ্রেণীর আন্ড়র্জাতিক ও আন্ড়র্জাতিকতাবাদী চরিত্র ও দায়িত্ব, এবং সে কারণে একটি আন্ড়র্জাতিক সাধারণ লাইন গড়ে তোলা এবং আন্ড়র্জাতিক পরিসরে তার ভিত্তিতে ঐক্য ও সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে অনেক দুর্বল করে দেয়।

– কিন্তু এরই পাশাপাশি নিজ পার্টির লাইনকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য বিদেশী পার্টি বা কমরেডদের সার্টিফিকেট ব্যবহার করা, বা সে সবের অসৃজনশীল লেজুড়বৃত্তি করা– এসব বিচ্যুতিপূর্ণ চেতনাও আন্দোলনে ব্যাপক শক্তিশালী ছিল।

এই উভয় ধরনের মতাদর্শগত বিচ্যুতিকে সংগ্রাম না ক'রে কোন সঠিক আন্ড়র্জাতিকতাবাদী পার্টি গড়ে তোলা যাবে না।

৬। সামগ্রিকতা ও অংশ, সাধারণ ও বিশেষ, রণনীতি ও রণকৌশল, বিপ্লবী সংগ্রাম ও আংশিক সংগ্রাম, গোপন কাজ ও প্রকাশ্য কাজ, সশস্ত্র সংগ্রাম ও গণসংগ্রাম, গ্রামের কাজ ও শহরের কাজ, কেন্দ্রীভূত কাজ ও ছড়ানো কাজ, মূল শ্রেণির কাজ ও অন্য শ্রেণির কাজ, পার্টির কাজ ও ফ্রন্টের কাজ, আদর্শগত কাজ ও রাজনৈতিক কাজ, তাত্ত্বিক কাজ ও বাস্ড়ব অনুশীলনগত কাজ– এই দ্বন্দ্বসমূহের মীমাংসার ক্ষেত্রে একতরফাবাদ। দ্বন্দ্ববাদের উপলব্ধি ও প্রয়োগের সমস্যা ঃ

প্রায় ক্ষেত্রেই মাওবাদী আন্দোলনে প্রধান প্রবণতা ছিল উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসায় একতরফাবাদের আশ্রয় নেয়া।

মাও দ্বন্দ্ববাদ বিকাশে মৌলিক অবদান রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলন দ্বন্দ্ববাদ অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করেছে সবচেয়ে কম করে।

এর কারণে মাওবাদী আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল বিনির্মাণে গুর"তর ধরনের একতরফাবাদী বিচ্যুতি কাজ করেছে।

৭। দ্বন্দ্ববাদের স্থলে সমন্বয়বাদ ঃ

মাওবাদী আন্দোলন তার প্রথম পর্বে মতাদর্শগতভাবে যে যান্ত্রিক একতরফাবাদের ভিত্তি গেড়েছিল তাকে পরবর্তীকালে আমাদের পার্টিতে কাটিয়ে তুলবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়, এবং দ্বন্দ্ববাদ উপলব্ধি ও প্রয়োগে গুর"ত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে।

কিন্তু এটা করতে গিয়ে পার্টিতে সমন্বয়বাদের একটা প্রভাব বেড়ে ওঠে। মতাদর্শগতভাবে সেটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত দেখা গেলেও তার প্রধান প্রভাব পড়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নতুন কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি ও লাইন গ্রহণের মধ্যে। 'সস পর্যায়'–লাইন এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ড়।

সমন্বয়বাদ নিজেকে বস্তুর সকল দিক দেখতে পারার মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক হিসেবে প্রকাশ করতে চাইলেও তার অন্ড়র্নিহিত বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুর মূল চরিত্রটিকে উপস্থাপন করতে না পারা। তাই, কোনটা দ্বন্দ্ববাদ, আর কোনটা সমন্বয়বাদ– সে বিচারে যথেষ্ট গুর"ত্ব দেয়া প্রয়োজন।

পাশাপাশি জোর দেয়া প্রয়োজন কোনটা যান্ত্রিক একতরফাবাদ, আর কোনটা বিপ-বী মাওবাদ– সে বিচারেও।

৮। প্রধান দ্বন্দ্ব ও মূল দ্বন্দ্বের প্রশ্নে দার্শনিক দুর্বলতা ঃ

মাওবাদী আন্দোলন মাও-এর প্রধান দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল, যা ইতিবাচক ছিল। এক্ষেত্রে প্রথম পর্বে কমরেড এসএস গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কিন্তু মূল দ্বন্দ্বের প্রশ্নটিকে একই মাত্রায় দুর্বল করে ফেলা হয়।

মূল দ্বন্দ্বের সমাধান ব্যতীত সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হয় না। তাই, প্রধান দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি বিপ্লবী রাজনীতির জন্য মূল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতনতা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। সুতরাং মূল দ্বন্দ্ব ও প্রধান দ্বন্দ্বের সম্পর্ক বিষয়টি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এর সাথে গুর"ত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব, মৌলিক দ্বন্দ্ব, তীব্রতম দ্বন্দ্ব– এইসব শব্দগুচ্ছ সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব মাওবাদী আন্দোলনে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক ও অনাকাংখিত বিভক্তির জন্ম দিয়েছিল।

এই বিষয়গুলোতে দার্শনিকভাবে স্পষ্টতা প্রয়োজন, যা এখনো ভালভাবে মীমাংসা হয়নি।

৯। মার্কসবাদী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা ঃ

মাওবাদী আন্দোলন আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে রাজনীতির উপর গুর"ত্ব দিয়েছিল। কিন্তু একইসাথে সমাজের ভিত্তি হিসেবে তার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুর"তর দুর্বলতা দ্বারা চালিত হয়েছে। মার্কসবাদী অর্থশাস্ত্র বিষয়ে গুর"ত্বহীনতা আন্দোলনে জেঁকে বসে।

সুদীর্ঘদিন এই ধারা অনুসরণের কারণে মার্কসবাদী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিশাস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্দোলনে দুর্বলতা গড়ে ওঠে। এমনকি গুর"ত্বপূর্ণ ও মৌলিক

বিষয়াবলীতে আত্মগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার কুঅভ্যাস ও বিচ্যুতি গড়ে ওঠে।

মাওবাদী আন্দোলন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এর উপর গুরুত্বারোপ প্রয়োজন।

১০। যুক্তিবাদ ঃ

মাওবাদী আন্দোলনে উপরোক্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতার হাত ধরে বিকশিত হয় যুক্তিবাদ। যুক্তি সত্যে উপনীত হবার একটি উপায় বটে, কিন্তু যুক্তিবাদ যুক্তি-তর্কের উপসংহারকেই সত্য মনে করে। কিন্তু সত্য হলো বস্তুগত বাস্তবতা, যা বহু সময় আপাতভাবে যুক্তিহীন মনে হতে পারে।

বিশেষত দুই লাইনের সংগ্রাম ও বিতর্কের ক্ষেত্রে আন্দোলনে, বিশেষত আমাদের পার্টিতে ব্যাপকভাবে যুক্তিবাদের চর্চা হয়েছে। এ সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। এবং তার পুনর্গঠন প্রয়োজন।

১১। ক্রমান্বয়বাদ ঃ

মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিশ্ব রাজনৈতিক উত্তাল সময়টা পার হবার পর বিশ্ব ও দেশীয় আন্দোলন এক সামগ্রিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়, এবং একটা দীর্ঘ লয়ে তার পুনরুদ্ধারের দুরূহ কাজ এদেশের মাওবাদী আন্দোলন হাতে নেয়। সে সময়ে মতাদর্শগতভাবে আন্দোলনে ব্যাপকভাবে ক্রমান্বয়বাদী বিচ্যুতি গড়ে ওঠে। এর পেছনে বিচ্যুতিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিও কাজ করেছে।

মার্কসবাদী দর্শন দ্বন্দ্ববাদে বিকাশের একটি নিয়ম হিসেবে পরিমাণগত বিকাশের প্রক্রিয়ায় গুণগত বিকাশকে তুলে ধরা হতো। দার্শনিক এই প্রতিপাদ্যের একটা তত্ত্বগত প্রভাব ছিল মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়বাদ বিকাশের ক্ষেত্রে।

যদিও মাও পরে দেখিয়েছিলেন যে, এ নিয়ম (পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন) প্রকৃতি ও সমাজে দেখা যায় বটে, তবে এটি বিকাশের ক্ষেত্রে বিপরীতের একত্বের মূল নিয়মেরই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু দর্শনে মাও-এর এই বিকাশকে তত্ত্বগতভাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও মাওবাদী আন্দোলনে ইতিপূর্বকার পরিমাণগত-গুণগত নিয়মের একটা বড় প্রভাব বজায় ছিল। এরই প্রকাশ ঘটে ক্রমান্বয়বাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে।

ক্রমান্বয়বাদ হলো বিকাশের প্রক্রিয়াকে ধীর লয়ে পরিমাণগত বিকাশের এক পর্যায়ে তারই ফলশ্রুতিতে আপনা আপনি গুণগত বিকাশ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। এটা সত্য যে, পরিমাণগত পরিবর্তন ব্যতীত গুণগত পরিবর্তন আসে না। কিন্তু বিকাশের গুণগত প্রশ্নটি হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে পরিমাণগত পরিবর্তনও আসলে ছোট ছোট উল্লম্ফন ও গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমেই ঘটে থাকে।

বিশেষত সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী গুণগত পরিবর্তন সচেতন প্রচেষ্টা দ্বারা আরোপ করতে হয়। এটা পূর্বতন প্রক্রিয়ার সাথে সচেতন বিচ্ছেদ ও পরিকল্পিত

উল্লম্ফনমূলক কাজ ছাড়া ঘটে না। বিশেষত যুদ্ধের ক্ষেত্রে, যখন আমাদের বিকাশকে আটকে দেবার জন্য বিপরীত একটা শক্তিশালী শত্রু সক্রিয়, তখন এই রাপচার বা সচেতন ও পরিকল্পিত উল্লম্ফন ব্যতীত গুণগত রূপান্তর ঘটে না। ফলে বিপ্লব আটকে যায়। অথবা তার সঠিক ও দ্রুত বিকাশলাভ ঘটে না।

ক্রমান্বয়বাদ দার্শনিকক্ষেত্রে উল্লম্ফন ও রাপচারকে দুর্বল করে দেয়– যদি-বা তাকে বাতিল না করে। রাজনৈতিকভাবে এটা সংস্কারবাদী বিচ্যুতি নিয়ে আসে।

১২। নারী-প্রশ্ন ঃ

নারী-প্রশ্নে সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনে গুরুতর দুর্বলতা, সমস্যা ও বিচ্যুতি বিরাজমান ছিল। যদিও ৮০-দশকে আমাদের পার্টি এক্ষেত্রে মৌলিক অগ্রগতি ঘটায়– যা ধারাবাহিকভাবে বিকাশমান। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মাওবাদী আন্দোলন এক্ষেত্রে গুণগতভাবে পশ্চাদপদতার পরিচয়ই দিয়েছে।

নারীদের মধ্যে কাজ করা অথবা নারী কেডার বা যোদ্ধা গড়ে তোলা, আর নারী-প্রশ্ন সমার্থক নয়। যদিও প্রথমোক্ত কাজগুলো অবশ্যই নারী-প্রশ্নে অগ্রগতির জন্য গুরুত্ব ধরে। প্রথম পর্বের বিপ্লবী আন্দোলন কম/বেশি পরিমাণে এ কাজ করেছিল বটে, কিন্তু নারী-প্রশ্নে তার চেয়ে বেশি কোন অগ্রগতি দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগে আন্দোলনে তখন ঘটেনি। ফলে নারীর অংশগ্রহণও আন্দোলনের ব্যাপ্তির তুলনায় ছিল অনেক পেছনে।

নারীমুক্তি বিপ্লবের অধীন অবশ্যই, কিন্তু তার বিশেষ ক্ষেত্র ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। যার অন্যতম মৌলিক বিষয় হলো যৌন প্রশ্ন, পরিবার প্রশ্ন, নৈতিকতার প্রশ্ন– যাকে অবশ্যই সামাজিক মূল্যবোধ থেকে বিপ্লবী বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নবতরভাবে তার নির্মাণ, পুনর্গঠন ও শিক্ষার এক নিরন্তর কাজ চালানো প্রয়োজন– পার্টির ভেতরে তো বটেই, পার্টির বাইরেও জনগণের মাঝে, যেখানে যেভাবে তা প্রযোজ্য সেভাবে।

কিন্তু এভাবে সমস্যাটিকে উপলব্ধি করা ও আঁকড়ে ধরা হয়নি। বরং বহু সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলনে বিরাজমান ছিল। আমাদের পার্টির প্রথম পর্বে 'ভ্রষ্টতা' বিরোধী যে চেতনাকে বিশেষ গুরুত্বদান করা হয়েছিল তা সামাজিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না। এছাড়া প্রেম-বিয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও পার্টি-বিপ্লবের স্বার্থ– এ দু'য়ের দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা করতেও পার্টি ব্যর্থ হয়েছে। এসবের জন্য বহু খেসারত পার্টিকে দিতে হয়েছে, বহু ভুল মূল্যায়ন ও ভুল শাস্তিদানের পদক্ষেপ পার্টি গ্রহণ করেছে, পার্টিতে ফজলু চক্র উদ্ভবের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নে পার্টির ভুল নীতি বড় শর্ত হিসেবে কাজ করেছে, এমনকি '৭৫-সালে বিপ্লবী আন্দোলনের চরম এক সংকটকালে গুটিকয় শীর্ষ নেতৃত্বের একজনকে মৃত্যুদণ্ডদানের ভয়ংকর ভুলের মাঝেও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ছিল।

মাওবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় কম/বেশি ক'রে নারীদেরকে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য একটা বড় শক্তি হিসেবে না দেখে একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখার কু-ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। প্রেম-বিয়েকে অনেক সময়ই ঝামেলা মনে করা হয়েছে। অনিবার্য

সন্ড়নাদি ও পারিবারিক সমস্যাকে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলত নারী কেডার সেভাবে গড়ে ওঠেনি, যারা এসেছেন তারা অনেকে বাস্ড়বেই সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় ধরনের পুর"ষ কমরেডদেরকেও সংশ্লিষ্ট দুই ধরনের কারণে আন্দোলন হারিয়েছে।

অবশ্য পুর"ষতান্ত্রিকতার বির"দ্ধে সংগ্রাম এবং নারী-মুক্তির প্রশ্নে জোরালো অবস্থানের কারণে আমাদের পার্টিতে বর্তমানে পুর"ষতান্ত্রিকতা ভিন্নরূপেও প্রকাশিত হয়, যা সমাজের বুর্জোয়া রূপান্ড়র থেকে এসেছে। শাশ্বত প্রেমের চেতনা, সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রেম, যৌন ও সন্ড়ন প্রশ্নে বুর্জোয়া অধিকার, যত্নশীলতার নামে পার্টি-বিপ্লবের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্ত্রী-স্বার্থের সেবা করা– ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনে নারীর পক্ষাবলম্বনের নামে অবিপ্লবী চেতনা সমাজে বিপুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যাকিনা আমাদের পার্টিতেও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। নারী-মুক্তির প্রশ্নে এ জাতীয় বিচ্যুতি এবং স্বার্থবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেও পার্টিতে ভালভাবে সংগ্রাম করতে হবে এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

১৩। সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন ঃ

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে এক ধরনের সংকীর্ণতাবাদী ও বিভেদবাদী বিচ্ছিন্নতায় ভুগেছে মাওবাদী আন্দোলন। এটা মতাদর্শগতভাবে ডানবিচ্যুতির ক্ষেত্রে আরো শর্ত দেয়।

চিন্ড়ার জগত এবং সৃজনশীল কর্মের এই ক্ষেত্রগুলোতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় এই ক্ষেত্রগুলো নিরংকুশভাবে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তদের দখলে। প্রগতিশীল অংশের মাঝেও ব্যাপকভাবে এই বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত চেতনার প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার উন্মোচন ছাড়াও বিশেষত জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ এবং সংস্কারবাদের ব্যাপক প্রভাবকে সংগ্রাম করা একটি দীর্ঘস্থায়ী কাজ। অন্যদিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করার প্রশ্নটিতেও দীর্ঘস্থায়ী কাজ প্রয়োজন। অবশ্যই আমরা বিপ্লবী শিল্প সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানী সৃষ্টির উপর জোর দেব। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে তা হবে সংখ্যালঘু। তাই, প্রগতিশীল কর্মের ও কর্মীদের সাথে ধৈর্যশীল সংগ্রাম ও দীর্ঘস্থায়ী পুনর্গঠনের উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বিপ্লবী কাজের অনুমোদন এবং অন্য সবকিছুর স্থূল নিষিদ্ধকরণ দ্বারা আমরা কোন উন্নত চিন্ড়াশীল সমাজ ও সৃজনশীল মানুষ গড়তে সক্ষম হবো না।

শিল্প-সংস্কৃতি বিপ্লবের জন্য একটা প্রধান হাতিয়ার– এটা মাওবাদী মাত্রই স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই জগতের বিশেষত্বকে আমলে নেয়া হয়নি। বরং শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বিপ্লবী সংস্কৃতি নির্মাণের আকাংখা ও প্রবণতা দ্বারা মাওবাদী আন্দোলন চালিত হয়েছে।

ফলে না হয়েছে যথেষ্ট সংখ্যক উন্নত শিল্প মানের সৃষ্টি, না হয়েছে প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতির বিপ্লবী পুনর্গঠন; এবং ব্যাপক বুদ্ধিজীবীদেরকে বিপ্লবী পরিম"লে টেনে আনা। একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সীমিত বিপ্লবী সংস্কৃতিকাজের জগতে মাওবাদী আন্দোলন

বিচরণ করেছে। এটা আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সফলতাগুলোকেও হাতছাড়া করে ফেলেছে। ফলত তার বুদ্ধিজীবীত্বের বিকাশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অন্যদিকে প্রচলিত সংস্কারবাদী, মানবতাবাদী, এমনকি বিনোদনমূলক সামাজিক সংস্কৃতির বলয় থেকে এমনকি নেতৃত্ব পর্যায়ের কমরেডগণও তেমনভাবে বের"তে পারেননি।

এরই প্রকাশ আমরা দেখি সুকান্ড়ের মত প্রগতিশীল সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মূল্যায়নের নামে এক ধরনের নেতিবাদী ধারণা গড়ে ওঠার মধ্যে। বিপরীতে আমাদের পার্টির রাজনৈতিক লাইনের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির প্রভাবে শরৎচন্দ্রকে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক' লেখক বলে মূল্যায়ন করবার ডানবিচ্যুতির মধ্যে। এ সবকিছু মাওবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কাজকে শুধু সংকীর্ণ গ"িতে আটকে দেয় তাই নয়, তার মাঝে গুর"তর ডানপন্থাও গড়ে উঠবার সুযোগ পায়।

– বিজ্ঞান ও দর্শনের আবিষ্কার ছাড়া মার্কসবাদ হতে পারতো না। তাই, বিকাশমান বিজ্ঞানকে মার্কসবাদী তত্ত্বে সংযুক্ত করার প্রশ্নটিকে যথোপযুক্ত গুর"ত্ব দিতে হবে। এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রশ্নে পার্টিকে সজ্জিত করার উপর গুর"ত্ব দিতে হবে। যেক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে।

১৪। সংকীর্ণতাবাদী পার্টিজান মতাদর্শ ঃ

মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনাতেই বহুধাবিভক্ত হয়ে একে অন্যকে সংশোধনবাদী ও এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল অভিধায় চিহ্নিত করার ভুল মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করার পর থেকে অব্যাহতভাবে যতনা বাস্ড়ব তথ্য থেকে, তার চেয়ে বেশি কল্পিত ধারণা থেকে অন্যদেরকে মূল্যায়ন করার প্রচ" আত্মগতভাব দ্বারা চালিত হয়েছে। এটা তথ্য থেকে সত্য অনুসন্ধান না করার ভাববাদ/গোঁড়ামিবাদে পর্যবসিত হয়েছে। এবং এভাবে সমগ্র আন্দোলনে এক গুর"তর সংকীর্ণতাবাদী পার্টি-জান মতাদর্শ গড়ে উঠেছে।

এ শতাব্দীর সূচনায় আমাদের পার্টি এ থেকে বেরিয়ে এলেও এর সামগ্রিক পুনর্গঠন হতে আরো সময় লাগবে। পূবাকপা/লাল পতাকা'র প্রধান নেতৃত্ব সম্প্রতি এক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন সেটাও খুবই আশাব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে তার পার্টি সমগ্রভাবে এতে কতটা সজ্জিত হতে পারে তা এখনো দেখার বিষয়।

এই ধরনের সংকীর্ণতাবাদী পার্টি-জান মতাদর্শ পার্টির বাইরের বৃহত্তর জনগণকে দেখা দূরের কথা, বৃহত্তর মাওবাদী আন্দোলনকে এবং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অনেক সময় দেখতেই পায়নি। ফলে এটা মাওবাদী ঐক্য এবং যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের পথে এক গুর"তর মতাদর্শগত বাধা হিসেবে কাজ করেছে। এটা নিজ পার্টির ভুল-ভ্রান্ড়ির দিকে নজর দিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। এটা ব্যক্তিগত সংকীর্ণতাবাদ, বিভেদবাদ, বিনয়ের অভাব, শিক্ষাগ্রহণের অভাব, আত্মসমালোচনা বিমুখতা এবং ঔদ্ধত্যের একসারি মতাদর্শগত সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

** সুতরাং পূর্বোল্লিখিত অতীত-মূল্যায়নের লাইনগত পর্যালোচনার পাশাপাশি এইসব মতাদর্শগত সমস্যাবলীর উপরও আমাদেরকে নজর দিতে হবে। কারণ, কখনো

কখনো মতাদর্শগত সমস্যাবলীই লাইনগত প্রশ্নে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার পথে বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই, লাইনগত সারসংকলন ও মতাদর্শগত পুনর্গঠন একটি পাশাপাশি বিষয়। একে একত্রে চালানোর মধ্য দিয়েই আমরা আন্দোলনকে উচ্চতর স্ড়রে উন্নীত করতে পারি। ❑

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মালে)-এর সংগ্রাম ও সমস্যা

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৪)

ভূমিকা

[লেখকের নোট ঃ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির লাইনের সমালোচনামূলক এই বিস্ড়রিত রচনাটি যখন যন্ত্রস্থ তখন এ পার্টির ইতিহাসে প্রধানতম নেতা, ও শেষদিকে এর তিনটি কেন্দ্রের একটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরীকে রাষ্ট্রীয় খুনী বাহিনী 'র‍্যাব' বন্দী অবস্থায় হত্যা করেছে গত ১৭ ডিসেম্বর। মৃত্যুর মুখেও তার দৃঢ় বিপ্লবী ভূমিকা মাওবাদী আদর্শের মহত্ত্ব ও অপরাজেয়তাকে এবং এ আদর্শের প্রতি তার আনুগত্যকে তুলে ধরেছে। বক্ষ্যমাণ রচনাটিতে পূবাকপা'র যে লাইন-নীতিসমূহের সমালোচনা করা হয়েছে তাকে প্রধানত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহীদ কমরেড চৌধুরী। ফলে এই রচনায় বারবারই তার নামটি এসেছে। রচনাটি তৈরিকালে ক.চৌধুরী জীবিত ও সক্রিয় ছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম, এই সমালোচনা ও সংগ্রামকে তিনি পর্যালোচনা করবেন, এবং আমাদের সাথে বিতর্ককে গভীর ও বিকশিত করতে ভূমিকা রাখবেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ রচনার প্রকাশকালে তিনি আর নেই! একজন শহীদ বিপ্লবী নেতা– যিনি আমাদের সমালোচনার জবাব দেবার জন্য এখন আর জীবিত নেই– সে প্রেক্ষিতটা ভিন্ন। আমরা আশা করবো তার অনুসারী আন্ড়রিক মাওবাদীগণ এটা উপলব্ধি করবেন। পাঠকবৃন্দের প্রতিও অনুরোধ থাকবে তারা যেন এটা স্মরণে রাখেন যে, আমরা যখন রচনাটি লিখেছি তখন একজন জীবিত কমরেডের ভুলকে সংগ্রাম করেছি, যার জবাব দেবার জন্য তিনি তখন সক্রিয় ছিলেন। একজন বিপ্লবী নেতার লাইনের এ সমালোচনা কোনক্রমেই তার বিপ্লবী জীবন, অবদান, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে একটুও ম্লান করে না। বরং তার আদর্শের বাস্ড়বায়নের জন্যই আমাদেরকে সঠিকভাবে এ কাজকে এগিয়ে নিতে হবে যাতে এদেশের সকল আন্ড়রিক মাওবাদীগণ একটি সঠিক লাইনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন।]

আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) একটি গুর"ত্বপূর্ণ ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। আরও কিছু মাওবাদী পার্টি ও গ্র"পের মত এই পার্টিও ষাট-সত্তর দশকের বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী উত্থানের প্রেক্ষাপটে, মাও সেতুঙের নেতৃত্বে চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষায় ও ভারতের মহান নক্সালবাড়ী

অভ্যুত্থানের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। এই পার্টিটি সত্তর দশকের প্রারম্ভে এদেশের মাওবাদী বিপ্লবী উত্থানের অন্যতম শরীক ছিল। সত্তর দশকের বিপর্যয়ের পর এই পার্টি সত্তর দশকের শেষার্ধে ও আশির দশকের প্রথমার্ধে নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম হয়। নব্বই দশকে প্রধানত দেশের পশ্চিমাঞ্চলে (ও গৌণত বৃহত্তর রাজশাহী-পাবনার কিছু এলাকায়) এ পার্টির নেতৃত্বে শক্তিশালী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠে যার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। তবে নতুন শতাব্দীর সূচনাতে এ পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে দু'টি ও পরে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়লেও, এবং তিনটি কেন্দ্র তিনটি পৃথক নামে এখন পরিচিত হলেও প্রত্যেকেই অবিভক্ত পার্টির লাইনগত উত্তারাধিকার মূলত দাবি করে। নব্বই দশকের সংগ্রামের ধারাবাহিকতা পশ্চিমাঞ্চলে এখনো চলছে এবং উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় তাদের বড় সংগ্রাম গড়ে উঠেছে।

সুদীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে এ পার্টির রয়েছে সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। যদিও এ সংগ্রামের রাজনৈতিক চরিত্রে বিবিধ বিচ্যুতি, এমনকি জায়গায় জায়গায় তার কম/বেশি অধপতন সম্পর্কে বহু প্রশ্ন, সমালোচনা ও দ্বিমত মাওবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির মাঝে রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্ড়ত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ড় এ পার্টি কেন্দ্রীয়ভাবে মূলত মাওবাদী শিবিরেই অবস্থান করেছে। বিভক্তির পর প্রতিটি কেন্দ্রের লাইন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা বিস্ড়রিতভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে অবগত না থাকলেও এটা ধারণা করা যায় যে, এখনো এর প্রধান তিনটি অংশেরই অসংখ্য আন্ড়রিক মাওবাদী নেতা ও কর্মী রয়েছেন, এবং বাহ্যত প্রতিটি কেন্দ্রই এখনো পর্যন্ড় নিজেদেরকে মাওবাদী বলেই দাবি করছে।

কিন্তু, পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুদীর্ঘ তিন দশকের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাস থাকলেও তার চরিত্রের বিভিন্ন বিচ্যুতিগুলো মোটেই হালকা কিছু নয়, বরং গুর"তর। এসব বিষয়ে সমালোচনা ও অভিযোগগুলো সবই যেমন সঠিক নয়, তেমনি সবই এগুলো ভিত্তিহীন বা সংশোধনবাদীদের প্রচারণা– তেমনটাও ঠিক নয়। সাম্প্রতিককালে তাদের বিভক্তির পর এমনসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে যা থেকে এ পার্টির বহু সমস্যা উঠে আসছে– যেগুলো নিছক অপপ্রচার বা ব্যক্তি আক্রমণ নয়, বরং যার গভীরে নিহিত রয়েছে গুর"তর লাইনগত প্রশ্নাবলী।

আমাদের এ রচনার উদ্দেশ্য হলো এ পার্টির লাইনগত সমস্যাগুলোকে ভ্রাতৃপ্রতিম অবস্থান থেকে পর্যালোচনা করা, যাতে এই পার্টির নেতা-কর্মীরাই শুধু চলমান বিতর্ককে গভীরতর করতে সহায়তা পাবেন তাই নয়, বরং বৃহত্তর মাওবাদী পরিসরে– আমাদের পার্টিসহ– ব্যাপক বিপ্লবী নেতা, কর্মী ও সচেতন জনগণ এ দেশের মাওবাদী আন্দোলনের সমস্যাগুলো নিয়ে 2LS-কে গভীর করতে সক্ষম হবেন– যার লক্ষ্য হলো এদেশের বিপ্ল-বের জন্য সামগ্রিকভাবে সঠিক ও উচ্চতর স্ড়রের একটি নতুন লাইন নির্মাণ করা ও তার ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী পার্টি গঠন করা। পূর্ব বাংলার মাওবাদী আন্দোলনের অন্য একটি গুর"ত্বপূর্ণ ধারার প্রতিনিধি হিসেবে আমরা মনে করি যে, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) [এখন থেকে সংক্ষেপে 'পূবাকপা' উল্লেখ করা হবে]-এর

সমস্যা এদেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের বৃহত্তর সমস্যারই অংশ– আমরা নিজেরাও কম/বেশি যার ভাগীদার ও ভুক্তভোগী। আমাদের পার্টি ভিন্ন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও বর্তমানে আমরা এদেশের মাওবাদী আন্দোলনকে বৃহত্তর পরিসরে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি– নিছক নিজ পার্টিগত পর্যালোচনা থেকে বেরিয়ে এসে– যা কিনা এদেশের মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলো সুদীর্ঘ তিন দশক ধরে করেনি। আমরা মনে করি যে, আমরাই একমাত্র সঠিক মাওবাদী পার্টি বা কেন্দ্র, আর অন্য সবাই সংশোধনবাদী– এমন অবস্থান বিগত তিন দশকের অভিজ্ঞতা ও আজকের পরিস্থিতি অনুমোদন করে না। এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সত্ত্বেও, তার ভুল-ভ্রান্ড়ির পাল্লা হালকা নয়– এবং আজ, ৩৫ বছর পর এ আন্দোলন এক সংকটকাল অতিক্রম করছে, যদিও বাস্ড়ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খোদ এই আন্দোলনে বিরাজমান শক্তি তার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেও সামনে রেখেছে। কিন্তু সে সম্ভাবনাকে জীবন্ড়করতে হলে অতীতের জের টানার বদলে সম্পূর্ণ এক নতুন উচ্চতায় এ আন্দোলনকে উন্নীত করতে হবে। তাই, আমরা এদেশের বিপ্লবের জন্য একটি মাওবাদী সঠিক লাইন নির্মাণ, সে লাইনের ভিত্তিতে সকল আন্ড়রিক মাওবাদীদের নিয়ে একটি নতুন ধরনের ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী পার্টি গঠন, এবং একটি সফল মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তোলা– এই তিনটি আন্ড়সম্পর্কিত কাজকে এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের আজকের নির্ধারক কাজ বলে নির্ধারণ করেছি। তাই, আমরা গুর"তর কিছু মতপার্থক্য সত্ত্বেও পূবাকপা'র মাওবাদী ঐতিহ্য ও আকাংখাকে সম্মান করে তাদের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনায় অংশ নিতে চাই– যে পর্যালোচনা এই পার্টিও করতে বাধ্য, এবং তাদের প্রতিটি বিভক্ত অংশই, সচেতন বা অসচেতনভাবে তা ইতিমধ্যে নিজ নিজ ধরনে করতে শুর" করেছে।

এই উদ্দেশ্য থেকেই আমরা পূবাকপা'র লাইন-সমস্যার উপর এ বিস্ড়ৃত আলোচনা তুলেছি, যা কিনা আরো বৃহত্তর ও ব্যাপকতম আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, এবং যা এই পার্টির আন্ড়রিক বিপ্লবীদের নিজেদের পর্যালোচনাকে বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়া ও তাতে তাদের ভূমিকা রাখায় সহায়তা করবে। এই মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে এই পার্টির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইতিহাস নিচে কিছুটা তুলে ধরা হচ্ছে– যাতে পাঠক আমাদের পর্যালোচনাকে সহজে অনুসরণ করতে পারেন।

---

* মোফাখ্খার চেধুরী হলো এই কমরেডের পারিবারিক নাম। তিনি পূবাকপা'র একটি কেন্দ্রের প্রধান নেতা। জীবিত ও সক্রিয় বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের পারিবারিক নাম, পরিচয় ইত্যাদি অন্য বিপ্লবী পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশ করাটা নিরাপত্তা-গোপনীয়তার অবস্থান থেকে নীতিসম্মত নয়। এছাড়া বিপ্লবী পার্টির অন্যান্য নেতাদের নাম বা স্ড়রও প্রকাশ করা যায় না, যদি না সেই পার্টি নিজ রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাকে প্রকাশ করে। এ বিষয়গুলোতে আমরা সচেতন। পূবাকপা বিভক্তির পর বিভিন্ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত প্রকাশ্য দলিলে যেসব নেতার নাম ইতিমধ্যেই প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে তাদের স্ড়রসহ, তাদের ক্ষেত্রেই শুধু আমরা গোপনীয়তা প্রকাশ করেছি। ক. মোফাখ্খার চৌধুরীর পারিবারিক নামটিও তার নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রটি থেকে ইতিপূর্বেই স্ড়রসহ প্রকাশ করা হয়েছে।

পার্টি-ইতিহাস

পূবাকপা সাংগঠনিকভাবে গড়ে উঠেছিল '৬৮ সালে। কিন্তু লাইনের দিক থেকে আজকের পূবাকপা '৭১-পূর্ব পার্টির উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে এবং '৭১-এর জুন মাসকে তাদের প্রতিষ্ঠাকাল বলে গ্রহণ করে।

ষাটের দশকে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের বির"দ্ধে বিদ্রোহের প্রক্রিয়ায় এ দেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানে) মাওবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এ দেশে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের ফেরিওয়ালা মনিসিং-নেতৃত্বাধীন ইপিসিপি থেকে বিদ্রোহ করার পর ইপিসিপি(এম.এল.) গঠিত হয়েছিল '৬৬-সালে। কিন্তু অচিরেই বিভিন্ন প্রশ্নে মতপার্থক্য থেকে '৬৮ সালে এ পার্টি থেকে বেরিয়ে মতিন-আলাউদ্দিন, দেবেন-বাশার প্রমুখ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। '৭০ সালের জুলাই মাসে এ পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তর"ণ বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কমরেড চার" মজুমদারের (এর পর থেকে CM/সিএম ব্যবহার করা হবে) লাইন গ্রহণের দাবি উঠে; কিন্তু তা গৃহীত হয় না। তবে '৭১-এর ১ জানুয়ারি পূবাকপা'র বিশেষ কংগ্রেসে সি.এম. লাইন গ্রহণ করা হয়– অথবা আংশিকভাবে তা গ্রহণ করা হয়। '৭১ সালের জুন মাসে[৭] সম্ভবত কুষ্টিয়ার এক বিশেষ সভা/সম্মেলনে সি.এম. লাইন পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়– যখন জনাব আমজাদ হোসেন সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় থেকেই এ পার্টিটি CM-লাইনের অনুসারী হিসেবে কাজ করতে থাকে।

* '৭১-এর জুন থেকে বর্তমান পর্যন্ড় এ পার্টির ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। এর প্রথম পর্ব ছিল, প্রতিষ্ঠা থেকে '৭৫ সালের প্রথম পর্যন্ড়। এ সময়কাল পর্বে এ পার্টির সম্পাদক ছিলেন প্রথমে জনাব আমজাদ হোসেন, পরে জনাব টিপু বিশ্বাস ও শেষে শহীদ কমরেড মনির"জ্জামান তারা। জনাব আমজাদ হোসেন লাইন-পার্থক্যের কারণে ('৭১-পরবর্তীকালে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান– এ বক্তব্যের ভিত্তিতে) এ পার্টি ত্যাগ করে ইপিসিপি(এম.এল.) [হক গ্র"প নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত]-এ যোগ দিয়েছিলেন '৭২-সালের প্রারম্ভেই। আর জনাব টিপু বিশ্বাস '৭২-সালে আত্রাই সংগ্রামের বিপর্যয়ের কিছু পরে গ্রেফতার হয়ে জেলে গিয়ে এ পার্টির অন্য কিছু বন্দী নেতা যেমন, আ.মতিন, ওহিদুর রহমান[৮] প্রমূখ সি.এম.-লাইনবিরোধী অবস্থান নেন। এর পর বস্তুত শহীদ ক. তারার নেতৃত্বে '৭৪-পর্যন্ড় যে সংগ্রাম জাগরিত হয় সেটাই ছিল সুসংহত সি.এম.-লাইনে এই পার্টির তৎকালীন গুর"ত্বপূর্ণ সংগ্রাম– যার প্রধান নেতাদের মাঝে ছিলেন কমরেড তারা ছাড়াও বাদল দত্ত, যিনি ঐ সময়কালে একটি পুলিশ-ক্যাম্প অপারেশনে শহীদ হন, এবং কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরী।*

এই সংগ্রামী উত্থান ছাড়াও '৭২-সালের প্রথমার্ধে রাজশাহীর আত্রাই-এ একটি বড় সংগ্রাম হয় এ পার্টির নেতৃত্বে– যখন প্রধান নেতৃত্বদের মাঝে আ. মতিন, টিপু বিশ্বাস, ওহিদুর রহমান, আলমগীর কবীর (বর্তমানে বিএনপি মন্ত্রী)– এরা ছিলেন। এ ছাড়া এ

পার্টির বিভিন্ন অংশের নেতৃত্বে '৭১-সালেও বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত বৃহত্তর পাবনায় বড় ধরনের সংগ্রাম হয়। অবশ্য '৭১-এর সংগ্রাম বিষয়ে এ পার্টিতে পরে নেতিবাচক মূল্যায়ন গড়ে উঠেছিল– যদিও তা মীমাংসিত এমনটা বলা যায় না। যাহোক, ক. তারা '৭৫-এর প্রথমে গ্রেফতার হন ও বন্দী অবস্থায় রাষ্ট্র তাকে হত্যা করে '৭৫-এর ২২ মে। এ সময়ে এ পার্টির অন্যান্য সব প্রধান নেতাই হয় শহীদ হন, নতুবা গ্রেফতার হন। এভাবে এই প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

* দ্বিতীয় পর্বের শুর" হয় '৭৬-সালে ক. মোফাখ্খার চৌধুরীর (এর পর থেকে শুধু "চৌধুরী" ব্যবহৃত হবে) মুক্তির পর। ক. চৌধুরী, ক. মধু, ক. মানস– এসব তর"ণ প্রধান নেতারা একে একে মুক্তি পান, এবং পার্টিকে পুনর্গঠন করেন, যেক্ষেত্রে লাইনগতভাবে প্রধান নেতৃত্ব দেন ক. চৌধুরী। ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত পার্টির বিকাশ হয় ও সংগ্রাম গড়ে ওঠে– বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রাম, যার কথা ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। '৭৬-সালে পুনর্গঠন শুর" হয় একটি 'কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি' (COC) গঠনের মাধ্যমে– তৎকালীন মুষ্টিময় নেতা-কর্মীদের এক সভায়। পার্টির বিকাশের প্রক্রিয়ায় '৮৫ সালে একটি প্লেনাম হয়– যেখানে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি (সিসি) নির্বাচিত হয়। এ পর্বটি ব্যাপ্ত ছিল ২০০০ সাল পর্যন্ড়। এটা ছিল ক. চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন পর্ব– যখন তার নেতৃত্বে CM-লাইনের/শিক্ষার অনুসারী দাবিদার হিসেবে এ পার্টি গড়ে ওঠে। সুদীর্ঘ ২৪ বছর ধরে মূলত ক. চৌধুরীর নেতৃত্বে এ পার্টি পরিচালিত হয়। সুতরাং এ সময়কালকে বস্তুত ক. চৌধুরী-লাইনের সময়কাল বলা চলে। যদিও দুইবার খুব অল্প সময়ের জন্য সম্পাদক বদল হয়েছিল এবং সূচনায় কিছু দিনের জন্য অন্য এক কমরেড সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং এ সময়ের সফলতা ও ব্যর্থতার জন্য চৌধুরী-লাইনই দায়ী। এ সময়কার অন্যান্য প্রধান নেতা ছিলেন ক. মধু, ক. মানস, ক. নাসির, ক. শিহাব, ক. তপন, ক. রাকেশ কামাল (রাকা)– প্রমুখ। যাদের মাঝে কেউ কেউ এখন বন্দী থাকলেও প্রধান অংশই মুক্ত ও সক্রিয় এবং প্রধানত এরাই আজকের তিনটি প্রধান কেন্দ্রের নেতা। এ পর্বে পার্টি-পুনর্গঠনকালের প্রথমদিকে গুর"ত্বপূর্ণ নেতাদের একজন ক. কাশেম সিরাজগঞ্জ শহরে (সম্ভবত ১৯৮৯ সালে) শহীদ হন।

এই দ্বিতীয় পর্বটি ছিল আন্ড়র্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক জটিল পর্যায়। অতীতের ধারাবাহিকতা হিসেবে এ পর্বেও প্রধানতম লাইন হিসেবে এই পার্টি CM-শিক্ষাকে তুলে ধরা অব্যাহত রাখে। কিন্তু নতুন বহু মৌলিক সমস্যা এ সময় মাওবাদী আন্দোলনে উপস্থিত হয় যে সম্বন্ধে ক. চৌধুরীর নেতৃত্বে এ পার্টি সিদ্ধান্ড় নেয়– যার মাঝে ছিল, CM, তথা ষাট-সত্তর দশকের বিপ্লবী সংগ্রামকে সম্পূর্ণ নেতিকরণকে সংগ্রাম করা, লিন-পন্থাকে গ্রহণ না করা, চীনা-তেং সংশোধনবাদকে বিরোধিতা করা, তিন বিশ্ব তত্ত্বকে বিরোধিতা করা, হোক্সাপন্থাকে বিরোধিতা করা– প্রভৃতি। পাশাপাশি ছিল আন্ড়র্জাতিক মাওবাদীদের নতুন মের"করণের কেন্দ্র RIM-এ যোগ না দেয়া ও তাকে বিরোধিতা করা, এবং ষাট-সত্তর দশকের সারসংকলনের কাজে আন্ড়র্জাতিক ও দেশীয় মাওবাদী উদ্যোগে কোন অংশ না নেয়া এবং বিশুদ্ধতাবাদী

অবস্থান থেকে তাকে বিরোধিতা করা, বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের বহু গুর"ত্বপূর্ণ লাইন-বিতর্ক থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখা ও গুটিয়ে রাখা।

* এ পার্টির তৃতীয় পর্ব শুর" হয়েছে বাস্ড়বে পার্টি-প্রধানের পদ থেকে ক. চৌধুরীর অপসারণের মধ্য দিয়ে ও সিসি'র ৪০-তম অধিবেশনে নভেম্বর, '৯৯-এ। তবে এটা চূড়ান্ড় রূপ পায় ২০০১-এর এপ্রিলে সিসি কর্তৃক ক. চৌধুরীর বহিষ্কার ও পরপরই ক. চৌধুরী কর্তৃক পৃথক কেন্দ্র গঠনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং, নতুন শতাব্দী শুর" হয়েছে এ পার্টির বিভক্তির মধ্য দিয়ে, এবং এ থেকেই শুর" হয়েছে এ মাওবাদী ধারাটির বিকাশের তৃতীয় পর্ব– যা এখন চলমান।

অবিভক্ত পার্টির সিসি-অধিবেশনে ৬/২ ভোটে ক. চৌধুরীকে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করার পর কেন্দ্রীয় শৃংখলার অধীনে নিজেকে রাখতে না চাওয়ার অভিযোগে সেপ্টেম্বর, ২০০০-এ তাকে সিসি থেকে বাদ দেয়া হয়। এবং উপদল গড়া ও কেন্দ্রের সিদ্ধান্ড়কে অস্বীকার করার প্রকাশ্য ঘোষণার পর এপ্রিল, ২০০১-এ তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কারের পরপরই (অথবা তার আগেই ??) ক. চৌধুরী ও ক. তপনের (সিসি-সদস্য) নেতৃত্বে পৃথক কেন্দ্র গঠন হয় এবং এই নতুন কেন্দ্রটি পার্টির একই নাম ব্যবহার করতে থাকে। এ অবস্থায় পূর্বতন সিসি'র নেতৃত্বাধীন সংগঠনটি তাদের সংগঠনের নামের সাথে "লাল পতাকা" যুক্ত করে।

কিন্তু চৌধুরী গ্র"প দুই বছরের মাথায় পুনরায় বিভক্ত হয়। ২০০৩-এর জুলাই/আগস্টে তপনের নেতৃত্বাধীন অংশটি নতুন পার্টি গঠনের ঘোষণা দেয়– পার্টির নামের সাথে "জনযুদ্ধ" যুক্ত করে।

এই প্রতিটি কেন্দ্রই একে অন্যকে সংশোধনবাদী বলেছে ও বলছে। প্রত্যেকেই CM-শিক্ষার অনুসারী বলে দাবি করছে। তবে বিভক্তির পর বিগত প্রায় চার বছরে প্রতিটি কেন্দ্রেই কিছু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। যদিও সামগ্রিক কোন Rupture কোন কেন্দ্রই করেছে বলে দেখা যায় না, কিন্তু কিছু কিছু নতুন সিদ্ধান্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। যেমন, 'লাল পতাকা' গ্র"প কমপোসা-য় যোগ দিয়েছে, আমাদের পার্টিসহ অন্যান্য মাওবাদী কেন্দ্রগুলোর সাথে সংযোগ/আলোচনার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে বা তুলছে, মাওবাদী বা গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর সাথে অবৈরী সম্পর্কের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে, এমনকি নিজেদের লাইন ও কাজের কিছু কিছু সারসংকলনও শুর" করেছে। অন্যদিকে চৌধুরী ও তপন গ্র"প পশ্চিমাঞ্চলে স্থানীয় শ্রেণিশত্র" খতমের পাশাপাশি পুলিশের অস্ত্র দখল ও পুলিশ খতমের উপর জোর দিয়েছে, অর্থনীতিবাদের বির"দ্ধে সংগ্রামের কথা জোরে শোরে বলছে, ঘাঁটির উপর জোর দেয়ার কথা বলছে– ইত্যাদি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রতিটি গ্র"পেই অতীত মূল লাইনগুলোও কম/বেশি করে ক্রিয়াশীল রয়েছে। ফলে নতুন পরিবর্তনগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক– উভয় ধরনের তাৎপর্য রয়েছে। সেগুলো এখনো ঘটমান ও প্রক্রিয়াধীন। যদিও এই নতুন পরিবর্তনগুলোর কিছু কিছু প্রশ্নকে আমরা আমাদের মূল আলোচনার সাথে যুক্ত করবো এবং অন্ড়ত একটি মূল

গুর"ত্বপূর্ণ প্রশ্নে– রণনীতির প্রশ্নে– এ রচনার শেষ দিকে পৃথক বিস্ড়ারিত আলোচনা করবো; কিন্তু আমরা প্রধান পর্যালোচনা চালাবো এ পার্টির ঐতিহাসিক লাইনের উপর, মূলত তার দ্বিতীয় পর্বের লাইনের উপর। কারণ, বাস্ড়বিকপক্ষে এই লাইনই আজকের পূবাকপা'র ভিত্তি। তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সব কিছুই এর মাঝে নিহিত। সুতরাং এখন এ পার্টি তিন ভাগে বিভক্ত হলেও এবং এ কেন্দ্রগুলোর বিভিন্নমুখী যাত্রা সত্ত্বেও তাদের বর্তমানকে ভালভাবে বুঝতে হলে, বিশ্লেষণ করতে হলে ও সঠিক মূল্যায়ন করতে চাইলে উপরোক্ত ভিত্তিটাই ভালভাবে জানতে হবে। বাস্ড়বে তাদের আজকের কিছু কিছু নতুন নেতিবাচক প্রবণতাগুলোরও মূল উৎস তাদের অতীতে ও ভিত্তিতে নিহিত। সুতরাং, আসুন পাঠকবৃন্দ, আমরা পূবাকপা'র লাইনের গভীরে যাবার চেষ্টা করি এবং সে অধ্যায়ে এখন প্রবেশ করি।

পূবাকপা-তে টু.এল.এস. ও বিভক্তি
কিন্তু লাইনের সমস্যাগুলো আসলে কোথায় ?

পূবাকপা বিভক্ত হবার পর প্রতিটি কেন্দ্রই অন্যদের সাথে নিজ লাইনের পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করছে, এবং অন্য লাইন ও কেন্দ্রগুলোকে সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করছে। বর্তমানের প্রধান তিনটি কেন্দ্রের মাঝে নিঃসন্দেহে পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব রয়েছে– যদিও বিভক্তির সময়কাল থেকে তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ দ্বন্দ্বের কারণেই এরা বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু বিভক্তির ক্ষেত্রে আসল প্রশ্নটা হলো, এ দ্বন্দ্বের ও পার্থক্যের মূল চরিত্রটা কী– অর্থাৎ, এই দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য সামগ্রিকভাবে একটি দুই লাইনের সংগ্রামের স্ড়রে, অথবা আরো যা গুর"ত্বপূর্ণ– মার্কসবাদ-সংশোধনবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের স্ড়রে উপনীত হয়েছিল কিনা। আমাদেরকে আরো দেখতে হবে এই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আসলে সঠিক লাই-নটা কী, তা কোন কেন্দ্র কতটা ধারণ করেছে এবং ভুলগুলোর চরিত্রটাই বা কী ও তার উৎস কোথায় নিহিত।

আমরা এখন জানতে পারছি যে, পূবাকপা-তে মধ্য ৮০-দশক থেকেই একটা 2LS ছিল– যার মীমাংসা সুদীর্ঘ দেড় দশকে হয়নি, বলা ভাল তা মীমাংসার জন্য এই সুদীর্ঘ সময়কালেও তাকে গুর"ত্বসহকারে হাতেই নেয়া হয়নি।

পূবাকপা'র এই 2LS-গুলোকে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। এজন্য বিভক্তির পর তিনটি কেন্দ্র থেকেই প্রকাশিত কিছু কিছু দলিল সংগ্রহ ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা যতটা জানতে পেরেছি তার উপরই আমরা প্রাথমিক মতামত গঠন করেছি। ফলে, আমাদের জানার মধ্যে ফাঁক, অসম্পূর্ণতা ও এমনকি ত্র"টিও থাকতে পারে। তবুও আমরা চেষ্টা করেছি লিখিত দলিলাদির বাইরে না যেতে। আর লিখিত দলিলপত্র থেকেও লাইনগত অবস্থানগুলো জানা-বোঝার উপরই আমরা গুর"ত্ব দিয়েছি ও তার সাথে যুক্ত তথ্যগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারপরও যেহেতু তিনটি কেন্দ্র থেকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে 2LS সম্পর্কে ভাল কোন অনুসন্ধান করতে পারিনি, তাই, আমাদের মতামতে তার প্রতিফলন থাকতে পারে। তবুও আমরা ধারণা করি যে, লাইনগত

অবস্থানগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মৌলিকভাবে ভুল তথ্যে যাইনি। একইসাথে আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা সচেতন। যেকোন কেন্দ্রই আমাদের তথ্যগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা পূরণে সহায়তা করলে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করবো।

* দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য সার্বজনীন যা একটি কমিউনিস্ট পার্টিতে সর্বদাই বিরাজ করে– যা পার্টি সম্পর্কে মাও-এর অগ্রসর অবদান থেকে আমরা সুগভীরভাবে শিখতে পারি। কিন্তু সকল মতপার্থক্যের চরিত্র এক নয়; কাজে কাজেই তার মীমাংসার পদ্ধতিও এক নয়। বিভিন্ন মত সারবস্তুতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ– তা সচেতন বা অসচেতন– যেভাবেই ঘটুক না কেন। কিন্তু মত পার্থক্য হলেই একটি পার্টি ও কমরেডগণ মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদের দুই রাজনীতিতে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে যায় না। প্রতিনিয়ত "এক দুই-এ বিভক্ত হয়", অর্থাৎ, একটি প্রশ্নে পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, মতগুলোর মধ্যে সংগ্রাম গড়ে ওঠে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংশ্লেষণ ঘটে ও নতুন ঐক্য গড়ে ওঠে; আবার নতুন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এ ঐক্য ভেঙ্গে যায়– এভাবে এগিয়ে চলে। পার্টির মধ্যকার দ্বন্দ্বের/সংগ্রামের বিকাশের মধ্য দিয়ে তা পার্টির মূলগত লাইন, রাজনীতি, মতাদর্শ ও তত্ত্বের পার্থক্যেও রূপ লাভ করতে পারে– এবং এক সময়ে তা নগ্নভাবে অথবা প্রচ্ছন্নভাবে মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদের দ্বন্দ্বেও উন্নীত হতে পারে। এ ধরনের অবস্থায় কখনো কখনো পার্টি-বিভক্তি অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে এবং বিভক্তির মাধ্যমেই পার্টি উচ্চতর ঐক্যে উপনীত হতে পারে– লাইনগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে। কিন্তু একটি বিপ্লবী পার্টিতে এমন বিভক্তি খুব সাধারণ ঘটনা নয়। এবং যে কোন ধরনের মতপার্থক্য, দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকেই পার্টি-বিভক্তিতে টেনে নেয়া যায় না, তাকে মার্কসবাদ-সংশোধনবাদের দ্বন্দ্ব বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। কারণ, পার্টির মতবাদিক ভিত্তি, বিপ্লবী রাজনীতি ও তার ভিত্তিতে সাংগঠনিক নীতি পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখে– যা আবার কোন স্থির বিষয় নয়, বরং উপরে আলোচিত দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে (এবং প্রত্যক্ষ বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে) অবিরাম বিকশিত হয়। সুতরাং, পার্টির অভ্যন্তরস্থ সংগ্রাম বা এমনকি বিভক্তির মধ্য দিয়ে লাইন-বিতর্ককে গভীর করা হয়েছে কিনা, লাইন-পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে কিনা, তাকে মার্কসবাদ-সংশোধনবাদের দ্বন্দ্বের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে কিনা, এবং সমগ্র পার্টিকে ও সম্ভবমত জনগণকে তাতে সজ্জিত ও সচেতন করা হয়েছে কিনা এগুলো 2LS-এর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূবাকপা'র 2LS-এ এগুলোর কোনটিই তেমন একটা হয়েছে তা বলা যাবে না। শুধুমাত্র বিভক্তির পর একে অন্যকে সংশোধনবাদী লেবেল আঁটা, এবং এজন্য মতপার্থক্যের কিছু বিষয়কে সামনে এনে তাকে অতিরঞ্জিত, বিকৃত ও একদেশদর্শী মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সমস্যার সরল সমাধানের চিত্রই ফুট ওঠে।

পূবাকপা'র সিসি-তে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে '৯৯-সালে তাদের দীর্ঘস্থায়ী নেতা চৌধুরীকে যখন সিসি-সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত করা হয় তখন থেকে। সকল পক্ষের দলিলাদি থেকে জানা যায় যে, অনির্ধারিত আলোচ্যসূচি হিসেবে সম্পাদক পরিবর্তনের প্রশ্নটা সিসি'র ৪০-তম অধিবেশনে ওঠে এবং ৬/২ ভোটে তাকে অপসারণ

করে রাকেশ কামাল (এর পর থেকে রাকা)-কে সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। এর পর দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে– পর্যায়ক্রমে তিনি সিসি থেকে বাদ পড়েন, ও পরে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হন।

বিভক্ত হবার আগেই, সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হবার পর তিনটি চিঠিতে ক. চৌধুরী দেখাতে চান যে, সংশোধনবাদীরা মধ্যপন্থীদেরকে সামনে দিয়ে সিসি'র ক্ষমতা দখল করেছে। এক্ষেত্রে সংশোধনবাদী হিসেবে তিনি ক. মানস ও মধ্যপন্থী হিসেবে ক. রাকাসহ আরো কিছু কমরেডকে চিহ্নিত করেছেন– যা পরবর্তীকালের অন্যান্য দলিলপত্রে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়।

একটা কমিউনিস্ট পার্টিতে এমন ঘটনা অসম্ভব নয়। চীনে মাও-মৃত্যুর পর এমনটাই ঘটেছিল– সংশোধনবাদী তেং-পন্থা মধ্যপন্থী হুয়াকুয়ো ফেং-এর ঘাড়ে ভর করে পার্টির ক্ষমতা দখল করেছিল। বাস্তবে এমন মধ্যপন্থা সংশোধনবাদেরই একটা রূপ মাত্র। চীনে হুয়া-তেং-রা যৌথভাবেই ক্যুদেতার মাধ্যমে মাও-লাইনের নেতৃত্ব চার-নেতাকে উচ্ছেদ করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে সংশোধনবাদী তত্ত্ব ও রাজনীতি সমগ্র পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সুতরাং, ক. চৌধুরীর অভিযোগ অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কী সেই সংশোধনবাদ– যার প্রতিনিধিত্ব করতেন ক. মানস?

পূবাকপা'র ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, মানস রায়ের সাথে চৌধুরীর কিছু বিষয়ে ঐতিহাসিকভাবে মতপার্থক্য ছিল। এই মতপার্থক্যের সূত্র ধরে সিসি-তে একবার অল্প সময়ের জন্য চৌধুরী সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছিলেন, এবং সাময়িকভাবে মানস রায় সিসি-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৪-তম অধিবেশন থেকে ১৭-তম অধিবেশন পর্যন্ত অর্থাৎ, ১লা – ৩রা অক্টোবর, '৮৯ থেকে ১৮ – ২০শে এপ্রিল, '৯০ পর্যন্ত)। এটা আবার পরিবর্তন হয় ৩/২ ভোটে চৌধুরী সংখ্যাগুরু হবার মাধ্যমে। এই দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছিল ২য় সার্কুলার (তাং ২০/১০/'৮৯) ও ৩য় সার্কুলারের (তাং ২৯/০৬/'৯০) মাধ্যমে। এ পার্থক্য ছিল মূলত খতম ও পার্টি গঠনের প্রয়োগগত বিষয়ে। এছাড়াও ৮৫-প্লেনামে ক. মানস রায় কর্মসূচির একটি ধারায় দ্বিমত করে সিসি-তে ও প্লেনামে দলিল পেশ করেছিলেন। ৮৫-প্লেনামের কিছু পরে "সি.এম. ভারতের না উপমহাদেশের কর্তৃত্ব"– এই প্রশ্নে মানস রায় আরেকটি দ্বিমত সম্বলিত দলিল সিসি-তে পেশ করেছিলেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য সিসি-তে অনেক দিন ধরেই ছিল। কিন্তু ২য়/৩য় সার্কুলারের মধ্য দিয়ে একটি বিষয়ে আংশিকভাবে মূল্যায়ন করা ছাড়া অন্য বিষয়গুলোতে বিতর্ক আদৌ দানাই বাধতে পারেনি। আর ২য়/৩য় সার্কুলারের ক্ষেত্রেও এর গভীরে নিহিত মতপার্থক্যগুলো সিসি'র বাইরে সমগ্র পার্টিতে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়নি। শুধুমাত্র সিসি-তে ৩/২ ভোটের ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চয়ই 2LS-এর মীমাংসার জন্য যথেষ্ট নয়– যদি তাকে মার্কসবাদ/সংশোধনবাদের মত নির্ধারক বিষয়ের দ্বন্দ্ব বলা হয়– যা আজ চৌধুরী বা তপন গ্রুপ বলছে।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উপরোক্ত পার্থক্যগলো সত্ত্বেও ক. মানস পূর্বাপর

সিসি'র গুর"ত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন– যে সিসি কিনা ৫/৭/৯ জনের ছোট একটা সংগঠন। ক. মানস রায় যদি সংশোধনবাদকেই প্রতিনিধিত্ব করতেন (২য় সার্কুলারের মাধ্যমে) তাহলে তার আত্মসমালোচনা ছাড়া এতটুকুন সিসি-তে, এমনকি পিবি-তেও তিনি কীভাবে গুর"ত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে থেকে যান? আর যদি শক্তির ভারসাম্যের কারণে তার অপসারণ সম্ভব ছিল না এমনই হয় (তেমনটা হতেই পারে) তাহলে এই 2LS-কে পার্টিব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া ও যত দ্র"ত সম্ভব তার মীমাংসা করাকে আঁকড়ে না ধরে সুদীর্ঘ ১৫ বছর কীভাবে সেটা ফেলে রাখা হলো খোদ চৌধুরীরই নেতৃত্বে? এটা খুবই বিস্ময়কর যে, সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হবার পর যদিও সিসি একবারও বলেনি যে, তারা ২য়/৩য় সার্কুলারের বিতর্কে ২য় সার্কুলারের পক্ষ নিয়েছে, তথাপি ২য় সার্কুলারের 'সংশোধনবাদী রাজনীতি'র দায় সিসি'র উপর চাপানো, এবং সেই যুক্তিতে পৃথক কেন্দ্র গঠন কি প্রমাণ করে না যে, বাস্ড়বে সিসি'র সাথে চৌধুরীর মূল মতপার্থক্য এখানে নয়?

মানস রায়ের বির"দ্ধে আরেকটি অভিযোগ চৌধুরী-তপন গ্র"প প্রচার করে থাকে। ৭০-দশকের শেষার্ধে চীনা-পার্টি সম্পর্কে মূল্যায়নে মানস রায় ভুল অবস্থান নিয়েছিলেন– যদিও পরে কখনো তিনি সেটা তুলে ধরেননি। একটা বড় লাইন-বিতর্কে একজন কমরেড ভুল করতেই পারেন। শুধু মানস রায়ই নন, সে সময় পূবাকপা'র সিসি কিছু দিনের জন্য চীনা-পার্টিকে সঠিক বলেছিলেন– তাতে ক. চৌধুরীরও ভূমিকা ছিল। যদিও পরে এই ভুল থেকে চৌধুরীই পার্টিকে বের করে আনেন এবং সেই জটিল মহ-াবিতর্কে গুর"ত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। এমনকি কোন কোন নেতৃত্ব লিন্পন্থাকেও নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পরে এ প্রশ্নে মূলত বিপ্লবী লাইনে এই পার্টি ও সিসি ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। অথচ আজ এতবছর পর, পার্টি-বিভক্তির পর, মানস রায়কে লিউ-তেং-হুয়াপন্থী বলা হচ্ছে। এটা 2LS-এ সুস্পষ্টভাবেই একটা নীতিহীনতা। মানস রায় এ প্রশ্নে তার অবস্থান কখন বদল হলো তা নাকি কখনো বলেননি– এ অভিযোগ যদি সত্যই হয় তাহলে মানস রায় যেমনি দায়ী, তেমনি দায়ী চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সমগ্র সিসি, যারা কিনা এতবড় একটি মহাবিতর্কে মানস রায়ের মতাবস্থান না জেনেই সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তাকে পার্টির, সিসি'র ও পিবি'র সদস্য করে রেখেছে। চৌধুরী-তপনের এ অভিযোগ বরং প্রমাণ করে চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এ পার্টি সমগ্র পার্টিতে, এমনকি সিসি-তেও মতাদর্শগত বিতর্ককে কতটা গুর"ত্বহীনভাবে দেখেছে ও পরিচালনা করেছে– যে সম্বন্ধে আমরা পরে আরো আলোচনা করবো।

অবশ্য আমরা এ কথা মনে রাখছি যে, একজন বিপ্লবী যদি সংশোধনবাদে অধপতিত হয়, তাহলে এর ঐতিহাসিক কারণের উপর আলোচনার গুর"ত্ব রয়েছে। সেক্ষেত্রে তার অতীতের ভিত্তি অবশ্যই কারণ হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু পূবাকপা'র নমুনাটা ভিন্ন। মানস রায় ক্ষমতা দখল করেছে, তাই সিসি সংশোধনবাদী হয়ে গেছে, কারণ মানস রায় আসলে তেংপন্থী...! এটা 2LS-এ স্রেফ অপপ্রচারের দৃষ্টান্ড়, যা লাইন-বিতর্ককে মোটেই গভীর করে না, তাকে গুর"তর ক্ষতিগ্রস্থ করে– যা

পূবাকপা'র এই সিসি-বিরোধী নেতারা বুঝে বা না বুঝে করে চলেছেন। সিসি তেং-পন্থাকে সমর্থন-তো করেইনি, এমনকি তাদের ঘোষণা মতে কথিত 'সংশোধনবাদী' ২য় সার্কুলারকেও নয়। সুতরাং, বিতর্ক-তো শেষই। চৌধুরী ও তপন গ্র"পের থেকে সিসি'র "সংশোধনবাদের" আসল জায়গাটাতো পাওয়াই যাচ্ছে না!

* এদিকে সিসি '৯৯-এ চৌধুরীকে নেতৃত্ব ও কেন্দ্র থেকে অপসারণ করলেও সর্বদাই ২য়/৩য় সার্কুলারের বিতর্কে ৩য় সার্কুলার, অর্থাৎ, চৌধুরীর অবস্থানকেই সঠিক বলেছে। এবং তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, চৌধুরীকে সম্পাদক পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে ভিন্ন কারণে– ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি কারণে। এমনকি চৌধুরীর তিন চিঠির জবাবে সিসি তখন সুস্পষ্টভাবে বলেছিল যে, চৌধুরীর বির"দ্ধে তাদের সংগ্রামটা ছিল একজন বিপ্লবীর ভুল বা বিচ্যুতির বির"দ্ধে সংগ্রাম; সেটা মার্কসবাদ-সংশোধনবাদের মধ্যকার সংগ্রামের চরিত্রবিশিষ্ট নয়। তাহলে এখন, বিভক্তির পর, লাইনের কোন মৌলিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে চৌধুরী বা তপন গ্র"পের রাজনীতি কেন সংশোধনবাদী হবে ?

সুতরাং, পার্টি যখন বিভক্ত হলো তখন একে অন্যকে সংশোধনবাদী বলায় আমরা সবল কোন তথ্য ও যুক্তি খুঁজে পাইনি। এটা ঠিক যে, শৃংখলা লংঘন, উপদলীয় তৎপরতা চালানো– এ সবই অমার্কসীয় কাজ। পার্টি-ভাঙা গুর"তর ক্ষতি ডেকে আনে পার্টি ও বিপ্লবের। এগুলো নির্দিষ্টভাবে কিছু অমার্কসীয় কাজ, মতাদর্শ ও সাংগঠনিক ধারাকে অবশ্যই প্রকাশ করে। কিন্তু এ থেকেই একটি লাইনের সামগ্রিকতা, বা তার মূলগত মতাদর্শগত-রাজনৈতিক চরিত্রকে মূল্যায়ন করা যায় না। সেটা করতে হবে লাইনের, অর্থাৎ, মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের পরিসরেই। এবং তার সাথে সাংগঠনিক বিভক্তির সম্পর্ক বের করতে হবে। নতুবা বিভক্তির ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বিতর্ক, অথবা যা আরো খারাপ, ব্যক্তিতাবাদী সংগ্রাম, আক্রমণ ও কুৎসা-অপপ্রচারের ক্ষুদে-বুর্জোয়া ধারা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। পূবাকপা'র 2LS এখনো পর্যন্ড় ব্যাপকভাবে এই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও কিছু কিছু প্রকৃত লাইন-প্রশ্ন ক্ষীণভাবে এখানে/সেখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিপক্ষকে সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ত্র"টির অতিরঞ্জন বা আত্মগত অভিযোগে নির্ভর করতে দেখা যাচ্ছে।

যদিও আমরা দেখেছি, চৌধুরীকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের লিফলেটে তার ৫/৬টি 'লাইনগত' সমস্যাকে উল্লেখ করেছে সিসি; পরে অন্য দলিলে (লাল পতাকা/১) মতাদর্শগত-রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে চৌধুরী-লাইনের চরিত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে; কিন্তু এগুলো সত্ত্বেও মূল মতাদর্শগত, রাজনৈতিক লাইনে মৌলিক পার্থক্য এসবে প্রকাশিত হয়নি। যদিও চৌধুরী-লাইনের কিছু বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করা বা তার চেষ্টা করাটা গুর"ত্বহীন নয়, বিপরীতে চৌধুরী ও তপন গ্র"প কর্তৃক পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রাম ও সিসি'র কিছু বিচ্যুতিকে উদ্ঘাটনের চেষ্টাটাও গুর"ত্বপূর্ণ– কিন্তু কোন আলোচনাই সমস্যার গভীরে ও উৎসে যেতে পারছে না। এবং অন্য যা গুর"ত্বপূর্ণ তাহলো, এসব পার্থক্য মতবাদিক প্রশ্নে বা মৌলিক লাইন প্রশ্নে বিকশিত হয়েছিল বা এখনো হয়েছে তা

বলা চলে না।

এটা আরো স্পষ্ট হবে চৌধুরী আর তপন গ্রুপের বিভক্তির ক্ষেত্রে। বিভক্তির পর পরই তপন গ্রুপের প্রচারিত বক্তব্যে দেখা যায় যে, চৌধুরীর সাথে লাইনে কোন পার্থক্য তারা দেখে না, সমস্যা হলো চৌধুরীর স্বেচ্ছাচার। অর্থাৎ ঐ একই সমস্যা যা সিসি বলেছিল বহু আগেই– পার্টি পরিচালনা, তথা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা অনুশীলনের সমস্যা ও পার্টি-অভ্যন্ড়রস্থ 2LS পরিচালনার সমস্যা। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সিসি-গ্রুপের সাথে তপন গ্রুপের আর পার্থক্য রইল কই? কারণ, এ অভিযোগ-তো সিসি পূর্বেই এনেছিল, এবং অনেকটা এ অভিযোগেই (এবং আরো কিছু দায়িত্বহীনতার জন্য) চৌধুরীকে সম্পাদকের পদ থেকে সরানো হয়েছিল– যখন কিনা ক. তপন ক. চৌধুরীর সাথে জোট করে সিসি'র বিরুদ্ধে উপদল গঠন করেছিলেন।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, এই তিনটি গ্রুপ যেভাবে বিভক্ত হয়েছিল, এবং যেভাবে একে অন্যকে সংশোধনবাদী বলেছিল ও এখন বলছে তা খুব একটা লাইনসম্মত নয়, মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের মূল ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তাত্ত্বিক বা রাজনীতিগতভাবে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানা হয়নি যে, এই হলো মার্কসবাদ, আর ওটা হলো সংশোধনবাদ– আর তা এই এই যুক্তিতে। সবগুলো কেন্দ্রই বলছে তারা মাওবাদী, তারা CM-শিক্ষানুসারী, তারা কৃষি-বিপ্লব করছে, তারা খতম লাইনে বিশ্বাসী, তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করছে ... ... ইত্যাদি। যদিও বিভক্তির তিন বছর পর এখন কিছু কিছু নতুন লাইনগত বিষয় আসা শুরু করেছে যা এই কেন্দ্রগুলোর মধ্যকার কিছু কিছু পার্থক্যকে স্পষ্ট করছে– কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বটা সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ/সংশোধনবাদের দ্বন্দ্ব হিসেবে এখনো বিকশিত হয়েছে এমনটা বলা যাবে না।

* এটা সত্য যে, পূবাকপা'র বিগত দেড়/দুই দশকের ইতিহাসে মানস রায় বনাম চৌধুরী– এভাবে একটা মতপার্থক্য দেখা যায়– যার একটা প্রকাশ হলো ২য় ও ৩য় সার্কুলার। আরো কিছু প্রশ্নও মানস রায় তুলেছিলেন যে সম্বন্ধে আমরা দলিলপত্র পাইনি। কিন্তু পূবাকপা'র 2LS-কে মানস/চৌধুরী 2LS হিসেবে যাচাই করতে গেলে সমস্যার কোন প্রকৃত সমাধান হবে না। বস্তুত ২য়/৩য় সার্কুলার ও তার সাথে যুক্ত বিতর্ক হলো খতম-লাইন ও CM-শিক্ষাকে পূবাকপা যেভাবে নিয়েছে সেই অভিন্ন লাইনের ভিত্তিতে উদ্ভূত প্রায়োগিক পার্থক্যের সমস্যা। সুতরাং এই অভিন্ন লাইনকে ভিত্তি করে বিচার করলে এক ধরনের সিদ্ধান্ড়ই হবে– যা পূবাকপা ঐতিহাসিকভাবে করেছে ও করে চলেছে। আর এর বাইরে থেকে দেখলে সিদ্ধান্ড়আসবে ভিন্ন। সুতরাং আগে সিদ্ধান্ড়নিতে হবে 2LS-কে আমরা মানস বনাম চৌধুরী– এখানেই রাখবো কিনা। আমাদের উত্তর হলো, না, সেটা রাখা চলে না। শুধু তাই নয়, সেটা করলে 2LS প্রশ্নে গুরুতর ভুল করা হবে– যদিও সামগ্রিক লাইন-আলোচনার মধ্যে এই প্রশ্নটিকেও বিচার করা যেতে পারে– যদি তার প্রয়োজন হয় এবং তা সম্ভব নয়।

কারণ, 2LS হলো সঠিক লাইন ও বেঠিক লাইনের দ্বন্দ্ব। মাওবাদীরা 2LS-এ অংশ নেয় যে কোন সময়, যে কোন মতপার্থক্যে বাধ্যতামূলকভাবে দ্বন্দ্বমান পক্ষ দ্বয়ের একটার

পক্ষাবলম্বনের জন্য নয়; বরং মাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মতগুলোকে বিচার করে সঠিক মাওবাদী লাইন ও অবস্থান গ্রহণের জন্য, তার ভিত্তিতে ভুলগুলোকে সংগ্রামের জন্য ও সঠিক লাইনকে বিকশিত করে তার ভিত্তিতে উচ্চতর ঐক্যের জন্য। সঠিক লাইন সেটাই যা কিনা এদেশের (ও বিশ্বের) সর্বহারা বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত মাওবাদী লাইন। সুতরাং, 2LS-কে এগিয়ে নেয়া, গভীর করা, ছড়িয়ে দেয়া ও সিদ্ধান্ড়নেয়ার সমস্যা হলো বিপ্লবের সামগ্রিক সঠিক লাইন নির্মাণ, গ্রহণ ও প্রয়োগের সমস্যা। এটা মানস বা চৌধুরী লাইন, অথবা সিসি/চৌধুরী/তপন গ্রুপের কোন একটাকে সঠিক/বেঠিক চিহ্নিত করার বিষয় নয়।

পূবাকপা'র বিগত প্রায় ২০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে লাইনগত বৈশিষ্ট্যটা সবচাইতে গুরুত্ব দিয়ে সামনে আসে তাহলো, এখনো পর্যন্ড়2LS-কে তারা ব্যাপকভাবে সীমিত করে রেখেছে মানস বনাম চৌধুরী দ্বন্দ্বে। বড় জোর এখনকার তিন কেন্দ্রের কে সঠিক কে বেঠিক– এই বিচারে। যদিও রাকা-গ্রুপটি এখন কিছু নতুন লাইনগত বিষয়, সমস্যা ও আলোচনাকে নিয়ে এসেছে– যা তাদের সংকীর্ণ গন্ড়ির জানালা-দরজা সবেমাত্র খুলতে শুরু করেছে– যা অবশ্যই ইতিবাচক, কিন্তু সমগ্রভাবে পূবাকপা'র ইতিহাস হলো তাদের পার্টির কিছু নির্দিষ্ট লাইনের গন্ড়ি কখনোই অতক্রম করতে না পারার ইতিহাস, তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে কিছু কিছু 2LS চালাবার, এমনকি সেটাও তেমন একটা ভালভাবে না চালাবার ইতিহাস, এবং MLM-এর ভিত্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ও পদ্ধতিকে বিকশিত করা ও যাবতীয় বিষয়কে বিচার না করার ইতিহাস।

এটা ব্যক্তি চৌধুরীর কোন সমস্যা নয় যে, তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছেন; অথবা এটা ব্যক্তি মানস রায়ের সমস্যাও নয় যে, তিনি ১৮ বছর ধরে স্কুল মাষ্টারী জীবনে থেকে ব্যক্তি-স্বার্থে বিপ্লবকে গুলিয়ে ফেলেছেন– যদিও-বা আমরা এই কমরেডদের এই সব ত্রুটি রয়েছে বলে ধরেও নেই। বাস্ড়বে প্রকৃত 2LS এই পার্টিতে বিগত ২৫ বছরে (চীনা পার্টি সংক্রান্ড়সিদ্ধান্ড়ের পর) আসেনি, কারণ, প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ লাইনগত প্রশ্ন এ পার্টিতে এ দীর্ঘ সময় ধরে আলোচিত হয়নি (আমরা '৯৬-সালে এ পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন-দলিলের কথা বিস্মৃত হইনি– যাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাদের অবস্থান প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এ প্রশ্নগুলোতেও পার্টির ব্যাপক স্ড়রে পর্যালোচনা-বিতর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। এ প্রশ্নে পরে আরো আলোচনা হবে)। অথচ এ সময়কালে আন্ড়র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বহু বহু গুরুত্বপূর্ণ লাইন-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর এ পার্টি নিজে বহু লাইন-প্রশ্নের সম্মুখীন হয় (মানস রায়ের ভ্রূণ দ্বিমতগুলোর গর্ভপাত ঘটানো ছাড়াও তাদের সংগ্রাম থেকে উত্থিত ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে আলোচিত বহু মৌলিক প্রশ্নকে হাতে তুলে নিলে লাইন-প্রশ্নের কোন অভাব ছিল না)। কিন্তু এগুলোকে এ পার্টি গুরুত্ব দেয়নি, এসব থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। বাস্ড়বে ধরে নেয়া হয়েছে, এদেশের বিপ্লবের লাইন-প্রশ্ন মূলত মীমাংসিত, তা তাদের রয়েছে, এখন শুধু প্রয়োগের সমস্যা, এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার আরো বিকাশ সাধনের কাজ। কিন্তু সে প্রয়োগের সমস্যাতেও তেমন কোন গুরুত্ববাহী পর্যালোচনা-বিতর্কের কোন উদ্যোগ

নেয়া হয়নি। বিগত ২৫-বছরে তাদের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে– তার বড় বিপর্যয়ের শুর ৯০-দশকের শেষাংশে। এর কোন সারসংকলন তারা করেনি, তাকে গুর ত্ব সহকারে হাতেই নেয়া হয়নি। তাদের দলিলপত্র থেকেই এখন দেখা যাচ্ছে যে, ঐ সংগ্রামে অর্থনীতিবাদী/সংস্কারবাদী বিচ্যুতিই শুধু নয়, এমনকি গুর ত্বপূর্ণ স্ড়রেও কিছু গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল অধপতন এসে পড়েছিল। যখন এর লাইনগত কোন সারসংকলন হয়নি, তখন অবধারিতভাবে পার্টিতে ব্যক্তিতাবাদী সংগ্রাম বিকশিত হয়েছে, একে অন্যকে দায়ী করায় তা পর্যবসিত হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ড় চৌধুরী নিজে অভিযুক্ত হওয়া থেকে রেহাই পেলেও বিভক্তি আসা মাত্র চৌধুরীকেই সবচেয়ে বেশি করে এখন আক্রান্ড় হতে হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে।

আমরা মনে করি পূবাকপা-কে আজ 2LS-এর প্রশ্নকে খুবই গুর ত্ব দিয়ে হাতে নিতে হবে। কারণ, সমস্যার মূল উৎস নিহিত লাইনে– যদিও প্রয়োগগত ত্র টি ও তাতে ব্যক্তিগত ভূমিকার মূল্যায়নকে আমরা বাদ দিতে বলি না। কিন্তু মাও বলেছেন, লাইন হলো নির্ধারক, আর মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনই হলো মূল লাইন। তাই, লাইনকে আঁকড়ে ধরলে বাকি সব সমস্যারই সঠিক ও সহজ সমাধান সম্ভব।

কিন্তু এই 2LS-কে মানস বনাম চৌধুরী, অথবা চৌধুরীর উপদলীয়তা-স্বেচ্ছাচার, বা মানস রায়ের ব্যক্তি-সুবিধাবাদ ও মধু বাবুর আত্মত্যাগের সমস্যা, অথবা তপনের সমরবাদ– এসবের মধ্যে আলোচনা করলে মৌলিক কোন অগ্রগতি ঘটবে না। এমনকি পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামের প্রয়োগগত সারসংকলনেও এর মীমাংসা হবে না– যদিও তার খুবই গুর ত্ব রয়েছে, কিন্তু তা তখনই আসল জায়গায় কথা বলবে যদি মৌলিক লাইন-আলোচনার সাথে তাকে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ 2LS-কে আরো অনেক বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জায়গায় তাদেরকে এখন নিতে হবে, দেখতে হবে এদেশের সমগ্র মাওবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতকে ঘিরে। এমনকি তাকে স্থাপন করতে হবে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের সর্বশেষ অগ্রগতি, তার পিছনকার লাইন, বিতর্ক ও 2LS-এর মধ্যে। সেটাই হলো নির্ধারক বিষয়– যার উপর আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করতে চাই।

পূর্ব বাংলার বর্তমান মাওবাদী আন্দোলনের প্রতি সঠিক মনোভাব ... ... একটি জর রী প্রশ্ন

এদেশের মাওবাদী আন্দোলন আজ আর শিশু অবস্থায় নেই। ষাটের দশকের শেষে এদেশে মাওবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। এর পর প্রায় তিন যুগ পেরিয়ে গেছে। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এদেশের মাওবাদী আন্দোলন আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? এ প্রশ্ন প্রতিটি আন্ড্ররিক মাওবাদী বিপ্লবীকে আজ করতে হবে। মাওবাদী আন্দোলন কি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, বা ভালভাবে এগিয়ে চলেছে? নাকি তা সংকটগ্রস্থ? কী এর উত্তর? ভাল না মন্দ– এর মাঝে একটা উত্তর অবশ্যই বেছে নিতে হবে। এটা এক

জর রী প্রশ্ন।

এটা সত্য যে, বিগত ৩৫ বছরে এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। বীরোচিত সংগ্রাম, ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ এবং গুর ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে বিপ্লবী ও বহু ভাল অবস্থান, লাইন ও তত্ত্ব মাওবাদীরা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ যদি এই বিপ্লবী ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে বাতিল করতে চায় তাহলে প্রথম কাজ হলো সেই বিলোপবাদকে র খে দাঁড়ানো। বিপ্লবী মাওবাদীরা এমন বিলোপবাদকে কখনোই অনুমোদন করতে পারেন না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, এই গৌরবময় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম সত্ত্বেও এদেশের মাওবাদী কেন্দ্রগুলো-কি দাবি করতে পারে, আমরা এদেশের বিপ্লবের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি? এর উত্তর হলো– না। বিপ্লবী আন্দোলনে আমরা প্রবেশ করেছি বটে, তা শুর করতে পেরেছি বটে, কিন্তু বিপ্লবের মৌলিক সমস্যাবলী এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। এটা ঠিক যে, বিপ্লবের উত্থান-পতন আছে, আগু-পিছু রয়েছে, সঠিক লাইন থাকলেও তা ঘটতে বাধ্য। কিন্তু এই বক্তব্য পূর্ব বাংলার মাওবাদী আন্দোলন সম্পর্কে খাটে না। কারণ, সুদীর্ঘ তিন যুগ ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েও আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে কিছু কিছু ক্ষুদে 'নিগেদ' (নিয়মিত গেরিলা দল) ও স্থানীয় স্কোয়াড ছাড়া বাহিনী গঠনের সমস্যার সমাধান হয়নি– ফলে শক্তিশালী কোন বিপ্লবী বাহিনী এখানে এখনো গড়ে উঠেনি। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা দূরের কথা, শক্তিশালী কোন গেরিলা অঞ্চল গড়ে উঠেনি। সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুটা এগিয়ে বার বার মার খেয়েছে, এবং প্রায় একই বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছে। অন্যদিকে মাওবাদীরা আজ বহু কেন্দ্রে বিভক্ত– যা তার সূচনা থেকেই আন্দোলনে বিরাজমান। কিন্তু আরো যা খারাপ তাহলো এদেশের মাওবাদী কেন্দ্রগুলো ঐতিহাসিকভাবে নিজেকেই একমাত্র সঠিক ও অন্যদেরকে সংশোধনবাদী, এমনকি প্রতিবিপ্লবী মনে করেছে। এমনকি বিভিন্ন গ্র পের মাঝে বৈরী সংঘাতের সম্পর্কও কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যমান, এবং তা না ঘটলেও তার লাইনগত ভিত্তি অনেকের মাঝেই বিরাজমান। মাওবাদীদের সম্মিলিত শক্তি উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংগঠনে তেমন কোন ব্যাপক জনগণ সংগঠিত নন– বাস্ড়বে প্রায় সকল গুর ত্বপূর্ণ কেন্দ্রেরই স্থানীয় বাহিনী/স্কোয়াড ছাড়া অন্য কোন গণসংগঠন নেই, বা নামেই শুধু রয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্ড়ক্ষেপ খুবই দুর্বল।

তাই, সুস্পষ্টভাবে প্রথম যে সিদ্ধান্ড়টা টানতে হবে, তাহলো, মাওবাদী আন্দোলন ভালভাবে এগুচ্ছে না। অথচ আমরা জানি যে, আজকের বিশ্বে মাওবাদকে জনআন্দোলনের নেতৃত্ব ও কমান্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা কতটা গুর ত্বপূর্ণ। বিশেষত দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে মাওবাদী গণযুদ্ধকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলাটা এখন অত্যন্ড় জর রী– যখন কিনা নেপাল গণযুদ্ধ দেশব্যাপী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দ্বারপ্রান্ড়ে, এবং তাকে ও ভারতের বিকাশমান গণযুদ্ধকে দমনের জন্য মার্কিন-ভারতের আগ্রাসী ষড়যন্ত্র খুবই জোরালো, যখন কিনা পূর্ব বাংলাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ কর্মসূচির স্বার্থে তার

নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ অবস্থায়, মাওবাদী আন্দোলন কেন ভালভাবে এগুচ্ছে না– তার অনসন্ধান জরুরী। যা কিনা, মাওবাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পূবাকপা-কেও করতে হবে।

মাওবাদী হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই স্বীকার করি যে, লাইনই হলো নির্ধারক, এবং মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনই হলো মৌলিক লাইন। সুতরাং, আমাদের সমস্যা ও সংকটের উৎস নিহিত রয়েছে লাইনের গভীরে। এদেশের বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত একটি সঠিক লাইনের সন্ধান ও নির্মাণ এবং তাকে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এজন্য ৩৫ বছরের মাওবাদী আন্দোলনের লাইনগত সারসংকলন এক জরুরী ও অপরিহার্য করণীয়। কিন্তু এজন্য দাঁড়াতে হবে MLM-এর অগ্রসর উপলব্ধির জায়গায়। এজন্য আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনের অগ্রসর অভিজ্ঞতাগুলো থেকে শিখতে হবে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে। ৬০/৭০-দশকের চেতনা, অভিজ্ঞতা ও আবেগে বন্দী হয়ে থাকলে কোন ভাবেই এগোনো যাবে না। আজকের বিশ্বে অগ্রসর মাওবাদী আন্দোলনে কেউই তা পারেনি– যেমন, পেরু, নেপাল, আমেরিকা, এমনকি ভারতে পর্যন্ত। এ ধরনের কাজ অবশ্যই সরল নয়, নির্ঝঞ্ঝাট নয়। বদ্ধ ঘরের জানালা খুললে বাইরের ঝড়ো বাতাস অনেক কিছুই এলোমেলো করে দিতে পারে বটে। কিন্তু বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণ গন্ডি কোন সমাধান নয়। সাহসের সাথে সমস্ত ধরনের কথাই মাওবাদীদের শুনতে হবে । আলোচনা করতে হবে। বিতর্ক করতে হবে কমরেডসুলভভাবে– বিভেদাত্মক ও নেতিবাদীভাবে নয়। এই ধরনের এক ব্যাপক ও বৃহৎ পরিসরের 2LS থেকেই শুধু এদেশের বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত সঠিক/অগ্রসর লাইন-নির্মাণে আমরা যেতে পারি। এই বিতর্ক ও লাইন-পুনর্নির্মাণের কাজ নিশ্চয়ই বিপ্লবী শ্রেণি-সংগ্রামের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না– সেটা মাওবাদীও নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই অর্জিত সুদীর্ঘ বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে– যার সারসংকলন জরুরী। এটা আজ এদেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের সামনে উপস্থিত– পূবাকপা হলো তারই একটি অংশ। এ কথা আমাদের পার্টির জন্যও প্রযোজ্য। আমরাও এ আন্দোলনের অংশ– তার গৌরব ও পরাজয়ের ভাগীদার আমরাও। এই উপলব্ধি ও দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা পূবাকপা'র লাইন-সমস্যাকে এ রচনায় তুলে ধরেছি। এই কাজ যে মাওবাদী যতটা ভালভাবে করবেন, তার বিপ্লবী শ্রেণিসংগ্রামে অংশ গ্রহণ হবে তত উন্নত ও কার্যকর। মৌলিক প্রশ্নগুলোতে আমাদের উত্থাপিত অবস্থান সন্দেহাতীতভাবে সঠিক– এমন দাবি আমরা করি না। আমরা মনে করি না যে, এই কেন্দ্র বা ঐ নেতা আগে সঠিক ছিলেন বা এখন সঠিক– তার মাঝ থেকে বেছে নিতে হবে। বরং আমাদের অবস্থান হলো, এক নতুন পর্যায়ে এদেশের মাওবাদী আন্দোলন প্রবেশ করেছে, যখন একে নতুন এক উন্নত স্তরে পুনর্গঠিত করার সংগ্রামে যে কেউ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে অতীতে কে কতটা সঠিক বা বেঠিক ছিলেন তা বিচার্য বিষয় নয়– যদিও এদেশের অতীত আন্দোলনের একটা মোটাদরের মূল্যায়ন আজকের অগ্রসর সঠিক লাইনের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় বৈ কি ! এই অবস্থান থেকেই আমরা মনে করি আমাদের পর্যবেক্ষণ,

পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমালোচনাগুলো পূবাকপা'র মধ্যকার লাইন-সংগ্রাম ও লাইন-পর্যালোচনাকে গভীর করতে, ও ব্যাপক করতে সাহায্য করবে– যে লাইন-বিতর্ক শুধু পূবাকপা'র কিছু নেতার বিষয় নয়, এমনকি তা শুধু তাদের কর্মী-সমর্থকদের জীবন-মরণের সমস্যাও নয়, বরং তা হলো সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের বিষয়। এভাবেই শুধু এ লাইন-সংগ্রামে ব্যাপকতর নেতা-কর্মী-জনগণের অংশগ্রহণকে টেনে আনা যাবে। এবং পার্টি ও বিপ্লবের মৌলিক সমস্যার সমাধানের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারবো।

লাইনের মৌলিক সমস্যাগুলো

আজ এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের সামনে যে জটিল পরিস্থিতি বিদ্যমান সেক্ষেত্রে মৌলিক সকল প্রশ্নকেই আলোচনায় আনতে হবে, আর প্রতিটি মূল প্রশ্নই পূবাকপা-কেও পর্যালোচনায় নিতে হবে। এর অর্থ এটা নয় যে, সকল মৌলিক প্রশ্নেই পূবাকপা ভুল– এমন কিছু আমরা বলছি। তবে আমরা বলছি যে, পূবাকপা-কে প্রতিটি মৌলিক লাইন-প্রশ্নে নতুন স্তরে নিজেকে বিকশিত করতে হবে– যা কিনা আমাদের সর্বহারা পার্টিসহ অন্য সকল মাওবাদী ধারা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সামগ্রিক লাইনের এই নতুন স্তরে বিকাশ হলো পুরনোর সাথে Rupture করা। এর একটা চমৎকার উদাহরণ হলো খোদ মাও-এর জীবন ও সংগ্রাম– বিশেষত ষাটের দশকে ও পরে– যখন তিনি স্ট্যালিন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরনো ধারা থেকে Rupture করেন। এই উদাহরণ আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর ঐতিহাসিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে, তার লাইনের ইতিবাচকতাকে রক্ষা করে কীভাবে নতুন স্তরে লাইনকে বিকশিত করা যায়। আমাদের দেশের ৩৫ বছরের বিপ্লবী সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের মনোভাব হতে হবে এমনই। আমরা এই ঐতিহ্যেরই ধারাবহনকারী। কিন্তু একই লাইনের বহনকারী নই। পুরনো লাইনগুলোর জের টেনে চললে বিপ্লবকে আর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। মাওবাদী আন্দোলনের সাম্প্রতিক ইতিহাস তা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে। তদুপরি আমাদের অতীত গৌরবময় হলেও তা স্ট্যালিনের অবদানের মত উচ্চমাপের ও ব্যাপকতর নয়। এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার এই মনোভাব থেকে আমরা পূবাকপা'র সমস্যা মনে করি প্রধানত মতবাদিক প্রশ্নে ও গণযুদ্ধের প্রশ্নে। এ পার্টির অন্য প্রায় সকল সমস্যাই এ থেকে জাত ও এর সাথে জড়িত। অবশ্য পার্টি গঠন, ফ্রন্ট, আন্তর্জাতিকতাবাদ, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও রণনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও তাদের গুরুতর সমস্যা দেখা যায় যার পৃথক আলোচনাও প্রয়োজন। এ সমস্তই আমরা নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবো।

১। মতবাদ বা মতাদর্শ

পূবাকপা একটি মাওবাদী সংগঠন। এ পার্টি MLM-কে তার মতাদর্শ ও তাত্ত্বিক

ভিত্তি মনে করে, এবং তার প্রধান প্রধান দিকগুলো তারা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে; আয়ত্ত্ব করার ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু একই সাথে তারা CM-শিক্ষাকেও গ্রহণ করেছে। '৭১-সালের জুনে এ পার্টি যখন CM-শিক্ষাকে গ্রহণ করে তখন থেকেই তারা পার্টি-ইতিহাসকে গণনা করে। এটাই স্পষ্টভাবে দেখায় যে, CM-শিক্ষাকে এ পার্টি কতটা গুরুত্বের সাথে দেখে।

CM-শিক্ষাকে মতাদর্শের ক্ষেত্রে তারা কীভাবে গ্রহণ করেছে– এবং সাম্প্রতিককালে এ প্রশ্নে তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের মাঝে মতপার্থক্যের অবস্থাটা কী তা নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে CM-এর মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

সারা দুনিয়ার সাচ্চা মাওবাদীরা ক. CM-কে ষাট-সত্তর দশকের এক গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী নেতা বলে স্বীকৃতি দেয়। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মাওবাদের প্রথম বার্তাবাহক। এবং তিনি ছিলেন ভারতের মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধানতম পথিকৃত।

কিন্তু CM-এর নেতৃত্বাধীন এ বিপ্লবী সংগ্রাম তার জীবিতাবস্থায়ই বিপর্যস্ড় হয়ে পড়ে যা তার মৃত্যুর পর বহুব্যাপ্ত রূপ লাভ করে। ভারতে এ সংগ্রামের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় ক. CM-এর সারসংকলনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ প্রশ্নে প্রধান তিনটি ধারা ভারতে তখন আবির্ভূত হয়। এক ঃ ক. CM ভুল ছিলেন; দুই ঃ ক. CM সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন; এবং তিন ঃ CM-এর মহান অবদান সত্ত্বেও তার লাইনে ও অনুশীলনে কিছু গুরুতর ভুলও ছিল।

বাস্ড়বে এই তিন নং ধারাটিই পরে ভারতীয় বিপ্লবী মাওবাদী ধারাকে এগিয়ে নেয়– যার মাঝে রয়েছে PW, MCC ও NB। এই তিন নং ধারাটিও একটি অখণ্ড ধারা ছিল না। এর মাঝে বিভিন্ন মতপার্থক্য ছিল ও এখনো রয়েছে। কিন্তু সে মতপার্থক্যগুলো CM-এর অবদান ও ত্রুটিকে দেখার ও মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে পার্থক্য। CM সম্পূর্ণ সঠিক– এমন কোন মত-উদ্ভূত নয়। নিশ্চয়ই এর মাঝে কোন ক্ষেত্রে কোন মত সঠিক, কোনটা বা বেঠিক; অথবা আপেক্ষিকভাবে কারও অবস্থানকে অগ্রসর বা কোনটাকে পশ্চাদপদ বলা যেতে পারে। আসলে এই মূল্যায়নের প্রশ্নে একটা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সঠিক অবস্থান ভারতীয় আন্দোলনে এখনো অর্জিত হয়নি। কিন্তু, ভারতীয় মাওবাদী আন্দোলনে এই ঐকমত্য বহু পূর্বেই অর্জিত হয়েছে যে, CM-কে সম্পূর্ণ সঠিক বলাটা ঠিক নয়। ভারতের বিপ্লবে এটা বহু আগেই মীমাংসা হয়ে গেছে– তত্ত্বে ও অনুশীলনে। বাস্ড়বে এটাই কারণ যে, পরে ভারতের বিপ্লব কেন মোটামুটি ভালভাবে এগোতে পেরেছে এবং CM-কেও রক্ষা করতে পেরেছে।

ভারতের সমস্ড় বিপ্লবী শক্তিই– যারা CM-কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে– তারা CM-এর অবদানকে স্বীকার করে। এই অবদানকে কেউ কেউ CM-এর শিক্ষাও বলেন। কিন্তু CM-শিক্ষা বলতে কেউই CM-লাইনের সম্পূর্ণ যথার্থতা দাবি করেন না; বরং CM-এর সারসংকলনের ভিত্তিতেই তার শিক্ষাকে তুলে ধরেন। সুতরাং, আমরা দেখছি, 'CM-শিক্ষা' বলতে কী বুঝবো, এবং তাকে কীভাবে দেখবো সেটাও একটা বিতর্কের বিষয়।

তাই, পূবাকপা'র মতাদর্শগত লাইনের উপর আলোচনা করার আগে দেখা দরকার– তারা CM-শিক্ষা বলতে কীভাবে তা বোঝেন। ইতিমধ্যেই পূবাকপা'র বিভিন্ন কেন্দ্রের মাঝে একটা বিতর্ক বা পার্থক্য অবশ্য দেখা যাচ্ছে CM-শিক্ষা পার্টির মতাদর্শ কিনা। চৌধুরী গ্রুপ কিছু জায়গায় বলেছে যে, পার্টির মতাদর্শ হলো MLM ও CM-শিক্ষা। RF (Red Flag– লাল পতাকা)-গ্রুপ বলতে চাচ্ছে তাদের পার্টির মতাদর্শ হলো MLM– CM-শিক্ষা কখনই পার্টির মতাদর্শ ছিল না। এ প্রশ্নে পার্থক্য সত্ত্বেও, এবং পার্টির মতাদর্শ সাংবিধানিকভাবে কী ছিল ও চেতনাগতভাবে কী ছিল সে ক্ষেত্রে পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, এই সমস্ড় কেন্দ্রগুলোর মাঝে মূল যে অভিন্নতা ছিল ও রয়েছে তাহলো, তারা প্রত্যেকেই, এবং ঐতিহাসিকভাবে এই পার্টি সুস্পষ্টভাবে বলে চলেছে যে, CM-শিক্ষা ছাড়া MLM-কে বোঝা যায় না, CM-শিক্ষা গ্রহণ না করলে MLM-কে অস্বীকার করা হয় এবং যারা CM-শিক্ষাকে গ্রহণ করে না তারা মাওবাদী নয়, সংশোধনবাদী।

এর অর্থ হলো, এ পার্টির মতে CM-শিক্ষা হচ্ছে এদেশের/ভারতবর্ষের/দক্ষিণ এশিয়ার প্রয়োগজাত MLM। এ ধরনের অসংখ্য বক্তব্য তাদের বিগত ২৫ বছরের পার্টি-ইতিহাসে বহু বহু দলিলে ছড়িয়ে রয়েছে। এটা কার্যত মতাদর্শের স্ড়রেই CM-শিক্ষাকে উন্নীত করে– সেটা সাংবিধানিকভাবে থাকুক বা না থাকুক, এবং পার্টির মতাদর্শ বলার সময় MLM-এর সাথে একবাক্যে CM-শিক্ষাকে বলা হোক বা না হোক।

তবে আমরা এটা মনে করি না যে, একবাক্যে মতাদর্শ হিসেবে CM-শিক্ষাকে অন্ড়র্ভুক্ত করা বা না করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তা রয়েছে বটে– প্রথমোক্তরা CM-শিক্ষাকে আরো উচ্চতর স্ড়রে নিয়ে যায়, যা দ্বিতীয়রা করছেন না– কিন্তু CM-শিক্ষা ছাড়া MLM-কে বোঝা ও প্রয়োগ করা যায় না, তা গ্রহণ না করলে মাওবাদী হওয়া যায় না, তা হলো উপমহাদেশের প্রয়োগগত MLM– এসব সূত্রায়ন সারবস্তুগতভাবে তাকে মতাদর্শের অন্ড়র্ভুক্ত করে ফেলে। বিভক্তির পর পূবাকপা'র বিভিন্ন কেন্দ্র বিভিন্নমুখী প্রবণতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে– যা আমরা ভূমিকাতেই বলেছি– কিন্তু এ পার্টির প্রধানতম সময়কালের ইতিহাসে CM-শিক্ষাকে তারা গ্রহণ করেছিল এমন অবস্থান থেকে যা ভারতীয় বিপ্লবে CM-মৃত্যুর পর এসেছিল উপরে উল্লেখিত ২নং ধারা হিসেবে, একটি বিশুদ্ধতাবাদী ধারা হিসেবে, অর্থাৎ, CM-এর ভুল ছিল না, এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে ও প্রয়োগ করেই লাইনেরও বিকাশ ঘটবে, নতুবা তা সম্ভব নয়। পূবাকপা'র বহু দলিলে এটা পাওয়া যাবে– চৌধুরী গ্রুপ সেটাই এখনো বলছে– CM-শিক্ষা গ্রহণ না করার অর্থ হলো সংশোধনবাদ। পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে, এখানে CM-শিক্ষা বলতে CM-এর সারসংকলনভিত্তিক শিক্ষার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে সিএম-এর সমস্ড় গুরুত্বপূর্ণ লাইন, নীতি ও প্রয়োগের কথা– পূবাকপা যেভাবে CM-শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল ও বহন করেছে বিগত দুই যুগ ধরে তার কথা।

* CM-এর শিক্ষাকে এভাবে দেখাটা কেন ভুল, তাকে একবাক্যে MLM-এর সাথে মতাদর্শ বলাটা কেন আরো বড় ভুল– সে বিষয়ে যাবার আগে মতাদর্শের সূত্রায়নে MLM-এর সাথে 'চিন্ড়াধারা', 'পথ', বা 'শিক্ষা'– এসব শব্দ বা শব্দসমষ্টি যুক্ত করার

সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তগুলো আমরা কিছুটা আলোচনা করতে পারি।

মাও-মৃত্যুর পর ৮০'র দশকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলন ছিল পেরুর গণযুদ্ধ। এই বিপ্লবের নেতা ক. গনজালোর অবদানকে পেরুর পার্টি 'গনজালো চিন্তাধারা' (GT) বলতো, এবং এক পর্যায়ে তারা তাদের পার্টির মতাদর্শ হিসেবে একে যুক্ত করে। তখন থেকে তারা পার্টির মতাদর্শ বলে MLM ও গনজালো চিন্তাধারা। পেরুর পার্টির এই অবস্থান বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে একটা বড় বিতর্কের সৃষ্টি করেছে যার মীমাংসা এখনো হয়নি। পেরুর বিপ্লবে ক. গনজালোর বিরাট অবদান রয়েছে এবং তার কিছু কিছু অবদান আন্তর্জাতিক তাৎপর্যমণ্ডিতও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেরু-পার্টি বলেছে যে, GT হলো পেরুর নির্দিষ্ট অবস্থায় MLM-এর প্রয়োগ। তারা দাবি করেনি যে, GT বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য বা এমনকি সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার জন্য প্রযোজ্য।

অনেকটা এ ধারাতেই নেপাল পার্টি মতাদর্শের ক্ষেত্রে MLM-এর সাথে 'প্রচণ্ড পথ' যুক্ত করে ২০০১ সালে। অবশ্য 'চিন্তাধারা' প্রশ্নে পেরু পার্টির সাথে নেপাল পার্টির পার্থক্য রয়েছে যা 'পথ' শব্দের ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু এ অভিজ্ঞতাগুলোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে যে বিষয়টা দেখা প্রয়োজন তাহলো পেরু ও নেপাল বিপ্লবের বিরাটাকার বিজয় ও অগ্রগতি, এবং তার লাইনগত ভিত্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলোর লাইনের উচ্চমান। পেরুর বিপ্লব ১২ বছর ধরে বিকশিত হয়, বিশাল বহিনী ও ঘাঁটি এলাকা গড়ে ওঠে, সমগ্র পেরুর এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত করে এবং দেশব্যাপী ক্ষমতা দখলের সমস্যার মুখোমুখি হয়– অবশ্য '৯২-পরবর্তীকালে তা ক্রমান্বয়ে এক সামগ্রিক বিপর্যয়ে পতিত হয়েছে। অন্য দিকে নেপাল বিপ্লব আরো এগিয়ে গেছে, ৯ বছর ধরে বিকশিত হয়ে এখন বলা চলে দেশের প্রায় সমগ্র গ্রামাঞ্চল মুক্ত করেছে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে রণনৈতিক আক্রমণের স্তরে প্রবেশের পরিকল্পনা করেছে এবং দেশব্যাপী ক্ষমতা দখলের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। সুতরাং এ বিপ্লবগুলোতে MLM প্রয়োগের ব্যাপকতা, গভীরতা ও সফলতার যে গুণ ও মাত্রা তার পিছনে ঐসব দেশে নির্দিষ্ট লাইনের নির্মাণ ও বিকাশে গুণগত অগ্রগতি খুবই সুস্পষ্ট। বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামে একমাত্র ফিলিপাইন ছাড়া (৮০-দশক পর্যন্ত) আর কোথাও এমন অগ্রগতি ঘটেনি। (যদিও ফিলিপাইন-গণযুদ্ধ লাইনগত মানে– এমনকি বাস্তব সংগ্রামেও– নেপাল গণযুদ্ধের মতো উচ্চস্তরে পৌঁছেনি)। আর তত্ত্বগত-লাইনগত প্রশ্নে পেরু-নেপালের মতো উচ্চমানে আলোচনা-বিতর্ক-অবদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমেরিকার মাওবাদী পার্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও, এই সব পার্টির লাইন ও সংগ্রামে এই বিরাট ভূমিকা সত্ত্বেও, এটা এখনো বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে বিতর্কিত যে, MLM-এর সাথে মতাদর্শ হিসেবে এভাবে মূলত জাতীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তাধারা, পথ, বা শিক্ষা যুক্ত করা সঙ্গত কিনা। কারণ, সর্বহারা শ্রেণি হলো একটি আন্তর্জাতিক শ্রেণি, তার বিপ্লবটা হলো বিশ্ববিপ্লব, এবং তার মতাদর্শ হলো এক অভিন্ন মতাদর্শ– যা আন্তর্জাতিকতাবাদ। আমাদের এই মতাদর্শ বিশ্বের

বিভিন্ন দেশে নিশ্চয়ই বিভিন্নভাবে প্রয়োগ হবে, কিন্তু তাতে তার মূলগত অভিন্ন চরিত্র পরিবর্তন হতে পারে না; এবং বিভিন্ন দেশে সর্বহারা শ্রেণির মতাদর্শ বিভিন্ন হতে পারে না। সুতরাং বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের এই বিতর্কে অংশ না নিয়ে, তার উপর সুস্পষ্ট মতাবস্থান গড়ে না তুলে কীভাবে MLM মতাদর্শের সাথে, বা মতাদর্শের মত করে অন্য কিছুকে গ্রহণ করা যায়? অথচ পূবাকপা সেটাই করেছে এবং সুদীর্ঘকাল ধরে তা চালিয়ে যাচ্ছে।

তদুপরি পূবাকপা'র CM-শিক্ষার ক্ষেত্রে পেরু-নেপালের উপরোক্ত দৃষ্টান্তও খাটে না।

প্রথমত ক. CM বিপ্লব করেছেন ভারতে, এবং ভারতের নির্দিষ্ট অবস্থায় তিনি MLM-কে প্রয়োগ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা সমগ্রভাবে কি পূর্ব বাংলা বা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায়– যেমনটা পূবাকপা বলে থাকে– MLM-প্রয়োগকে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম? মোটেই নয়। ভারতের জাতীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে CM-এর কোন অবদান যদি আন্তর্জাতিকভাবে প্রযোজ্যতার মান ধারণ করে তাহলে তাকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণ না করে, কেন তাকে শুধু ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য প্রযোজ্য বলা হবে? সিএম-কে কেন ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ার বিপ্লবের কর্তৃত্ব বলা হবে? এ দাবি সারবস্তুগতভাবে মার্কসবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী দাবি (যার রূপ হলো উপমহাদেশীয় আঞ্চলিকতাবাদ)।

ক. CM কি ভারতের কর্তৃত্ব, না উপমহাদেশের কর্তৃত্ব?– এমন একটা বিতর্ক ক. মানস '৮৫-সালে পার্টি-কেন্দ্রে তুলেছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়; কিন্তু তা নিয়ে বিগত প্রায় ২০ বছরে আর কোন বিতর্ক হয়নি, আলোচনা হয়নি, স্বয়ং প্রাক্তন সম্পাদক ক. চৌধুরী বিতর্কিত দলিল একাধিকবার নাকি হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে এর উপর 2LS-কে এগিয়ে নেয়া যায়নি– ইত্যাদি। ফলে আমরা জানি না (সম্ভবত পূবাকপা'র অধিকাংশ নেতৃত্বও জানেন না যে) এই বিতর্কে ক. মানস কী বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার অবস্থান বা যুক্তি যা-ই থাকুক না কেন, এটা একটা বিশাল বড় প্রশ্ন– খোদ মতাদর্শের প্রশ্ন– যার মীমাংসা ছাড়া লাইনের ক্ষেত্রে পার্টি এক পা-ও এগোতে সক্ষম নয়, ঐক্যবদ্ধ থাকতেও সক্ষম নয়। এই বিতর্ক আসার পরও পূবাকপা-যে আরও ১৫ বছর ঐক্যবদ্ধ থেকেছে– এবং সবেমাত্র ভেঙ্গেছে– বাহ্যত অন্যান্য কারণে– সেটাই বরং বিস্ময়ের ব্যাপার। কারণ, যে পার্টি মতাদর্শের মৌলিক লাইনে বিতর্কের মীমাংসা করেনি, এবং এই বিতর্কের গুরুত্ব ১৫ বছর ধরে উপলব্ধিও করেনি– সে পার্টি বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শগত লাইন এবং পার্টি ও লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে

* সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে 'কমপোসা' গঠন এরই স্বীকৃতি দিচ্ছে। এমনকি এ প্রসঙ্গ ধরে 'দক্ষিণ-এশীয় সোভিয়েত' গঠনের প্রস্তাবনাটিও আলোচনা হতে পারে– যা কিনা নেপাল পার্টি ও ক. প্রচন্ড উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এমন কোন প্রস্তাব বা পদক্ষেপই দক্ষিণ-এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে পৃথক পৃথক বিপ্লবের স্বাতন্ত্র্যকে ও তাদের স্বতন্ত্র লাইনকে বাতিল করে না, এবং শুধু পূর্ব বাংলা, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে যুক্ত সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষের কর্মসূচি হাজির করে না।

2LS-এর গুর"ত্বকে-যে মাওবাদ থেকে ভালভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে তা সুস্পষ্ট, এবং সে পার্টির– অন্যসব এলোমেলো ইস্যুতে ভেঙ্গে যাবারই কথা।

কর্তৃত্ব বা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নটা হলো উপমহাদেশ বা ভারতবর্ষ বলতে কী বুঝবো– কারণ প্রায় সর্বদাই তারা এ শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু '৯৬-এর গুর"ত্বপূর্ণ লাইনগত দলিলে তারা সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, CM দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্ব– যেখানে নাম ধরে তারা পূর্ব বাংলা ছাড়াও শ্রীলংকা, পাকিস্ড়ান, নেপাল– এ সব দেশের উল্লেখ করেছে। ইতিমধ্যে নেপাল-গণযুদ্ধ অনেক এগিয়ে গেছে– যার নেতৃত্বকারী পার্টি CM-কে– আর সব মাওবাদীদের মতই– মহান বিপ্লবী নেতা হিসেবে তুলে ধরলেও পূবাকপা'র মত করে CM-শিক্ষাকে গ্রহণ করেনি। বরং তারা নেপালের নির্দিষ্ট অবস্থায় MLM-প্রয়োগ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণকে "প্রচন্ড পথ" হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিপ্লবী অনুশীলনের অগ্নিপরীক্ষায় এটা-কি প্রমাণিত হয়নি যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দেশ নেপালে পূবাকপা'র মত CM-কর্তৃত্ব গ্রহণ না করেই গণযুদ্ধ ও বিপ্লব সর্বাধিক এগিয়ে গেছে– অন্ড়ত পূবাকপা'র চেয়ে অনেক ভালভাবেই এগিয়েছে? পূবাকপা'র কি উচিত নয় ৩০ বছর ধরে একই ডগমা জপা'র মধ্যে আর আটকে না থেকে বিশ্ব-বিপ্লব থেকে, বিশেষ করে বাড়ির কাছের সফল গণযুদ্ধগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া?

পূবাকপা'র কর্মসূচিতে রয়েছে পূর্ব বাংলায় বিপ্লব করে সমাজতান্ত্রিক পশ্চিম বাংলার সাথে তাকে যুক্ত করে অখ" সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্তু, তাদের মতে CM হলেন দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্ব। সেক্ষেত্রে সমগ্র দক্ষিণ-এশীয় একটি সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি না দিয়ে তারা শুধু সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ার কথা কেন বলছেন ? এটা-কি এ কারণে নয় যে, একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে ক. CM এ রকম একটা বাক্য লিখেছিলেন– যাকে মাথা খাটিয়ে বুঝতে বা সৃজনশীলতার সাথে গ্রহণ করতে পূবাকপা সক্ষম নয়?

এটা সত্য যে, ভারত, পূর্ব বাংলা ও পাকিস্ড়ান– এই তিনটি রাষ্ট্র একদা একই সাম্রাজ্যের অধিনস্থ ছিল– যা বৃটিশ উপনিবেশ ছিল। এই দেশগুলোর জনগণের অনেক অভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রয়েছে, যেমন কিনা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মাঝেও রয়েছে। কিন্তু মার্কসীয় জাতিতত্ত্ব অনুসারে বৃটিশ ভারতবর্ষ কখনো এক জাতি অধ্যুষিত ছিল না। তদুপরি প্রায় ৬০ বছর হতে চললো এই তিন রাষ্ট্র পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ৭/৮টি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, প্রায় তিন প্রজন্ম ধরে ভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রগুলোর জনগণ পার হয়েছেন। বহু অভিন্নতা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি ব্যাপকভাবে বিভিন্নও বটে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ভিত্তিক বিপ্লবের লেনিনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী এই রাষ্ট্রগুলোতে বিপ্লব হলো বিভিন্ন– অভিন্ন বা একই নয়– যদিও বিশ্বব্যাপী এক অখ" সর্বহারা বিপ্লবের অংশ তারা। এবং বিশ্বের একটি অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোর মাঝে রয়েছে আরো ব্যাপক ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক– যাকে মাওবাদী বিপ্লবীদেরকে অবশ্যই গুর"ত্ব দিতে হবে।*

সুতরাং, ভারতের বিপ্লবে ক. CM-এর অবদান ভারতের নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রযোজ্য। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর জন্য তাকেই পার্টি-লাইন করা, এবং সিএম-কে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্ব বানানোর লাইনটা মার্কসবাদী নয়। নিশ্চয়ই ভারতের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে ও ক. CM থেকে আমাদের শেখার রয়েছে, যেমন কিনা রয়েছে নেপালের বিপ্লব থেকে, পের"র গণযুদ্ধ থেকে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাওবাদীদের অবদানগুলো থেকে শিক্ষা নেয়ার– কারণ, আমরা সর্বহারা শ্রেণি এক অভিন্ন বিশ্ব-বিপ্লবের কাজে বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত। এবং এক অভিন্ন আন্ড়র্জাতিক মতাদর্শ দ্বারা আমরা চালিত। ভারতের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, বিশেষত পশ্চিম বাংলার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি গুর"ত্বের দাবি নিশ্চয়ই রাখে, কারণ ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, বহু অভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্য আমাদের দুই জনগণের মাঝে রয়েছে, বিশেষত পশ্চিম বাংলার বাঙালী জনগণের সাথে, কিন্তু ভারতের বিপ্লব ও তার লাইন একটা বিশিষ্ট লাইন– যা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে একই হতে পারে না। এটা না বুঝলে ভারতীয় শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদী চরিত্র, আর তার দ্বারা আক্রান্ড় পূর্ব বাংলার জাতি-জনগণের সমস্যার পার্থক্য বোঝা যাবে না; বোঝা সম্ভব হবে না '৭১-পূর্ব পাক-আমলে পূর্ব বাংলার জাতি সমস্যার বিশেষত্বকে, বা '৭১-সালের বিশেষ অবস্থাগুলোকে; আরো সম্ভব নয় ভারতের ব্যাপক বনাঞ্চল ও পর্বতসংকুল অঞ্চলের বিপরীতে পূর্ব বাংলার প্রধানত সমভূমিতে বিপ্লবের জন্য গণযুদ্ধের বিশিষ্ট সমস্যাসহ আরো অনেক মৌলিক রাজনৈতিক ও সামরিক গুর"ত্বপূর্ণ বিশেষত্বকে; সম্ভব নয় পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি, সংশোধনবাদ ও মাওবাদী আন্দোলনের বিশেষ সমস্যাগুলাকে চিহ্নিত করা। আমরা পরে দেখবো যে, পূবাকপা'র রাজনৈতিক ও সামরিক লাইনসহ বহু ক্ষেত্রে কীভাবে এই মৌলিক মতাদর্শগত লাইনের বিচ্যুতি ছাপ ফেলেছে এবং তারা বহু ভুল লাইন ও নীতিকে সামনে এনেছে। এমন বহু সব ভুল ক. CM-এর নয়, পূবাকপা'র নিজস্ব– যা তারা CM-শিক্ষা বলেই চালাচ্ছে, এবং এভাবে কার্যত ক. CM-কে গুর"তরভাবে অবনমিত করছে। পূবাকপা'র অনেক গুর"তর ভুল CM-লাইনের উপর চালানো চলে না। এগুলো পূবাকপা'রই লাইন, নির্দিষ্টভাবে চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন লাইন– যা আজকের পূবাকপা'র সমস্ড় কেন্দ্রই মূলগতভাবে এখনো অনুসরণ করে চলেছে, অন্ড়ত স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে তার মৌলিক কোন সারসংকলনে উন্নীত হয়নি। আর এমন নিজস্ব ভুলের প্রধানতম দিকটি হলো মতাদর্শগত লাইন আকারে সিএম-শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি। দ্বিতীয়ত CM-শিক্ষা হিসেবে পূবাকপা যেভাবে CM-অবদানকে গ্রহণ করেছে, এবং কোন কোন কেন্দ্র যেভাবে একে মতাদর্শ বলছে–

* এ বছর ২১ সেপ্টেম্বর ভারতের সর্ববৃহৎ দুটো মাওবাদী পার্টি MCCI ও PW ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন ঐক্যবদ্ধ পার্টি CPI (Maoist) গঠন করেছে। এ তথ্য আমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও আমাদের এ রচনায় MCCI ও PW পার্টি দুটোর নামই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, CPI (M) মাত্র গঠিত হয়েছে যার ইতিহাসের সবে শুর"। আর আমরা আলোচনায় আনছি মূলত ঐক্যের পূর্বেকার ভারতের মাওবাদী আন্দোলনকে।

তা কতটা সঠিক ?

আগেই আমরা বলেছি, ভারতীয় বিপ্লবে– এবং এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে – ক. CM-এর গুর"ত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও তার লাইনে ও অনুশীলনে কিছু গুর"ত্বপূর্ণ ত্র"টি ছিল বলেও ভারতের মাওবাদীরা মনে করেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের সকল মূল্যায়ন সঠিক তা আমরা দাবি করি না, কিন্তু যে বিষয়টা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো ক. CM-কে দ্বান্দ্বিক সারসংকলন না করে ভারতের বিপ্লব ৭০-দশকের বিপর্যয় কাটিয়ে তুলে আবার এগুতে পারতো না, এবং আজ নকশালবাড়ীর আদর্শে অন্ধ্র, দ"কারণ্য, বিহার, ঝাড়খন্ডে এক বিজয়ী গণযুদ্ধ গড়ে উঠতে ও এগিয়ে যেতে পারতো না। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সারসংকলন এখনো চূড়ান্ড় হয়নি, তার ভিত্তিতে ভারতের সমস্ড় প্রকৃত মাওবাদী বিপ্লবীরা এখনো পরিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। কিন্তু এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ক. CM-এর সারসংকলন ৭০-দশকেই অপরিহার্য ছিল, এবং তার ত্র"টিগুলোকে বহন করে বিপ্লবকে রক্ষা করা যেত না। চোখ-কান বন্ধ করে সংকীর্ণ গর্তে বসে থাকতে না চাইলে যে কারও পক্ষেই এ সত্য জানা সম্ভব।

এ প্রশ্নে আরো কিছু দৃষ্টান্ড় দেয়া যায়। ভারতের মাওবাদী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শক্তি এখন MCC, যা ঝাড়খন্ড ও বিহারে সংগ্রাম করছে।* এই MCC সূচনা থেকেই CM-ধারার বাইরে থেকে এগিয়েছে।

CM জীবিতকালে MCC-লাইনের সাথে তার বিরোধ ছিল– যা অনেকাংশে সঠিক ছিল, যদিও সর্বাংশে নয়। কিন্তু MCC– CM-শিক্ষাকে ভিত্তি না করে– MCC-কে ভিত্তি করে, ক্রমান্বয়ে নিজ দুর্বলতা ও ত্র"টিকে কাটিয়ে এবং CM-লাইনের ত্র"টিগুলো হতে মুক্ত থেকে আজ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাওবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে যা সারা বিশ্বের আন্ড়রিক মাওবাদীদের দ্বারা স্বীকৃত। আমরা বলছি না MCC-র সমস্ড় অবস্থানই সঠিক, বরং কিছু প্রশ্নে আমাদের পার্থক্য ও সমালোচনাও রয়েছে, কিন্তু আমরা পূবাকপা-কে বিরোধিতা করছি ভিন্ন জায়গায়। পূবাকপা-যে বলেছে, CM-শিক্ষা ছাড়া MLM উপলব্ধি হয় না, যারা CM-শিক্ষা গ্রহণ করে না তারা সংশোধনবাদী– সে কথা MCC'র ক্ষেত্রে কীভাবে তারা প্রয়োগ করবে ?

ভারতের প্রধান বিপ্লবী পার্টি PW-র ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। এ পার্টি CM-ধারা থেকে গড়ে উঠলেও ৭০-দশকের বিপর্যয়ের পর তারা CM-এর সারসংকলন করে– এবং তার ফলেই এগোতে সক্ষম হয়।

সুতরাং CM-শিক্ষা গ্রহণের সময় খুবই মৌলিক প্রশ্ন হলো CM-এর অবদান কী, আর তার ভুলগুলোই বা কী।

এই বিষয়ের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিস্ড়রিত জায়গা আমাদের এ রচনায় নেই। কিন্তু নিতম যা বলা যায় তাহলো, CM-এর লাইন সর্বাংশে সঠিক ছিল না। তার একটি বিষয় এ আলোচনায় বেশি গুর"ত্বপূর্ণ– খতম-লাইন। খতম-লাইনকে পূবাকপা CM-এর একটা বুনিয়াদী লাইন, মৌলিক লাইন, রণনৈতিক লাইন বলে মনে করে।

মাওবাদী গণযদ্ধের তত্ত্ব ও রাজনীতিকে ভারতের মাটিতে আনার ক্ষেত্রে ক. CM-এর বড় অবদান ছিল। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে সামরিক লাইন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি খতম-লাইনের মাধ্যমে বড় ধরনের ভুল করেছিলেন– যার সাথে বাহিনী গঠনের প্রশ্নও জড়িত। এ বিষয়টিকে ভারতের মাওবাদী বিপ্লবীরা বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন ও সারসংকলন করেছেন– তা ঠিক, তবে মূল যে অভিন্নতা তাদের মাঝে ছিল ও রয়েছে, তাহলো ক. CM খতম-লাইনকে যেভাবে এনেছিলেন তা সঠিক ছিল না। একই কথা প্রযোজ্য গণসংগঠনের বিষয়ে। আমরা এ বিষয়গুলো গণযুদ্ধ অধ্যায়ে বিস্ড়রিত আলোচনা
করবো। এখানকার নির্দিষ্ট সমস্যাটি হলো, যাকে পূবাকপা ক. CM-এর বুনিয়াদী লাইন বলে ও CM-শিক্ষার এক মূল্যবান স্ড়ম্ভ মনে করে তা বিশ্বব্যাপী– এবং ভারতেও– মাওবাদীদের দ্বারা ভিন্নভাবে মূল্যায়িত। অথচ CM-শিক্ষাকে মতাদর্শ বা মতাদর্শের কাছাকছি নিয়ে গেছে পূবাকপা– ফলত CM-এর উপরোক্ত ভুল লাইন ও নীতিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করে চলেছে। এভাবে তারা পার্টির মতাদর্শিক লাইনে গুর"তর সমস্যা সৃষ্টি করেছে যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে তাদের অন্য বহুবিধ সমস্যা। MLM যখন মতাদর্শ হয়, তখন CM-শিক্ষাকেও আমরা MLM দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি– যা বিশ্বের সকল মাওবাদী করেছে বা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু CM-শিক্ষা যখন মতাদর্শের মত করে গ্রহণ করা হয়, তখন CM-শিক্ষাই হয়ে পড়ে MLM-এর বিশিষ্ট রূপ– পূবাকপা'র অবস্থান থেকে পূর্ব বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ও সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায়। তখন MLM আমাদের দেখতে হয় CM-শিক্ষার চশমা দিয়ে, CM-শিক্ষার আলোকে, CM-শিক্ষা দ্বারা। পূবাকপা তাদের অসংখ্য দলিলে এভাবেই কথা বলেছে। যারা এখন বলছেন CM-শিক্ষাকে তারা মতাদর্শ বলেন না, তবে CM-শিক্ষা ছাড়া MLM উপলব্ধি করা যায় না, তারাও মূলত একই সারবস্তু তুলে ধরেন ভিন্ন ভাষায়– তবে কিছুটা নি মাত্রায়। এটা আন্ড়র্জাতিক সর্বহারা মতাদর্শ হিসেবে খোদ MLM-এর আঁকড়ে ধরাকেই দুর্বল করে দেয়। আর এই 'শিক্ষা'য় যেহেতু গুর"ত্বপূর্ণ কিছু ভুলও রয়েছে, ফলে MLM-কে ভুলভাবে বোঝা ও দেখার এক সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। পূবাকপা এই মহাবিপদের মধ্যেই অবস্থান করছে– যা থেকে তাদের বিভক্তি মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের অনুশীলনগত গুর"তর সব বিচ্যুতিকে তারা যে ব্যাপকভাবেই MLM-এর আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ ও সংশোধন করতে পারছে না, এমনকি কোন কোন সময় সে রকম কোন আলোচনাতে প্রবেশ পর্যন্ড় করতে পারছে না, ঘুরপাক খাচ্ছে CM-শিক্ষানুযায়ী কে ভুল আর কে সঠিক এমন বিতর্কের এক বৃত্তে– এর মতাদর্শগত উৎস নিহিত রয়েছে এখানেই।

* আরেকটা কথা খুব শোনা যায় পূবাকপা'র ভাষায়– CM-এর কর্তৃত্ব, বা উপমহাদেশের কর্তৃত্ব CM– ইত্যাদি। এটা CM-শিক্ষা গ্রহণের পূবাকপা সংস্করণ থেকেই জাত।

নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে একটা বিতর্ক

রয়েছে বটে, যাতে সকল সচেতন মাওবাদীরই অংশ নেয়া প্রয়োজন। পের"র পার্টি এ প্রশ্নে 'জেফেতুরা'-চেতনা তুলে ধরেছিল– যার সাথে অনেকেই একমত নন। এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা হলো লাইন প্রধান, না ব্যক্তি প্রধান? আমরা মার্কসবাদী হিসেবে মনে করি লাইনই হলো নির্ধারক– যা শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এই গড়ে ওঠায় ও তার সফল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ায় পার্টি নেতৃত্ব দেয়, যাকে নেতৃত্ব দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি– এক সারি নেতা– যার মাঝে একজন থাকেন প্রধান নেতা। যদিও লাইন, মতবাদ প্রায়ই এই প্রধান নেতার নামে পরিচিত হয়, কিন্তু প্রধান নেতাসহ সকলেই এই লাইনের অধীন, কারণ তা একজন ব্যক্তির নয়– বরং জনগণের ও পার্টির সৃষ্টি। তাই, নেতা সর্বদাই পার্টির অধীন। পার্টি-ঊর্ধ্ব বা লাইন-ঊর্ধ্ব কোন নেতৃত্ব বা সেই অর্থে কর্তৃত্ব হতে পারে না। কর্তৃত্ববাদী চেতনা হলো ব্যক্তিতাবাদী– যা GPCR–কালে লিনপন্থা ধারণ করতো– এবং মাওবাদ হিসেবে চালাতো।

মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় প্রশ্ন করার, বিতর্ক করার, অস্বীকার করার ও বিদ্রোহ করার। মার্কসবাদ বিতর্কাতীত কোন আনুগত্য শেখায় না, যদিও শৃংখলা বিপ্লব ও পার্টিতে অতীব প্রয়োজন। মার্কসবাদ তত্ত্ব ও লাইনকে গ্রহণ করতে শেখায় বিপ্লবের জন্য; সেজন্য পার্টি গঠন শেখায়, সে পার্টির গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রীকতা, গণলাইন ও 2LS পরিচালনা শেখায়। বিভিন্ন পার্টির নেতৃত্ব অবদান রাখেন বিভিন্ন মাত্রায় ও গুণে। যে নেতৃত্ব মতবাদের গুণগত বিকাশ ঘটান, অথবা যে নেতৃত্ব একটা দেশের বিপ্লবের সঠিক লাইন নির্মাণ করে সফল বিপ্লবের জন্ম দেন, তার সাথে অন্য নেতৃত্বের নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সকল নেতৃত্বই পার্টির অধীন; যতদিন তিনি পার্টি-নেতৃত্ব ততদিন ব্যক্তি-নেতৃত্ব ও তার কাজ প্রশ্ন/বিতর্ক/বিদ্রোহের সামনে রাখাটাই মার্কসবাদ সম্মত। সকল ধরনের নেতৃত্বকেই থাকতে হবে পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার অধীনস্থ। কর্তৃত্বের নামে পার্টির ঊর্ধ্বে কোন নেতৃত্বকে স্থাপন করা মার্কসবাদী নয়– এটা ধর্মীয় পীরবাদেরই পরিবর্তিত সংস্করণ।

পূবাকপা প্রথমত ভুলভাবে CM-শিক্ষাকে মতাদর্শের মত করে গ্রহণ করেছে; দ্বিতীয়ত কর্তৃত্বের সংজ্ঞাকে যাচ্ছে-তাই ব্যক্তিতাবাদী ধরনে গ্রহণ করেছে। কর্তৃত্বকে তারা বানিয়েছে 'নিরীশ্বরবাদীদের ইশ্বর'।[৯] এটা মার্কসবাদ নয়। MLM এইসব চেতনা থেকে মুক্ত গতিশীল জীবন্ড় বিজ্ঞান বলেই তা আমাদের মতাদর্শ। যদিও পূবাকপা CM-কে কর্তৃত্ব মানেন, চৌধুরীকে নয়– কিন্তু তাদের পার্টি-বিভক্তির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কীভাবে তাদের পার্টিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার অনুশীলন করা ও 2LS-কে বিকশিত করার পথে চৌধুরীর 'কর্তৃত্ববাদী' পরিচালনা বাধা হিসেবে সামনে এসেছিল। এটা নিঃসন্দেহে 'কর্তৃত্ব' সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা ও চেতনার সাথে জড়িত। যা GPCR-কালে লিনপন্থার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে– মাওবাদের নামে। এটা রূপের দিক থেকে ভিন্ন দেখালেও সারবস্তুতে আমলাতান্ত্রিকতার বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্যেরই ভিন্ন ধারা– যা ক্ষুদেবুর্জোয়া দেশে 'পীরবাদে' রূপ পায়। যা থেকে আমাদের পার্টিও মুক্ত ছিল না।

* সুতরাং, আমরা দেখছি পূবাকপা'র মূলগত সমস্যা তাদের মতবাদিক ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে। সরাসরি বলা হোক (চৌধুরী) বা অন্যভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হোক (মানস

রায়), CM-শিক্ষা ছিল ও রয়েছে তাদের মতাদর্শ হিসেবে। কিন্তু তাদের প্রয়োজন মতাদর্শ হিসেবে MLM-কে গ্রহণ করা, অন্য কিছুকে নয়; এবং আর বাকি সবকিছুকে, সর্বাগ্রে CM-লাইনকে তার আওতায় বিচার-বিশ্লেষণ করা। যে কাজ খোদ ভারতের বিপ্লবীরা অনেক আগেই করেছেন, যে কাজ নেপালের মহান গণযুদ্ধের নেতা CPN (Maoist) করেছে চমৎকার দ্বান্দ্বিকতার সাথে– সে কাজ নিজেরা শুর" করা এবং শুর" করার আগে ও পাশাপাশি এইসব বিপ্লবীদের মূল্যায়নকে জানা/বোঝার চেষ্টা করা। মতবাদিক সমস্যার সমাধান না করে এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়।

* মতবাদিক প্রশ্নে প্রথমেই আসে মাওবাদের বিষয়। পূবাকপা মাওবাদকে গ্রহণ করেছে। তারা মাওবাদী, কিন্তু ৬০/৭০-দশকের মাওচিন্ড়াধারার স্ড়রে/লেবেলেই মাওবাদকে উপলব্ধি করলে আজকের বিশ্বের অগ্রসর সর্বহারা চেতনায় পৌঁছানো যাবে না। পূবাকপা যখন মাওচিন্ড়াধারার বদলে মাওবাদ গ্রহণ করে তখন তারা বলেছিল তারা শুধু সূত্রায়নটা বদলাচ্ছে। কিছুটা এ ধরনের ভুল আমাদের পার্টিও প্রথমে করেছিল। কিন্তু আন্ড়র্জাতিক পরিসরে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর সাথে– বিশেষত RIM-এর সদস্য হিসেবে তার অগ্রসর চেতনাগুলোর সাথে আলোচনা-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে, যদিও মাওচিন্ড়াধারা গ্রহণের মধ্য দিয়েই ৬০/৭০-দশকে মতাদর্শের তৃতীয় স্ড়রকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু খোদ মাওচিন্ড়াধারা সূত্রায়ন নিজেই মতাদর্শের তৃতীয় স্ড়র সম্পর্কিত উপলব্ধির নিচু লেবেলে থেকে গিয়েছিল। কমরেড গনজালোর নেতৃত্বে পের"র পার্টি এক্ষেত্রে ICM-এ নির্ধারক অবদান রাখে (যদিও পের"র পার্টির এ সংক্রান্ড় উপলব্ধির কিছু কিছু প্রশ্নে ICM-এ বিতর্ক রয়েছে)। ৯৩-সালে RIM এই অগ্রসর চেতনার ভিত্তিতে মাওবাদ গ্রহণ করে, এবং RIM-এর নেতৃত্বেই বিশ্বব্যাপী এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠেছে। RIM-বহির্ভূত আরো কিছু পার্টি (যেমন, পূবাকপা) পরে মাওবাদকে গ্রহণ করলেও উচ্চতর লেবেল থেকে মতাদর্শের এই বিকাশকে ধারণ করতে অনেকেই সক্ষম হয়নি। এই উপলব্ধি পূবাকপা'র জন্য বিশেষভাবে গুর"ত্বপূর্ণ এজন্য যে, মতাদর্শের ক্ষেত্রে ৬০/৭০-দশকের চেতনা এখন আর অগ্রসরতাকে প্রতিনিধিত্ব করে না। CM-শিক্ষাকে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ/ধারণের মাধ্যমে পূবাকপা MLM-উপলব্ধির ক্ষেত্রেও ৬০/৭০-দশকেই (বলা ভাল '৭২-পূর্বকালে) পড়ে রয়েছে। ক. CM সেই সময়ে মাওবাদী বিশ্ব আন্দোলনের একেবারে সূচনায়– তার অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে মাওচিন্ড়াধারাকে ধারণ করেছিলেন এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য হলো শুধু CM-ই নন, সমগ্র বিশ্ব আন্দোলনেই মাওবাদের উপলব্ধি তখনও ছিল দুর্বল ও নিচু স্ড়রের। বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ হলো, ক. CM-এর মৃত্যুর পর আরও ৪ বছর মাও জীবিত ছিলেন এবং বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর চলমান বিপ্লবের– GPCR-এর প্রায় অর্ধেক সময়কালের লাইন/নীতি ও সংগ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়ে এই মতাদর্শে আরো বিকাশ ঘটান। CM-শিক্ষাকে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ/ধারণের মাধ্যমে তারা এ বিকাশকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন যার একটা গুর"ত্বপূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখি তাদের মাঝে লিন-পন্থার প্রভাবের মধ্যে।

* বস্তুত লিনবিরোধী সংগ্রাম বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার একেবারে সূচনাতেই CM শহীদ হন। লিনবিরোধী সংগ্রামের প্রাথমিক সারসংকলন হয় ১০ম কংগ্রেসে– CM-মৃত্যুর পরে। ফলে ক. CM-এর জন্য লিন ও তেং বিরোধী সংগ্রামের শিক্ষাগুলো ও মাও-লাইনের পরবর্তী বিকাশগুলো আত্মস্থ করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু CM-শিক্ষাকে মতাদর্শ করার মধ্য দিয়ে এই 'CM-পন্থী'রা উপরোক্ত শিক্ষাকে আত্মস্থ করায় গুরুত্বভাবে পিছিয়ে থেকেছে। GPCR-কে তারা ধারণ করেছে অর্ধেক– তার প্রাথমিক স্তরে, পরিণত শেষার্ধে নয়।

তারা মতাদর্শের ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে পড়েছে মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী আন্তরিক মাওবাদী বিপ্লবীদের মধ্যকার পর্যালোচনা-বিতর্ক-2LS, এবং এর মধ্য দিয়ে MLM-উপলব্ধির বিকাশ থেকে প্রায় স্বেচ্ছায় ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্য দিয়ে; এমনকি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে অগ্রসর চেতনা, লাইন, সংগ্রাম ও সংগঠনকে বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে (যেমন– RIM-বিরোধিতা)। এ সময়কালে কিছু মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছেন বটে (যেমন– তেং, হোক্সা, তিনবিশ্ব তত্ত্ব– এসবকে বিরোধিতা)। কিন্তু আন্তর্জাতিক এই সর্বব্যাপী বিতর্কে ভাল কোন সক্রিয় ভূমিকা তারা রাখেননি। আর যেটুকুও-বা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন তাতে তাদের সমগ্র পার্টিকে তারা খুব কম পরিমাণেই সমাবেশিত করতে পেরেছেন – যার উৎস নিহিত এই সব লাইন-সংগ্রামের ব্যাপকতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে না পারায়। (এখন দেখুন, পার্টি-বিভক্তির পর ক. চৌধুরী অভিযোগ করেছেন যে, RF-গ্রুপের অন্যতম নেতা মানস রায় নাকি তেং-পন্থী– অথচ এই কথিত 'তেং-পন্থী' কিন্তু আজীবন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীনেই পার্টির অতিক্ষুদ্র এক সিসি-তে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বহাল ছিলেন। আর মানস রায় বলেছেন যে, তেংপন্থাকে সমর্থন করাটা ছিল খুব সাময়িক, কিন্তু কবে কীভাবে তিনি তা বর্জন করেছিলেন তার কোন রেকর্ড পার্টি-সিসি-তে নেই)।

ফলে তাদের মাঝে লিনপন্থার প্রভাব কম/বেশি থেকে গিয়েছিল– কারণ, এটা সর্বজনবিদিত যে, '৭১-সাল পর্যন্ত লিন-কে মাও-এর উত্তরসূরী বলা হতো, এবং তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হতো– যা ক. CM-ও করেছিলেন– যা থেকে তিনি বেরুবার সময় পাননি। কিন্তু পূবাকপা সে সময় বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু CM-শিক্ষাকে মতাদর্শ করে ফেলায় লিন-প্রশ্নে তাদের স্বচ্ছতা গড়ে ওঠেনি। এর কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। যেমন, '৭৫-পরবর্তীকালে কারাগারে CM-শিক্ষার প্রশ্নে টিপু-মতিনদের ডান বিলোপবাদকে সংগ্রাম করার সময় লিনপন্থী মধুবাবু ও মাওপন্থী চৌধুরীর মাঝে লাইনগত ঐক্য বজায় ছিল। এটা ততদিন পর্যন্ত বজায় ছিল যখন কিনা বাইরের কমিটি সুস্পষ্টভাবে জানায় যে, লিনপন্থার সাথে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে না। এই পার্টিতে এক সময়ে লিন-পন্থী লাইনটি কেন্দ্রেও এসেছিল।

আমরা পরে দেখাবো যে, বিশ্ব বিপ্লবকে গ্রাম-শহর বিভাজন করার লিন-লাইনকে তারা এখনো সমর্থন করছেন– দাবি করছেন, এটা মাওবাদী লাইন– যেমন কিনা

তেংপন্থীরা দাবি করে তিন বিশ্ব তত্ত্ব[১০] মাও-এর লাইন।

অনুরূপ 'যুগ'-এর প্রশ্নেও তারা লিন-লাইনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এটা সত্য যে, ৯ম কংগ্রেস রিপোর্ট মূলত মাও-লাইনকে তুলে ধরেছিল– যদিও তা লিনপিয়াও উত্থাপন করেছিল। তেমনি ১০ম কংগ্রেসের রিপোর্টের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য– যা চৌ-এন-লাই তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু ৯ম রিপোর্টে যুগ-প্রশ্নে উত্থাপিত বক্তব্য[১১]– মাও চিন্তাধারা নতুন যুগের ML, এটা ১০ম কংগ্রেসে বর্জিত হলেও সে সেময়ে বিশ্বব্যাপী মাওবাদীরা এ প্রশ্নে তেমন একটা স্বচ্ছতায় পৌঁছতে পারেননি। পূবাকপাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী মাওবাদীদের মাঝে এটা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এ প্রশ্নে ক. এ্যাভাকিয়ানের নেতৃত্বে RCP গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান রাখে– আরো অন্য বিষয়সহ (যেমন, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ফ্যাসিবাদ বিরোধী ফ্রন্টের সাধারণ লাইনের প্রশ্ন)। পরবর্তীতে প্রধানত RIM-এর নেতৃত্বে প্রায় সর্বত্রই 'যুগ' সম্পর্কে ১০ম কংগ্রেসের মূল্যায়ন[১২] গৃহীত হয়।

পূবাকপা ঠিক ৯ম কংগ্রেসের ভাষায় এখন কথা বলছে না বটে, কিন্তু ঐ সূত্রায়নের রেশ, প্রভাব ও ছাপ তাদের বক্তব্যে এখনো দেখা যায় যা '৯৬-এর গুরুত্বপূর্ণ দলিলেও উত্থাপিত হয়েছে। এখানে মাওবাদকে নতুন যুগের এম-এল-এর মতো করেই উত্থাপন করা হয়েছে। এই কিঞ্চিত সরে আসার বিষয়েও-কি পূবাকপা-তে বিগত ২৫ বছরে পার্টিব্যাপী কোন ব্যাপক আলোচনা-বিতর্ক হয়েছে?

পূবাকপা যখন CM-শিক্ষাকে সম্পূর্ণ গোঁড়ামিবাদী ঢং-এ তুলে ধরে তখন এসব প্রশ্নে পার্টিব্যাপী বিতর্কের গণলাইন প্রয়োগ ও নীতিসম্মত সিদ্ধান্ত থাকা তাদের পক্ষে কঠিন– কারণ খোদ CM– ৯ম রিপোর্ট ও লিন-এর "গণযুদ্ধের বিজয় দীর্ঘজীবী হোক" পুস্তকের সূত্র ধরে এমন বহু বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত তার জীবদ্দশায় টেনেছিলেন। পুনরায় বলা উচিত, মাওবাদ প্রসারের সেই প্রাথমিককালে এ সীমাবদ্ধতা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ তিন দশক পর বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের বিপুল তত্ত্বগত স্বচ্ছতা ও অগ্রগতির সময়ে পূবাকপা'র এমন গোঁজামিল কি অনিবার্য সীমাবদ্ধতা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব সম্পর্কিত বিতর্কের বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। লিনপন্থার একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিতাবাদ– যা পার্টিতে এক ধরনের পীরবাদ চালু করতে চাইছিল, যাকে মাও নিজে তীব্র সংগ্রাম করেন। পূবাকপা'র কর্তৃত্ব সম্পর্কিত ধারণাও লিনপন্থার সাথে জড়িত– যা মাওবাদ নয়।

মাও-মৃত্যুর পর বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের তত্ত্বগত ও বাস্তব সংগ্রাম ও তার

*এর সাথে তুলনা করুন ক. এ্যাভাকিয়নের নেতৃত্বে RCP কর্তৃক তাদের দেশের সশস্ত্র আন্দোলনগুলোর পর্যালোচনা, বিশেষতঃ ৬০-দশকে ব্ল্যাক প্যান্থার আন্দোলনের সুগভীর সারসংকলনকে। অথচ এই পার্টিকে পূবাকপা সশস্ত্র সংগ্রাম করে না বলে তত্ত্বের কচকচিওয়ালা পার্টি বলে থাকে ও নিজেদেরকে অগ্রসর সশস্ত্র সংগ্রামী দাবি করে। পূবাকপা'র প্রয়োগবাদ বোঝার জন্য এ উদাহরণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বিকাশের মধ্য দিয়ে– বিশেষত পের"র গণযুদ্ধ, রিম গঠন ও তার লাইনগত সংগ্রাম ও বিকাশ, রিম-এর আরো কিছু পার্টি বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাওবাদী পার্টি– আরসিপি, ইউএসএ-এর গুর"ত্বপূর্ণ তত্ত্বগত কাজ এবং নেপাল গণযুদ্ধ– এইসব যুগান্ড়কারী সংগ্রাম ও ঘটনার মধ্য দিয়ে মা-লে-মা'র উপলব্ধি নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। মতাদর্শের এই উপলব্ধি আত্মস্থ করার সাথে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের সফল নেতৃত্ব দেয়া, ও তার পূর্বশর্তরূপে একটি সামগ্রিক সঠিক লাইন নির্মাণ করাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের পার্টি এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তাই, পূবাকপা-কে মতাদর্শের ক্ষেত্রে সিএম-শিক্ষার প্রশ্নটার পাশাপাশি মা-লে-মা-প্রশ্নে উচ্চতর স্বচ্ছতায় পৌঁছতে হবে। এজন্য সাহসী সংগ্রাম চালাতে হবে। বিশ্ব আন্দোলন থেকে বিনয়ী শিক্ষা নিতে হবে। যে ক্ষেত্রে আমরাও পথযাত্রী। তাহলেই বাকি অন্য সমস্ড় সমস্যার সঠিক সমাধানের পথে তারা এগুতে সক্ষম হবে।

২। গণযুদ্ধ

মতবাদিক প্রশ্নের পরে পূবাকপা'র প্রধানতম সমস্যা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সামরিক প্রশ্নে, তথা গণযুদ্ধের প্রশ্নে, যা কিনা মতবাদিক প্রশ্নের সাথে, তথা MLM-উপলব্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও তারই অংশ এক মৌলিক বিষয় হয়ে উঠেছে।

CM-শিক্ষানুসারী দাবিদার পূবাকপা খতম-লাইনকে তাদের বনিয়াদী, মৌলিক ও রণনৈতিক লাইন মনে করে। MLM–কে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণের পর আমাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়ে MLM-থেকে সামরিক লাইনকে বিচার করা। এবং বিশ্বের অতীত ও বিশেষত চলমান মা-লে-মা-বাদী গণযুদ্ধগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশের জন্য উপযুক্ত একটা সর্বাঙ্গীণ সামরিক লাইন গড়ে তোলা। কিন্তু পূবাকপা সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সামরিক লাইনে-তো বটেই, বস্তুত প্রায় সবকিছুই বিচার করেছে CM-শিক্ষা থেকে, আরো সংকীর্ণ অর্থে খতম-লাইন থেকে। এটা তাদেরকে বাধ্য করেছে তাদের সামরিক লাইনকে MLM-এর ভিত্তিতে বিচার, মূল্যায়ন, সারসংকলন ও বিকাশ **না** করতে এবং বিশ্বের অগ্রসরমান গণযুদ্ধগুলো থেকে শিক্ষা **না** নিতে।

* মার্কসবাদী সামরিক বিজ্ঞানে মাও-এর অমূল্য অবদান হলো গণযুদ্ধের তত্ত্ব। এটা মাওবাদের এক অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং, এটা হলো পার্টির মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের অংশ।

গণযুদ্ধ সার্বজনীন– যা বিশ্বের সর্বত্র প্রযোজ্য। MLM-এর গভীরতর উপলব্ধির ভিত্তিতে আজ সারা বিশ্বের অগ্রসর মাওবাদীরা এ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন– যা ৬০/৭০-দশকে মাওবাদীদের মাঝে এমনভাবে স্পষ্ট ছিল না। এ উপলব্ধি গভীর করার ক্ষেত্রে পের"র কমিউনিস্ট পার্টি ও পরে RIM গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। পূবাকপা গণযুদ্ধ সম্পর্কে এই অগ্রসর উপলব্ধি গ্রহণ করেছে এমন কোন প্রকাশ আমরা তাদের কোন দলিল বা অনুশীলনে দেখি না। বরং CM-শিক্ষায় আটকে থাকার মধ্য দিয়ে তারা ৬০/৭০ দশকের চেতনাকেই শুধু গ্রহণ করার কথা বলে। এমনকি CM-এর মৃত্যুর পর

৭০ দশকেই ক.SS-এর নেতৃত্বে আমাদের দেশের নতুনতর সামরিক অভিজ্ঞতাগুলোকেও কখনো তারা পর্যালোচনা করেনি।* আর বাস্ড়বে আমরা দেখবো যে, ৬০/৭০ দশকের অনেক ভুল ও দুর্বলতাগুলোকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে বাস্ড়বে তারা সে সময়কার বিপ্লবী অগ্রসরতা থেকেও অনেক সরে গেছে ও যাচ্ছে।

গণযুদ্ধকে যখন বিশ্বজনীন হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তার কতগুলো মৌলিক নীতিকেও বিশ্বজনীনভাবে আমরা স্বীকৃতি দেই। এর মাঝে কিছু গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় হলো– রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু করা, ঘাঁটিকে গণযুদ্ধের সারবস্তু হিসেবে গ্রহণ করা, অস্ত্র নয় জনগণকে নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করা, ৩য় বিশ্বের দেশগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধকে রণনীতি হিসেবে গ্রহণ করা ও গেরিলা যুদ্ধের রণনৈতিক গুর"ত্বকে স্বীকৃতি দেয়া– ইত্যাদি। ক. CM মতাদর্শগত-রাজনৈতিকভাবে এ বিষয়গুলোকে খুবই জোরালোভাবে উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই তত্ত্ব ও রাজনীতিকে সামরিক লাইনের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগে তিনি বিভিন্ন ভুলও করেছিলেন যার মাঝে অন্যতম ছিল খতম-লাইন। এ লাইনটি পূবাকপা'র অস্ড়িত্ব, সমগ্র লাইন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে এতবেশি নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে যে, এর আলাচনা ব্যতিরেকে আমরা পূবাকপা'র লাইন-সমস্যাকে ভালভাবে বুঝতে পারবো না।

৬০/৭০ দশকে ভারত ও বাংলাদেশে [আংশিকভাবে নেপালেও– "ঝাপা" আন্দোলন] খতম-লাইন এক প্রচ" বিপ্লবী রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাকে নিয়ে এসেছিল, যা এসব দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুদীর্ঘ দিনের গেড়ে বসা সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদ-সংসদীয়বাদ, তথা বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদের সাথে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটানোর এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক এই বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও সামরিক ক্ষেত্রে এর যে দুর্বলতা ও ত্র"টি ছিল তা ৬০/৭০ দশকের সংগ্রামের বিপর্যয়ের পর দ্র"তই অনুভূত হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্যা সমাধানের উত্তর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নভাবে দেয়। ডান ও সংশোধনবাদী লাইন এ সংগ্রামকে ব্যক্তি-সন্ত্রাসবাদ বলে নিন্দা জানায়। আর বাম সংকীর্ণতাবাদীরা এ সমস্যা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে একেই চালিয়ে যেতে চায়– যা আমাদের পূবাকপা 'খতম-অভিযান চলছে, চলবে' স্লোগানের মধ্য দিয়ে অব্যাহত রাখতে চায়। আমাদের পার্টিও আংশিকভাবে তাকে বহন করে– যদিও ৮০-দশক হতে আমরা আমাদের সমগ্র চেতনা ও কাজের সারসংকলনের পথেও এগিয়ে চলি। কিন্তু ৯০-দশকের আগ পর্যন্ড় আমরাও এ পুরনো লাইনের সাথে Rupture করতে পারিনি। কিন্তু ভারতসহ বিশ্বের মাওবাদী বিপ্লবীরা ৭০-দশকেই এর দ্বান্দ্বিক সারসংকলন করে– যদিও ভারতে, আমাদের মতে, এক্ষেত্রে কিছু ডান ঝোঁক গড়ে ওঠে, তাসত্ত্বেও– এ সারসংকলনই তাদেরকে নতুন পর্যায়ে এগিয়ে দেয়, যার ফসল হলো আজকের PW ও MCC নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী গণযুদ্ধ।

খতম-লাইনটা কী ? এ লাইন (i) গণশত্র" (শ্রেণি/জাতীয় শত্র") খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ সূচনার একটি সাধারণ লাইন তুলে ধরে, এবং (ii) খতমকে একটা পর্যায়/স্ড়র পর্যন্ড় সংগ্রামের মূলরূপ হিসেবে চালিয়ে যেতে চায়। এভাবে খতম-লাইন

একটা রণনৈতিক গুরুত্বের স্তরে উপনীত হয়।

এ লাইনে CM-নেতৃত্বে ভারতের পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সামরিকীকরণ ঘটলেও, সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের এক বিরাট ব্যাপ্তি ঘটলেও, ব্যাপক কৃষক-জনগণ ও বিপ্লবী তরুণ-বুদ্ধিজীবীদের এক বড় উত্থান ঘটাতে তা সাহায্য করলেও এ সংগ্রাম কিছুদূর এগিয়ে রাষ্ট্রের দমনের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

এর সাথে বাহিনী গড়ার দুর্বলতাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। এলাকা-ভিত্তিক ক্ষমতা দখলের সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন সত্ত্বেও রণনৈতিক অঞ্চলকে আঁকড়ে ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পিত বিকাশের বদলে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ক্ষেত্রে এ লাইন গুরুতর ভূমিকা রাখে।

ফলে এই সামরিক লাইনের গুরুতর সারসংকলনের কাজকে পরবর্তীকালে মাওবাদী বিপ্লবীরা হাতে নেন– ভারতে এবং বিশ্বব্যাপী।

৬০/৭০ দশকের বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী উত্থানের পর ৮০-দশকে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর ও শক্তিশালী বিপ্লবী সংগ্রাম হিসেবে আবির্ভূত হয় পেরুর গণযুদ্ধ। ৯০-দশকে সূচিত নেপাল গণযুদ্ধ আরো এগিয়ে গেছে। তাই, এইসব মহান ও বিজয়ী গণযুদ্ধগুলো থেকে শিক্ষা না নিয়ে, এসবের সাথে খোদ ভারতের গণযুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলোকে পর্যালোচনা না করে ৬০/৭০ দশকেই পড়ে থাকলে তার গৌরবময় পুনরাবৃত্তি-তো সম্ভবই নয়, বরং এক মর্মান্তিক পরাজিত অভিজ্ঞতা, বিকৃত সংগ্রাম ও তা থেকে উদ্ভূত বিবিধ ধরনের অধপতনকেই জন্ম দেয়া হয়– যা কিনা পূবাকপা'র ইতিহাসে দেখা গেছে ও দেখা যচ্ছে। সেগুলো নির্দিষ্টভাবে পর্যালোচনার আগে খতম-লাইনকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সাথে আমরা কিছুটা মিলিয়ে দেখতে চাই।

* যুদ্ধ মানেই হলো রক্তপাতময় সংগ্রাম, আর মাও-এর ভাষায়, ন্যায় যুদ্ধ দিয়েই অন্যায় যুদ্ধকে বিরোধিতা করা যায়। সুতরাং শত্রু-হত্যা বা খতম ছাড়া কোন যুদ্ধ হতে পারে না– হোক তা অন্যায় যুদ্ধ বা ন্যায় যুদ্ধ। তাই প্রশ্নটা আদৌ শত্রু-হত্যায় নয়– যা কিনা ডান সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়া বিরুদ্ধবাদীরা খতম-লাইনের বিপক্ষে সর্বপ্রথম ও প্রধানভাবে প্রচার করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো খতমকে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রাজনীতিকে বিরোধিতা করা।

প্রশ্নটা হলো যুদ্ধের নির্দিষ্ট লাইনটা নিয়ে– তা এক সফল গণযুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুকে আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণের প্রক্রিয়ায় পরাজিত করতে সক্ষম কিনা, জনগণের বাহিনীকে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম কিনা– পরিমাণে ও গুণে– এবং প্রথমে অনুকূল জায়গায় ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা ও পরে দেশব্যাপী ক্ষমতা দখলের পথে এগিয়ে চলতে সক্ষম কিনা। এমন মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি লাইনটা ধারণ করে কিনা।

পেরুর গণযুদ্ধ ৮০'র দশকে এই সফলতাগুলো অর্জন করেছিল ও তার লক্ষ্যে এগুতে পেরেছিল। মাও-মৃত্যুর পর, ও ৬০/৭০ দশকের বিপ্লবের পরাজয়ের পর এটাই ছিল সবচেয়ে সফল সংগ্রাম। এ সংগ্রাম থেকে বিশ্বের মাওবাদীরা শিক্ষা না নিয়ে এগোতে পারেনা। পূবাকপা এমন কোন শিক্ষা-কি নিয়েছে ? গোটা ৮০'র দশক জুড়ে পূবাকপা

পেরুর এই মহান বিজয়ী গণযুদ্ধের পক্ষে পার্টিতে ও জনগণের মাঝে কতটা আলোচনা করেছে? তারা এটা করেনি– অনেক পরে হঠাৎ করেই পেরুর গণযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু ইতিবাচক কথা বলা ছাড়া। বরং তারা তাদের মত করে CM-শিক্ষাতেই আটকে থেকেছে, তাদের মত করে খতম লাইনকে চালিয়ে গেছে এবং পৃথিবী জুড়ে না হলেও ভারতে খোঁ-াজাখুঁজি করেছে তাদের সমমনা কোন মাওবাদী পাওয়া যায় কিনা– যাতে তারা স্বভাবতই ব্যর্থ হয়েছে।

পেরুর পার্টি বলতো গণযুদ্ধের চারটি রূপ– যার মাঝে একটা হলো বাছাই খতম। দেখুন তারা খতমকে গ্রহণ করলেও "খতম অভিযান", "একমাত্র খতমই ... ..." এ সবও বলছে না। নেপাল গণযুদ্ধেও ঠিক এভাবে গ্রহণ করা হয়েছে খতম-কে। অথচ খতম-লাইনে পূবাকপা খতমকে স্থূল সাধারণীকরণ করেছে যা বিশ্বের সফল গণযুদ্ধগুলোর অভিজ্ঞতার সাথে আদৌ মেলে না।

* খতম-লাইন সূচনায় খতমকেই একমাত্র এ্যাকশন হিসেবে সামনে আনে। কিন্তু পেরুর গণযুদ্ধে আমরা দেখি সূচনা হয়েছিল ভোট কেন্দ্রে বোমা-হামলার মধ্য দিয়ে, যাকে তারা গণযুদ্ধের আরেকটি রূপ বলে– ধ্বংসাত্মক এ্যাকশন (Sabotage)– যা খতমের থেকে পৃথক। অন্যদিকে যে রণনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে নেপাল-গণযুদ্ধের সূচনা করা হয়েছিল তাতে খতম-এ্যাকশন ছিলই না। আমরা দেখছি যে, বিগত ৩০ বছরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দুটো গণযুদ্ধ খতম দিয়ে সূচিত হয়নি, খতমকে একটা স্তর করা হয়নি– যদিও গণযুদ্ধে এ্যাকশনের একটা রূপ হিসেবে বাছাই খতমকে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে পেরু-নেপালের গণযুদ্ধ-কি কম বিকশিত হয়েছে? তারা কি এ কারণেই সংশোধনবাদী হয়ে গেছে?

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, নেপাল পার্টি ক. CM-কে দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগণ্য মাওবাদী বিপ্লবী নেতা হিসেবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে অবশ্যই। কিন্তু তারাও CM-এর সারসংকলন করেই এগিয়েছে; এবং বিশ্বের অগ্রসর মাওবাদী লাইন– যাকে RIM প্রতিনি-ধিত্ব করে– তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এই মহান গণযুদ্ধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

তাই, আমরা দেখি যে, না বিশ্বের কোন সফল গণযুদ্ধে, না উপমহাদেশের কোন দেশে খতম-লাইনকে একটি সাধারণ সামরিক লাইন হিসেবে বা রণনৈতিক লাইন হিসেবে অগ্রসর মাওবাদীরা কেউ বহন করছে। আমাদের পূবাকপা-ই শুধু এর ব্যতিক্রম।

* তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, অন্য কেউ গ্রহণ করলো না বলেই কি আমরা একটা সত্যকে গ্রহণ করবো না? মার্কসবাদীরা কখনো তা মনে করেন না। মার্কস-এঙ্গেলস দু'জন মাত্র ছিলেন। কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ তুলে ধরেছিলেন। তাই, দেখতে হবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটা মত সঠিক কিনা, তাকে কতজন সমর্থন করলো– তা গণনা করা নয়। এর একটা উপায় হলো অনুশীলনের পরীক্ষা। তার দৃষ্টান্ত আমরা উপরে দিয়েছি– খতম-লাইন কী ফল দিয়েছে, আর পেরু-নেপালের [এমনকি আংশিকভাবে CM-পরবর্তী ভারতেরও] সামরিক লাইন কী ফল দিয়েছে ও দিচ্ছে। পূবাকপা'র নিজস্ব অভিজ্ঞতা আরো শোচনীয়ভাবেই কি এটা দেখাচ্ছে

না ?

দ্বিতীয়ত, লাইনগতভাবে আলোচনা করলে এর ফল কীভাবে বোঝা সম্ভব?

আমরা প্রথমেই বলেছি যে, গণযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য বা কর্মসূচি হলো জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতাদখল। এর অর্থ হলো, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করা; রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান শত্রুর সশস্ত্র বাহিনীকে গণযুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত ও ধ্বংস করার মাধ্যমেই যা সম্ভব। এ সত্য বিশ্বজনীন, এবং তা মাওবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং গণযুদ্ধের কেন্দ্রীয় কর্তব্য দাঁড়ায় রাষ্ট্র/শত্রু বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করা। এই কর্তব্য গণযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ড় বিরাজ করে। যদিও ধাপে ধাপে, স্ড়রে স্ড়রে এই কর্তব্য সাধিত হয়– কিন্তু সূচনা থেকেই এই কর্তব্যকে হাতে না নিলে, তাকে কেন্দ্রে না রাখলে শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্র তার বাহিনীকে আমাদের আক্রমণের থেকে বাইরে রাখার সুযোগ পাবে। ফলে আমরা গণযুদ্ধ বিকাশের মৌলিক জায়গাতেই দুর্বল থেকে যাবো– শত্রুর প্রাণভোমরা বা শক্তি-উৎসে আঘাত পড়বে না, তার অস্ত্র আমরা দখলে পাবো না, তাতে সজ্জিত হয়ে আমাদের বাহিনীকে বাড়াতে (পরিমাণে ও গুণে) পারবো না, শত্রুর মনে প্রকৃত ভয় ঢুকাতে পারবো না, তার পরিকল্পনাকে ছিন্নভিন্ন করতে পারবো না। এমন হলে কোন যুদ্ধেই কেউ জিততে পারে না। খতম-লাইন যুদ্ধের সূচনায় ও একটা স্ড়র পর্যন্ড় এভাবেই আমাদেরকে দুর্বল করে দিতে বাধ্য। ফলে এ লাইন গণযুদ্ধকে সফলতার পথে এগিয়ে নেয়া দূরের কথা, তাকে ভালভাবে গড়ে তুলতেই পারে না। যদিও পার্টি ও জনগণকে এটা কিছু পরিমাণে সশস্ত্র করে, সামরিকীকরণ ঘটায়, বিশেষত গ্রাম্য স্থানীয় শত্রুদের মনে সাময়িকভাবে ভয় ঢুকায়– ইত্যাদি।

ক. CM খতমকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমণে উন্নীত করার কথা গুরুত্ব দিয়েই বলেছেন। নতুবা তা অর্থনীতিবাদ আনবে এটাও বলেছেন। পূবাকপা-ও CM-এর এইসব শিক্ষাকে তুলে ধরার কথা বলে। কিন্তু ক. CM, পুনরায়, এ প্রশ্নটিকে রাজনৈতিকভাবে যতটা address করেছেন সঠিকভাবে, এর সামরিক দিকটা ততটা করেননি। যুদ্ধটা অবশ্যই রাজনীতি, কিন্তু বিশেষ ধরনের রাজনীতি। সেই বিশেষত্বের আলোচনা না করলে যুদ্ধের লাইন গড়ে উঠতে পারে না।

সমগ্র পার্টি ও জনগণ, এবং তাদের সংগ্রামের চেতনা ও পরিকল্পনা যখন সূচনায় খতম লাইনের ভিত্তিতে সজ্জিত হতে থাকে, তখন একটা পর্যায় পর আক্রমণকে রাষ্ট্র-বাহিনীর উপর উন্নীত করাটা শুধু বাস্ড়ব-সংগ্রামের ক্ষেত্রে-ই যে কঠিন হয়ে পড়ে তা নয়, বরং এ ক্ষেত্রে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধকতাও ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে যায়। খতম-লাইন একটি খতমের পর আরো খতমের জরুরী চাহিদা ও তাড়না সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে প্রতিশোধবাদ– যা বিপ্লবী রাজনীতিকে দুর্বল করতে থাকে। এভাবে খতমের বৃত্তে সংগ্রাম ঘুরপাক খাবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এমনকি রাষ্ট্রের উপর কিছু আক্রমণ ঘটলেও খতম-লাইন তার মতাদর্শগত-রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতিসহ পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকে যা সমগ্র সামরিক কর্মকাণ্ডেও ভূমিকা রাখতে থাকে। বাহিনীর দুর্বলতার পাশাপাশি খতম-লাইনের সাথে জড়িত ক্ষুদে এলাকাবাদ বা সংগ্রামের

স্থানিক চরিত্র, স্বতঃস্ফুর্ততা, এমনকি অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদ শত্রু-বাহিনীর আক্রমণে টেকা ও পাল্টা-আক্রমণের মধ্য দিয়ে বিকশিত হবার সমস্যার সমাধান করতে শেষ পর্যন্ড় ব্যর্থ হয়।

* কিন্তু পূবাকপা'র জন্য সমস্যাটা হয়েছে আরো জটিল ও শোচনীয়। ৬০-৭০-দশকের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে খতম-লাইনের সাথে যুক্ত বিপ্লবী রাজনীতিক চরিত্র পরবর্তীকালে তেমনিভাবে ধরে রাখা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এবং খতম-লাইনের এক বিকৃত চরিত্রকে তারা প্রয়োগ করে চলে– যা আবার খতম-লাইনের ভুল ও সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। পূবাকপা'র চলমান 2LS-এ যদিও পারস্পরিক দোষারোপ, ঘটনা ও ব্যক্তিকেন্দ্রীক সংগ্রাম খুব প্রকটভাবে দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকের বক্তব্য থেকেই একটা বিষয় উঠে আসে– তাহলো, তাদের সকল সংগ্রামে অর্থনীতিবাদের বিকাশ ও কম/বেশি প্রতিক্রিয়াশীল অধপতন। পূবাকপা নিজেদেরকে CM-পন্থী বলে দাবি করে, আর খোদ CM বলেছেন যে, খতমে আটকে থাকলে, রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ উন্নীত না করলে তা অর্থনীতিবাদ নিয়ে আসবে। অথচ এই পূবাকপা '৭৬ থেকে শুরু করে তাদের পার্টি বিভক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ড় সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে– চৌধুরী লাইনে– রাষ্ট্রের উপর কয়টা আক্রমণ করেছে তা খুঁজতে তাদের নিজেদেরকেই কষ্টে পড়তে হবে। এ সুদীর্ঘ সময়ে তারা সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহীতে বড় আকারের সংগ্রাম করেছে বলে দাবি করলেও এই সমস্ড় অঞ্চলে রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ হয়নি বললেই চলে। এ সময়কালে তাদের প্রধান সংগ্রামী রিজিয়ন পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক শ' খতম হয়েছে– কিন্তু রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ হয়েছে ২/১টি মাত্র। এটা যে কী পরিমাণে সংস্কারবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের জন্ম দিতে পারে তা পূবাকপা'র প্রতিটি গ্রুপের দলিলপত্রে এখন প্রকাশিত হচ্ছে। বাস্ড়বে রাষ্ট্রের উপর ১/২ টি আক্রমণ তাদের সংগ্রামকে রাষ্ট্রবিরোধী চরিত্রে উন্নীত করেনি, বরং খতম-অভিযানকে আরো জোরালোভাবে চালানোর জন্য তাদেরকে কিছু অস্ত্র সরবরাহ করেছে মাত্র। ফলে, এসব এ্যাকশন ছিল যতনা রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশি ছিল টেকনিক্যাল। তাদের প্রতিটি অঞ্চলের রিপোর্টেই দেখা যায়– খতমের পর একটা স্থানীক জোয়ার হয়েছে; কিন্তু তারপর স্থানীয় ইউনিটগুলো অধপতিত হচ্ছে– তারা চাঁদাবাজি, অত্যাচার, গণবিরোধিতায় পর্যন্ড় চলে যাচ্ছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে– লাল্টু, তুহিন, সিরাজ– এসব সন্ত্রাসী গ্রুপ। পরিস্থিতি কতটা খারাপ পর্যায়ে গেছে সেটা বোঝা যাবে তপন ও চৌধুরী গ্রুপের বিভক্তির সময়ে পারস্পরিক দোষারোপ থেকে। সর্বশেষ চৌধুরী গ্রুপের দ্বিতীয় নেতা তাপু গ্রেফতার ও নিহত হবার পর এই গ্রুপের দলিল থেকেই দেখা যাচ্ছে তাদের কেন্দ্রীয় নেতা আকাশ বিট্রে করে ধরিয়ে দিয়েছে– যে কিনা ব্যক্তিগত স্বার্থে গাড়ি কিনেছিল এবং ১৮ হাজার টাকায় বাসা ভাড়া করে ঢাকায় নারী ব্যবসা করতো। আর এ সবই কিনা প্রকাশ হচ্ছে তারা সরাসরি বিট্রে করার পর– তার পূর্ব পর্যন্ড় এই সব অধপতিত সন্ত্রাসী প্রতিক্রিয়াশীলরা পার্টির সিসি-সদস্য পর্যন্ড় হতে পেরেছিল, এবং তাদের এইসব স্থূল প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উন্মোচিত হয়নি– যা কিনা একটি ক্ষুদে-

বুর্জোয়া দেশপ্রেমিক পার্টিতেও কল্পনা করা যায় না। যা শুধু শাসকশ্রেণীর সন্ত্রাসী নেতাদেরই বর্তমান চরিত্র।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির কী কারণ ? কারণ হলো, এইসব নেতা, কেডার ও পার্টি-শাখা 'খতম' করতে সক্ষম হচ্ছে, খতমকে 'পুলিশের উপর আক্রমণ'-এ সম্প্রসারিত করতেও কিছু কিছু সক্ষম হচ্ছে পুলিশ খতমের মধ্য দিয়ে; এবং এসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সন্ত্রাসের প্রভাবে ভিন্ন গোষ্ঠীর শত্রুস্থানীয় বা অশত্রু ধনী/সচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে বড় ধরনের অর্থ সংগ্রহ করতে পারছে। পার্টি খতম করছে ও টাকা তুলছে ("চাঁদাবাজি" অর্থে)। পার্টির "কৃষি-বিপ্লবে"র রাজনীতি, "গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা"র রাজনীতি কেউ জানছে না। গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখল তথা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কেউ জানছে না। MLM-মতাদর্শের আলোচনা-তো বহুদূর। একে-কি CM-এর খতম-লাইনের বিপ্লবী রাজনীতি বলে দাবি করা চলে?

তাহলে কীভাবে এই ঘটনাটা ঘটছে যখন কিনা একটি বিপ্লবী রাজনীতির আকাংখা ও সূচনা পরিণত হচ্ছে স্থূল সংস্কারবাদে, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নগ্ন প্রতিক্রিয়াশীলতায়?

এটা বুঝতে হলে কিছুটা পরিমাণে চেয়ে দেখতে হবে পূর্ব বাংলার চলমান বুর্জোয়া রাজনীতি ও চলমান সামাজিক পরিস্থিতির কিছু বৈশিষ্ট্যকে। শাসকশ্রেণী সশস্ত্র মাস্তানবাজি তৈরি ও তার উপর নির্ভর করাকে একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছে। ফলে রাষ্ট্রের বাইরে এক বিস্তৃত ও ব্যাপক মাস্তান-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে– যার পরিণতিতে সারা দেশ জুড়ে– শহরে ও গ্রামে– ছোট ছোট স্থানীয় গ্যাং তৎপরতা, চাঁদাবাজি ও খুন-খারাপী সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। এটা শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট, লালিত ও মদদপ্রাপ্ত ধারা বলে জনগণের মাঝেও এর প্রভাব পড়েছে– যখন তাদের একাংশও একে ব্যবহার করতে চায়– বিশেষত ধনী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে ঘায়েল করার জন্য। গণশত্রুরা জনগণকে শোষণ ও দমনের জন্য এর ব্যবহার ছাড়াও নিজেদের মধ্যকার কামড়াকামড়িতে এর ব্যাপক ব্যবহার করে। রাষ্ট্র সাধারণত অর্থের বিনিময়ে একে রক্ষা ও মদদ দেয়– শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অবস্থায় কিছু কিছু দমন করা ব্যতীত। স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলো জাতীয় রাজনীতিতে বুর্জোয়া কামড়া-কামড়ির সাথে যুক্ত থাকে। এমত পরিস্থিতিতে 'খতম' এদেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনা– এবং প্রায়ই তা প্রতিক্রিয়াশীল। বহু পার্টি ও গ্রুপ এখন গড়ে উঠেছে এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। পূবাকপা-সহ কিছু কিছু মাওবাদী সংগঠন অনেক জায়গায় কম/বেশি মাত্রায় এতে সামিল হচ্ছে। পূবাকপা'র "খতম লাইন" তাদেরকে এ ধরনের তৎপরতার অংশ হতে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষত যেসব গ্রুপ অতিদ্রুত বিকাশের প্রত্যাশী হয়ে মতাদর্শ ও রাজনীতিকে গৌণ করে দিয়ে এ্যাকশনকে প্রাধান্যে নিয়ে আসার লাইন নিয়ে আসছে তাদের মাঝে এমন দ্রুত অধপতন নিচ থেকে উপর পর্যন্ড় চলে যাচ্ছে যার কিছু দৃষ্টান্ড় উপরে দেয়া হয়েছে।

আমরা বলছি না যে, পূবাকপা পার্টিগতভাবে বিপ্লবী রাজনীতি বর্জন করেছে। কিন্তু

তাদের খতম-লাইন ব্যাপকভাবে অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদে চলে গেছে, যা CM-এর প্রকৃত বিপ্লবী রাজনীতি থেকে বহু বহু দূরে। এবং পরিহাসের বিষয় হলো এই যে, ক. CM-এর খতম-লাইনে অবস্থান করে এই অধপতন থেকে পরিত্রাণেরও কোন উপায় তাদের নেই। গণযুদ্ধের এক উচ্চমাত্রার উপলব্ধি ও লাইনে নিজেদেরকে সজ্জিত না করলে বিপর্যয়, নতুবা অধপতন– এই বৃত্ত থেকে কখনই তারা বের হতে পারবে না। আর একই বৃত্তে ঘোরা মানেই হলো সংস্কারবাদে নামতে থাকা, কারণ, বিপ্লব সর্বদা পুরনোর সাথে ও প্রচলিত ধারার সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়– এমনকি আগে তা বিপ্লবী হলেও– এবং নতুন স্ড়রে চেতনা ও সংগ্রামকে উল্লম্ফন ঘটাবার দাবি হাজির করে। এর পূরণ না হলে 'বিপ্লব' আর বিপ্লব থাকে না।

উত্তরাঞ্চলের সাম্প্রতিক সংগ্রামকে দমনের জন্য রাষ্ট্র ও স্থানীয় শত্রুরা মিলে যখন "বাংলাভাই" ষড়যন্ত্র ও উত্থান ঘটালো তখন RF প্রচারিত প্রধানতম প্রচারপত্রে আহ্বান জানানো হয়েছে পাল্টা-খতমের। অর্থাৎ, যখন রাষ্ট্র-বাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগ-সাজসে স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী ব্যাপক হত্যা-নির্যাতনে নেমেছে তখনো তারা আঘাতটা শত্রুর মাথায় না করে লেজে করার আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের এ নীতি সংগ্রামকে কোনক্রমেই উচ্চতর স্ড়রে নিতে পারে না। এই সার্বিক দমন নেমে আসার পূর্বে এই অঞ্চলে তারা বেশ কিছু দুঃসাহসী খতম-এ্যাকশন করে– এমনকি দিনের বেলায় পুলিশ-ক্যাম্পের ১০০ গজের মধ্যেও তারা এ্যাকশন করেছে। অথচ তারা ১০/১৫ জনের পুলিশ ক্যাম্পকে আক্রমণ করেনি এই যুক্তিতে যে, কর্মী-জনগণ প্রস্তুত হয়নি। এটা বিপ্লবী পরিস্থিতিকে বোঝার ব্যর্থতাই শুধু নয়, অর্থনীতিবাদী যুক্তিও বটে। সুতরাং 'বাংলাভাই' উত্থানের পরও তাদের উপরোক্ত আহ্বান তাদের ইতিপূর্বকার বিচ্যুতিরই ধারাবাহিকতা– যার উৎস নিহিত খতম-লাইনের বিকৃত বিকাশের মধ্যেই।

অন্যদিকে বিভক্তির পর চৌধুরী ও জনযুদ্ধ গ্রুপ পশ্চিমাঞ্চলে পুলিশের উপর বেশকিছু বোমা-আক্রমণ করেছে। তারা RF গ্রুপকে অর্থনীতিবাদী বলছে, কারণ, তারা (আর.এফ.) খতমকে রাষ্ট্রের উপর আক্রমণে উন্নীত করছে না। এর অর্থ হলো তারাও খতম-লাইন থেকেই কথা বলছে, তবে এখন খতমকে রাষ্ট্রের উপর আক্রমণে উন্নীত করতে বলছে।

এখনো পর্যন্ড় পশ্চিমাঞ্চলে পুলিশের উপর বোমা-হামলাগুলো হয়েছে প্রধানত শহরে। শহরাঞ্চলে গেরিলা-এ্যাকশন দোষের নয়, বরং ভাল। কিন্তু সংগ্রামের ভারকেন্দ্র যেখানে গ্রামাঞ্চল, সেক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামকে উন্নত স্ড়রে উন্নীত করার কাজ প্রাধান্য না পেলে গ্রামে ঘাঁটি তৈরির রণনীতি থেকেই সরে পড়া হবে। পশ্চিমাঞ্চলে এই দুই গ্রুপের পুলিশ-আক্রমণের ধরনে এ আলামতই দেখা যাচ্ছে– যদিও তারা এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা-দখলের কথা খুবই বলছে।

দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের উপর আক্রমণে সংগ্রামকে উন্নীত করা, আর পুলিশ-হত্যা– দুটো দুই জিনিষ। বাস্ড়বে তারা খতম-লাইনই চালাচ্ছেন! এতদিন শুধুমাত্র স্থানীয় শত্রুদের খতমে তা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এর সাথে যোগ হয়েছে পুলিশ-খতম। রাষ্ট্র-বাহিনীকে

লড়াই-এ পরাজিত করা, তার অস্ত্রে গণবাহিনীকে সশস্ত্র করা ও পরিমাণে ও গুণে বিকশিত করা, বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটির লক্ষ্যে গেরিলা অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবী গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা শুরু করা– এসবের সাথে এমন পুলিশ-খতমের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। খতম-লাইনকে ভিন্নরূপে পুলিশ-খতমে পর্যবসিত করলে রাষ্ট্রের হিংস্র আক্রমণে দ্রুতই ছিন্নভিন্ন হওয়া ব্যতিত আর কোন পরিণতি হতে পারে না– যা পশ্চিমাঞ্চলে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। আর এ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরো নিম্মানের অর্থনীতিবাদী খতমে নেমে যাওয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক অধপতনের পথ তাদের সামনে খোলাই রয়েছে– যার অনুশীলন এ অঞ্চলে অতীতেও তারা কম/বেশি করেছে।

তাই, লাইনগতভাবে খতম-লাইনের বদলে গণযুদ্ধের এক সামগ্রিক লাইন একেবারে সূচনা থেকেই তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেজন্য নিজেদের অতীত ও চলমান সংগ্রামগুলোর সিরিয়াস সারসংকলন করতে হবে। বিগত ২৫ বছরে এই পার্টির সর্ববৃহৎ সংগ্রাম– পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামে বিপর্যয় ও অধপতন নেমে এলে ৯০-দশকের শেষে ঐ বিভাগের প্রধান ক. মধুকে ব্যাপকভাবে দায়ী করে কাজ শেষ করা হয়েছে। এটা সত্য যে, একটা লাইন সঠিক হলেও তার প্রয়োগ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-নেতৃত্বের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ– যার মূল্যায়ন, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু একটি সংগ্রামের বিপর্যয়ের সারসংকলন ভিন্ন বিষয়। সংগ্রাম যেমন গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট লাইনে, তেমনি তার বিপর্যয় ঘটলে প্রথমে লাইনেই তার সন্ধান করতে হয়। এমনও হতে পারে যে, লাইন সঠিক ছিল, কিন্তু শক্তির ভারসাম্যের কারণে তার পরাজয় ঘটেছে– কিন্তু সেটা হলেও লাইনকে তা পরিষ্কারভাবে নিয়ে আসতে হবে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে। পূবাকপা পশ্চিমাঞ্চল সংগ্রামের সারসংকলন দূরের কথা, ৬০/৭০ দশকের সারসংকলনই করেনি। পূবাকপা-কি মনে করে না যে, ৭০ দশকের সংগ্রাম পরাজিত হয়েছিল? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তার লাইনগত সারসংকলন তাদের কী? এই প্রাথমিক কাজটাকেই তারা স্বীকৃতি দেননি সুদীর্ঘ ২৫ বছর। আর এমন কোন সারসংকলন কোন মার্কসবাদী করতে পারে না তার আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শ (শুধু কথিত 'দক্ষিণ-এশীয়' শিক্ষা নয়) ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংগ্রামের, বিশেষত সফল গণযুদ্ধগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া ছাড়া। কিন্তু এই কমরেডগণ বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের পুনর্গঠনের এই জটিল সময়ে একটিবারও উপমহাদেশীয় 'CM-শিক্ষা'র গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী মা-লে-মা-এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ার উদ্যোগ নেয়নি; একবারের জন্যও তারা বলেনি যে, পেরুর গণযুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ, অথবা নেপালের বিজয়ী গণযুদ্ধের থেকে এইসব শিক্ষা আমাদেরকে নিতে হবে, এবং এই হলো বিগত ৩০ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে, তথা মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্নে আমাদের সারসংকলন।

* সম্প্রতি পূবাকপা'র একটি গ্রুপের (RF) থেকে এলাকাবাদের একটি সমস্যারও উত্থাপন হচ্ছে। এলাকাবাদ সংস্কারবাদেরই একটা রূপ। যদিও এ প্রসঙ্গটা RF-গ্রুপ এনেছে রণনীতি বিষয়ে তাদের পুরনো একটা লাইনের পুনর্জীবনের সূত্র ধরে (গ্রাম-

শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের রণনীতি– যে সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করবো), কিন্তু বাস্তবে তাদের এই সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে ব্যাপকভাবে খতম-লাইনের সাথে যুক্তভাবে। গণযুদ্ধ'র লাইন দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চলে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্রে রেখে যুদ্ধের লাইন উত্থাপন করে। কিন্তু খতম-লাইন খুবই সংকীর্ণ জায়গায় খতম-এ্যাকশনকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করে ও কাজ করে। খতম-লাইন এটা আনতে বাধ্য। যার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে স্বতঃস্ফুর্ততাবাদ। এটা এমনকি CM-সময়েও ঘটেছে– যদিও তা পূবাকপা'র চেতনা ও অনুশীলন থেকে গুণগতভাবেই ভিন্ন ছিল। এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের সঠিক বিপ্লবী রাজনীতি সত্ত্বেও এ স্বতঃস্ফুর্ততা, এমনকি CM-নেতৃত্বাধীন সংগ্রামকেও ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে দেয়নি। কিন্তু তাকে সারসংকলন না করার ফলে পূবাকপা'র অবস্থা হয়েছে খুবই শোচনীয়। তারা এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের রাজনীতির কথা প্রচুর বলেছে বটে, কিন্তু বিগত ২৫ বছরে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কোন চেতনা তাদের সংগ্রামে কখনই প্রকাশিত হয়নি। এর অর্থ হলো ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কোন সচেতন দিশা ও পরিকল্পনা ছাড়াই তারা এলাকাগত সংগ্রাম করেছে খতমের মাধ্যমে। এটা এলাকাবাদ ও সংস্কারবাদ সৃষ্টি করতে বাধ্য। যা বামরূপে তাদের মাঝে গুরুতর ডানবিচ্যুতির জন্ম দিয়েছে। আর এ ডান-বিচ্যুতি যখন দেশীয় পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াশীল মাস্তানবাজির আবহাওয়ায় কাজ করেছে তখন বারে বারে তার মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল অধপতনও কম/বেশি মাত্রায় গড়ে উঠেছে যার এক শোচনীয় পরিণতি পশ্চিমাঞ্চলে দেখা দিয়েছে।

এই বিচ্যুতিকে সংশোধন করার একটা শুভ প্রচেষ্টা RF-গ্রুপ যখন হাতে নিয়েছে তখন তারা তাদের পার্টির পুরনো এক ভুল রণনীতিকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিপরীতধর্মী ডানবিচ্যুতিকে আনতে শুরু করেছে– যা পূবাকপা'র দ্বারা অনুসৃত খতম-লাইনের ভুলের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া মাত্র। এটা অতীত বিচ্যুতিরই অপর পিঠ– ভুল শুধরে সঠিক জায়গায় আসা নয়। আমরা পরে এ বিষয়ে আরো কথা বলব।
ক. CM-এর এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের রাজনীতি এলাকাবাদী সংগ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করতো না। তা ছিল মূলত নগরভিত্তিক অভ্যুত্থানে দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের লাইনের বিপরীতে গ্রামে ঘাঁটি গড়া, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করার দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রণনীতির প্রকাশ। এটা ছিল ক. CM-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলোর একটি। এমনকি ক. CM-এর বাস্তব সংগ্রামও এলাকাবাদী ছিল না, বরং তা ছিল তৎকালীন সামর্থ্যের মধ্যে সর্বোচ্চভাবেই ছড়ানো, দেশব্যাপী গণযুদ্ধ গড়ার বিপ্লবী রাজনীতিতে সজ্জিত– যদিও বাস্তব অনুশীলনে ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার সচেতন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দুর্বলতা তাতে ছিল– কাজে কাজেই সে সংগ্রামে স্বতঃস্ফুর্ততাও ঘটেছিল।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, CM-শিক্ষানুসারী দাবিকারী এই পার্টিটি সেই সুদূর '৭৬-সালেই ক. চৌধুরীর নেতৃত্বে গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের রণনীতি গ্রহণ করেছিল– যদিও '৯৬-সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছরে এর উপর পার্টিতে, এমনকি সিসি-তে পর্যন্ত কোন আলোচনাই প্রায় হয়নি– এবং এটা-যে CM-রাজনীতি থেকে

মৌলিকভাবে সরে যাওয়া সেটাও কেউ দেখেনি। আবার অন্যদিকে বিগত ২৫ বছর ধরে তাদের দলিলপত্রে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের রাজনীতির কথাও প্রচুর দেখা গেছে। এই হচপচ থেকে প্রমাণ হয় যে, খোদ রণনীতির প্রশ্নেই তাদের কোন সুগভীর, সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় অবস্থান ছিল না– যা গণযুদ্ধের তত্ত্বকে সুগভীরভাবে উপলব্ধি করতে না পারার সাথে যুক্ত।

ঘাঁটি-প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে গণযুদ্ধের তত্ত্বের সাথে যুক্ত একটি সমস্যা। গণযুদ্ধের সার্বজনীনতার সাথে ঘাঁটি-প্রশ্নটাও সার্বজনীন। যদিও সাম্রাজ্যবাদী দেশে গণযুদ্ধের প্রয়োগ ও ঘাঁটি তৃতীয় বিশ্বের চেয়ে ভিন্নতর হবে, কিন্তু ঘাঁটি ঐসব দেশের গণযুদ্ধের জন্যও গুর"ত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে RCP-র লাইন ও পর্যালোচনার অধ্যয়ন সবার জন্যই গুর"ত্বপূর্ণ। ঘাঁটি হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু– এই মাওবাদী তত্ত্বকে পের"র পার্টি গুর"ত্বের সাথে ICM-এ উত্থাপন করে যা RIM-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মাওবাদীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে ও হচ্ছে। RIM-বহির্ভূত মাওবাদীদের সাথে RIM গণযুদ্ধের তত্ত্বের এই উচ্চতর উপলব্ধির ভিত্তিতে 2LS-ও চালাচ্ছে যা পূবাকপা-কেও উপলব্ধি করতে হবে। নতুবা এ প্রশ্নে বিভিন্নমুখী সমস্যা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে না।

এটা সত্য যে, যেখানেই জনগণ সেখানেই গণযুদ্ধ করা সম্ভব। কিন্তু ঘাঁটি নির্দিষ্ট কিছু অনুকূল অঞ্চলেই সূচনা হতে পারে। এজন্য রাজনৈতিক, সামরিক ও ভৌগোলিক বিবেচনায় নির্দিষ্ট কিছু রণনৈতিক অঞ্চল নির্ধারণ করা অপরিহার্য; যেখানে ঘাঁটি গড়ার লক্ষ্যে গণযুদ্ধ সূচনা ও বিকশিত করতে হবে। পূবাকপা– আমাদের পার্টির অতীতের মতই– কখনো এমন কোন রণনৈতিক অঞ্চলকে বাছাই করে, আঁকড়ে ধরে সংগ্রাম গড়ে তোলেনি। এ ধরনের অঞ্চল নির্ধারণের জন্য রাজনৈতিক বা সামরিক আলোচনা কখনো তারা গুর"ত্ব দিয়ে উত্থাপন করেনি। সুতরাং সামরিক লাইনের প্রশ্নে পূবাকপা'র আরেকটি গুর"ত্বপূর্ণ গলতি রয়ে গেছে ঘাঁটি প্রশ্নে, যা তাদেরকে অবশ্যই সমাধান করতে হবে।

* গণযুদ্ধের আরেকটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণসমাবেশিতকরণ ও গণক্ষমতা। ঘাঁটি গণযুদ্ধের সারবস্তু– এর থেকে বেরিয়ে আসে যে, জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাই গণযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়। এটা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বিপ্লবী রাজনীতিতে গণসমাবেশিতকরণ– তথা গণলাইন, গণভিত্তি এবং বিভিন্ন ধরনের গণসংগঠন গড়ার সাথে। গণসংগঠন-প্রশ্নে CM-এর কিছু লাইনগত দুর্বলতা ও ত্র"টি পূবাকপা-কে সুদীর্ঘকাল ধরে এক্ষেত্রে দুর্বল করে রেখেছে– বিশেষত গণসংগঠন না করার পথে আটকে রেখেছে। যদিও তারা বলেছে যে, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় জনগণের গণসংগঠন তারা গড়তে চায়, বা নিদেনপক্ষে বিপ্লবী কমিটি গড়তে চায়– কিন্তু বিগত সুদীর্ঘ ৩০ বছরের সংগ্রামে তারা বাহিনী-সংগঠনের নিম্নরূপের কিছু স্কোয়াড গঠন ছাড়া কোন একটা গণসংগঠনও গড়তে পারেনি। এটা কোন হেলাফেলার বিষয় নয়, বা প্রয়োগগত বিষয় নয়, বরং খোদ লাইনেরই বিষয় যে, পার্টির দীর্ঘ ৩০ বছরের ইতিহাসে এই পার্টি একটি গণসংগঠনও কেন গড়তে পারেনি।

এর সাথে খোদ পার্টি-গঠনের সমস্যাও জড়িত যা আমরা পরে আলোচনা করবো।

কিন্তু গণযুদ্ধের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত প্রশ্নটি হলো, বহুবিধ গণসংগ্রাম গড়া ও তার সর্বোচ্চ ও কেন্দ্রীয় রূপ হিসেবে গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন। পূবাকপা'র সংগ্রামী অঞ্চলে পার্টি-কেডারদের অধপতনের একটা আলোচনা আমরা খতম-লাইনের সাথে যুক্তভাবে ইতিমধ্যেই করেছি। এটা গণভিত্তি-গণসমাবেশ-গণসংগ্রাম প্রশ্নে তাদের সংকীর্ণতাবাদী বামরূপের ডান লাইনের সাথেও জড়িত। কারণ, খতম-এ্যাকশনের বিকাশ গ্রামাঞ্চলে একধরনের ক্ষমতা-শূন্যতার সৃষ্টি করতে থাকে। গণযুদ্ধের তত্ত্ব নির্দেশ দেয় যে, এই শূন্যতা পূরণ করতে হবে গণক্ষমতার দ্বারা– যা জনগণের বিবিধ ধরনের সংগঠন ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিপ্লবী কমিটি হলো বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার জনগণেরই ফ্রন্ট – যা জনগণ তাদের বিবিধ গণসংগঠন ছাড়া এগিয়ে নিতে সক্ষম নন। তাই, গণভিত্তি, গণসমাবেশিতকরণ ও গণসংগঠন ছাড়া ক্ষমতা হয়ে পড়ে কার্যত পার্টি বা বাহিনীর ক্ষমতা। এটা পার্টি ও বাহিনীকে আমলাতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্থ করা, ও অধপতনে না নিয়েই পারে না। পূবাকপা'র সংগ্রামী অঞ্চলে প্রায়ই যে ব্যাপক অধপতন– সংস্কারবাদ, সমরবাদ, দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার কথা এখন তারাই উত্থাপন করছে– মধু বাবু, তপন, মানস রায় বা চৌধুরীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে– এর মূল উৎস লাইনে নিহিত, যার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো গণক্ষমতার বদলে বাহিনীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। এই বাহিনী যখন হয় স্থানীয়, কম বা নিচু শৃংখলাবদ্ধ স্কোয়াড, বিচ্ছিন্ন গেরিলাদের সংগঠন– তখন এটা দ্র"তই প্রচলিত মাস্ড়ান গ্যাং-এ রূপ নিতে থাকে। কোনরকম শুদ্ধি অভিযান, শিক্ষা আন্দোলন বা শৃংখলার দৃঢ়করণই এর মীমাংসা করতে পারে না– শুধুমাত্র একে সাময়িকভাবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীত।

কিন্তু গণসমাবেশ, গণসংগঠনের প্রশ্নটা শুধু সশস্ত্র অঞ্চলেই নয়, সমগ্রভাবে পার্টি-গঠনের সাথে যুক্ত বিষয়, কাজে কাজেই সমগ্র পার্টি-সংগ্রাম, তথা গণযুদ্ধের সাথে যুক্ত বিষয়। আমাদের মত ছোট দেশ, প্রায় এক জাতি অধ্যুষিত, দ্র"ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাপক সংযোগ মাধ্যম (ফোন, কম্পিউটার, টিভি, পত্রিকা ইত্যাদি), যেখানে বিকৃত চরিত্র সত্ত্বেও পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে চলেছে– সেদেশে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে গণসংগ্রাম, শহরাঞ্চলের কাজ, জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার গুর"ত্ব। এ সবই একটি সৃজনশীল গণযুদ্ধের সাথে যুক্ত বিষয়– গণযুদ্ধকে সহায়তাকারী ও রক্ষাকারী এবং গণযুদ্ধের অংশ।

'৯৬-দলিলে প্রকাশ্য গণসংগঠনের কাজ অর্থনীতিবাদ বাড়িয়ে তোলে বলার মধ্য দিয়ে তারা এ ধরনের গণসংগঠন গড়াকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়াকে ন্যায্য করতে চেয়েছে। যেন, গোপন কাজ, সশস্ত্র সংগ্রাম বা খতম-সংগ্রাম অর্থনীতিবাদকে বাড়াতে পারে না! বিভক্ত পার্টির কেন্দ্রগুলো নিজেরাই তারস্বরে বলে চলেছে, ভুল দৃষ্টিভঙ্গির খতম, খতমে আটকে থাকা তাদের অর্থনীতিবাদকে বাড়িয়ে তুলেছে যা সত্যই বটে। তাহলে খতমকে তারা বাদ দিচ্ছে না কেন?

ভূতের ভয় সর্বত্রই রয়েছে। আপনি ভূতে আক্রান্ড় হবেন কিনা তা নির্ভর করে ভূতে আক্রান্ড়হবার বাতিক আপনার মাঝে রয়েছে কিনা। প্রকাশ্য গণসংগঠনের কাজেও

নিশ্চয়ই অর্থনীতিবাদ আসতে পারে– যেমন কিনা খতমেও তা বাড়তে পারে– তাই বলে কোন সচেতন মাওবাদী এ কারণে প্রকাশ্য কাজ ও গণসংগঠনকে সেধে পড়ে বাদ দিতে পারে না। বরং তাদের দায়িত্ব হলো বিপ্লবী মতাদর্শ ও রাজনীতির স্বার্থে যতটা সম্ভব এ কাজগুলোকে ব্যবহার করা।

* সামরিক লাইনে পূবাকপা'র উপরোক্ত সমস্যাবলী তাদের কিছু ভুল তাত্ত্বিক উপলব্ধি বা সূত্রায়নেই প্রকাশিত হয়– যদিও এগুলো খুব একটা প্রকটভাবে উচ্চারিত হয় না। কিন্তু এসব তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির উৎস রয়েছে– যা গণযুদ্ধের তত্ত্বের উপলব্ধিতে দুর্বলতার সাথেই জড়িত। যেমন, তাদের বিভিন্ন কাগজপত্রে একটা সূত্র মাঝেই মাঝেই দেখা যায়– "খতমের গেরিলা যুদ্ধকে গণযুদ্ধে পরিণত করুন।" এর থেকে বেরিয়ে আসে যেন চলমান 'গেরিলা যুদ্ধ'টা গণযুদ্ধ নয়। তত্ত্বগতভাবে এটা সঠিক নয়। মাওবাদী গেরিলা যুদ্ধ গণযুদ্ধেরই একটা রূপ। কিন্তু তারা এগিয়েছে বিপরীতভাবে। গণযুদ্ধকে তারা অবনমিত করেছে গেরিলা যুদ্ধে, এবং গেরিলা যুদ্ধকে খতম-এ্যাকশনে। কিন্তু খতম-এ্যাকশন প্রথমাবস্থায় ব্যাপক জনগণকে সমাবেশিত করার ভিত্তিতে যখন হচ্ছে না, তখন তাদের ধারণা গড়ে ওঠে– এটা এখনি গণযুদ্ধ নয়, গেরিলা এ্যাকশন, যাকে গণযুদ্ধে পরিণত করতে হবে।

এটা দুই ধরনের দুর্বলতা ও বিচ্যুতি থেকে উদ্ভূত। প্রথমত তারা গেরিলা যুদ্ধকে সূচনা থেকেই গণযুদ্ধের একটা রূপ হিসেবে দেখতে ব্যর্থ হয়। আসলে বিশ্বের তাবৎ সশস্ত্র সংগ্রামীরা এখন গেরিলা যুদ্ধ করে, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীলরাও। সুতরাং নিছক গেরিলা এ্যাকশন বা গেরিলা যুদ্ধই আমাদের লাইন নয়, খতম-তো নয়ই (আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি এদেশে এখন প্রতিক্রিয়াশীল-খতমই হরদম চলছে)। আমাদের রণনীতি ও সামরিক লাইন হলো মাওবাদী গণযুদ্ধ। এভাবে যখন গ্রহণ করা হয় সামরিক লাইনকে, তখন গণযুদ্ধের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক তাৎপর্য সর্বপ্রথম সামনে আসে– যা গেরিলা যুদ্ধ বা খতম-কে করলে আসে না।

নিশ্চয়ই– সূচনাকালে ও যুদ্ধের একটা পর্যায় পর্যন্ড, গণযুদ্ধ গেরিলা যুদ্ধের রূপ নেয়। এমনকি পরেও– চলমান যুদ্ধ ও অবস্থান যুদ্ধ গড়ে উঠলেও গেরিলা যুদ্ধের গুরুত্ব থাকে– যা চীনেও ছিল, এখন নেপালেও দেখা যাচ্ছে। এ কারণেই গেরিলা যুদ্ধ রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, গেরিলা যুদ্ধ আমাদের রণনীতি– যা পূবাকপা প্রায়ই বলে থাকে। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ড় গণযুদ্ধ হলো রণনীতি– যা আমাদের মত দেশে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রণনীতিতে প্রকাশিত হয়। যদিও তাত্ত্বিক প্রশ্ন, তথাপি এর সাথে পূবাকপা'র বহুবিধ বিচ্যুতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে– যেসব বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে গণযুদ্ধকে ব্যাপক জনগণের সংগ্রাম হয়েই শুরু হতে হবে– এই চেতনা ডানবিচ্যুতির ঝোঁক সৃষ্টি করে– যা অন্ড়ত RF-গ্রুপে এখন দেখা যাচ্ছে– যার প্রকাশ ঘটেছে তাদের নতুন রণনীতি সূত্রায়নে। সূচনায়– আমাদের মত দেশে– গণযুদ্ধ খুব ব্যাপক সংখ্যায় জনগণকে সমাবেশিত না-ও করতে পারে। সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে না তা

বহুবিধ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, সূচনা থেকেই গণযুদ্ধের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক চরিত্রকে ধারণ করে এ সংগ্রামকে এগোতে হবে এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে প্রধান করে গণসমাবেশিতকরণ-গণভিত্তি-গণসংগ্রামসহ এক ব্যাপক গণ-রাজনৈতিক তৎপরতা হিসেবে তাকে গড়ে তুলতে হবে। গণযুদ্ধের প্রকৃত ও গভীরতর উপলব্ধির সাথে এগুলো জড়িত। পূবাকপা'র আলোচিত ভুল সূত্রায়নগুলো এইসব উপলব্ধির দুর্বলতার সাথেই জড়িত।

* গণযুদ্ধের উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সাথে– বিশেষত খতম-লাইনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বাহিনী-গঠনের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যাবলী। ক. CM-আমলেও এক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটেছিল। কিন্তু পূবাকপা CM-এর খতম-লাইনকে নিজেদের মত প্রয়োগ করে যে গুরুতর এলাকাবাদ, স্বতঃস্ফুর্ততা ও সংস্কারবাদের জন্ম দিয়েছে তা তাদের বাহিনী-গঠনকে গুরুতরভাবে আটকে রেখেছে। বাহিনী গঠনের সমস্যা আমাদের পার্টিতেও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে ঘটেছে বটে, এবং পূর্ব বাংলায় এ সমস্যার চূড়ান্ড় সমাধান যদিও এখনো হয়নি, তথাপি এটা বলা অন্যায় হবে না যে, বাহিনী-গঠনের প্রশ্নে পূবাকপা-তে কোন সিরিয়াস আলোচনা, সারসংকলন, বিতর্ক আমাদের চোখে পড়েনি। এটা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে খতম-লাইন ও ঘাঁটি-প্রশ্নের সাথে জড়িত। নিশ্চয়ই বাহিনী শুরু হতে পারে স্থানীয় গেরিলাদের স্কোয়াড দ্বারা; আর গণযুদ্ধের সূচনাও হতে পারে খতম দ্বারা। কিন্তু আমরা যদি রাষ্ট্রশক্তি উচ্ছেদ করে বিপ্লবী গণক্ষমতার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্রে রাখতে চাই ও সেভাবে গণযুদ্ধ গড়তে চাই তাহলে অবশ্যই নিয়মিত গেরিলা বাহিনী দ্রুতই গড়ে তুলতে হবে, এবং রাষ্ট্র-বাহিনীর উপর পাল্টা-আক্রমণের মাধ্যমে তাদের উপর ছোট ছোট থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বড় বড় পরাজয় আরোপ করতে হবে। নতুবা স্থানীয় অসার্বক্ষণিক গেরিলা-গ্রুপের চলমানতার অভাবে ও সার্বক্ষণিক বাহিনী-সংস্থানের অভাবে তাতে আমরা ব্যর্থই হবো না, তা বিপর্যস্ড়ও হয়ে পড়বে। আর এটা করলেই ধাপে ধাপে নিয়মিত গেরিলা বাহিনীকে উচ্চতর রূপে বিকাশ করা যাবে, যুদ্ধকেও নতুনতর স্ড়রে এগিয়ে নেয়া যাবে। পূবাকপা সুদীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় গেরিলা গ্রুপের স্ড়রেই পড়ে থাকার মধ্য দিয়ে বাহিনী-গঠনে গুরুতর দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে যা গণযুদ্ধের বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে।

* উপরে আলোচিত সমস্যাগুলো কাটালেই-যে এদেশের গণযুদ্ধের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা আমরা বলছি না, বরং বলা ভাল যে, এটা করলে পূবাকপা'র সামরিক লাইনের একটা মাওবাদী ভিত্তি মাত্র স্থাপিত হবে। কারণ, বিশ্বে গণযুদ্ধের অগ্রসর অভিজ্ঞতাগুলো এবং তত্ত্বগত আলোচনা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে হাজির করেছে। এগুলোর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হলো যুদ্ধের সূচনা থেকেই রণনৈতিক পরিকল্পনা-ভিত্তিক সংগ্রাম গড়ে তোলা, গণযুদ্ধের অক্ষের (Axis-এর) প্রশ্ন, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের(PPW-এর) সাথে নগর-ভিত্তিক অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করার প্রশ্ন, শত্রুর সাথে সংলাপের সমস্যা, জাতীয় রাজনীতিতে হস্ড়ক্ষেপের প্রশ্ন, দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলের অন্যান্য গণযুদ্ধগুলোর সাথে সমন্বিত করা ও আঞ্চলিক যুদ্ধ

চালানোর প্রশ্ন– প্রভৃতি বিষয়। সুতরাং "খতমের মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান হবে"– এই সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হলে সমস্ত পুরনো ও নতুন মৌলিক প্রশ্নে এ পার্টি আলোচনায় প্রবেশ করতে পারবে। এবং ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবার পথে নিজেদেরকে স্থাপন করতে পারবে। পূবাকপা এ প্রশ্নে যদি-না আজও মনোনিবেশ করে তাহলে জটিলতর আবর্তে তারা নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য– যার একটি মাত্র প্রকাশ দেখা যাচ্ছে পার্টির বিভক্তির মধ্য দিয়ে। পূবাকপা'র নেতৃবৃন্দের এটা ভাবা গুরুতর ভুল হবে যে, এই বিভক্তি নিছক চৌধুরীর Careerism, স্বেচ্ছাচার বা উপদলীয়তার জন্য হয়েছে; অথবা এটা মানস রায়ের ইন্ধনে "চার কুচক্রী"র চক্রান্তের ফল। এ বিভক্তির উৎস হিসেবে আশু একটা কারণ-তো অবশ্যই ছিল পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামের সত্যিকার কোন লাইনগত সারসংকলন না করা– যা আবার নিহিত এ পার্টির সামগ্রিক লাইনগত-সমস্যার গভীরে। আমরা আশা করি এই ঘূর্ণাবর্তে বিপ্লবাকাংখী, ত্যাগী, সাহসী নেতা ও কমরেডগণ সঠিক ভূমিকায় এগিয়ে আসবেন– যা কিনা আমাদের পার্টির সামনেও উপস্থিত। আসলে এ দায়িত্ব আজ এদেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের সামনেই হাজির।

পূবাকপা'র শক্তি নিহিত মাওবাদের উপর তাদের আস্থায়। কিন্তু মাওবাদের অগ্রসর উপলব্ধিতে নিজেদেরকে সজ্জিত ও নিজেদের সশস্ত্র সংগ্রামকে তার ভিত্তিতে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড় করালেই মাত্র তারা এগোতে পারবে। নতুবা মুখে যতই মাওবাদ বলা হোক না কেন, কার্যক্ষেত্রে অধপতিত হোক্সাপন্থী সশস্ত্র তৎপরতা বা জাসদীয় ও অন্যান্য নামের গণবিরোধী সশস্ত্র গ্যাং-এর সাথে এর পার্থক্য অপসারিত হতে খুব একটা বড় ধাক্কার প্রয়োজন পড়বে না। দেশের ব্যাপক জনগণ-যে এখনো ঐসব সশস্ত্র অপতৎপরতার সাথে মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামের বড় একটা পার্থক্য করতে পারেন না, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া পত্রিকাওয়ালারা-যে সচেতনভাবে মাওবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে এতটা বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে তার মূল কারণ নিহিত রয়েছে খোদ মাওবাদী সংগ্রামের মাঝেই– তার দুর্বল ও বিচ্যুতিপূর্ণ রাজনীতিক চরিত্রের মাঝে– যা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত সামরিক লাইনের সাথে। তাই, মাওবাদী আন্দোলনের এই সার্বিক পুনর্গঠনের কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য পূবাকপা-কে তার সামরিক লাইনের পর্যালোচনায় গভীর মনোযোগ দিতে হবে বলেই আমরা মনে করি।

অন্যান্য মৌলিক প্রশ্ন

১। পার্টি গঠন

মাওবাদের উপলব্ধি থেকে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে পূবাকপা'র রয়েছে ঐতিহাসিকভাবে কিছু বিচ্যুতি যা কিনা উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে শতাব্দীর শুরুতে তাদের পার্টি-বিভক্তির ঘটনা থেকে।

* মাও দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়ম হিসেবে দ্বন্দ্বের নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করেন যা

মার্কসবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে মাও-এর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। দ্বন্দ্বের এ নিয়ম সার্বজনীন– যা পার্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই, দেখা যায় যে, সকল কমিউনিস্ট পার্টিতে সর্বদাই দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকে। সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি-লাইন-নীতি-কৌশল-পদ্ধতির পাশাপাশি অসর্বহারা দিকগুলোও থাকে। এ দু'য়ের সংগ্রাম স্থায়ী– এবং এ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পার্টি বিকশিত হয়। কখনো এ অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম থাকে নিচু লয়ে। কখনো-বা তা তীব্রতায় ফেটে পড়ে। একটি মাওবাদী ও CM-শিক্ষানুসারী পার্টি হিসেবে পূবাকপা তত্ত্বগতভাবে একে গ্রহণ করে ও প্রচার করে। কিন্তু তাদের পার্টি-পরিচালনায় এ সংক্রান্ত উপলব্ধির গুরুতর দুর্বলতা দেখা যায় যা কিনা আবার কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক মূলনীতি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার সাথে যুক্ত।

৭০-দশকের শেষার্ধে পার্টি-পুনর্গঠনের সময়কালে লিন প্রশ্নে ও চীনা পার্টি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের সময়টা বাদে পরবর্তী সুদীর্ঘ ২০/২৫ বছরে আর কখনো এ পার্টিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনপ্রশ্নগুলোতে সুগভীর পর্যালোচনা-বিতর্ক হতে দেখা যায়নি এবং সমগ্র পার্টিকে তাতে সামিল করতে দেখা যায়নি। তেমনি দেখা যায় না পার্টি-অভ্যন্তরস্থ (প্রধানত সিসি-অভ্যন্তরস্থ) মতপার্থক্যগুলোকে গুরুতরভাবে হাতে নিয়ে বিতর্ককে গভীর করা ও পার্টিব্যাপী তা ছড়িয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে পার্টি-লাইনের বিকাশ সাধন করতে। তাদের একটা লাইন ছিল – যা পার্টির সূচনাতে তারা গ্রহণ করেছিল– CM-লাইন। লাইনের ক্ষেত্রে আর কোন কাজ যেন এ পার্টির আর ছিল না– শুধুমাত্র ঘাড়ের উপর চড়ে বসা ২/১ টি মৌলিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া– যেমন চীনা পার্টি সম্পর্কে মূল্যায়ন– যা না করলে তারা বিপ্লবী পার্টিই থাকতো না। এমনকি MLM গ্রহণ করে যে পার্টি শুধু MLM-ই আওড়ায় এবং তার সাধারণ কিছু অনুশীলন করে, কিন্তু নির্দিষ্ট সমস্যায় MLM-এর সৃজনশীল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লাইন-নীতির অব্যাহত বিকাশ ঘটায় না, সে পার্টি লাইনের ক্ষেত্রে স্থবির হয়ে যেতে বাধ্য। এটা একটা বড় কারণ যে, কেন এই পার্টিটি এত বিপুল ত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও সুদীর্ঘ ৩০/৩৫ বছর পরও লাইনের ক্ষেত্রে '৭১-সালেই পড়ে রয়েছে; কেন তারা ICM তথা বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের অগ্রসর চেতনা ও বিকাশগুলো থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন, এমনকি এতটা কম অবগত, এবং ফলশ্রুতিতে বহুক্ষেত্রে তার বিপরীতও বটে।

অবশ্য '৯৬-সালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন-প্রশ্নে পার্টি একটি দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছিল যাতে তাদের পুরনো কিছু লাইন-অবস্থানের ব্যাখ্যাসহ মাওবাদ ও RIM সহ নতুন কিছু বিষয়েও তাদের মতাবস্থান প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু খুবই নির্ধারক নতুন লাইন-প্রশ্নগুলোতে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের পার্টিতে ভাল কোন পর্যালোচনা-বিতর্ক তারা করেছে, এ সংক্রান্ত সুগভীর অধ্যয়ন ও জানা-শোনা তারা করেছে– এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তাদের পার্টি-ইতিহাসে। যেমন, মাওচিন্তাধারাকে তারা হঠাৎ করেই মাওবাদ বলা শুরু করলো। কিন্তু কেন? কী তার ব্যাখ্যা? এ বিষয়ে তারা পার্টির কোন সম্মেলন বা এ জাতীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলেও আমরা জানি না। পার্টির

মতাদর্শ পূর্বে মাওচিন্ড়াধারা ছিল। পরে যখন মাওবাদ করা হলো তখন তা অবশ্যই গুর"ত্বের দাবি রাখে। বিশেষত এই সূত্রায়ন আন্ড়র্জাতিক পরিসরে এসেছে যখন আরো অনেক আগে, প্রথমে পের"র পার্টিতে, পরে RIM-এ। এ সূত্রায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে RIM-এর সুনির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। RIM-অভ্যন্ড়রে এর আওতায় কিছু মতপার্থক্যও ছিল ও রয়েছে। এসবের কোনরূপ উল্লেখ ছাড়া এ পার্টিটি একদিকে RIM-কে বিরোধিতা করলো, অন্যদিকে RIM-দ্বারা আন্ড়র্জাতিক পরিসরে গৃহীত মাওবাদ সূত্রায়নটি বলা শুর" করলো। একে কী বলা যাবে?

এই পার্টিতে বিগত ১৯ বছর ধরে CC-তে মানস রায় ও চৌধুরীর নেতৃত্বে একটা 2LS-এর বিষয় জানা যায়। এ মতপার্থক্যের একটা অংশমাত্র তাদের ২য়/৩য় সার্কুলারে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি এ বিতর্কটিও চূড়ান্ড়ভাবে ও পার্টিব্যাপী মীমাংসিত হয়নি। শুধুমাত্র কাজ চালানোর মত করে এ প্রশ্নে CC-তে সংখ্যাগরিষ্ঠের একটা সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়াও মানস রায়ের পক্ষ থেকে কর্মসূচি, CM-কর্তৃত্বসহ সম্ভবত আরো বিষয়েও মতপার্থক্য ছিল, তিনি লিখিত দলিলও পেশ করেছিলেন। কিন্তু এই 2LS-কে কখনই এগিয়ে নেয়া হয়নি– পার্টিব্যাপী-তো নয়ই, এমনকি CC-তেও নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এইসব দলিল প্রায় ক্ষেত্রেই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্বতন সম্পাদক ক. চৌধুরী হারিয়ে ফেলেন, লেখক পুনরায় তা লিখে দেন, পুনরায় সম্পাদক তা হারিয়ে ফেলেন। প্রশ্নটা হারানোতে নয়, সেটা একটা গোপন বিপ্লবী পার্টিতে হতেই পারে– আসল সমস্যাটা হলো একজন গুর"ত্বপূর্ণ সিসি-সদস্যের গুর"ত্বপূর্ণ লাইনগত-দ্বিমতকে কোন গুর"ত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে সেটা। আসল সমস্যাটা হলো 2LS-এর মধ্য দিয়ে পার্টি বিকাশের মাওবাদী শিক্ষাকে এ পার্টি কীভাবে দেখেছে। এভাবে ১৫ বছর ধরে বিষয়গুলো অমীমাংসিত থেকে যায়।

পার্টির ৪০-তম অধিবেশনে (১৮/১১/'৯৯) এসব সহ আরো কিছু সমস্যার সূত্র ধরে আলোচনা ওঠে এবং দায়িত্বহীনতার অভিযোগে তার পদাবনতি ঘটানো হয়, নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হন। এটা সত্য যে, এ প্রশ্নে অবশ্যই পূর্বতন সম্পাদকের দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আমরা পূবাকপা'র নেতৃত্বদের কার দায়িত্ব কতটা– এমন কোন আলোচনায় এখানে যাচ্ছি না। বরং আমরা দেখাতে চাচ্ছি এই পার্টি, এ পার্টির কেন্দ্র কীভাবে 2LS-কে দেখেছে ও তাকে পরিচালনা করেছে। এটা কোনভাবেই মাওবাদী পার্টি-ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এর অনিবার্য ফল হিসেবে এ পার্টিতে আমলাতন্ত্র এসেছে, অন্ধ আনুগত্য এসেছে, বিশুদ্ধতাবাদ এসেছে– এবং এক সময়ে পার্টি ভেঙ্গে গেছে নীতিগত বিষয়গুলোতে সুগভীর বিতর্ক-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লাইন-বিতর্কের স্পষ্টকরণ ছাড়াই। ভাঙ্গনের পর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে কম/বেশি করে ব্যক্তিতাবাদী অভিযোগ খাড়া করা হয়েছে। এবং জোর করে কিছু লাইন-পার্থক্য আরোপ ও অতিরঞ্জন করে বিভেদকে বিভিন্ন পক্ষ ন্যায্য করতে চেয়েছে (আমরা এর উপর পরে কথা বলছি)। কিন্তু প্রয়োজন হলো এ পার্টির গঠন ও পরিচালনাকে মাওবাদী 2LS-ধারণার ভিত্তিতে স্থাপন করা, এবং এজন্য তাদের অতীত

থেকে Rupture করা। লাইন ও নীতিতে ভুল করেছে পার্টি, যাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সিসি ও সম্পাদক। তাই, ব্যক্তিকে দোষারোপ করার মধ্য দিয়ে এর মীমাংসা-তো সম্ভব নয়ই, বরং এটা ক্ষুদে-বুর্জোয়া ব্যক্তিতাবাদী সংগ্রামকেই তীব্র করে পার্টির মাওবাদী চরিত্রকে আরো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

ঠিক এ কারণেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলের এত বড় সংগ্রামের বিপর্যয়/অধপতনগুলোর জন্য আজ তপন-গ্র"প দায়ী করছে চৌধুরী ও মধু বাবুকে; অন্যদিকে চৌধুরী গ্র"পের দলিলে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের উপর আক্রমণে সশস্ত্র সংগ্রামকে সম্প্রসারিত না করার জন্য দায়ী করা হচ্ছে রাকা-মধু বাবুকে। অন্যদিকে RF-গ্র"প এইসব বিপর্যয়ের জন্য চৌধুরীর ব্যক্তিতাবাদী পরিচালনাকে দায়ী করছে। মাওবাদীরা সংগ্রামের সারসংকলন কাজকে সর্বদাই লাইনে কেন্দ্রীভূত করে। তা করার পথে পার্টিতে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন সেই 2LS-কে এগিয়ে নিতে হয়, গভীর করতে হয়, ছড়িয়ে দিতে হয় ও সমগ্র পার্টিকে তাতে সজ্জিত করতে হয়। এবং এর মধ্য দিয়েই পার্টি-লাইন বিকশিত হয়, পার্টি-লাইনে ভুল থাকলে তা সংশোধন করা আন্ড়রিক বিপ্লবীদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে, এবং পার্টির ঐক্য উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। অবশ্যই এ প্রক্রিয়ায় কিছু অসংশোধনীয় বা অধপতিত উপাদান পার্টি থেকে বর্জিত হতে পারে, কিন্তু তাতে পার্টির অনাকাংখিত বিভক্তি ঘটেনা, বরং পার্টি উপকৃত হয় ও এগিয়ে যায়। তা যখন করা না হয় তখন পার্টিতে ব্যক্তিতাবাদী ও উপদলবাদী সংগ্রাম গড়ে ওঠা প্রায় অনিবার্য। আর তা হলে একটি মাওবাদী পার্টি হিসেবে পার্টিকে এগিয়ে নেয়া যায় না। পূবাকপা'র পার্টি-গঠনের প্রশ্নে পার্টি-অভ্যন্ড়রস্থ মতপার্থক্যকে দেখা ও 2LS পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যাটা মৌলিক বলেই প্রকাশিত হয়।

* পার্টি-গঠনের প্রশ্নে গুর"ত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সঠিক লাইনের ভিত্তিতে আন্ড়রিক বিপ্লবীদের এককেন্দ্রীক ঐক্যের প্রশ্ন। কারণ পার্টির ঐক্যের মাধ্যমেই শুধু জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়– যাতে এদেশের মাওবাদী আন্দোলন শোচনীয়ভাবে বিচ্যুত হয়েছে। সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে পূবাকপা গুর"তর একতরফা, সংকীর্ণতাবাদী ও বিভেদাত্মক লাইন ও নীতি দ্বারা চালিত হয়েছে যার উদ্ভব ঘটেছে সংশোধনবাদ সম্পর্কে তাদের ভুল উপলব্ধি থেকে।

পার্টিতে যে দুই-লাইনের সংগ্রাম চলে, পার্টি-বহির্ভূত বিপ্লবীদের সাথেও যা সর্বদা বিরাজমান তাতে উভয় পক্ষই সঠিক নয়। অবশ্যই একটি লাইন সঠিক, বা আপেক্ষিকভাবে অগ্রসর, এবং অন্যগুলো ভুল বা পশ্চাদপদ। ভুল লাইন ও নীতি হলো অসর্বহারা লাইন ও নীতি। এবং তা চূড়ান্ড়ভাবে সংশোধনবাদ। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, প্রতিটি ভুল মতধারা সামগ্রিকভাবে সংশোধনবাদী, বা ভুল মতটা আশুভাবেও সংশোধনবাদী। পূবাকপা-তে ঐতিহাসিকভাবে এ প্রশ্নে গুর"তর একতরফাবাদ বিরাজ করেছে– যখন তারা ভিন্নমতকে সংগ্রাম করেছে সংশোধনবাদ হিসেবে, এবং যেকোন ভিন্ন নীতি/লাইনধারীকে সংশোধনবাদের ধারক বলে চিহ্নিত করেছে। আর এর সাথে যখন তারা যোগ করেছে এই মত যে, সংশোধনবাদ মানেই প্রতিক্রিয়াশীল, তখন সকল ভিন্ন

মতের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম হয়ে পড়েছে বিভেদাত্মক ও বৈরী। এরই ফল আমরা দেখি তাদের পার্টি-বিভক্তির পর প্রতিটি কেন্দ্র অন্যকে যখন সোজাসাপ্টা সংশোধনবাদী বলছে তখন। আর একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিটি গ্রুপ অন্য গ্রুপের উপর আত্মগতভাবে কিছু অভিযোগ যেমন আরোপ করেছে, তেমনি বাস্ড়ব ভুলকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থিত করেছে। এটা কোনক্রমেই প্রকৃত লাইন-পার্থক্যে সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করে না, এবং বিভ্রান্ড় বা ভুল করেছেন এমন কমরেডদের ভুলকে কাটাতে কোন ভূমিকা রাখে না।

এটা-যে শুধু তাদের পার্টির অভ্যন্ড়রেই ঘটছে তা নয়, বরং এর যাত্রা শুরু হয়েছে প্রথমত অন্যান্য মাওবাদী গ্রুপগুলোর প্রতি ভুল মূল্যায়নের থেকে– তাদেরকে সরলরৈখিকভাবে সংশোধনবাদী চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে। এ সমস্যাটা আমাদের পার্টিতেও ঘটেছিল যা কিনা ৬০/৭০-দশকে সংশোধনবাদবিরোধী ন্যায্য সংগ্রামকালে লিনপন্থার প্রভাবে পার্টিগুলোতে প্রবেশ করেছিল। স্ট্যালিনের একস্ড়ঙ্গী পার্টি-মডেলের প্রভাবও এতে কাজ করেছে– যা কিনা পার্টি-প্রশ্নে মাওবাদকে ভালভাবে আত্মস্থ না করার সাথে জড়িত ছিল। পূবাকপা এই বিচ্যুতি ও পশ্চাদপদতাকে সযত্নে লালন করে এতটাই পাকিয়ে তুলেছে যে, যেকোন ভিন্নমতকে সংশোধনবাদ বলা ও ভিন্নমতধারীকে সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করে বিভেদাত্মক-বৈরী সংগ্রাম করা তাদের এক সংকীর্ণ 'বিপ্লবী' ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছিল। বিভক্তির পর এ পার্টির কোন কোন অংশ এ ট্র্যাডিশন থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে বলে দেখা যায়– যা ইতিবাচক; কিন্তু সংশোধনবাদ সম্পর্কে ভুল উপলব্ধি ও মাওবাদীদের ঐক্যের প্রশ্নের সাথে তাকে যুক্ত না করা পর্যন্ড় এ ভুলের শিকড় পর্যন্ড় যাওয়া যাবে না।

* গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার সমস্যাটি উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সাথেই যুক্ত– যা পূবাকপা-তে ঘটেছে।

ভাঙ্গনের শুরুতে সম্পাদক পরিবর্তন হয়েছিল সম্পাদকের প্রতি যেসব অভিযোগে তার একটি হলো দায়িত্বহীনতার অভিযোগ। সম্পাদক যদি ১০ বছর ধরে কংগ্রেস রিপোর্টসহ ৬টি গুরুত্বপূর্ণ দলিল লেখার দায়িত্বের একটিও পালন না করেন তাহলে তা গুরুতর সমালোচনার যোগ্যই বটে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সুদীর্ঘ ১০ বছর ধরে এ প্রশ্নে এই পার্টির সিসি সমালোচনা-সংগ্রাম আনতে ব্যর্থ হলো কেন? এমনকি এই প্রশ্নটি ৪০-তম অধিবেশনেও মূল আলোচ্যসূচিতে প্রথমে ছিল না– অন্য প্রসঙ্গ ধরে এটা এসেছিল। এটা আসলে সম্পাদকের দায়িত্বহীনতার চেয়েও বড় কিছুকে প্রকাশ করে যা এখনো পর্যন্ড় এ পার্টির কোন অংশই গুরুত্ব দিয়ে ধরেনি। কতটা স্বতঃস্ফুর্ত ধারায় এ পার্টি পরিচালিত হয়েছে সেটাই এতে প্রমাণিত হয়। লাইন ও রাজনীতির উপর প্রধান গুরুত্ব না দিয়ে এ্যাকশনকে ঘিরে পার্টি গড়ার মৌলিক সমস্যা থেকেই এর উদ্ভব ঘটেছে।

আলোচ্যসূচিতে না থাকলেও কোন ফোরাম নতুন আলোচ্য বিষয় আনতে পারে না তা নয়– এ ক্ষেত্রে চৌধুরী বা তপন গ্রুপ যে যুক্তি দিচ্ছে তা একেবারেই খেলো। কিন্তু আসল প্রশ্নটা মোটেই চৌধুরীর ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার নয়। চৌধুরী এ দশ বছরে

তাদের পার্টির জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিশ্চয়ই করেছেন– যে যুক্তি চৌধুরী গ্রুপ এখন তুলে ধরেছে, এমনকি কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইনগত কাজও করেছেন– যেমন, '৯৬-এর দলিলটি যার কথা উপরে বলা হয়েছে। পার্টির কংগ্রেস, দলিল প্রণয়ন, পত্রিকা প্রকাশ– এগুলো পার্টি-কেন্দ্রের কাজ– সমগ্র পার্টির কাজ। সম্পাদক যখন তা করেন না, তখন পার্টির বা কেন্দ্রের দায়িত্ব হলো তা করানো। কিন্তু এ পার্টি সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে তা করেনি। বিভক্তির পর বহু দৃষ্টান্ড় দেখা যাচ্ছে যখন প্রকাশ পাচ্ছে যে, চৌধুরী বিভিন্ন শাখায় নিজ পছন্দ মত পদোন্নতি দিয়েছেন, বদলী করেছেন, এমনকি এ্যাকশনও করিয়েছেন। এসবই যতনা ব্যক্তি চৌধুরীর সমস্যা, তার চেয়ে বেশি করে এ পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি প্রয়োগ কতটা করেছে না করেছে সেই মূল প্রশ্নের সাথে যুক্ত সমস্যা। সম্ভবত তৎকালীন সম্পাদকই সেইসব ভুল ও বিচ্যুতিকে প্রধানত নেতৃত্ব দিয়েছেন– যদিও আমাদের পক্ষে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন– কিন্তু আসল সমস্যা হলো এ পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার উপলব্ধি ও প্রয়োগে গুরুতর দারিদ্র্যের বিষয়টি। কতটা ব্যক্তিতাবাদী পরিচালনা হলে সবচেয়ে অগ্রসর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদকের অগোচরে তার অধীনস্থ অঞ্চল কমিটির এক সদস্যকে কেন্দ্রীয় সম্পাদকের নির্দেশে অন্য কমরেডদের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতে পারে? (গনেশের মৃত্যুদন্ড)। যদিও অন্যরা এ শাস্ড়ির বিষয়ে পরে একমত হয়েছেন, কিন্তু এ প্রশ্ন তোলা অন্যায় নয় যে, এমন হলে বিভাগীয় কমিটি ও তার সম্পাদকের আর প্রয়োজন কী?

এই পার্টি '৭১-সালে প্রতিষ্ঠার পর একটিও কংগ্রেস করেনি। '৭৬-সালে পার্টি-পুনর্গঠনের একটা সভা এবং '৮৫-সালে প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্লেনাম (যেখানে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল) ছাড়া আর কোন কেন্দ্রীয় সম্মেলনের কথা এ পার্টির ইতিহাসে জানা যায় না। যদিও ভাঙনের পূর্বে উপরোক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির ৪১টি সভা হয়েছিল কিন্তু তার কাগজপত্র অনেক কিছুই সংরক্ষিত হয়নি (একটা গোপন বিপ্লবী পার্টিতে এক্ষেত্রে সংকট থাকতেই পারে, কিন্তু পূবাকপা'র এ সমস্যা ভিন্নতর তা বোঝা যাবে এসব সিসি-মিটিং-এর প্রায়গুলোরই কোন রিপোর্ট পার্টিতে প্রকাশ হয়নি)। বিভক্তির পর একই সমস্যাগুলো কতটা গুরুতর রূপ পায় তা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে, সিসি'র দুই সদস্য– চৌধুরী ও তপন মূল সিসি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পরই একটা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা দেন– কিন্তু কীভাবে এ সিসি নির্বাচিত হলো তার কোন ঘোষণা আমরা কোথাও পাই না। অথচ '৭৬-সালে পুনর্গঠনের সময়ে তৎকালীন নেতা-কর্মীদের একটি সভায় নির্বাচিত/গঠিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রের নাম তারা দিয়েছিল 'কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমটি' (COC)। অনেক পরে '৮৫-এর প্লেনামে তারা সিসি গঠনে সক্ষম হন– যে প্লেনাম প্রকৃতই সমগ্র পার্টিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই ইতিবাচক দৃষ্টান্ড়ের কিছুই অনুসৃত হয়নি বিভক্তির পর। দুই বছর পর চৌধুরী ও তপন বিভক্ত হওয়া মাত্র দুটো পৃথক সিসি'র ঘোষণা আমরা পাচ্ছি। চৌধুরী নেতৃত্বাধীন সিসি-তে অবিরামভাবে নতুন নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা হচ্ছে বলে প্রকাশ পাচ্ছে। কী ধরনের গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে এগুলো হয়ে থাকে?

সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, পূবাকপা'র বিভক্ত গ্রুপগুলোর কোন কোনটা গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে চালিত হচ্ছে না। একজন নেতা– তিনি যত বড়ই হোন না কেন– চাইলেই নিজ পছন্দমত লোকদের নিয়ে একটা সিসি গঠন করে ফেলতে পারেন না। কমিউনিস্ট পার্টির সিসি গড়ে ওঠে সমগ্র পার্টির সদস্যদের মতামতে, তাদের প্রতিনিধিত্বকারীদের নির্বাচনে– তবেই সেই সিসি পার্টিকে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার পায়। সিসি নিজেও একটা সংগঠন– তাই তাকেও পরিচালিত হতে হয় গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে। এগুলো আজ পূবাকপা'র কিছু গ্রুপে যেন বিস্মৃত তত্ত্ব। যেকোনভাবেই একটা গ্রুপ খাড়া করা, কেন্দ্র বানানো, কেন্দ্র ও কাজ ব্যক্তিতাবাদীভাবে পরিচালনা– এগুলো করে বুর্জোয়া-ক্ষুদেবুর্জোয়ারা। কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারা শ্রেণির সবচাইতে অগ্রসর ও সুশৃংখল বাহিনী। পূবাকপা'র আজকের স্থূল সমস্যাগুলো বহুপূর্ব থেকেই তাদের কেন্দ্রসহ পার্টিব্যাপী ঘনীভূত হয়ে জমছিল। সুতরাং ব্যক্তি চৌধুরীকে দায়ী করাটাই মীমাংসা নয়, বরং পার্টির সামগ্রিক পুনর্গঠন হলো জরুরী– যেখানে গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রীকতার নীতিমালা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। আর সমগ্র পার্টি যখন এই নীতিতে সজ্জিত হয় ও গড়ে ওঠে তখন কোন ব্যক্তি-নেতার পক্ষে ছড়ি ঘুরিয়ে পার্টি-চালানো সম্ভব হয় না।

* পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে পেশাদার বিপ্লবীর প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূবাকপা-তে ঐতিহাসিকভাবে পেশাদার বিপ্লবী প্রথা রয়েছে বলেই মনে হয়– যদিও এ সংক্রান্ত কোন নীতিমালা আমরা পাইনি। সংগ্রামের জোয়ারে বা শত্রুর দমনে অনেক কর্মী-কেডার বাড়ি ছাড়া হতে বাধ্য হবার পর তাদের মাঝে পেশাদার বিপ্লবী প্রশ্নের ফয়সালা ভালভাবে হয়েছে বলে মনে হয় না। পার্টির পেশাদার বিপ্লবী ও বাহিনীর সার্বক্ষণিক গেরিলা এক নয়। পেশাদার বিপ্লবীর মূল প্রশ্নটা শুধু সার্বক্ষণিকভাবে বিপ্লবী কাজ করাই নয়। তার অন্যতম মূল বিষয় হলো শ্রেণিচ্যুত হওয়া (সম্পদশালী শ্রেণি-উদ্ভূত কর্মীদের ক্ষেত্রে)। ব্যক্তিগত শ্রেণিসম্পর্কগুলো থেকে নিজের বিচ্ছেদ ঘটানো– যার অন্যতম প্রধান বিষয় হলো ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ও সেই সম্পদের পরিচালনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই ধরনের পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব-মেরুদণ্ড গড়ে উঠলেই মাত্র সে পার্টি সর্বহারা শ্রেণি চরিত্র রক্ষা করতে পারে।

পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামে পূবাকপা'র স্থানীয় নেতৃত্বে চলে এসেছে লাল্টু-পল্টু ধরনের এ্যাকটিভিষ্ট ব্যক্তিরা। যারা বাড়ি ছাড়া বাহিনী-কমান্ডার হলেও পেশাদার বিপ্লবী চরিত্র কতটা অর্জন করে সেটা গুরুতর প্রশ্নসাপেক্ষ। পূবাকপা'র সংগ্রামে সমরবাদের বিকাশ এবং পার্টি-নেতৃত্ব দুর্বল হবার একটা বড় কারণ এর মাঝে নিহিত বলেই মনে হয়।

ঠিক একই সমস্যা বিপরীতরূপে প্রকাশ পেয়েছে অন্যত্র– যেখানে সংগ্রাম ও দমন ততটা জোরালো হয়নি। ভাঙনের পর RF-বিরোধীরা মানস রায়কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ন্যায্য করতে চায়– এমন একটা ধারা দেখা যাচ্ছে। এর ত্রুটি সত্ত্বেও এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন-যে, মানস রায় ব্যক্তিগত এলাকায় ১৮ বছর ধরে স্কুল-শিক্ষকের জীবনে থেকেও কীভাবে সিসি-সদস্য নির্বাচিত হন এবং সিসি-তে গুরুত্বপূর্ণ পিবি-সদস্য থাকেন, যে পার্টি কিনা অব্যাহতভাবে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে

বলে দাবি করে, এমনকি এই কমরেডের সংশ্লিষ্ট এলাকাতেও?

এটা ঠিক যে, একটা পার্টি গঠনের/পুনর্গঠনের প্রাথমিক সময়ে পেশাদার বিপ্লবীর সংখ্যাল্পতার কারণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্তরে, এমনকি কেন্দ্রেও অপেশাদার পার্টি-সদস্য আসতে পারেন না তা নয়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ লেনিনবাদী নীতি হলো, পার্টির মূল মেরুদণ্ড গঠিত হবে পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে। আর মাওবাদী গণযুদ্ধের পার্টিতে সেটা আরো বেশি করে প্রযোজ্য। কিন্তু পূবাকপা'র ৫/৭/৯ সদস্যের ছোট সিসি-তেও মানস রায় সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। এক্ষেত্রে পার্টির নীতিটা কি খুব স্পষ্ট? আজ পার্টি-ভাগের পর চৌধুরী বা তপন গ্রুপ মানস রায়কে এজন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে যা স্পষ্টতই অনৈতিক। বরং যে পাল্টা প্রশ্নটা তাদের প্রতি করা সঙ্গত তাহলো, এই অভিযোগ কেন ভাঙন-পূর্ব সুদীর্ঘ ১৮ বছরে ওঠেনি ও তার ফয়সালা নীতিগতভাবে করা হয়নি? ঐ ধরনের গ্রামীণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে থাকলে একজন সচেতন ব্যক্তি সামাজিক সংস্কারবাদী, মানবতাবাদী কাজ ও সম্পর্কে জড়িত হতে বাধ্য। এটা কারও ব্যক্তিগত ত্রুটির বিষয় নয়– বরং পার্টির নীতির বিষয় যে পার্টি তার নেতৃত্বকে এইসব সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কোন নীতি পার্টিতে গ্রহণ করেছে। '৯৬-পূর্ব সুদীর্ঘ ১৮ বছর ধরে পাবনা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের স্থায়ী উপস্থিতি সত্ত্বেও সশস্ত্র সংগ্রাম জোরালোভাবে গড়ে না ওঠার পিছনে এই সমস্যার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তা-কি পূবাকপা কখনো পর্যালোচনা করেছে?

* পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে এ্যাকশনবাদ পূবাকপা-তে প্রবল প্রভাব ছড়িয়েছিল যা পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামে সুস্পষ্টভাবেই দেখা গেছে, যা এখন সেখানে আরো স্থূলভাবে, চৌধুরী বা তপন-গ্রুপের কাজে প্রকাশ পাচ্ছে। মতাদর্শ ও রাজনীতিকে ভিত্তি করে পার্টি গঠনের পরিবর্তে এ্যাকশনকে (মূলত খতম-এ্যাকশনকে) ভিত্তি করে পার্টি গড়ার পথে আগানো হয়েছে। এটা পার্টিতে যে শক্তিশালী সমরবাদ গড়ে তোলে তার শ্রেণি চরিত্র সর্বহারা-তো নয়ই, কৃষক-ও নয়, বরং তা হলো গ্রামীণ ক্ষুদেবুর্জোয়া– যার মাঝে লুম্পেন চরিত্রও প্রবল। যদিও বেকার, ভবঘুরে ও মাস্তান চরিত্রের দরিদ্র শ্রেণি-উদ্ভূত অনেকেই এর মাঝে রয়েছে, কিন্তু তারা এই সব শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণি চরিত্রকে ছাড়িয়ে যায়। এভাবে সর্বহারা চরিত্রের পার্টি-গঠনে গুরুতর দুর্বলতা চলে আসে।

পূবাকপা'র এই বাস্তব সমস্যাকে অতিক্রমের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় মানোন্নয়ন ও শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটাই নির্ধারক নয়। কারণ কৃষক-শ্রমিক উদ্ভূত কর্মী-কেডারগণ ছাত্র-বুদ্ধিজীবী উদ্ভূত কর্মীদের মত করে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন না। যতই মানোন্নয়ন করা হোক না কেন তাদের বড় অংশটি এক্ষেত্রে পিছনেই পড়ে থাকেন। এই মূল শ্রেণি উদ্ভূত কর্মীরা MLM শেখেন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে– যদি সেই অনুশীলন মাওবাদী লাইনে হয়। সুতরাং যে লাইন পার্টিতে সমরবাদ গড়ে তোলে, এবং প্রকৃত মাওবাদী গণযুদ্ধের চেতনাকে দুর্বল করে সে লাইনকে সংশোধন করাটাই হলো নির্ধারক।

এ সূত্র ধরেই মানস রায়ের একটা মত-ধারা প্রকাশিত হতে দেখা যায় যা কিনা

পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ শ্রেণিবাদী ধারার মোড়কে আরেকটি ভুল প্রতিক্রিয়া। এই মতটি পার্টির শ্রেণি চরিত্রের সংশোধন করতে চাইছে পার্টির প্রতিটি কমিটি গঠনে ও প্রথম এ্যাকশনে মূল শ্রেণি উদ্ভূত কর্মীদের প্রাধান্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে। পার্টি অবশ্যই সর্বহারা শ্রেণির পার্টি, কিন্তু এটা হলো রাজনৈতিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং পার্টি গঠিত হবে মতবাদ ও রাজনীতির ভিত্তিতে– নিছক শ্রেণি উদ্ভূত কমরেডদের দিয়ে নয়। আর যেহেতু এই মতবাদ ও রাজনীতি হলো নির্দিষ্ট শ্রেণির ও প্রধানত মূল শ্রেণিসমূহের স্বার্থরক্ষাকারী– ফলে তা যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তাহলে অবশ্যই এ শ্রেণি-উদ্ভূত কমরেডগণ সংগঠনেও প্রাধান্য পাবেন। এটা কৃত্রিমভাবে আরোপ করা চলে না, যদিও কখনো কখনো মূল শ্রেণি উদ্ভূত কমরেডদেরকে টেনে আনার জন্য কিছু কিছু সাংগঠনিক পদ্ধতি নেয়া যেতে পারে। বাস্তবে পূবাকপা'র সমস্যা অন্তত প্রাথমিক কাজ ও সংগ্রামে মূল শ্রেণীতে যাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই নয়। কিন্তু তাদের বহু শাখার মূল শ্রেণির কমরেডগণ পরে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে অধপতিত হন। এর কারণ নিহিত লাইনে– সুতরাং লাইনের সংশোধন ও বিকাশের মধ্য দিয়েই তার মীমাংসা করতে হবে। পূবাকপা'র সমস্ত সমস্যার আলোচনাকে এখন অন্তত কেন্দ্রীভূত করতে হবে লাইন-সমস্যার উপর। নিশ্চয়ই মূল শ্রেণির কর্মীদেরকে দায়িত্বে টেনে আনার প্রস্তাব ও মনোভাব ভাল; কিন্তু তাদের প্রাধান্যে কমিটি গঠন– ইত্যাদি হলো যান্ত্রিক, যা লাইনের প্রশ্নকে দুর্বল করে দেয়। চূড়ান্তভাবে যা কমিউনিস্ট পার্টির রজনৈতিক চরিত্রকে ভালভাবে উপলব্ধি না করার সাথে যুক্ত।

* পার্টি-গঠনের সাথে অন্য আরো যে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নাবলী যুক্ত তার মাঝে রয়েছে গণসংগঠনের প্রশ্ন, আন্তর্জাতিকতবাদের প্রশ্ন, ফ্রন্টের প্রশ্ন, নারী প্রশ্ন প্রভৃতি। গণসংগঠন প্রশ্নটি আমরা গণযুদ্ধ অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। অন্যান্য বিষয়ে আমরা পরে আলোচনায় যাচ্ছি।

২। আন্তর্জাতিকতাবাদ

পূবাকপা এমন একজন মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী নেতার শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে বলে দাবি করে যিনি কিনা ৬০/৭০ দশকে এক সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের দেশ ভারতে থেকে ঔদ্ধত্যের সাথে ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন– "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"। এমন জোরালো আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা তাঁর ছিল যে, বিপ্লবী পূর্ব বাংলাকে বিপ্লবী পশ্চিম বাংলার সাথে একত্র করা, অথবা সমাজতান্ত্রিক সংযুক্ত ভারতবর্ষ গঠনের কথা বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি। অথচ এমন এক মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী নেতার আদর্শধারী দাবিকারী পূবাকপা দুঃখজনকভাবে তাদের ইতিহাসে আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

পূবাকপা তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে একবার– সম্ভবত '৭৪-সালে– ভারতে মাওবাদী পার্টির সন্ধানে গিয়ে লিনপন্থার খপ্পরে পড়ে, আর '৭৭/'৭৮ সালে গিয়ে সংযোগ করে নয়া সংশোধনবাদের ভারতীয় প্রধান স্তম্ভ বিনোদ মিশ্র গ্রুপের সাথে। পূবাকপা'র

শক্তিশালী দিক হলো তারা শেষ পর্যন্ত লিনপন্থাকে গ্রহণ করেনি, বা বিনোদ মিশ্রের ধারায় তেং পন্থীও হয়নি। তারা মাওবাদেই থেকেছে। কিন্তু উপরোক্ত দুটো নেতিবাচক অভিজ্ঞতার পর তাদের পার্টি-ইতিহাসে আর কোন আন্তর্জাতিক সংযোগ-সম্পর্কের কথা কখনো জানা যায়নি (ভাঙনের পূর্ব পর্যন্ত)। বিশেষত বিগত ২৫ বছরে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের বিকাশের এক টালমাটাল সময়কালে ICM থেকে এ পার্টিটি 'নিরাপদ' দুরত্বে অবস্থান করে নিজের চারপাশে এক দুর্ভেদ্য খাঁচা তৈরি করে রেখেছিল যাকে ভেদ করা কোন বৈদেশিক পার্টির পক্ষে তো দূরের কথা, নিজ বাড়ির অন্য কোন মাওবাদী সংগঠনের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব ছিল।

মাও-মৃত্যুর পর বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নতুন বিপর্যয়কালে সারা বিশ্বের সাচ্চা মাওবাদীরা পুনর্গঠিত হতে থাকেন– দেশীয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও। তারা একদিকে ৬০/৭০ দশকের বিপ্লবী ভিত্তিকে রক্ষা করেন, অন্যদিকে তার সারসংকলন করে নতুন পর্যায়ে এগিয়ে যান। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিপ্লবী পার্টির মাঝে চিন্তা-ভাবনায় ব্যাপক পার্থক্য ও ফাঁক ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংযোগ-সম্পর্ক-আলোচনা-বিতর্ক-যুক্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এই পার্টিগুলো ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বের মাওবাদীদের একটি বড় অংশের উদ্যোগে '৮৪-সালে গঠিত হয় RIM– যার বার্তা এদেশে '৮৪-সালেই পৌঁছে যায় তার ঘোষণা-র বাংলা সংস্করণ প্রকাশের মাধ্যমে। এবং RIM-এর অন্যতম সদস্য আমাদের পার্টির কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে।

অথচ একটি মাওবাদী দাবিদার পার্টিরূপে পূবাকপা সুদীর্ঘ ১২ বছর ধরে এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে– তবে প্রচ্ছন্নভাবে একে বিরোধিতা করে যা মাওবাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষমেশ '৯৬-সালে এসে তারা RIM সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পেশ করে ও RIM-কে বিরোধিতা করে। এই প্রকাশ্য RIM-বিরোধিতার পূর্বে তারা RIM-এর সাথে সংযোগ করা, তাদের মতাবস্থান নিয়ে RIM-এর সাথে সংগ্রাম করা, এর মধ্য দিয়ে নিজেদের মতকে যাচাই করা ও জানা-শোনাকে স্পষ্ট করা ও সঠিক করা– এসব কিছুই করেননি– যার সম্পূর্ণ সুযোগ তাদের ছিল। তারা সর্বদা RIM থেকে নিজেদেরকে দশ হাত দূরে সরিয়ে রাখে, দূরে থেকে কিছু কিছু বোঝার চেষ্টা করে, আর ১২ বছর পর এ সম্পর্কে একটা নেতিবাচক মূল্যায়ন হাজির করে। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। কারণ, এটা সরাসরিভাবে একটি পার্টির লাইন-নির্মাণ ও পার্টি-গঠনের লাইনের সাথে যুক্ত বিষয়। এটা পুনরায় প্রকাশ করে, আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক-সংগঠনের অংশ হিসেবে পার্টি ও তার লাইন গঠনের মার্কসবাদী শিক্ষাকে তারা কতটা কম উপলব্ধি করেছিল ও তা থেকে কতটা সরে গিয়েছিল। এভাবে পূবাকপা বিশ্বের অগ্রসরতম মাওবাদী মেরুকরণ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

* '৯৬-দলিলে RIM-কে বিরোধিতার ক্ষেত্রে RIM-এর মৌলিক দলিল– RIM ঘোষণা ('৮৪) ও MLM-জিন্দাবাদ ('৯৩)– এ দুটোতে প্রকাশিত মতাদর্শ-রাজনীতিকে উত্থাপন করে তাকে খন্ডন করে তাকে বর্জন করার বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী পথটি তারা

ধরেই-নি। বরং কিছু ভুল তথ্যের আরোপ ও নিজেদের কিছু ভ্রান্ড় লাইনের সংমিশ্রণে সৃষ্ট মতাবস্থানের ভিত্তিতে তারা RIM-কে বিরোধিতা করার চেষ্টা চালায়। আমরা এখানে তার উপর কিছু আলোচনা করবো এ কারণে যে, RIM আজকের মাওবাদী আন্দোলনে একটি বিরাট বিষয়– যা প্রতিটি দেশে একটা সঠিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইন নির্মাণ ও পার্টি-গঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এটা সত্য যে, বিশ্বের সকল সাচ্চা মাওবাদী পার্টি ও সংগঠন এখনো RIM-এ যুক্ত নয়। আর RIM সেটা দাবিও করে না। RIM এখনো নিজেকে পূর্ণাঙ্গ কোন আন্ড়র্জাতিক মনে করে না– এজন্যও যে, এখনো তার লাইন সে পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে বলে RIM মনে করে না। কিন্তু RIM-এর মৌলিক সাধারণ লাইনগত ভিত্তি রয়েছে, তা অবিরত বিকশিত হচ্ছে এবং বিশ্বের সকল সাচ্চা মাওবাদীদের সাথে RIM সংযোগ-সম্পর্ক-আলোচনা-বিতর্কের প্রক্রিয়ায় যেতে খুবই সচেষ্ট। ভারতের মাওবাদী দুটো বৃহত্তম পার্টি PW ও MCC, এবং ফিলিপাইনের পার্টি এর দৃষ্টান্ড়। এই তিনটি গুর“ত্বপূর্ণ মাওবাদী পার্টি দীর্ঘদিন RIM-এ যুক্ত না হলেও এভাবেই RIM-এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বহুক্ষেত্রে RIM ও এই পার্টিগুলো যুক্ত কার্যক্রম চালায়।

পূবাকপা-কে RIM-এর সকল গুর“ত্বপূর্ণ কাগজপত্র পৌঁছানো হয়েছে এবং RIM দলিলাদি এদেশে সহজলভ্য। এ অবস্থায় RIM-এর বিরোধিতা করতে হলে মাওবাদীদেরকে তা করতে হবে RIM-দলিলাদির ভিত্তিতে, কোন আত্মগত ধারণা বা কুৎসা-অপপ্রচারের ভিত্তিতে নয়। PW বা MCC-র মত যে গুর“ত্বপূর্ণ মাওবাদী পার্টিগুলো এখনো RIM-এর বাইরে রয়েছে তারাও RIM-এ যুক্ত না হবার কারণকে লাইনগতভাবে উপস্থিত করেছে। তাদের কেউ কেউ বলতো যে, ৩য় আন্ড়র্জাতিকের বি-লুপ্তির পর আর কোন আন্ড়র্জাতিকের প্রয়োজন নেই, মাও নিজেও তা করেননি– ইত্যাদি। অবশ্য RIM-এর পক্ষ থেকে লাইনগত সংগ্রামের ফলশ্র“তিতে এখন এদের কেউ কেউ বলছেন, আন্ড়র্জাতিক গড়া দরকার বটে, তবে তার পরিস্থিতি এখনো হয়নি। তবে RIM-এ যুক্ত হোক বা না হোক, এই ধরনের সকল সাচ্চা মাওবাদী পার্টিরই ব্যাপক আন্ড়র্জাতিক সম্পর্ক রয়েছে– যার মাঝে RIM-ও অন্যতম। এরা প্রত্যেকেই RIM-কে মাওবাদী বলে স্বীকৃতি দেয়– অর্থাৎ, RIM-বহির্ভূত হলেও গুর“ত্বপূর্ণ মাওবাদী পার্টিগুলোর সাথে RIM-এর সম্পর্ক ভ্রাতৃপ্রতিম। RIM-এর সাথে তাদের পার্থক্য হলো মাওবাদীদের নিজেদের মধ্যকার পার্থক্য। যেমন, সম্প্রতি PW ও MCCI-এর ঐক্যের মধ্য দিয়ে গঠিত ভারতের বৃহত্তম মাওবাদী পার্টি নবগঠিত CPI (M)-এর দুই নেতার সাথে প্রথম গুর“ত্বপূর্ণ সাক্ষাতকারেও তারা বলেছেন যে, তাদের এই নবগঠিত "পার্টি RIM-এর সাথে সুগভীর সম্পর্ককে অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছে।" সারা বিশ্বের প্রকৃত ও গুর“ত্বপূর্ণ মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনের মাঝে শুধুমাত্র পূবাকপা-ই ব্যতিক্রম যারা RIM-কে বিরোধিতা করে বক্তব্য দিয়েছে।

পূবাকপা'র অবস্থাটা কী ? তারা বাস্ড়বে বিগত ২৫ বছরে কোন রকম আন্ড়র্জাতিক সম্পর্ক গড়েছে তার প্রমাণ আমরা পাইনি। এর কারণ তাদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের গভীরে নিহিত– যা আন্ড়র্জাতিকতাবাদের থেকে গুর“তর বিচ্যুতিতে আজ পরিণত হয়েছে। এ কারণেই RIM সম্পর্কে বিশ্বের কোন মাওবাদী সংগঠনই যা বলে না, পূবাকপা তাকেই কেন্দ্রবিন্দু করেছে RIM বিরোধিতায়– RIM নাকি তত্ত্বের কচকচির আড্ডাখানা; এখানে নাকি তেমন কোন বিপ্লবী পার্টি নেই। এক কথায় RIM কোন বিপ্লবী মাওবাদী পার্টির ঐক্য-কেন্দ্র নয় (দেখুন, '৯৬-এর দলিল)।

সারা বিশ্বের বিপ্লবী ও সচেতন গণতান্ত্রিক শক্তি জানেন যে, মাও-মৃত্যুর পর সমগ্র ৮০-দশক জুড়ে বিশ্বের সবচেয়ে জোরালো ও বিকাশমান গণযুদ্ধ বা বিপ্লবী আন্দোলন ছিল পের“র গণযুদ্ধ। এই পের“র পার্টি PCP রিম-প্রতিষ্ঠা থেকেই তার সদস্য।

নেপাল পার্টি ছিল সংস্কারবাদী ধারার একটি পার্টি– যদিও তারা মাওচিন্ড়াধারাকে মানতো। RIM-লাইনের শর্তে এই পার্টি ৯০-দশকের শুর“ থেকে ক. প্রচন্ডের নেতৃত্বে একটা অগ্রসর লাইন গড়ে তোলে। নেপাল গণযুদ্ধ আজ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগ্রাম। নেপাল পার্টি তাদের এ গণযুদ্ধ বিকাশে সর্বদাই RIM-এর অবদানকে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছে। এসব তথ্য-কি প্রমাণ করে যে, RIM বিপ্লব শেখায় না, শেখায় তত্ত্বের কচকচি?!

পূবাকপা বাস্ড়বে RIM-বিরোধিতাকে লাইনের প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত করতে ব্যর্থ হয়ে এইসব অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েছিল। তবে তাদের ক্ষীণ ও দুর্বল কিছু লাইন-বিরোধিতাও '৯৬-দলিলে ছিল যা করার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের লাইনগত বিচ্যুতিরই বরং প্রকাশ ঘটেছে। এ সম্পর্কে নিচে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে।

* তারা বলেছে, মাও আন্ড়র্জাতিক গঠন না করে পার্টি-পার্টি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রেখেছেন, সেটাই এখনো সম্ভব এবং তা-ই করা উচিত। তারা আরো বলেছে, আন্ড়র্জাতিক গঠনের উদ্যোগ নেয়া মানে হলো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রেখে-যে পারস্পরিক শিক্ষা নেয়া যায় তাকে অস্বীকার করা; বিশ্ব বিপ্লবের লাইন ও কর্তৃত্ব-যে একটি দেশের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে (যেমন মাওবাদ ও মাও) তাকে অস্বীকার করা– ইত্যাদি।

আমরা-কি পূবাকপা'র নিকট প্রশ্ন করতে পারি না যে, এই রকম পার্টি-পার্টি সম্পর্কও তারা সুদীর্ঘ ২৫ বছরে কোথায় কোথায় করেছেন, আর আন্ড়র্জাতিক এমন সব সম্পর্ক থেকে তারা কী শিক্ষা নিয়েছেন? তারা "মাওবাদ" শিখেছেন RIM থেকে, কিন্তু তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে, তার ভাল কোন উপলব্ধি ছাড়াই। তারা পের“র গণযুদ্ধের পার্টি, নেপাল গণযুদ্ধের পার্টি, ভারতের PW বা MCC কারো সাথেই কি কোন নিয়মিত ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন? কেন তা করেননি? এইসব পার্টি সংশোধনবাদী বলে কি? বলতে পারবে তারা একথা স্পষ্ট করে দলিলপত্রে?

তাদের অভিযোগের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, RIM কখনো মনে করে না পার্টি-পার্টি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রাখা, তার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়, অথবা নির্দিষ্ট দেশের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লাইন ও নেতৃত্বের গড়ে ওঠা ও বিকাশ– এগুলো ভুল। কিন্তু RIM যা মনে করে তাহলো এটাই পর্যাপ্ত নয়। কারণ, সর্বহারা শ্রেণি হলো আন্ড়র্জাতিক শ্রেণি, তার

লাইন হলো আন্ড়র্জাতিক চরিত্রের, তার বিপ্লব হলো আন্ড়র্জাতিকতাবাদী, এবং তাকে সংগঠিত হতে হবে আন্ড়র্জাতিকভাবে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও"– এই হলো তার রণনৈতিক স্লোগান, এবং "সর্বহারা শ্রেণির কোন দেশ নেই"– এই হলো তার আদর্শ– যাকে আমাদের আন্ড়র্জাতিক শিক্ষকগণ বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই, যদিও বিপ্লব দেশে দেশে ঘটবে, এবং নির্দিষ্ট বিপ্লবের মধ্যদিয়ে লাইন ও নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, কিন্তু এইসব বিপ্লব ও লাইন কোনটাই সারবস্তুতে দেশীয় নয়, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন কোন বিষয় নয়, বরং এগুলো এক অভিন্ন আন্ড়র্জাতিক বিপ্লবেরই অংশ ও সাধারণ লাইনের সাথে সংযুক্ত বিশিষ্ট লাইন। কোন 'দেশীয়' সর্বহারা বিপ্লবই ঘটতে পারে না আন্ড়র্জাতিক সাধারণ লাইনের অধীনস্থ না থেকে, তাকে বিকশিত করায় ভূমিকা না রেখে এবং বিশ্ব-বিপ্লবের প্রেক্ষিতে পরিচালিত না হয়ে। লেনিন বা মাও এভাবেই কাজ করে শুধু নিজ দেশের বিপ্লব বা সর্বহারা শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেননি, নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশ্ব সর্বহারা আন্দোলনকেও। এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক– যাকে পূবাকপা অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে আটকে থাকার মাধ্যমে একতরফাভাবে দেখছে এবং সারবস্তুগতভাবে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিকে তুলে ধরছে।

RIM– মাও-মৃত্যু পরবর্তীতে– বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক সার্বিক বিপর্যয়কালে মাওবাদের ভিত্তিতে এক নতুন আন্ড়র্জাতিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি প্রস্তুতি সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ প্রশ্নে RIM-বহির্ভূত সাচ্চা মাওবাদীদের সাথে RIM ঘনিষ্ঠ আলোচনা-বিতর্ক চালাচ্ছে। দেখা প্রয়োজন এ বিতর্কে RIM-এর অবস্থান ও যুক্তি সঠিক কিনা। মাও জীবিতাবস্থায় এটা করেননি, তাই আমরাও করবো না– এটা কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদের অগ্রসর বিপ্লবীর বক্তব্য হতে পারে না। এটা মাওবাদ নয়। প্রথমত মাও-এর সময়কার পরিস্থিতি ও এখনকার পরিস্থিতি এক নয়। তাই, একই ধরনে আমরা চলতে পারি না। দ্বিতীয়ত আমরা কমিউনিস্টরা মাও কী করেছেন আর না করেছেন সেভাবে আগাই না। এটা রছুলের সুন্নত[১৩] নয়। আমরা এগোই মতবাদ দ্বারা। সুতরাং দেখতে হবে এটা MLM-সম্মত কিনা, সঠিক কিনা। সেই সূত্র ধরে স্ট্যালিনের আন্ড়র্জাতিক বিলুপ্তকরণ, বা মাও-এর নতুন আন্ড়র্জাতিক গঠন না করা– এ সবের উপর আলোচনা অবশ্যই হতে পারে। এক্ষেত্রে RIM-ভুক্ত পার্টিগুলোরও অভিন্ন কোন সারসংকলন নেই। তবে তারা প্রত্যেকেই যা মনে করে তাহলো আজকের অবস্থায় একটি নতুন আন্ড়র্জাতিক গঠনের কাজ শুর" করা প্রয়োজন। এটা অবশ্যই অতীতের মূল্যায়নের সাথে জড়িত– যাতে প্রত্যেক মাওবাদীই নিজস্ব মত রাখতে পারেন। RIM-ভুক্ত কিছু কিছু পার্টি– যেমন, RCP মনে করে ৩য় আন্ড়র্জাতিক বিলুপ্ত করা ঠিক ছিল না। এ বিতর্কে পূবাকপা-ও অংশ নিতে পারে। কিন্তু তা না করে, সেই বিতর্কের উপর সুগভীর পর্যালোচনায় অংশ না নিয়ে পূবাকপা অপপ্রচার করেছে RIM নাকি সাংস্কৃতিক বিপ্লব বোঝে না। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে, RIM নয়, বরং পূবাকপা-ই CM-শিক্ষাকে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে GPCR-এর প্রায় অর্ধেক সময়কে, তার অধিক মূল্যবান শেষার্ধকে ভালভাবে বুঝেনি। GPCR-এর শিক্ষার ব্যাখ্যামূলক ও

তার বিরোধী সকল ধরনের মতের খ"নমূলক সবধরনের তাত্ত্বিক সংগ্রামে RIM ও তার সদস্য কিছু গুর"ত্বপূর্ণ পার্টির, যেমন– RCP, PCP থেকে উচ্চতর ও ব্যাপকতর কোন কাজ RIM-বহির্ভূত কোন শক্তির পক্ষ থেকে এ পর্যন্ড় হয়েছে– তা-কি পূবাকপা দেখাতে পারবে? তাদের নিজেদের লাইন ও কাজের কথা না-হয় বাদই দেয়া যাক!

RIM-বিরোধী সিদ্ধান্ড়ে পূবাকপা'র আরো কিছু ভুল প্রবণতা ও বিচ্যুতিপূর্ণ লাইন-অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। সে সবের উপর বিস্ড়ারিত আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও তার কিছু উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ, RIM ও আন্ড়র্জাতিক বিতর্ক থেকে নিজেদের সুবিধাবাদী বিচ্ছেদ কীভাবে পূবাকপা-কে ইঁদুরের সংকীর্ণ গর্তে আটকে রেখেছিল সেটা দেখিয়ে দেয়াটা এখন খুবই দরকার।

* তারা বলেছে বিশ্বের যে ৪টি মৌলিক দ্বন্দ্ব[১৪] মাও-মৃত্যু পর্যন্ড় বলা হতো তা এখনো বিদ্যমান। এ ৪টি দ্বন্দ্বের একটি ছিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। বিশ্বে যখন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই, তখনও তারা বলছে এ দ্বন্দ্ব বিরাজমান। RIM-এর ত্র"টি হলো তারা এটা স্বীকার করে না! বাস্ড়বে, আমাদের জানা মতে, বিশ্বের আর কোন মাওবাদীই এটা স্বীকার করেন না– শুধু RIM নয়। কারণ, যে বস্তুর অস্ড়িত্ব নেই– তার সাথে দ্বন্দ্ব হয় না।

তবে পূবাকপা তাদের বক্তব্যের পিছনে কিছু যুক্তি হাজির করেছে। নিশ্চয়ই তার উপর আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এই কারণ দেখিয়ে RIM, তথা বিশ্বের সকল প্রকৃত মাওবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা যায় না।

* তারা বলেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে এখন দরকার গেরিলা তৎপরতা করা, যা তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবকে সমর্থন/সহায়তা করবে; তৃতীয় বিশ্ব হলো বিশ্বের গ্রাম, যে গ্রামাঞ্চল আগে মুক্ত করে বিশ্বের শহর অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদী দেশ দখল হবে, বা সে সব দেশে বিপ্লব হবে– ইত্যাদি।

তাদের এই মত মাওবাদী গণযুদ্ধের তত্ত্বের উপলব্ধির সাথে যুক্ত সমস্যা। এই লাইন ও অবস্থান প্রথম এসেছিল লিনপিয়াও-এর "গণযুদ্ধের বিজয় ... ..." পুস্ড়কে। এই পুস্ড়ক লেখা হয়েছিল মাও-নেতৃত্বাধীন অবস্থায়। তাই, এর অনেক অবস্থানই ছিল মাওবাদী। তাই বলে একে সম্পূর্ণরূপে মাওবাদী পুস্ড়ক যেমন বলা চলে না, তেমনি লিন-লিখিত বলেই এটা সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়। প্রয়োজন হলো মাওবাদ থেকে এর বিচার ও মূল্যায়ন। কিন্তু পূবাকপা একেই মাওবাদ বলে ধরে নিয়েছে– যা কিনা '৭১-পূর্ব সাংস্কৃতিক বিপ্লবকালে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে প্রবল ছিল। সম্ভবত ক. CM-এর মাঝেও এর প্রভাব ছিল। CM-শিক্ষাকে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ফলে পূবাকপা'র পক্ষে এর পর্যালোচনা অসাধ্য হয়ে উঠেছে। আমরা-যে আগেই দেখিয়েছি, মতাদর্শের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপকভাবে '৭১-এই পড়ে রয়েছে তার একটা প্রকাশ এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। লিনের উপরোক্ত গ্রাম-শহর, গেরিলা তৎপরতা বিষয়ে RIM কোন সর্বসম্মত লাইন গ্রহণ করেনি। তবে RIM-এর অন্যতম গুর"ত্বপূর্ণ সদস্য RCP তাদের দেশে

বিপ্লবের রণনীতি-রণকৌশল নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা-সারসংকলন-মূল্যায়ন করেছে ও করে চলেছে। তারা মনে করেন এ লাইন ভুল যা সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপ্লবী পরিস্থিতিকে শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবের উপর নির্ভরশীল করে ফেলে, সাম্রাজ্যবাদী দেশে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি-কাজকে দুর্বল করে ফেলে ও প্রয়োজনীয় সময়ে যে বিপ্লব সম্ভব তাকে ভবিষ্যতের জন্য– তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লব-সফলতার পরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে এই লাইন বিপ্লবী পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও এসব দেশে গেরিলা তৎপরতার মাধ্যমে গণবিচ্ছিন্ন বা ভ্রাম্যমাণ গেরিলা তৎপরতা চালাতে চায়– যা গণযুদ্ধের তত্ত্বের বিরোধী। অথবা বিপ্লবী পরিস্থিতির কথা বলে এটা ক্ষমতাদখলকে কেন্দ্রে না রেখে তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবের সমর্থনকে কেন্দ্রে রাখার গেরিলা তৎপরতার মাধ্যমেও গণযুদ্ধের তত্ত্ব থেকে সরে যায়, 'ঘাঁটি গণযুদ্ধের সারবস্তু'– এ থেকে সরে যায়, ভ্রাম্যমাণ গেরিলাবাদকে ফেরী করে এবং শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণে নিশ্চিতভাবে বিপর্যস্ত হয়। এ দৃষ্টান্ত ৬০/৭০ দশকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বহু গেরিলা সংগ্রামে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

RCP'র এই মূল্যায়ন নিয়েও নিশ্চয়ই আলোচনা-বিতর্ক হতে পারে। পূবাকপা RCP'র এ সংক্রান্ত বহু ব্যাপক পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ-বিতর্ক ও আলোচনাকে কতটা অধ্যয়ন করেছে, বা আদৌ সে সম্বন্ধে কতটা অবগত তা আমরা জানি না। অজ্ঞতাকে গৌরবান্বিত করার ঐতিহ্য এই পার্টির ছিল বটে! কিন্তু তা নিয়ে মাওবাদের অগ্রসর উপলব্ধিগুলোকে জানা ও বোঝা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে পূবাকপা'র যুক্তি কীভাবে বুমেরাং হয়েছে তা দেখানোটা ভাল হবে। '৯৬-দলিলে তারা RIM-বিরোধিতা করতে গিয়ে যুক্তি দিয়েছে যে, মাও সাম্রাজ্যবাদী দেশে বিপ্লব করেননি, তাই তিনি দ্বান্দিক বস্তুবাদ অনুসরণে সে সব দেশের লাইন নির্মাণও করতে যাননি, আন্তর্জাতিক গঠন করেননি– অথচ RIM আজ তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে– ইত্যাদি। বেশ কথা! তাহলে, এখন পূবাকপা কেন সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপ্লবের লাইন প্রদর্শন করতে যাচ্ছে?!

মাও নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী দেশের সমস্ত বিশিষ্ট লাইন নির্মাণের কাজ নিজ ঘাড়ে নেননি– যা সঠিক ছিল। RIM-ও তা করেনি বা করছে না। কিন্তু মাও খোদ মাওবাদের স্রষ্টা– যা কিনা বিশ্বব্যাপীই প্রযোজ্য। এমনকি ৬০-দশকের প্রথমার্ধে মতাদর্শগত মহাবিতর্ক কালে মাও-এর নেতৃত্বে চীনা পার্টি একটা সাধারণ লাইন পেশ করেছিল– যা অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপ্লবের অনেক সাধারণ সমস্যাকে address করেছিল। এসবের বিপরীতে পূবাকপা মাও-কে উত্থাপন করতে চায় জাতীয়তাবাদীর মত– যিনি কিনা চীন ছাড়া অন্য কোন দেশের বিপ্লবের কোন লাইন নির্মাণে হাত দেননি! এর উৎস নিহিত পূবাকপা'র নিজেরই জাতীয়তাবাদী চেতনায়, তথা আন্তর্জাতিকতাবাদের উপলব্ধির বিরাট ঘাটতিতে ।

* RIM-কে বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে পূবাকপা তাদের আন্তর্জাতিকতামুখী জানালাটা শক্ত করে বন্ধ করার ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে পূবাকপা'র নিজের। তার মতাদর্শ ও লাইনে যে সংকীর্ণতা সূচনা থেকেই বিরাজ করছিল তা বিপুলভাবে শক্তিশালী

হয়ে ওঠে এর দ্বারা। সাম্প্রতিককালে কমপোসা গঠনের পর পূবাকপা'র একটি গ্রুপ RF তাতে যোগ দিলেও অন্য দুটো গ্রুপ চালিয়ে যাচ্ছে আগের মতই। RF-এর কমপোসা-য় যোগদান নিঃসন্দেহে পূবাকপা'র ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ইতিবাচক ঘটনা। তবে একে সম্পূর্ণতা দান করা জরুরী। এজন্য প্রথম প্রয়োজন নিজেদের অতীতের সারসংকলন করা– অন্য বিষয়ের সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নেও। মাও-মৃত্যু পরবর্তী প্রায় ৩০ বছরে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে মাওবাদের উপলব্ধি ও প্রয়োগে বিরাট অগ্রগতিকে এবং বিপুল মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করতে না পারলে এদেশেও বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। আর এজন্য প্রকৃত ফোরাম 'কমপোসা' নয়, বরং RIM। RIM-ই হলো আজ বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় বিষয়। পূবাকপা'র সকল কেন্দ্রের আন্তরিক নেতা ও কর্মীদেরকে আজ এ প্রশ্নটিকেই হাতে নিতে হবে।

৩। ফ্রন্টের প্রশ্ন

মাও পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্টকে বিপ্লবের জন্য তিন যাদুকরী হাতিয়ার বলেছেন। এর অর্থ হলো এই তিন হাতিয়ার থাকলেই আমরা বিপ্লবকে সফল করতে পারি, নতুবা তা পারি না। এর মাঝে পার্টি ও বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে পূবাকপা'র ঐতিহাসিক সমস্যাগুলোর উপর ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে– যা আবার ফ্রন্টের প্রশ্নে তাদের লাইন-সমস্যার সাথে যুক্ত। বাস্তবে এই তিন হাতিয়ার গঠনের সমস্যা হলো একে অন্যের সাথে যুক্ত সমস্যা। ফলে একটির ভুল অন্যটিতে সম্প্রসারিত হয় এবং একে অন্যকে প্রভাবিত করতে থাকে। পূবাকপা মাওবাদী হিসেবে যুক্তফ্রন্টের কথা অবশ্যই স্বীকার করে। কিন্তু সুদীর্ঘ ৩০ বছরের পার্টি-জীবনে এক্ষেত্রে তারা ঠিক কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা-কি বলতে পারবে? আমাদের জানা মতে কিছুই না। শুধু তাই নয়, যুক্তফ্রন্ট-প্রশ্নে তারা কিছু গুরুতর সংকীর্ণতাবাদী ও বাম বিভেদবাদী নীতি দ্বারা সর্বদা চালিত হয়েছে।

তারা CM-শিক্ষা থেকে সঠিকভাবেই বলে থাকে যে, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে যে বিপ্লবী কমিটি গড়ে উঠবে সেটাই বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট। বিভিন্ন মিত্র শ্রেণি-পেশার জনগণের যুক্তফ্রন্ট হিসেবে এই বিপ্লবী কমিটি গড়ে উঠে। অর্থাৎ, বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট হলো জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা।

কিন্তু কথা হলো, এ ধরনের ক্ষমতার সংস্থা গড়তে হলে জনগণের নিজস্ব শ্রেণি-পেশাগত সংগঠনও থাকতে হবে– যা পূবাকপা কখনো গড়েনি। তারা এ কাজকে ফেলে রেখেছে গ্রামাঞ্চল আধা-মুক্ত এলাকা হওয়া পর্যন্ত। অবশ্য আধা-মুক্ত এলাকার সংজ্ঞা কী তা স্পষ্ট নয়। আমরা যদি তাকে অগ্রসর গেরিলা অঞ্চল ধরে নেই তাহলে পূবাকপা'র লাইন দাঁড়ায় এই যে, এমন আধা-মুক্ত অঞ্চল গড়া পর্যন্ত পার্টি ও বাহিনীই

যথেষ্ট– গণসংগঠন বা যুক্তফ্রন্টের কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, একটা পর্যায় পর্যন্ড় তাদের বিপ্লবের হাতিয়ার হলো দু'টি– তিনটি নয়– যুক্তফ্রন্টের হাতিয়ারটি শুধুমাত্র আধা-মুক্ত এলাকা হবার পরই কার্যকর হবে। যেহেতু পূবাকপা বিগত ৩০ বছরে এতদূর যেতে পারেনি, তাই যুক্ত ফ্রন্টের কাজও তারা শুর" করেনি। সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধরে দু'টি হাতিয়ার নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছে। এখানে কি পরিষ্কার হচ্ছে না যে, কীভাবে তারা তাদের সমগ্র পার্টি-ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ড় মাও-শিক্ষা থেকে দূরে সরে আছে?

বাস্ড়বে জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থাকে যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি বা মূলরূপ হিসেবে গ্রহণ করাটা সঠিক হলেও মাওবাদী ফ্রন্ট-লাইনকে এতেই সীমাবদ্ধ করলে গুর"তর একতরফাবাদী ভুল হবে– যা পূবাকপা করে চলেছে। যুক্তফ্রন্ট হলো ক্ষমতা ও আন্দোলন– উভয়েরই সংস্থা। এই আন্দোলন বিভিন্ন রূপের ও চরিত্রের– তাই যুক্তফ্রন্টেরও রূপ ও চরিত্রের বহু বিভিন্নতা থাকতে হবে– কিন্তু তাকে পরিচালনা করতে হবে ক্ষমতা-দখলকে কেন্দ্রে রেখে। পূবাকপা যেহেতু সংগ্রামের ক্ষেত্রে একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম ও সংগঠনের ক্ষেত্রে একমাত্র সশস্ত্র সংগঠনকে গুর"ত্ব দেয়– অন্ড়ত আধা-মুক্ত এলাকা হওয়া পর্যন্ড়, যাতে তারা কখনো যেতে পারেনি– তাই, অন্যান্য বিবিধ রূপ ও চরিত্রের আন্দোলন ও সংগঠন তারা করেনি, এবং কোন রূপ যুক্তফ্রন্টীয় কার্যক্রমের পথেও তারা যায়নি। এভাবে তারা গুর"তর ভুল পথে চলেছে যা কিনা আবার পার্টি-গঠন ও বাহিনী/যুদ্ধ বিকাশকে গুর"তরভাবে দুর্বল করেছে।

দ্বিতীয়ত যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ড় তাদের সমস্যাটি যুক্ত তাদের সংশোধনবাদ সংক্রান্ড় ভুল উপলব্ধির সাথেও– যে সম্বন্ধে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তারা বলে সংশোধনবাদ মানেই প্রতিক্রিয়াশীল। আর 'আজকের যুগে' 'CM-শিক্ষা'য় ভুল লাইন মানেই সংশোধনবাদ। অর্থাৎ, দাঁড়াচ্ছে গিয়ে, পার্টির ভেতরে ও বাইরে যে কোন ভুল লাইন, কেন্দ্র, সংগঠন ও সংগ্রামকেই তারা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবতে বাধ্য। ফলে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী লাইনের বাইরে বিভিন্ন মিত্র অসর্বহারা শ্রেণির যে অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের লাইন থাকে সে সবের বহনকারীদের সাথে মিত্রতা বা যুক্তফ্রন্ট গঠনের সুযোগ আর তাদের থাকে না। বিগত ২৫ বছরে তাদের প্রধানতম সংগ্রাম, পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামে তারা হোক্সাপন্থী হক-গ্র"পের সাথে এক সর্বব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। বিভক্ত একটা গ্র"পের তথ্য মতে এ সময়কালে পূবাকপা'র হাতে হক গ্র"পের ১৩০ জনের বেশি কর্মী-সমর্থক নিহত হন– যা হক-গ্র"পও পাল্টাভাবে করে। এই গুর"তর আত্মঘাতী কর্মকা" তাদের যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ড় ভুল নীতির সাথে পুরোপুরি যুক্ত।

এটা সত্য যে, হক-গ্র"পের এসব কর্মীর অনেকে প্রতিক্রিয়াশীল বা গণবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিল না তা নয়। সেটা কিন্তু পূবাকপা-তেও দেখা গেছে– তাদের স্বীকারোক্তি মতেই। গনেশ-লাল্টুরা তাদেরই লোক ছিল। কিন্তু এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে লিপ্ত পূবাকপা নেতা-কর্মীকে যখন অন্য কোন পার্টি খতম করে দেয় তখন কিন্তু তার সূত্র ধরেই পূবাকপা এক 'মহান সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম' শুর" করে দেয়। বহু ক্ষেত্রে তাদের লাইন গণশত্র"দের বির"দ্ধে জনগণের ব্যাপক ঐক্য গড়ার

বদলে এ জাতীয় পার্টিগত সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে যা জনগণের বিভক্তিই শুধু বাড়ায় না, গণশত্র" ও রাষ্ট্রের সুবিধাই শুধু করে দেয় না, বরং তা গণশত্র"দের এক পক্ষের বির"দ্ধে অন্য পক্ষের সাথে জোট বাধায় গড়ায়, বা এমনকি তাদের হাতিয়ারে পরিণত হবার পথেও তাদেরকে চালিত করে। বিভক্ত পূবাকপা'র বিভিন্ন কেন্দ্রের পারস্পরিক অভিযোগকে জড়ো করলে এর বহু অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হক-গ্র"পের মত সংশোধনবাদী ক্ষুদেবুর্জোয়া গ্র"প বা এ জাতীয় মতাদর্শের জনগণের সাথে অবৈরিতা বা সাময়িক/আংশিক মিত্রতার প্রশ্ন-তো আরো পরে, পূবাকপা তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্য কোন মাওবাদী বা গণতান্ত্রিক শক্তির সাথেই যুক্তফ্রন্ট লাইনে কাজ করেনি, সম্পর্ক গড়ে তোলেনি, এমনকি ভাল কোন সংযোগ-আলোচনাও গড়ে তোলেনি। এবং অন্য কেউ তা চাইলেও তারা নিজেদের দরজা-জানালাগুলো এমন শক্ত করে সেঁটে বসে থেকেছে যে, বারবার কড়া নেড়েও সাড়া পাওয়া যায়নি। এভাবে এই পার্টিটি, বলা যায়, পূর্ব বাংলার সমস্ড় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে ও নিজেদের 'বিশুদ্ধতা' বজায় রাখতে বিপুল সফলতা দেখিয়েছে।

পূবাকপা গণসংগঠনের ভুল লাইনের সাথে যুক্তভাবে প্রকাশ্য কাজ সম্পর্কিত বাম সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতিতে আক্রান্ড় যা সরাসরিভাবে যুক্তফ্রন্ট-প্রশ্নে তাদের বিচ্যুতিকে বাড়িয়ে তোলে। যখন তারা প্রকাশ্য গণসংগঠনের কাজ বর্জন করেছেন, তখন তারা কোন কৌশলগত কর্মসূচি আনতে বা তেমন কোন ঐক্য গড়তেও সক্ষম নন। এক্ষেত্রে নেপাল-গণযুদ্ধ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে– যদিও হুবহু নয়। নেপাল পার্টি "কৌশলগত তত্ত্ব"-এর গুর"ত্বের কথা বলে থাকে যা কিনা ব্যাপক শহুরে মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াকে পক্ষে টানার জন্য খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। এমনকি প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ব্যবহারেও এটা খুবই গুর"ত্ব ধরে। এসবই ফ্রন্ট-প্রশ্নের সাথে যুক্ত।

একই কারণে তারা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন বা জর"রী ইস্যুতে কোন যুক্ত আন্দোলন, ঐক্য, সমঝোতা বা যুগপৎ সংগ্রাম– এসব কোন বিষয়েই কখনো ছিল না, কখনো ঢুকতে পারেনি এবং কখনো ঢুকতে চায়ওনি। অথচ এসবই যুক্তফ্রন্ট লাইনের প্রয়োগের সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িত সমস্যা।

৪। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন

আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা থেকে মতপার্থক্য ব্যাপক। পূবাকপা পূর্ব বাংলাকে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ড়বাদী বলে মূল্যায়ন করে এবং পূর্বাপর সর্বদা সামন্ড়বাদের সাথে দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব বলেছে। বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে "আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ড়বাদী" অবস্থান ব্যাপকভাবে গৃহীত হলেও প্রধান দ্বন্দ্ব প্রশ্নে পূর্ব বাংলার সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে। '৭১-পূর্ব, '৭১ ও '৭১-পরবর্তী কিছু সময়ে জাতীয় সমস্যা ও জাতীয় দ্বন্দ্বের গুর"ত্বকে পূবাকপা কখনো আমল দেয়নি– যাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না।

আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি অতীতে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি

করেছিল বলে আমরা এখন মূল্যায়ন করি। কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে মতপার্থক্য এতে নিরসন হয়নি। এক্ষেত্রে দুটো মৌলিক দিক রয়েছে– (i) '৭১-পূর্ব ও '৭১-সালে জাতীয় সমস্যা ও '৭১-সালে ভারতীয় আগ্রাসনের সমস্যা; এবং (ii) পূর্ব বাংলার সমাজে নতুন পরিবর্তনগুলো, শ্রেণির রূপান্ড়রগুলো ও তার ভিত্তিতে প্রধান দ্বন্দ্ব ও কর্মসূচির প্রশ্নে কী পরিবর্তন প্রয়োজন সে বিষয়ে।

প্রথম বিষয়ে পূবাকপা, CM-শিক্ষাকে তারা যেভাবে নিয়েছে তা থেকে, পূর্ব বাংলার সমাজ ও ভারতের সমাজকে একাকার করে দেখতে বাধ্য। তা থেকেই তারা '৭১-পূর্বকালে জাতীয় সমস্যার বিশেষ গুর"ত্ব ও '৭১-সালে জাতীয় সংগ্রামের মূল্যায়নকে সঠিকভাবে কখনই আনতে পারেনি। তাদের এ রাজনৈতিক সমস্যার উৎস মতবাদিক– যা আমরা মতাদর্শ অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। পূর্ব বাংলার সমাজের এ বিশিষ্টতার প্রশ্নে ৬০-৭০ দশকে ক. SS গুর"ত্বপূর্ণ মতাদর্শগত সংগ্রাম করেন যাকে আমরা মূল্যবান বলে মনে করি। যদিও রাজনৈতিক লাইনে তিনি ডান বিচ্যুতি করেছিলেন, কিন্তু এটাও প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে, '৭১-সালে ও ভারতীয় আগ্রাস-নকালে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যকে পূবাকপা বুঝতে পারেনি। ঐ সময়কালেও তারা একঘেঁয়েভাবে শ্রেণি সংগ্রামের প্রাধান্যের কথাই বলে চলেছে। খোদ পূবাকপা-তেই এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যার খুব সুষ্ঠু ফয়সালা হয়েছে বলে আমরা জানি না। '৭২-সালে টিপু বিশ্বাস '৭১-এর মূল্যায়ন নিয়ে ঠিক কী বিতর্ক এ পার্টিতে এনেছিলেন তা আমরা জানি না। কিন্তু সে বিতর্ককে পুনর্জীবিত করা প্রয়োজন (টিপু বিশ্বাস পরে মাওবাদ ত্যাগ করেছেন বলেই '৭২-সালে তার বিতর্কটাও সংশোধনবাদী ছিল এমন সরলীকরণ লাইন-বিকাশে একটুও গ্রহণযোগ্য নয়)। এটা কেন প্রয়োজন তা বোঝা যাবে তাদের সাম্প্রতিককালের বিতর্কেও। '৯৯-সালে পাবনা-রিপোর্টেও যখন '৭১-এর কিছু বাস্ড়বতা ও সংগ্রামকে তুলে ধরা হয় তখন কেন্দ্রীয় স্ড়র থেকে তা সমালোচনার মুখে পড়ে। এ বিতর্ক বিভক্তির কারণে চাপা পড়ে গেলেও আমরা মনে করি এটা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ এক বিষয়। পূবাকপা'র এ ঐতিহাসিক বিচ্যুতি তাদের মতাদর্শগত লাইনের পুনর্গঠনের সাথেই জড়িত।

* কিন্তু পূর্ব বাংলার বিপ্লবে এখন যা বেশি গুর"ত্বপূর্ণ তাহলো আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত চরিত্র, মূল দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি বিশ্লেষণ, প্রধান দ্বন্দ্ব, কর্মসূচি– ইত্যাদি নির্ধারণ। ... ...

এ বিতর্ক আমাদের মতে খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ড় বাদী' অবস্থান ব্যাপকভাবে গৃহীত থাকলেও আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাওবাদীদের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য ও বিভিন্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। আমরা মনে করি, এর বস্তুগত উৎস নিহিত রয়েছে পূর্ব বাংলার সমাজের বাস্ড়ব পরিবর্তনগুলোর মাঝে, তার রূপান্ড়রের মাঝে। এগুলো প্রকাশিত হয়, মূল দ্বন্দ্ব ও মৌলিক দ্বন্দ্ব, প্রধান দ্বন্দ্ব, শ্রেণি বিশ্লেষণ, কর্মসূচি– এসব প্রশ্নে বিভিন্নমুখী চেতনা ও প্রবণতায়।

যেমন, পূবাকপা প্রায়ই বলে থাকে যে, প্রধান দ্বন্দ্ব হলো সামন্ড়বাদী ব্যবস্থার

সাথে কৃষক-জনগণের দ্বন্দ্ব। প্রশ্নটা হলো ব্যবস্থার কর্তৃত্ব করে শ্রেণি; ফলে শ্রেণিগতভাবে দ্বন্দ্বটা প্রকাশিত হতে বাধ্য। কিন্তু তাকে তীক্ষ্ণভাবে তুলে না ধরে কেন তারা ব্যবস্থার সাথে দ্বন্দ্বকে আনে? সামন্ড়বাদী ভূস্বামী শ্রেণির সাথে কৃষকের দ্বন্দ্ব প্রধান হলে সেভাবেই-তো তা তুলে ধরা উচিত। নাকি ব্যাপকভাবে সামন্ড়বাদী ভূস্বামী শ্রেণি তারা গ্রামাঞ্চলে পাচ্ছেন না?

আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সাথে শ্রমিক, জনগণ ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বন্দ্বও তারা দেখান। প্রশ্ন হলো– এটা-কি একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব? হলে তা-কি প্রধান দ্বন্দ্ব হতে পারে না? (প্রসঙ্গত ভারতের প্রধানতম মাওবাদী পার্টি PW-এর সাথে একীভূত হবার পূর্ব পর্যন্ড় বিহারে সক্রিয় PU গ্র"পটি এ দ্বন্দ্বকে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব বলতো)।

সমাজ বিকাশে মূল দ্বন্দ্ব কাকে বলবো এবং মৌলিক দ্বন্দ্বই-বা কী? মূল দ্বন্দ্ব ও মৌলিক দ্বন্দ্বের পার্থক্য কী? এবং প্রধান দ্বন্দ্বের সাথে মূল দ্বন্দ্বের সম্পর্ক কী?

সারা দুনিয়া জুড়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে ও ঘটছে যা কৃষিসহ সমগ্র অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটায়। এটা এক ধরনের পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়। ... ... শাসক শ্রেণি হিসেবে এ অবস্থায় সামন্ড়বাদী ভূস্বামী শ্রেণি কতটা গুর"ত্বপূর্ণ? শ্রেণির রূপান্ড়রগুলো কী ঘটেছে ও ঘটছে?

এসবসহ ব্যাপক প্রশ্ন রয়েছে যা অগ্রসর মাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মেথডলজি থেকে বিচার করতে হবে। আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে মাওবাদীরা-কি এসব প্রশ্নে সুস্পষ্ট ও মৌলিক ঐক্যে রয়েছেন– যারা আধা-সামন্ড়বাদ বলছেন? আমরা তা মনে করি না। তাই, আমরা মনে করি আধা-সামন্ড়বাদের সুগভীর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন– শুধুমাত্র তার সাধারণ উল্লেখ আদৌ যথেষ্ট নয়... ... ... ।

পূবাকপা'র বিভক্তির পর RF গ্র"পের দলিলে সুস্পষ্টভাবে লেখা হচ্ছে, আমাদের সমাজ চীনের মত নেই, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকসহ সর্বক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হলো পার্থক্যগুলো কী, এবং তা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূল্যায়নে পরিবর্তন প্রয়োজনীয় করে তুলেছে কিনা। না তুললে কেন?

... ... মাওবাদী আন্দোলনে আমরা যে-বিষয়টা তুলে ধরতে চাই তাহলো, চীন বিপ্লবের পর, এমনকি ৬০-৭০ দশকের পর, একটা দীর্ঘ সময় পার হয়েছে– যখন বিশ্বে পুঁজিবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের অনেক বিকাশ হয়েছে। যেমন, প্রযুক্তিগত এক বিরাট উল্লম্ফন ঘটেছে, বিশেষত যোগাযোগ ব্যবস্থায়। রাস্ড়াঘাট, সংবাদ মাধ্যম, ফোন, কম্পিউটারের মধ্য দিয়ে একদিকে শত্র"র ও অন্যদিকে জনগণের চেতনা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটে চলেছে যা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিরাট রূপান্ড়রেরই প্রকাশ। আমরা মনে করি, বিগত শতাব্দীর ৪০ দশকের চীন বা এমনকি ৬০-৭০ দশকের ভারতবর্ষের অবস্থায় চেতনাকে রেখে দিলে আমরা উপযুক্ত ও সঠিক লাইন নির্মাণ করতে পারবো না। এদেশের একটি গুর"ত্বপূর্ণ মাওবাদী শক্তি হিসেবে পূবাকপা-কে অবশ্যই এ পর্যালোচনা-বিতর্ক-2LS-এ সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। কিছু সনাতন লাইনের রক্ষণশীল উপস্থাপন এ জন্য যথেষ্ট-তো

নয়ই, বরং পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিপ্লবের জন্য অনুপযুক্ত হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে।

* শ্রেণি সংগ্রামের নামে জাতীয় সমস্যার উপর কম গুর"ত্বদানের ত্র"টি পূর্ব বাংলার নিপীড়িত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের প্রতি পূবাকপা'র মনোভাবেও প্রকাশ পায়। পূবাকপা'র ইতিহাসে তারা কখনো এ জাতিসত্তাসমূহের জাতীয় সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী ও গুর"তর সমস্যাকেও তারা খুব কমই address করেছে। অথচ আজকের বিশ্বের সকল অগ্রসর গণযুদ্ধে দেখা যায় এইসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণ বিপ্লবে এক বড় ভূমিকা রাখছেন। খুবই যান্ত্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূল্যায়নকে অতীতের মতই চালিয়ে যাবার সাথে তাদের এ দুর্বলতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেই ধারণা করা যায়।

৫। নারী-প্রশ্ন

মতাদর্শগত প্রশ্নে ও পার্টি-গঠনের সাথে অন্য একটি বিষয় জোরালোভাবে যুক্ত, তাহলো নারী-প্রশ্ন। পূবাকপা-য় ঐতিহাসিকভাবে এ প্রশ্ন খুবই উপেক্ষিত বলে মনে হয়। এই পার্টি তার সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের জীবনে নারী-প্রশ্নে খুব কমই আলোচনা করেছে। এমন একটি পার্টির থেকে এই সুদীর্ঘ সময়ে নারী-প্রশ্নে একটাও গুর"ত্বপূর্ণ লেখা আমাদের চোখে পড়েনি– শুধু এ তথ্যটিই অনেক কিছু প্রমাণ করে।

আজকের অগ্রসর গণযুদ্ধগুলোতে, এমনকি প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-গুলোতে পর্যন্ড় নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নারী-প্রশ্নের অতীব গুর"ত্বকে তুলে ধরে। কিন্তু মাওবাদীদের নিকট নারী-প্রশ্ন শুধু গণযুদ্ধে নারীর বৃহত্তর অংশগ্রহণের সমস্যাই নয়, বরং তার চেয়ে আরো উচ্চতর কিছু। এ প্রশ্নের মীমাংসা ছাড়া একদিকে যেমন বিপ্লবের এক শক্তিশালী বিশাল রিজার্ভ থেকে পার্টি বঞ্চিত হবে, তেমনি সমাজের এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবী রূপান্ড়রে ব্যর্থ হবে। অনিবার্যভাবে এর প্রভাব পড়বে পার্টির উপর। পার্টিতে হাজারো রকম বিচ্যুতি গড়ে উঠবে– যার মাঝে যৌনসমস্যাবলীও অন্যতম– যার প্রকাশ ঘটে একদিকে যৌন-নৈরাজ্য, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল সনাতন পরিবার-প্রথার সংরক্ষণ ও সমর্থনে। পূবাকপা-কে বিশ্বের অগ্রসর মাওবাদী চেতনা ও অনুশীলনের পথে নিজেকে স্থাপন করতে হলে অবশ্যই নারী-প্রশ্নকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

** পূবাকপা'র ঐতিহাসিক লাইনের পর্যালোচনার শেষ ধাপে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি। কিন্তু অন্য একটি অধ্যায়ের উপর আগামীতে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনাকে এখনি শুর" না করে এই রচনা শেষ করলে তা অসম্পূর্ণ থাকবে।

পূবাকপা বিভক্ত হয়ে গেছে প্রায় ৪ বছর হতে চলেছে। এ সময়ে তার তিনটি প্রধান কেন্দ্রে লাইন ও বাস্ড়ব কাজে বিশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে– যে সম্বন্ধে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক

উভয় ধরনই দেখা যাচ্ছে। চৌধুরী গ্র"প ও তপন গ্র"প দৃশ্যত তাদের সমস্ড় আদি লাইনকে চালিয়ে যাচ্ছে– যার পর্যালোচনা এই রচনায় করা হয়েছে। বিভক্তির পর বাস্ড়ব সংগ্রামে উভয় গ্র"পই রাষ্ট্রের উপর আক্রমণে জোর দিয়েছে (প্রধানত পুলিশ খতমের মাধ্যমে), অর্থনীতিবাদের সমস্যার কথা জোরালোভাবে বলছে, এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখল ও ঘাঁটির কথায় পুনরায় জোর দিচ্ছে। তেমনি অন্যদিকে তাদের পার্টি-গঠন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে নীতিহীনতার অনেক প্রকাশ দেখা যাচ্ছে– যা 'খতম চলছে চলবে' লাইনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের অন্যতম প্রকাশ হিসেবে এ্যাকশনবাদ ও সুবিধাবাদের থেকে উদ্ভূত। পার্টিগত সংঘর্ষ ও র"দ্ধদ্বার নীতিও তারা পূর্বের মতই চালাচ্ছে। তথাপি আমরা মনে করি লাইনই নির্ধারক, এবং এই গ্র"পগুলোর আদি মৌলিক লাইনগুলোর ত্র"টির উপর আসল মনোযোগ দিলে নতুন সমস্যাগুলোও উঠে আসবে। নতুবা এগুলোর সংশোধন সম্ভব নয়। বরং আরো আরো নৈতিক অধপতন এদেরকে গ্রাস করতে পারে, কারণ ভুল বা সঠিক কোনটাই একটা জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে না; তার বিকাশ ঘটে; এবং ভিতর থেকেই বস্তুর সামগ্রিক চরিত্র এক সময় বদলেও যায়।

বিভক্ত অন্য একটি গ্র"প হলো RF। এই গ্র"পটিতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে বিকাশ দেখা যাচ্ছে তাহলো, নিজেদের অতীত সম্পর্কে এক আমূল পর্যালোচনার প্রাথমিক চেতনা। এখনি তারা আমূল রূপান্ড়রিত হয়ে গেছে বা তেমনভাবে মৌলিক লাইনের সমস্যাগুলোকে ধরে ফেলেছে তা বলা যাবে না। এই জগতে তারা মাত্র প্রবেশ করেছে। কিন্তু গুর"ত্বপূর্ণ ইতিবাচক অগ্রগতি তাদের ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

যেমন, একমাত্র নিজেদেরকেই বিপ্লবী মনে করার সংকীর্ণতাবাদী জায়গা থেকে সরে আসা, মাওবাদী ও গণতান্ত্রিক অন্যান্য শক্তির সাথে সংঘর্ষের আত্মঘাতী লাইন-নীতির বর্জন, অন্যান্য মাওবাদী শক্তির সাথে সংযোগ-সম্পর্ক স্থাপন, কমপোসায় যোগদান, গণসংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্ড়, রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণে গুর"ত্ব দান প্রভৃতি। তারা চৌধুরী-নেতৃত্বাধীন পার্টির হারিয়ে যাওয়া বহু গুর"ত্বপূর্ণ দলিল উদ্ধার করেছে, দুই লাইনের সংগ্রামকে ছড়িয়ে দেয়া ও পার্টি-পরিচালনার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছে– এমন আভাসও পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব ইতিবাচক অগ্রগতি সত্ত্বেও এ কেন্দ্রটিও পূবাকপা'র ঐতিহাসিক লাইনের মৌলিক সারবস্তু থেকে এখনো Rupture করেনি, বরং ব্যাপকভাবে, প্রধানত ও মূলত ঐ লাইনই তারা অনুসরণ করছে– যে লাইন/নীতি সম্পর্কে আমাদের এই রচনা জুড়ে আমরা আলোচনা করেছি। ইতিমধ্যেই তারা যখন দরজা-জানালা খুলতে শুর" করেছে তখন বিশ্বের মাওবাদী আন্দোলনের বিবিধ প্রবণতা ও বিশিষ্ট লাইনের সংস্পর্শেও তারা আসছে– যা অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু যা বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ তাহলো তারা এসব থেকে কী শিখছে এবং তাদের নিজ লাইনে কী পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের (বা পুরনো লাইনের পুনর্জীবনের) সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো "গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের রণনীতি"র বিষয়টি যা খুবই গুর"ত্ব দিয়ে আলোচনার দাবি রাখে।

RF বলছে যে, এটা তাদের পার্টি কর্তৃক '৭৬-সালে (ক.চৌধুরী-নেতৃত্বাধীনে) গৃহীত রণনীতি– যা সুদীর্ঘ ২০ বছর ধরে পার্টিতে অনালোচিত ছিল; এবং '৯৬-সালে চৌধুরী যখন সম্পাদক তখন সিসি ও পার্টিতে ব্যাপক কোন আলোচনা ছাড়াই এ রণনীতি থেকে চৌধুরী তার নিজস্ব কায়দায় সরে যেতে থাকেন। এখন RF উক্ত রণনীতিটিকেই পুনর্জীবিত করার কথা বলছে। RF-এর নতুন মুখপত্র "লাল পতাকা"র ১নং সংখ্যায় (ডিসেম্বর, '০৩) এ বিষয়টি উত্থাপনের পাশাপাশি বেশ কিছু আলোচনাও আনা হয়েছে। তাতে বোঝা যায় RF তাদের লাইন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকেও অত্যন্ড় গুর"ত্ব দিচ্ছে– যার সাথে নিশ্চিতভাবেই রণনৈতিক পরিকল্পনা, সংগঠন ও সংগ্রামের পরিকল্পনা রচনা করাটা যুক্ত।

* '৭৬-সালে পূবাকপা ঠিক কীভাবে এই রণনীতি গ্রহণ করেছিল, কী তার ব্যাখ্যা ছিল তা আমরা জানি না। পূবাকপা'র কোন গ্র"পই তা এখন হাজির করতে পারছে না। তবে সে সময়ে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রণনীতি, তথা গ্রামে ঘাঁটি ও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর রণনীতি (যা পূবাকপা-তে 'এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতি' নামে পরিচিত, যা ক. CM প্রথম উত্থাপন করেছিলেন) থেকে তা-যে কম/বেশি পার্থক্য এনেছিল সেটা বোঝা যায় বিভক্ত কেন্দ্রগুলোর এখনকার ভাষ্যে। যেমন, RF বলছে '৯৬-দলিলে উক্ত রণনীতি থেকে চৌধুরী সরে যেতে শুর" করেন যখন তিনি একই দলিলে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতির কথাও বলেন। অন্যদিকে চৌধুরী গ্র"প তাদের জুলাই, '০৩ বর্ধিত সভার দলিলে এ প্রশ্নে সারসংকলনমূলক বক্তব্য হাজির করছে এই বলে যে, অতীতে ঘাঁটি-প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর রণনীতি থেকে পার্টির সংগ্রাম সরে গিয়েছিল যা ভুল ছিল– যদিও চৌধুরী সরাসরিভাবে '৯৬-দলিলের সমন্বয়বাদের কোন মূল্যায়ন পেশ করেননি।

'৯৬-দলিলে একদিকে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতির কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের কথাটিও বলা হয়েছে। একে RF এখন বলছে সমন্বয়বাদ– দুটো রণনীতির মাঝে মিল-মিশ করে সমন্বয়বাদী বক্তব্য দেয়া।

এ থেকে দেখা যায় যে, গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের রণনীতিটিকে RF একটা পৃথক রণনীতি হিসেবে তুলে ধরছে– যা এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রণনীতি থেকে ভিন্ন। পরিহাসের বিষয় হলো, ক. CM-এর সব চাইতে গুর"ত্বপূর্ণ অবদানগুলোর মাঝে একটা ছিল এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বা রণনীতি– যাকে RF এখন বদলে দিচ্ছে, পৃথক রণনীতির কথা বলছে, অথচ তারা কিন্তু CM-শিক্ষাকে পূর্বের মত করেই পার্টির মতাদর্শের প্রায় কাছাকাছি করে তুলে ধরাটা অব্যাহতই রেখেছে। এই স্ববিরোধিতার উপর আমরা পরে আরো কথা বলবো; তবে প্রথমে আসা যাক RF

* MBRM সম্পাদক ক. শাহীনের নামে প্রচারিত একটি নিবন্ধ (আগষ্ট,০৪) আমাদের হাতে এসেছে যাতে এই গ্র"পটি RF-কে আলোচ্য রণনীতিক সূত্রায়নের জন্য সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করেছে। নিঃসন্দেহেই RF-এর সূত্রায়নটিকে আমরাও সমালোচনা করছি, এমনকি এ বছরের প্রথমার্ধে RF-এর সাথে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠকেই আমরা মৌখিকভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরি। কিন্তু

উত্থাপিত এই রণনীতির বিষয়টাতে।

* এটা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন। কারণ, রণনীতি নির্ধারণের উপর নির্ভর করে একটা পার্টি বিপ্লবের জন্য কীভাবে সজ্জিত হবে, কীভাবে লড়াই-এ আগাবে এবং খোদ পার্টিকেই-বা কীভাবে গড়ে তুলবে। অর্থাৎ, এটা পার্টি-গঠন, সংগ্রামের তথা গণযুদ্ধের নির্দিষ্ট লাইন ও পার্টির রণনৈতিক পরিকল্পনাসহ মৌলিক বিষয়াবলীর সাথে জড়িত এক অতি গুর"ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লাইনের সমস্যা। এ রণনীতির উৎস সম্পর্কে RF এখন বলছে দুটো কথা (১) '৭৬-সালেই পার্টি কর্তৃক নির্ধারিত রণনীতি এটা– যাকে চৌধুরী-নেতৃত্বাধীনে পার্টি গুর"ত্ব দিয়ে সামনে আনেনি; (২) সম্প্রতি কমপোসা-য় যোগদানের পর তার অন্যতম সদস্য নেপাল পার্টির সাথে আলোচনায় তারা গণযুদ্ধের সাথে অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করার একটা ধারণা পেয়েছে যাকে তারা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে।

নেপাল-পার্টি আজকের বিশ্বে সব চাইতে অগ্রসর একটি গণযুদ্ধে নেতৃত্ব করছে। সুতরাং যুদ্ধ ও রণনীতি প্রশ্নে তাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই গুর"ত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত– যদিও নেপাল পার্টি বলছে বলেই সেটা সঠিক হবে এমন দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদ সম্মত নয়। নেপাল পার্টি RIM-এর গুর"ত্বপূর্ণ সদস্য, যার সদস্য আমাদের পার্টিও। তাই, RIM-এর মাধ্যমে ও দ্বিপাক্ষিকভাবে সুদীর্ঘ ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের কারণে নেপাল পার্টির লাইন ও সর্বশেষ বিকাশগুলো সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা রয়েছে তা থেকে আলোচ্য বিষয়ে আমরা কিছু কথা এখানে বলতে পারি।

নেপাল পার্টি ২০০১ সালে তাদের ২য় সম্মেলনে অনেক গুর"ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ড়ের সাথে রণনীতির প্রশ্নে তাদের কিছু নতুন ধারণা প্রকাশ করে– যার সারমর্ম হলো গণযুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের রণনীতিকে সংযুক্ত করা। এটা Fusion তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বের মাওবাদী আন্দোলনে এটা এখন আলোচিত হচ্ছে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ– তথা গ্রামে ঘাঁটি ও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও– এই প্রক্রিয়াকে তা বাতিল করে না, তবে একে নতুন ধরনে পেশ করে যার গুর"ত্বপূর্ণ দিক হলো এর সাথে নগরভিত্তিক অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করা। এ বিষয়ের উপর বিস্ড়রিত

MBRM-এর সমালোচনাটি থেকে আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে চাই, কারণ এতে তারা RF-এর লাইনকে বাস্ড়বসম্মতভাবে বিশ্লেষণ না করে নেহায়েত যুক্তিবাদী কায়দায় আত্মগত অভিযোগ তাদের উপর আরোপ করেছে যা বাস্ড়বে স্থূল একতরফাবাদী অপপ্রচারে পর্যবসিত হয়েছে। উপরন্ত এই গ্র"পটি তার জন্ম থেকেই আন্ড়র্জাতিক বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংশোধনবাদী, এমনকি প্রতিবিপ্লবী বলার বাতিকে ভুগছে। আর তারা এমন আন্ড়র্জাতিক শক্তির বাস্ড়ব ভুলকেও অতিরঞ্জিত করে থাকে। RF তাদের অতীত বহু সমস্যাবলী থেকে বের"তে চাইছে, এবং তা করার প্রক্রিয়ায় তারা এ প্রশ্নে গুর"তর এক ভুল পথে পা বাড়িয়েছে, যা আবার তাদের পার্টিতে অতীত থেকেই বজায় ছিল। একে কমরেডসুলভভাবে দেখিয়ে দেয়া প্রত্যেক অগ্রসর মাওবাদীর দায়িত্ব। MBRM তা-তো করেই নি, বরং এর সাথে আবার স্বভাবসিদ্ধভাবে 'আ. ক. সংশোধনবাদ'-কে জড়াচ্ছে– যা অবশ্য তাদের পুরনো অসুখ। সর্বত্রই 'আ. ক. সংশোধনবাদ' দেখা এবং সর্বত্রই তাকে জুড়ে দেয়া! তবে এক্ষেত্রে আরো গুর"ত্বপূর্ণ কারণ অবশ্যই রয়েছে– RF এবং আমাদের পার্টি উভয়েই কমপোসা'র সদস্য– যাকে MBRM প্রকাশ্যে নিন্দা ও বিরোধিতা করেছে। তাই, RF-কে সংশোধনবাদী বলার পাশাপাশি আমাদের পার্টিকেও জুড়ে দেয়াটা তাদের জন্য স্বাভাবিকই হয়েছে।

আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়, তবে এর মূল উৎসরূপে তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। নেপাল-পার্টি উত্থাপিত নতুন ধারণাটি একটি নতুন রণনীতি, নাকি দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের (দীগযু) রণনীতিরই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ– সেটা এখনো পর্যালোচনাধীন ও বিতর্কাধীন। কিন্তু ধারণাটি মোটেই গ্রামে ঘাঁটি ও দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মৌলিক নীতিমালাকে (যেমন– যুদ্ধের তিন স্তর) বাতিল করে না। খোদ নেপালের গণযুদ্ধ আজকের পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে মূলত গ্রামে ঘাঁটি ও দীগযু'র রণনীতির পথ ধরেই, অবশ্য তার যান্ত্রিক অনুসরণে নয়, বরং নেপাল-পার্টি কর্তৃক তার সৃজনশীল প্রয়োগ ও বিকাশের মধ্য দিয়ে।

পূবাকপা "গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের" যে নতুন রণনীতির কথা বলছে তার ব্যাখ্যা কী? খুব একটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তারা দেননি, তবে এটা বলেছেন যে, এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের রণনীতি থেকে এটা পৃথক রণনীতি।

গ্রাম-শহরে অভ্যুত্থান যদি একটি নতুন রণনীতি হয়, এবং তা যদি এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের রণনীতি থেকে পৃথক রণনীতি হয় তাহলে দীগযু'র রণনীতি কার্যত বাতিল হয়ে যায়। নেপাল-পার্টি কিন্তু তা কখনো বলেনি। তারা বলেছে দীগযু'র সাথে অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করার কথা। গণযুদ্ধের সাথে অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করা এক ব্যাপার, আর গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থান হলো ভিন্ন ব্যাপার। বাস্তবেই এটা পৃথক রণনীতি– যদিই বা একে কোন রণনীতি বলে গ্রহণ করা যায়। তাই, আমরা বলতে পারি যে, নেপাল-পার্টির কিছু মনোভাবকে RF সমর্থন করতে চাইলেও উপসংহারে তারা যে সূত্রায়ন করেছে সেটা নেপাল পার্টি কর্তৃক অনুসৃত ও অনুশীলনে এ পর্যন্ত প্রমাণিত রণনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

* অবশ্য আমরা লক্ষ্য করছি, RF তাদের এই পত্রিকাতেই দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা সংগ্রাম, বাহিনী গঠন, রণনৈতিক অঞ্চলকে আঁকড়ে ধরে গেরিলা অঞ্চল গড়ে তোলা, এমনকি অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা– এসব কিছুকেও তুলে ধরেছে। বলছে, এসবের মধ্য দিয়েই দেশব্যাপী জোয়ার, উত্থান, অভ্যুত্থান ইত্যাদি– এভাবে আগাবে। তাই, এখনি বলা যাচ্ছে না, RF দীগযু'র রণনীতিকে বাতিল করে দিয়েছে, যা কিনা MBRM নেতৃত্ব বলেছেন তার এক সাম্প্রতিক সমালোচনাপত্রে– কিন্তু এটাও সত্য যে, তাদের নতুন সূত্রায়ন উক্ত রণনীতিকে দুর্বল করে দিতে বাধ্য– সচেতন বা অসচেতনভাবে।*

গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের বক্তব্য এ কারণেও ভুল যে, অভ্যুত্থান হয় মূলত নগরভিত্তিক– গ্রামেও তার বিস্তার থাকতে পারে, থাকা উচিতও, কিন্তু নগর হয় তার কেন্দ্র। তবেই সেটা শত্রুর ক্ষমতা-কেন্দ্র নগরকে দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী ক্ষমতা দখল করতে পারে। সুতরাং, RF উত্থাপিত এ রণনীতি তাদের নিজেদেরই গ্রাম প্রধান, কৃষক প্রধান, কৃষি বিপ্লব, গ্রামে গেরিলা অঞ্চল ও অস্থায়ী ঘাঁটি– এ সবকিছুর সাথে স্ববিরোধ সৃষ্টি করে।

গ্রাম-শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থানের বক্তব্য ভুল এ কারণেও যে, এটা গ্রামে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, গণযুদ্ধের সূচনা থেকেই তার সারবস্তু হিসেবে ঘাঁটিকে আঁকড়ে ধরা– এই মূল প্রশ্নকে

গুরুত্বহীন/দুর্বল করে দেয়। ফলে ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার গুরুত্বকেও তা দুর্বল করে দিতে বাধ্য।

এভাবে এমন এক স্ববিরোধিতার মধ্যে RF প্রবেশ করেছে যা লাইনের দিক থেকে নিজেকে এক সমন্বয়বাদী লাইন হিসেবে হাজির করেছে। এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে– যদি না এর সংশোধন হয়। যদিও নেপাল-পার্টি কর্তৃক উত্থাপিত কিছু সঠিক চেতনা ও ধারণাকেও RF গুরুত্ব দিতে চাচ্ছে– যাকে আমাদের পার্টিও সমর্থন করে। কিন্তু সঠিক রণনীতির ভিত্তিতেই তাকে উন্নত করা যায়– রণনীতি থেকে সরে গিয়ে নয়। যে রণনীতির মূল প্রশ্ন গ্রামে ঘাঁটি। এ থেকে বিচ্যুতিই অন্য সমস্ত সমস্যার উৎস। তাই, তার উপর আরো কিছুটা আলোচনা দরকার।

* RF তাদের মুখপত্র 'লাল পতাকা'র ১ম সংখ্যায় এমন কিছু কথা বলেছে– এই 'নতুন' রণনীতিকে ন্যায্য করার জন্য– যা তাদের ঐক্যবদ্ধ পার্টির '৯৬-দলিলেও ছিল, এবং ধারণা করা যায়, '৭৬-সালে তাদের এই ভুল সূত্রায়নের সময়ও যা আলোচিত হয়েছিল। এই বক্তব্যগুলোর সারমর্ম হলো, পূর্ব বাংলা চীনের মত নয়, দুর্গম অঞ্চল নেই বা কম, ছোট দেশ, সুতরাং এখানে স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে উঠবে না, অস্থায়ী চরিত্রের ঘাঁটি হবে– ইত্যাদি। এখন RF বলছে– দেশব্যাপী গেরিলা যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে হবে, গেরিলা অঞ্চল গড়ে উঠবে, কিন্তু স্থায়ী ঘাঁটি হবে না– ইত্যাদি।

এই সব বক্তব্যের মাঝে অনেক তথ্যই সঠিক (যেমন, ছোট দেশ, দুর্গম এলাকা কম, সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ... ইত্যাদি)। কিন্তু এর লাইনগত সারমর্মের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে, 'ঘাঁটি' ... ... 'সম্ভব নয়"– এমন একটি প্রবণতাই এই সমস্ত কথা সবচেয়ে জোর দিয়ে তুলে ধরে।

আমাদের পার্টিতে এমন নেতিবাচক অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। আসলে পূর্ব বাংলার সমাজের উপরোক্ত বিশেষত্বগুলো সামরিক প্রশ্নের সাথে যুক্তভাবে ক. SS-ই সর্ব প্রথম এদেশে তুলে ধরেন এবং গণযুদ্ধের তত্ত্বকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগের চেষ্টা চালান। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন তাহলো, দেশব্যাপী বিস্তারে একতরফাভাবে জোর দেয়া, এবং সূচনা থেকেই ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরে গণযুদ্ধ শুরু ও বিকাশ না করা। আমরা এর সারসংকলন করি এভাবে যে, '৭৩/'৭৪-সালের উত্থানের, এমনকি ৮০-দশকের শেষার্ধে পুনউত্থানের ব্যর্থতার অন্যতম মৌলিক কারণ ছিল এটা– ঘাঁটি থেকে বিচ্যুতি, যদিও তার তাত্ত্বিক স্বীকৃতি সর্বদাই আমাদের ছিল। এই বিচ্যুতি আমাদের বাহিনী গঠন ও সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পূবাকপা ঐতিহাসিকভাবে CM-শিক্ষাকে এত-যে গোঁড়ামিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল তা সত্ত্বেও তারা CM-এর এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের রাজনীতির মূল তাৎপর্যকে কখনই ধারণ করতে পারেনি। যা হলো ঘাঁটির তাৎপর্য, শুরু থেকেই তাকে কেন্দ্র করে কাজ করা– যাকে RIM বলে থাকে "ঘাঁটি হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু"। এ প্রশ্নে বিচ্যুতি হলো এদেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক বিচ্যুতি। পূবাকপা তাদের

এ বিচ্যুতির কারণেই সুদীর্ঘ বছর ধরে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যে কোন এলাকায় খতম-সংগ্রাম করেছে, বিকাশ ঘটিয়েছে, মার খেয়েছে, আবার সেখানে বা নতুন এলাকায় তা-ই করেছে। এবং এভাবে করেই চলেছে। ফলে এই খতম-সংগ্রাম যতনা হয়েছে CM-লাইনে ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম, তার চেয়ে বেশি পর্যবসিত হয়েছে অর্থনীতিবাদী বা সংস্কারবাদী-এলাকাবাদী সশস্ত্র তৎপরতা, যা অবধারিতভাবে আরো অধপতনে পার্টির কাজকে টেনে নিয়েছে– সমরবাদ ও এমনকি গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলতায় পর্যন্ড়। সুতরাং পূবাকপা'র সংগ্রামের সমগ্র সমস্যাকে বিচার করতে হলে সুগভীরভাবে তাকে ঘাঁটি-প্রশ্নের সাথে যুক্তভাবে দেখতে হবে। কারণ, ঘাঁটি প্রশ্ন শুধু সামরিক বিষয় নয়, গুর"তর রাজনৈতিক প্রশ্ন।

এখন RF তাদের পার্টি-বিকাশের নতুন পর্যায়ে যখন অতীত ভুল-ভ্রান্ড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যা খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক ও ইতিবাচক, তখন তারা এই মৌলিক প্রশ্নটিকে একদিকে অতীত ভুলের বিকশিত তাত্ত্বিক সূত্রায়ন করে CM-শিক্ষার মাওবাদী রণনীতি থেকে সরে যাচ্ছে, অন্যদিকে আবার ছড়ানো স্বতঃস্ফুর্ততাবাদের ভুল সংশোধনের জন্য গেরিলা অঞ্চল গড়ার লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার অর্ধেক সঠিক পথে এগিয়েছে। ফলে তাদের লাইনে ও পরিকল্পনায় পুনরায় স্ববিরোধ ও সমন্বয়বাদ দেখা যাচ্ছে। তারা অতীতে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের সঠিক রাজনীতির ভুল উপলব্ধির ফলে সংকীর্ণ এলাকাবাদী-অর্থনীতিবাদী-স্বতঃস্ফুর্ততাবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে– এভাবে বাম সংকীর্ণতাবাদী রূপে গুর"তর ডান বিচ্যুতি করেছে যা ঘাঁটি প্রশ্নকে ধরতে পারেনি। আর এখন তা থেকে বের"বার জন্য দেশব্যাপী ছড়ানো ও রণনৈতিক পরিকল্পনাধীনে কাজ করার সঠিক শিক্ষার নামে ঘাঁটি-গঠনের গুর"ত্বকে কমিয়ে দিচ্ছে। এভাবে ভিন্নরূপে ডান বিচ্যুতিই চর্চা করছে। উভয় ক্ষেত্রে সারবস্তুগত অভিন্ন ভুল জায়গাটা হলো ঘাঁটি-প্রশ্নকে না বোঝা।

RF বলতে পারে যে, স্থায়ী ঘাঁটি সম্ভব নয় একথা বলেছি মাত্র– অস্থায়ী ঘাঁটির কথাতো মানছিই, আর গেরিলা অঞ্চলকে-তো দৃঢ়ভাবেই ধরেছি। আসলে ভুলটা এখানেই। "স্থায়ী" ঘাঁটি কথাটা খুবই আপেক্ষিক। পৃথিবীর কোন ঘাঁটিই স্থায়ী নয়। এমনকি ইয়েনানও এক সময় মাওকে ছাড়তে হয়েছিল। তাই, শক্তিশালী শত্র"র ঘেরাও-এ ঘাঁটির অস্থায়ী চরিত্র স্বাভাবিক। কিন্তু ঘাঁটি হলো ঘাঁটি– যেখানে শত্র"র ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটি রণনৈতিক অঞ্চল জুড়ে এমন ক্ষমতা যত স্বল্পস্থায়ীই হোক না কেন তা ঘাঁটি। এবং এটাই গণযুদ্ধের প্রাণ। এই অগ্রসর উপলব্ধির কারণেই ৮০-দশকে পের"তে, এবং এখন নেপালে গণযুদ্ধের এত দ্র"ত বিকাশ ঘটেছে। যা আমরা অন্য কিছু মাওবাদী গণযুদ্ধে সেভাবে দেখি না– যেখানে ঘঁ-াটির বদলে গেরিলা অঞ্চলকে রণনৈতিক গুর"ত্ব দেয়া হয়েছে এবং দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, কাজে কাজেই বাহিনী ও যুদ্ধের বিকাশকে, পেছনে টেনে রাখা হয়েছে। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী দেশেও ঘাঁটির রণনৈতিক গুর"ত্বের প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে– যাকে RCP ব্যাপক আলোচনা করেছে ও করছে। এ সব প্রশ্নে RIM-এ যে অগ্রসর উপলব্ধি সূত্রায়িত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা নিয়ে RIM-বহির্ভূত মাওবাদী শক্তির সাথে RIM সুদীর্ঘ লাইন-সংগ্রাম চালাচ্ছে। ভারতের PW ও MCC, বা ফিলিপাইনের CPP সুদীর্ঘকাল ধরে

গণযুদ্ধ চালিয়ে গেলেও এ প্রশ্নে তাদের দুর্বল উপলব্ধির সাথে RIM-এর পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী লাইন-সংগ্রাম চলেছে। কেন-যে আমরা, RIM-পন্থীরা নেপাল-গণযুদ্ধকে সবচেয়ে অগ্রসর গণযুদ্ধ বলে থাকি তা বোঝাটা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। নেপাল গণযুদ্ধের সবচেয়ে বড় গণবাহিনীই এর মূল কারণ নয়, বরং যে অগ্রসর লাইন ও চেতনা এ বৃহৎ গণবাহিনী সৃষ্টির উৎস সেটা হলো গুর"ত্বপূর্ণ। ফিলিপাইন, PW, MCC'র সংগ্রামে অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘস্থায়ীত্ব, সুদীর্ঘ ক্রমান্বয়বাদী বিকাশ– এ সবের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তাদের ঘাঁটি ও গেরিলা অঞ্চল সম্পর্কিত ধারণা। RF ইতিমধ্যেই যে সব যুক্তি এনেছে তা ঘাঁটির উপর জোর প্রদানের বদলে বরং ঘাঁটি-যে স্থায়ীভাবে সম্ভব নয়, তা-যে চীনের মত করা যাবে না, সেজন্য গেরিলা অঞ্চলের উপর জোর দিতে হবে– এ সবের উপরই গুর"ত্ব দিয়েছে। এ সবের সাথে তারা তাদের অতীত ভুল সূত্রায়নকে জুড়ে দিয়েছে। এ সব কিছুই দুর্বল করছে ঘাঁটি-প্রশ্নকে, দীগযু-কে ও সাধারণভাবে গণযুদ্ধের উপলব্ধিকে। আমরা আশা করবো অগ্রসর আন্ড়র্জাতিক অভিজ্ঞতা জানা/বোঝার ইতিবাচক ধারাকে RF আরো এগিয়ে নেবে এবং ঘাঁটি-প্রশ্নে তাদের ঐতিহাসিক দুর্বলতা ও তার বিকশিত রূপে বর্তমানে যুগপৎ অভ্যুত্থানের রণনীতির ভুল লাইনকে শুধরে নেবে।

নিশ্চয়ই ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার রণনীতির সাথে দেশব্যাপী গণযুদ্ধ গড়া বা ছড়ানোর দৃশ্যত একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে, যার সঠিক মীমাংসা ছাড়া ভিন্ন ধরনের এলাকাবাদী বিচ্যুতি আসতে পারে। নিশ্চয়ই চীনের মত নয় পূর্ব বাংলার সমাজ– ভৌগোলিকভাবে-তো বটেই, সময়ের পার্থক্যের সাথে সাথে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের মৌলিক ক্ষেত্রেও বলা যায়। সুতরাং অবশ্যই সৃজনশীলভাবে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের লাইনকে প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে গণযুদ্ধের সাথে নগরকেন্দ্রীক জাতীয় রাজনীতি, গণসংগ্রাম, কৌশলগত কর্মসূচি ও অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করার অবশ্যই বিশেষ গুর"ত্ব রয়েছে। কিন্তু এসব কিছুই করা প্রয়োজন দীগযু-এর রণনীতিকে ভিত্তি করে– যার মৌলিক উপাদান হলো গ্রামে ঘাঁটি। আমরা আশা করবো RF এ প্রশ্নকে গুর"ত্ব সহকারে এখনি আঁকড়ে ধরবে।

উপসংহার

এ রচনা শেষ করার আগে একটা মন্ড়ব্য করা অতিরঞ্জিত হবে না মনে করি– তাহলো, লাইন-প্রশ্নে, সমগ্র পূবাকপা ধারা এক আগ্নেয়গিরির উপর বসে রয়েছে। শত্র"র হিংস্র দমনে বীরোচিত সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ– তা নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু আত্মত্যাগের পথেই সব শেষ হয় না। বেশি ভয়ংকর হলো লাইনগত অধপতন। তার আলামত ব্যাপকভাবেই দেখা যাচ্ছে। RF-গ্র"পটি নিজেকে পর্যালোচনার জগতে আনলেও তার মুখপত্রের প্রথম সংখ্যাটিতেই পার্টির কেন্দ্রীয় কাজ নিয়ে বহু মত প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের উপরের লাইন-পর্যালোচনার ভিত্তিতে পূবাকপা-কে অবশ্যই তার আশু কেন্দ্রীয় কাজকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে– যেমনি কিনা ক্রমবর্ধিত শত্র"-দমনে নিজেকে রক্ষা করার উপায় বের করতে হবে। নিবেদিত প্রাণ অভিজ্ঞ ও নবীন বিপ্লবীগণ পাহাড়সম সাহসের সাথে এ সমগ্র কাজকে এগিয়ে নিবেন এটাই আমরা আশা করি।

শেষ করার আগে পুনরায় আমাদের নিজ পার্টি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক মনোভঙ্গির কথা আমরা পুনউল্লেখ করতে চাই। আমরা কোন উঁচুমন্যতার মনোভাব থেকে এই

পর্যালোচনায় হাত দেইনি। সম্পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি মাওবাদী পার্টির লাইনকে আমরা আলোচনা করেছি– MLM-এর ভিত্তিতে– যা কিনা আমাদের উভয় পার্টির অভিন্ন মতাদর্শ। আমাদের নিজেদেরও MLM-উপলব্ধির দুর্বলতা এই পর্যালোচনায় নিঃসন্দেহেই থাকতে পারে। যে কোন আন্তর্জাতিক মাওবাদী– তা দেশের বা বিদেশের হোক না কেন– তা ধরিয়ে দিলে আমরা তা শুধরে নেবো। তবে যতক্ষণ আমাদের উপলব্ধিতে তা MLM-সঙ্গত, ততক্ষণ তাকে আমরা তুলে ধরবো।

পূবাকপা ও PBSP– এদেশের দুটো প্রধান মাওবাদী স্রোতকে প্রতিনিধিত্ব করে। আজ– নতুন শতাব্দীর শুরুতে– দুটো স্রোতই বহুধা বিভক্ত। এর বাইরেও আরো প্রবীণ ও নবীন মাওবাদী শক্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে, এবং প্রত্যেকের মাঝেই কম/বেশি ভুলের সমাবেশ ছিল, এখনো রয়েছে। নতুবা মাওবাদীরা এমনভাবে বিভক্ত হতেন না এবং এদেশের মাওবাদী আন্দোলন এমন একটা সংকটজনক অবস্থায় পড়তো না। তাই, আমরা যে পথে এতদিন চলেছি তার সম্পূর্ণ পর্যালোচনা প্রয়োজন– যার যার জায়গা থেকে– তার সাথে Rupture প্রয়োজন এবং উচ্চতর এক নতুন ও সঠিক মাওবাদী লাইনে একটি নতুন ধরনের ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী পার্টি গঠন করা প্রযোজন– যে লাইন ও পার্টি চলমান বিপ্লবী সংগ্রামকে সঠিক ভিত্তিতে ও সঠিক পথে এগিয়ে নিতে পারবে, এবং একটা সফল গণযুদ্ধ এদেশে জাগিয়ে তুলতে পারবে। এটা আপাতভাবে খুবই দুরূহ সমস্যা মনে হলেও বাস্তবে তা এতটা দুঃসাধ্য নয়। কারণ, বিপ্লবী পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিপক্ক। শাসক শ্রেণি অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। জনগণ বুর্জোয়া রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ; তারা নতুন রাজনীতির সন্ধান করছেন। সংশোধনবাদীরা উন্মোচিত এবং তাদের সাথেও ব্যাপক বিপ্লবাকাংখী, আমূল পরিবর্তনকামী ও সমাজতন্ত্রমনা কর্মী যুক্ত রয়েছেন যারা একটা শক্তিশালী বিপ্লবী বিকল্প চান। প্রচুর মাওবাদী বিপ্লবী এদেশে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মাওবাদী অগ্রসর অভিজ্ঞতা আমাদের সামনেই রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মাওবাদীরা বর্ধিত বেগে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন– বিশেষত নেপালে। জাতিগত আন্দোলনও এ অঞ্চলে সুতীব্র। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা এক নতুন সংকটে ঢুকছে; নতুন এক বিপ্লবী ঢেউ-এর আগমন বার্তা শোনা যাচ্ছে। এমন অবস্থায় একটি সঠিক লাইন অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠতে পারে এবং সারা দেশকে প্লাবিত করতে পারে। তেমন একটা কর্মযজ্ঞে এদেশের সকল আন্তর্জাতিক মাওবাদীকে, বিশেষত নতুন প্রজন্মের বিপ্লবীদেরকে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। পুরনো পার্টিগুলো এবং অভিজ্ঞ নেতা ও কর্মীগণ এই কাজে নেতৃত্বকারী ভূমিকা রাখতে পারেন যদি তারা পার্টিজান মনোভাব ত্যাগ করে বৃহত্তর পরিসরে মাওবাদী আন্দোলন পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে ব্রতী হন। আমাদের পার্টি এই লক্ষ্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা আশা করি পূবাকপা'র নেতা ও যোদ্ধারা এই মনোভাব গ্রহণে এগিয়ে আসবেন, এবং আমাদের এই পর্যালোচনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও কমরেডসুলভভাবে গ্রহণ করবেন। তাহলেই ইতিহাস-প্রদত্ত দায় আমরা শুধতে পারবো এবং নতুন অগ্রগতির পথে হাঁটতে সক্ষম হবো। ❑

বাংলাদেশে মাওবাদ অনুশীলনের অভিজ্ঞতা এবং মাওবাদ রক্ষা ও বিকাশের সমস্যা

(নভেম্বর, ২০০৪)

বাংলাদেশে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় ষাটের দশকের শেষার্ধে– যা কিনা বিশ্বের আরো বহু দেশের জন্যও প্রযোজ্য। মাও সেতুঙের নেতৃত্বে চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাবে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তবে শুরু থেকেই এদেশের মাওবাদী আন্দোলন বহুধা বিভক্ত ছিল। আমাদের পার্টি ছিল এ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা– যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার। আমাদের পার্টির বাইরে আরো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারা শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল– যে ধারাগুলো নিজ নিজ পথেই বিকশিত হয়েছে– যেমনি আমাদের পার্টিও হয়েছে। এখনো আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলন সেই বিভক্তির ধারাকে অতিক্রম করতে পারেনি। তাই, বাংলাদেশে মাওবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতা হলো এদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে আংশিক। এদেশের মাওবাদী আন্দোলনকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করার কাজ অল্প কিছু সময় ধরে শুরু হয়েছে– যাতে আমাদের পার্টি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। তবে এখনো তার সংশ্লেষণ সম্পূর্ণতা পায়নি। তাই, আমাদের পক্ষে প্রধানত আমাদের পার্টির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই ভালভাবে যাচাই করা সম্ভব– যদিও সমগ্র অন্দোলনের অন্যান্য শিক্ষাকেও আমরা এ নিবন্ধে যতটা সম্ভব যুক্ত করার চেষ্টা করবো।

* বাংলাদেশে মাওবাদী আন্দোলনের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান পর্বে ভাগ করা যায়। এর প্রথম পর্বটি হলো ষাট/সত্তর দশকের বিশ্ব বিপ্লবের উত্তাল সময়কালের পর্ব। এ সময়েই মাওবাদী আন্দোলন এদেশে শিকড় গাড়ে, এবং বলা যায় কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন প্রথম স্বতন্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এদেশে গড়ে ওঠে। এর দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হয় এই বিপ্লবী উত্থানের বিপর্যয়ের পর, বিশেষত '৭৬-সালে মাও-মৃত্যুর পর বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামগ্রিক বিপর্যয়কালে। যে পর্বটি চলতে থাকে বিগত শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত। আর তৃতীয় পর্বটি গত শতাব্দীর শেষে বা এ শতাব্দীর শুরু থেকে আরম্ভ হয়েছে। যদিও এই প্রতিটি পর্বকে বেশ কিছু উপ-পর্বে (পর্যায়ে) ভাগ করা যায়, তবুও মাওবাদের রক্ষা এবং তার উপলব্ধির ও বিকাশের ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসকে উপরোক্ত তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত করাটাই ভাল হবে।

মাওবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত প্রথম পর্বটি হলো মাওবাদকে (তৎকালে মাও চিন্তাধারাকে) মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ, এবং মাওবাদের ভিত্তিতে

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করার সময়কাল। এ পর্বে প্রধান সমস্যা ছিল মাওচিন্ড়াধারাকে গ্রহণ, তথা তাকে আমাদের আন্ড়র্জাতিকতাবাদী সর্বহারা মতাদর্শের তৃতীয় স্ড়র হিসেবে গ্রহণের সমস্যা। প্রকৃত মাওবাদীরা বাদেও সেই উত্তাল সময়ে প্রগতিশীল অনেক বামপন্থী মাওকে তুলে ধরেছিল বটে, মাওচিন্ড়াধারার কথাও অনেকে বলেছিল, কিন্তু মাওচিন্ড়াধারাকে মতাদর্শের তৃতীয় স্ড়র হিসেবে তারা গ্রহণ করেনি। এই অংশটা অচিরেই একে একে মাওচিন্ড়াধ-ারাবিরোধী হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করা শুর" করে। এমনকি মাওচিন্ড়াধারাকে তৃতীয় স্ড়র হিসেবে গ্রহণকারীদের মাঝেও ছিল উপলব্ধির ব্যাপক অসমতা ও দুর্বলতা। সুতরাং মৌলিক সমস্যা ছিল মতাদর্শের তৃতীয় স্ড়র হিসেবে মাওবাদকে গ্রহণ করার সমস্যা। এটাই ছিল MLM-রক্ষা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রথম পর্বের প্রধানতম সমস্যা।

এর সাথেই যুক্ত বিষয় ছিল MLM-এর সৃজনশীল প্রয়োগের সমস্যাটি। যে বিষয়ে মহামতি লেনিন বহু আগেই উল্লেখ করেছিলেন, মার্কসবাদ বেদবাক্য নয়, কর্মপরিচালনার গাইড। মাও এ তত্ত্বকে আরো গভীরতা দান করেন দর্শনের ক্ষেত্রে তার অবদানের মাধ্যমে– দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা ও জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায়। সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের বিশিষ্টতা প্রয়োগ করলে আমরা দেখি যে, প্রতিটি দেশের সমাজ অন্য দেশের সমাজ থেকে পৃথক; আর সময়ের অগ্রগতির সাথে প্রতিটি সমাজই বদলে যায়– যদিও একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগে সমাজগুলোর মাঝে মৌলিক অভিন্নতাও রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের সমাজে MLM-কে সৃজনশীল প্রয়োগের প্রশ্নে এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে শুর" থেকেই বিতর্কের উদ্ভব ঘটে। চীন বা ভারতের মত একই ধরনের সমাজ বলে হুবহু একই লাইন নিয়ে আসার একটা গোঁড়ামিবাদী প্রবণতা ও বিচ্যুতি সূচনা থেকেই এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে বিরাজমান ছিল– যা প্রকাশ পাচ্ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক লাইনের ক্ষেত্রে। কমরেড সিরাজ সিকদার এই বিচ্যুতির বির"দ্ধে সংগ্রাম করেন।

কিন্তু উপরোক্ত গোঁড়ামিবাদের বির"দ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ও সৃজনশীলভাবে MLM প্রয়োগ করতে গিয়ে ক. সিরাজ সিকদারের মাঝে বিপরীত ধরনের বিচ্যুতি আমরা লক্ষ্য করি। এটা রাজনৈতিক লাইনে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি আনে– যা কিনা MLM-এর মূলনীতির গভীর উপলব্ধি ও তার প্রতি দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে দুর্বলতার সাথে যুক্ত ছিল।

সুতরাং এ প্রথম পর্বে একদিকে গোঁড়ামিবাদ, অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদ বা প্রয়োগবাদ– এই উভয় ধরনের সমস্যা থেকে আমাদের মাওবাদী আন্দোলন মুক্ত হতে পারেনি। যার ফলস্বরূপ, এ পর্বে গৌরবময় সংগ্রাম সত্ত্বেও বিপ্লব সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। এ সময়ে মাওবাদকে ভালভাবে উপলব্ধি ও আয়ত্ত্ব করায় দুর্বলতা থেকে যায়। মাও-এর নয়াগণতন্ত্র ও গণযুদ্ধের তত্ত্বকে, এবং চীন-বিপ্লবপূর্ব মাও-এর দার্শনিক অবদানগুলোকে গ্রহণ ও প্রয়োগের চেষ্টা হলেও প্রকৃতপক্ষে GPCR-কালে মাও কর্তৃক মতাদর্শের সর্বাঙ্গীণ গুণগত বিকাশকে ততটা গভীরভাবে আয়ত্ত্ব করা যায়নি। এমনকি নয়াগণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কৃষি-বিপ্লবের সমস্যাকে জোরালোভাবে আঁকড়ে ধরা যায়নি– একাংশের মাঝে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির ঝোঁকের জন্য; আর অন্য অংশের

মাঝে সনাতন অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদের থেকে Rupture না হয়ে কৃষক-সমস্যাকে ধরার কারণে। তেমনি গণযুদ্ধের প্রশ্নেও উপলব্ধির ব্যাপক দুর্বলতা ছিল। গণযুদ্ধের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক প্রকৃতি ও তাৎপর্যে যতনা গুর"ত্ব দেয়া হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি গুর"ত্ব দেয়া হয়েছিল সংগ্রামের সশস্ত্র রূপের উপর। এলাকা-ভিত্তিক ক্ষমতাদখল তথা ঘাঁটি-প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্রে রেখে সশস্ত্র সংগ্রামকে প্রধান করে গণলাইন, গণভিত্তি, গণসংগ্রাম, গণসংগঠনসহ গণযুদ্ধকে এক ব্যাপক গণ-রাজনৈতিক তৎপরতা হিসেবে পরিচালনার বদলে গেরিলা লড়াই-এর উপর একতরফা জোর প্রদান করা হয়। অন্যদিকে স্বতঃস্ফুর্ত তৎপরতার মধ্যদিয়ে সনাতন বা নতুন রূপে সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী বা সংস্কারবাদী বিচ্যুতি ঘটে যা বিপ্লবী রাজনীতিকে দুর্বল করে। একদিকে বিশেষ অবস্থার যুক্তিতে গণঅভ্যুত্থানের/দেশব্যাপী ছড়ানোর কথা বলে গণযুদ্ধে ঘাঁটির তাৎপর্যকে সঠিকভাবে বোঝা হয়নি ও আঁকড়ে ধরা হয়নি। অন্যদিকে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের নামে গুর"তর এলাকাবাদী তৎপরতা গড়ে তোলা হয় যা ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার কোন পরিকল্পনার বদলে স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশের পথে কাজ করতে থাকে।

তাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাওবাদ গ্রহণের এই প্রথমাবস্থায় বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের নামে অথবা গোঁড়ামিবাদী ধরনে MLM-এর মূল নীতির কিছু মৌলিক প্রশ্নে আমাদের আন্দোলন বিচ্যুত হয়। উপরন্তু GPCR-এর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মাওবাদকে ভালভাবে উপলব্ধি ও আয়ত্ত্ব করতে না পারায় দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গি, পার্টি-গঠন, শ্রেণি-লাইন, গণলাইন, ফ্রন্ট ও মেথডলজীসহ মৌলিক প্রশ্নাবলীতে দুর্বলতা ও বিচ্যুতি দেখা দেয়। এবং একটি অগ্রসর মাওবাদী পার্টি-গঠন ও বিপ্লব নির্মাণে ব্যর্থতা আসে।

* '৭৬-সালে মাও-মৃত্যুর পর চীনে তেং-হুয়া চক্র ক্ষমতা দখল করে মহান চীনা পার্টিকে সংশোধনবাদে অধপতিত করে; অন্যদিকে আলবেনিয়ার হোক্সা স্ট্যালিনের পক্ষাবলম্বনের যুক্তিতে মাওবাদের উপর এক সার্বিক আক্রমণ চালায়। ইতিমধ্যেই ষাট-সত্তর দশকের বিশ্বব্যাপী গণউত্থানে বিপর্যয় ও ভাটা নেমে এসেছিল– যা উপরোক্ত ঘটন-াবলীতে পূর্ণতা পায়। মাওবাদী আন্দোলন বিশ্বব্যাপী এক সার্বিক বিপর্যয়ে পতিত হয়– যা থেকে বাংলাদেশের আন্দোলনও মুক্ত ছিল না। বাস্ড়বে এদেশে প্রথম পর্বের মাওবাদী বিপ্লবী উত্থান '৭৫-সালের প্রথমার্ধেই সম্পূর্ণ বিপর্যস্ড় হয়ে পড়ে। '৭৬-পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী নতুন মতাদর্শগত মহাবিতর্কের কালে এদেশেও ব্যাপকভাবে দলত্যাগ, অধপতন, বিভ্রান্ড়ি ও হতাশা নেমে আসে। সকল ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের আক্রমণের মুখে মাওবাদকে রক্ষার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে। যার প্রধান রূপ তখন হয়ে দাঁড়ায় বিগত মাওবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রামের সমর্থন, পক্ষাবলম্বন ও রক্ষা করার প্রশ্ন। পূর্বতন মাওবাদীদের একটা অংশ GPCR-এর বির"দ্ধে তেং-পন্থাকে সমর্থন করে ও সংশোধনবাদী তিনবিশ্ব তত্ত্বকে মাও-এর ঘাড়ে চাপায়। অন্যদিকে তিনবিশ্ব তত্ত্ব ও তেং-পন্থাকে বিরোধিতার অজুহাতে অন্য এক বড় অংশ মাও ও GPCR-এর উপর আক্রমণ চালায়। এ উভয় পক্ষের সাধারণ আক্রমণস্থল ছিল দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ, GPCR ও মাওবাদ। এই জটিল সংকটজনক সময়ে

আমাদের দেশের স্বল্পসংখ্যক মাওবাদী বিপ্লবী দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের তত্ত্ব ও বিগত সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ান। আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কে তারা তেং-পন্থা ও হোক্সাপন্থার বিপরীতে GPCR ও মাওবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। এ সময়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রকৃত মাওবাদী বিপ্লবীদের নতুন মের"করণের প্রক্রিয়ায় আমাদের পার্টিসহ এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের বৃহৎ অংশ RIM-এ ঐক্যবদ্ধ হয়, যা আবার দেশীয় ক্ষেত্রে মাওবাদ রক্ষায় বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

আমরা যখন আজ পিছন ফিরে এই দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে যাই, তখন দেখা যায় যে, GPCR-এর শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম পর্বের চেয়ে উচ্চতর উপলব্ধিই মাওবাদকে রক্ষার ক্ষেত্রে মাওবাদীদেরকে সক্ষম করে তুলেছিল। বাস্তবে MLM-কে রক্ষা করার সংগ্রাম এই উপলব্ধিকে গভীর করার প্রয়োজন সৃষ্টি করেছিল এবং এ লাইনগত সংগ্রামই তাকে এগিয়ে দেয়। এ সময়ে দর্শন (দ্বন্দ্ববাদ), সমাজতন্ত্র (সর্বহারা একনায়কত্বাধীনে অব্যাহতভাবে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া), পার্টি (2LS-এর মধ্যদিয়ে বিকাশ) প্রভৃতি সম্পর্কে মাও-এর অবদানকে মাওবাদীরা গভীরতরভাবে আয়ত্ত করতে থাকেন। কিন্তু গণযুদ্ধের প্রশ্নে পূর্বতন লাইনে কিছু গুর"ত্বপূর্ণ সংস্কার ছাড়া উপলব্ধিতে গুণগত অগ্রগতি হয়নি। এমনকি উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নেও মাওবাদের উপলব্ধি ও প্রয়োগে দুর্বলতা বজায় থাকে। এইসব অগ্রগতি ও দুর্বলতা উভয়েরই প্রকাশ ঘটে ৮০ ও ৯০-দশকে এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের নতুন উত্থানে– যা মাওবাদকে রক্ষা করে, প্রথম পর্বের মাওবাদী বিপ্লবী ঐতিহ্যকে রক্ষা করে, তার লাইনগত বিকাশ ঘটায় এবং নতুন বিপ্লবী উত্থানও ঘটায়; কিন্তু পাশাপাশি কিছুদূর এগিয়ে এ উত্থান পুনরায় বিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

এই পর্বে মাওবাদী আন্দোলনকে রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুর"ত্বপূর্ণ ছিল একদিকে বিপ্লবী লাইনকে রক্ষা ও পাশাপাশি তার বিকাশ সাধনের বিষয়টি। প্রথম পর্বের পরাজয়ের পর যখন প্রধান কাজ ছিল মাওবাদকে বর্জন করার বিলোপবাদকে সংগ্রাম করা, তখন মাওবাদী আন্দোলনে একটা শক্তিশালী ধারা হিসেবে দেখা দেয় প্রথম পর্ব সম্পর্কে একটা বিশুদ্ধতাবাদী ধারা। এটা বলতে থাকে আমাদের লাইন ঠিক, সুতরাং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই। শত্র"-দমনে, নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে বা বিশ্বাসঘাতকতায় অথবা প্রয়োগের বিচ্যুতি/দুর্বলতায় সংগ্রাম বিপর্যস্ত হয়েছে। এই ধারাটি প্রথম পর্বের লাইনকে এমনভাবে উত্থাপন করতে থাকে যা কিনা পার্টির মতাদর্শের সমপর্যায়ে বা তার কাছাকাছি ধরনে তাকে স্থাপন করতে থাকে। SS-শিক্ষা বা CM-শিক্ষার নামে এই চেতনা নিজেকে প্রকাশ করে। এ অবস্থায় বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলনকে একদিকে SS/CM/প্রথম পর্বের বিপ্লবী অবদানকে রক্ষা করতে হয়েছে; অন্যদিকে তাদের অসম্পূর্ণতা/দুর্বলতা/বিচ্যুতিকে অতিক্রম করার কাজকে হাতে নিতে হয়েছে। অবশ্য মাওবাদী আন্দোলনে শক্তিশালী ধারা হিসেবে উপরোক্ত বিশুদ্ধতাবাদী লাইন থেকে গিয়েছিল এবং এখনো তা রয়েছে– যা কিনা পুরনো পরাজিত বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির এক নিষ্ফল চেষ্টায় মতাদর্শগত-রাজনৈতিকভাবে ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে; নতুবা গোঁ-

াড়ামিবাদী ধরনে বিপ্লব-বিচ্ছিন্ন কথামালার মাওবাদে পরিণত হয়েছে। যাহোক অগ্রসরমান ধারাটি প্রথম পর্বের সারসংকলনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী লাইনকে বিকশিত করার ফলেই আন্দোলনের পুনগতি সঞ্চার হয়েছে, এবং লাইন নতুন উচ্চতর লেবেলে উন্নীত হয়েছে। যদিও আরো পরে, এই দ্বিতীয় পর্বেরও বিপর্যয়কর সমাপ্তির পরে আমরা আজ বলতে পারি যে, উপরোক্ত সারসংকলন অতীত লাইন থেকে Rupture করতে পারেনি, এবং ফলে কিছু কিছু নতুন দুর্বলতাকেও তা সৃষ্টি করেছিল– ফলে এ দেশের বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত সামগ্রিক একটি সঠিক লাইনের নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকে। আর বিপ্লবের পুনঃবিপর্যয়ের ফলস্বরূপ হতাশা, বিভ্রান্তি, অধপতন, বিশ্বসঘাতকতা– এসব কিছুর পাশাপাশি ব্যাপক বিভক্তিও মাওবাদী আন্দোলনে গড়ে ওঠে। এদেশের মাওবাদী আন্দোলন এ অবস্থায় প্রবেশ করেছে নতুন শতাব্দীতে– যখন কিনা MLM-এর উচ্চতর উপলব্ধির প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক অগ্রসর অভিজ্ঞতা ও ধারণাগুলো থেকে বিনয়ের সাথে ও সৃজনশীলভাবে শেখার প্রশ্ন এবং নতুন উচ্চতর স্তরে একটি সঠিক লাইন নির্মাণের প্রশ্নাবলী জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়েছে– যার ভিত্তিতে মাওবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রামের সামগ্রিক পুনর্গঠন জর"রী। এভাবে আন্দোলন প্রবেশ করেছে তৃতীয় পর্বে।

চলমান পর্বটি, বলা যায়, বিগত শতকের প্রথম থেকেই শুর" হয়েছিল, যখন আমাদের পার্টি গণযুদ্ধের এদেশীয় নির্দিষ্ট লাইনের ক্ষেত্রে অতীত থেকে রাপচার শুর" করে এবং মাওবাদ সূত্রায়ন গ্রহণ করে– যদিও মাওবাদের উচ্চতর উপলব্ধির ক্ষেত্রে তখনো দুর্বলতা ছিল, এবং মাওচিন্তাধারার বদলে মাওবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিছক সূত্রায়ন বদলের পশ্চাদপদ চেতনাও তাতে বেশ পরিমাণে বিরাজমান ছিল। এ পর্বটি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে ও এ শতাব্দীর শুর"তে। তাই এখনি এ পর্বের উপর কোন চূড়ান্ত মূল্যায়ন টানার সময় আসেনি। তবে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে মালেমা রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু নতুন অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

এদেশে মালেমা প্রয়োগের অতীত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে (যার মাঝে গুর"তর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে) পার্টির মতাদর্শের মত করে তুলে ধরার একটা ধারা অতীত থেকেই এখানে বিরাজমান ছিল, যা এখন নতুন রূপে দেখা যাচ্ছে। এটা মালেমা-এর ভিত্তিতে আমাদের আন্দোলনের সারসংকলনকে বাধাগ্রস্থই শুধু করে না, খোদ মালেমা-কেও দুর্বল করে দেয়। এমনকি অজান্তে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নিয়ে আসে।

আমাদের দেশের অতীত মাওবাদী আন্দোলনে বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে শুধু সশস্ত্র রূপের উপর একতরফাবাদী জোর প্রদানের বিচ্যুতি এখন এমন কিছু তত্ত্বগত লাইনে নিজেকে প্রকাশ করছে যা স্থূলভাবে মালেমা-কে সশস্ত্র সংগ্রাম বা গণযুদ্ধের অধীনস্থ করে ফেলে। অর্থাৎ, সশস্ত্র সংগ্রামকেই মালেমা-বাদী মূল্যায়নের একমাত্র মানদ" করে ফেলে। এভাবে মালেমা-কে গুর"তরভাবে দুর্বল করে ফেলে।

এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে ঘাঁটি-প্রশ্নে ঐতিহাসিক দুর্বলতা এখন কোন কোন পক্ষ থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, যখন দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ-র সাথে অভ্যুত্থানের সমন্বয়ের সঠিক নীতির ভুল উপলব্ধি এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের মূলগত লাইন থেকে সরে

যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও মালেমা রক্ষার প্রশ্নটি প্রকাশিত হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ-র মাওবাদী তত্ত্বের সমর্থনের মধ্য দিয়ে।

মালেমা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পক্ষাবলম্বনের নামে এদেশের উপযুক্ত মূর্ত-নির্দিষ্ট লাইন নির্মাণ, এবং মালেমা ও বৈদেশিক অভিজ্ঞতার সৃজনশীল প্রয়োগের অর্থাৎ, এগুলোকে দেশীয় পরিস্থিতির সাথে ফিউশন ঘটাবার জন্য বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামকে কার্যত নেতিকরণের একটা ধারাও বিরাজমান। এটা মালেমা রক্ষার সংগ্রামকে অবনমিত করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তত্ত্বালোচনায়।

এছাড়া, একদিকে মাওবাদের পক্ষাবলম্বন, আর অন্যদিকে সনাতন অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী বিচ্যুতিকে বহন করে চলা– এমন একটি ধারাও বিরাজমান– যা আমাদের মত দেশে যত দ্রুত সম্ভব গণযুদ্ধ সূচনা করাকে রণনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে এখনো কার্যত আয়ত্ত করতে পারেনি।

সংশোধনবাদী ধারাগুলো– যেগুলো এখন এদেশে তত্ত্বগতভাবে ও বস্তুগত শক্তিতে দুর্বল এবং বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উন্মোচিত– তাদেরকে সংগ্রামের পাশাপাশি উপরোক্ত বিচ্যুতিগুলোকে সংগ্রাম করাটা মাওবাদ রক্ষার জন্য এখন গুরুত্বপূর্ণ।

* বিগত সময়কালে এদেশের MLM-ist আন্দোলনে মাওবাদকে রক্ষা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তথা বিপ্লবী লাইন বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতার কিছু সারসংক্ষেপ নিম্নোক্তভাবে করা যায়–

আমরা যখন MLM-এর রক্ষার কথা বলি, তখন তার সঠিক উপলব্ধি হলো প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ উপলব্ধি ছাড়া তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। MLM-কে গ্রহণ করার কথা বলা, আর MLM-ist হওয়া এক কথা নয়– যা প্রায়ই দেখা যায়।

কিন্তু এই উপলব্ধি আবার জড়িত তার প্রয়োগের সাথে। এর অর্থ হলো, বিপ্লবী অনুশীলনের মধ্য দিয়েই শুধু মতবাদের উপলব্ধি গভীর থেকে গভীরতর হতে পারে এবং তাকে রক্ষা করাও সম্ভব হয়। MLM হলো প্রথমত বিপ্লবের বিজ্ঞান, এবং মাও-এর ভাষায়, নাশপাতি খেয়েই শুধু নাশপাতির স্বাদ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা যায়; অর্থাৎ, বিপ্লব করেই শুধু বিপ্লবের মতবাদ MLM সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যায়। এবং তাকে রক্ষা করা যায়।

বাংলাদেশের মাওবাদী আন্দোলনে মাওবাদের উপলব্ধি ও রক্ষায় তারাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, যারা তার প্রয়োগের বিপ্লবী অনুশীলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। বিপ্লবী অনুশীলন না করে, তার সাথে তত্ত্বকে সংযুক্ত না করে, তার প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত না করে MLM-এর উপলব্ধি ও সুরক্ষা হতে পারে না। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি যান্ত্রিক ও একতরফাবাদী ধারণা, প্রবণতা, বিচ্যুতি ও ধারা এই দেশের বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলনে ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান– যা এখনো প্রবল। লাইন আছেই, সমস্যা শুধু প্রয়োগে– এমন ধারার স্থূল প্রয়োগবাদ লাইনের গতিশীলতাকে বাস্তবিকপক্ষে বাতিল করে দেয়। ফলে লাইনের বিকাশকে রুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে MLM-রক্ষার কাজকে দুরূহ করে তোলে। লাইনের বিকাশ হলো অভিজ্ঞতার সারসংকলন ও সংশ্লেষণের কাজ। যা

তত্ত্বগত কাজের গুরুত্বকে নিয়ে আসে। সুতরাং MLM-রক্ষার ক্ষেত্রে তত্ত্বগত কাজের গুরুত্ব অপরিসীম– যা এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন ধারার মাঝে ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত থেকেছে। নিজেদের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে লাইনকে বিকশিত করা, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া এবং তত্ত্বগত অধ্যয়ন-গবেষণাকে গভীর করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা উপরোক্ত সমস্যার সাথে যুক্ত।

MLM-এর প্রয়োগ সৃজনশীল; তা যান্ত্রিক বা গোঁড়ামিবাদী নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজগুলো পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন– তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, সংস্কৃতি, ভূগোল– এগুলো পৃথক; এবং সময় নিয়ত বহমান– যার সাথে সাথে প্রতিটি সমাজ আবার নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই, MLM-এর বিশ্বজনীন সাধারণ মতবাদকে বিভিন্ন দেশে সৃজনশীলভাবেই শুধু প্রয়োগ করা যায়। এভাবে দেশে দেশে বিপ্লবী প্রয়োগের মধ্য দিয়ে MLM বিশেষ রূপ ধারণ করে– যার কথা মাও বলেছিলেন– যা সংশ্লিষ্ট দেশে বিপ্লবের বিশিষ্ট কর্মসূচি, রণনীতি, কৌশল– প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের মাওবাদী আন্দোলনে– অন্য সব দেশের মতই– গোঁড়ামিবাদ MLM-এর বড় ক্ষতি করেছে। গোঁড়ামিবাদী ধরনে MLM-এর রক্ষার চেষ্টা তাতে ব্যর্থ হয়। এই ধারাটি বিপ্লবী অনুশীলনের বিশিষ্টতার সাথে তত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটায় না। ফলে তত্ত্বের/MLM-এর সাধারণ আলোচনা হয় বাস্তব বিচ্ছিন্ন– যা নির্দিষ্ট বিতর্কের কোন মীমাংসা করে না এবং কখনই উচ্চতর কোন সংশ্লেষণ ঘটায় না। এভাবে এটা লাইনের বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়।

কিন্তু MLM–এর সৃজনশীল প্রয়োগ অবশ্যই জটিল ও কষ্টসাধ্য। তা MLM–এর নীতি থেকে বিচ্যুতির ঝুঁকিও সৃষ্টি করে– যা আবার MLM–রক্ষার সংগ্রামে একটা মৌলিক সমস্যা হিসেবে সর্বদাই বিরাজ করে।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, MLM-এর রক্ষা MLM-এর সঠিক উপলব্ধির সাথে যুক্ত, আর MLM-এর উপলব্ধি তার সৃজনশীল প্রয়োগের সাথে যুক্ত। MLM-এর রক্ষা, আর তার সৃজনশীল প্রয়োগ একটা দ্বন্দ্ব। এর সঠিক মীমাংসা MLM-রক্ষা ও তার বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোঁড়ামিবাদী ও যান্ত্রিকভাবে MLM-কে রক্ষা করা যায় না, আবার MLM-এর মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে তার সৃজনশীল প্রয়োগ হয় না। সুতরাং, MLM-কে রক্ষা ও প্রয়োগের জন্য তার মূলনীতিকে জানা ও তার পক্ষাবলম্বন করা, বিপ্লবী অনুশীলনের সাথে এই সব তত্ত্বকে সংযুক্ত করা এবং বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার সৃজনশীল বিকাশ সাধন হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই পর্যন্ত এসে যে সমস্যা উদ্ভূত হয় তাহলো MLM-এর নীতি বলবো কাকে– যা থেকে বিচ্যুতির অর্থ MLM থেকেই বিচ্যুতি? আর কাকেই-বা বলবো তার সৃজনশীল প্রয়োগ ও বিকাশ। এ দুয়ের মাঝে বিতর্ক অন্তহীন যা বিশ্ব বিপ্লবের বিকাশ ও কমিউনিজমে উপনীত হবার মাধ্যমেই শুধু মীমাংসা হতে পারে। এখানে MLM-এর বিকাশ সাধনের প্রশ্নে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সংক্ষেপে কিছু ধারণা তুলে ধরতে পারি।

* MLM হলো বিজ্ঞান, বিপ্লবের বিজ্ঞান– যা অন্য সব বিজ্ঞানের মতই বিকাশশীল। বাস্ড়বে বিকাশ না ঘটিয়ে MLM বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসেবে তার জীবন্ড় চরিত্র বজায় রাখতে পারে না। এ কারণেই মার্কসবাদ এক সময়ে ML-এ বিকশিত হয়েছে, এবং পরে বিকশিত হয়েছে MLM-এ। সুতরাং, মাওবাদী হিসেবে যা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে তাহলো MLM বিকশিত হতে বাধ্য– বিশ্ব বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ও তার প্রয়োজনে– প্রথমত বিশ্ব বিপ্লবের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে; দ্বিতীয়ত অতীতের সর্বহারা বিপ্লবগুলোর সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও বিচ্যুতির সারসংকলনের মধ্য দিয়ে। যে দুটো আবার একটি অপরটির সাথে যুক্ত সমস্যা।

কিন্তু MLM-কে রক্ষার প্রধান সমস্যা তার যথার্থ উপলব্ধি ও সঠিক প্রয়োগের সমস্যা, তার বিকাশের সমস্যা নয়– যদিও তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিক। MLM বিকাশের জন্য আমরা বিপ্লব করি না, বরং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে MLM বিকশিত হয়। অর্থাৎ MLM-কে বিকশিত করে তারপর বিপ্লব করি না, বরং MLM-এর ভিত্তিতে বিপ্লব শুর" করি এবং বিপ্লবের প্রয়োজনে, বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে MLM বিকশিত হয়। অবশ্য MLM-এর এ বিকাশ স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঘটে না, আপনাআপনিই হয় না। বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সারসংকলন ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, কষ্টসাধ্য চিন্ড়া-গবেষণা-বিতর্কের প্রক্রিয়ায় তা সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু যা বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ তা হলো বিপ্লবের সমস্যা সমাধানে শুধুমাত্র MLM-এর প্রয়োগই তার বিকাশ ঘটাতে পারে। কারণ আমরা যখন MLM-এর বিকাশের কথা বলি, তখন MLM-এর কথাই বলি, অন্য কিছুর নয়।

কিন্তু, পূর্বেই যা আলোচনা হয়েছে, আর আমাদের দেশের মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও হলো এই যে, লাইনের বিকাশ ছাড়া বিপ্লবী লাইনকে রক্ষা করা যায় না। রক্ষা ও বিকাশ একটা দ্বন্দ্ব– যার সঠিক মীমাংসার উপরই নির্ভর করে লাইনের সঠিক বিকাশ হবে ও তার মাধ্যমে বিপ্লব রক্ষা হবে, নাকি বিকাশের নামে বিপ্লব থেকে বিচ্যুতি সৃষ্টি হবে ও শেষ পর্যন্ড় বিপ্লব ব্যর্থ হবে। MLM-এর বিশ্বজনীন মতাদর্শের ক্ষেত্রে একই কথা খাটে। MLM-এর বিকাশই MLM-কে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু সে বিকাশ কীভাবে ঘটতে পারে ও আমরা কীভাবে তাকে দেখবো সেই প্রশ্নের মীমাংসা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। বিকাশের সমস্যা আর নীতি থেকে বিচ্যুতির সমস্যা প্রায়ই বিভ্রান্ড়িকর।

MLM-এর নীতির বিষয়টা কী? এটা এক ব্যাপক ও জটিল বিষয়, এবং সর্বদাই এক উর্বর বিতর্কের ক্ষেত্র। তা সত্ত্বেও তার মূল ভিত্তিটা হলো গুর"ত্বপূর্ণ– যা তার সকল নীতির উৎস। MLM হলো সর্বহারা বিপ্লবের বিজ্ঞান যার দর্শন হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। সুতরাং MLM-এর অখ"নীয় মূল নীতি হলো বিশ্ব ব্যাপী শ্রেণিহীন সমাজ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা। সর্বহারা বিপ্লব একটি বিশ্ব বিপ্লব, সর্বহারা শ্রেণি হলো আন্ড়র্জাতিক শ্রেণি, বিশ্বব্যাপী যার স্বার্থ অভিন্ন; সুতরাং আন্ড়র্জাতিকতাবাদ– আদর্শে, রাজনীতিতে ও সংগঠনে– হলো তার মতাদর্শের মৌলিক উপাদান। এবং যেহেতু MLM বিপ্লবের বিজ্ঞান, তাই তা বলপ্রয়োগ তথা বিপ্লবী একনায়কত্বের নীতির ভিত্তিতে

প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এইসব মূল নীতির মীমাংসা অবশ্যই সরল নয়। বিগত দেড়শ' বছরের বেশি সময় ধরে মার্কসবাদ বিকশিত হয়েছে অসংখ্য ভুল চেতনা, ধারণা, নীতি, কৌশল– প্রভৃতির বির"দ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যা কেন্দ্রীভূত হয়েছে চূড়ান্ড়ভাবে তত্ত্বগত সংগ্রামে। সুতরাং এই সুদীর্ঘ সময়কালে মার্কসবাদের ভা"ার স্ফীত হয়েছে অনেক গুর"ত্বপূর্ণ তত্ত্ব দ্বারা– যা MLM-এর নীতিগত ভিত্তিকে স্থাপন করেছে। তাই, MLM–এর রক্ষা মানে তার মৌলিক তত্ত্বাবলীর সমর্থন ও পক্ষাবলম্বন করা ও তার ভিত্তিতে MLM-কে বিকশিত করা।

কিন্তু তত্ত্বও শ্বাশত নয়; বহু তত্ত্ব চূড়ান্ড় নয় এবং তত্ত্বও বিকাশশীল। অনেক আপাত সঠিক তত্ত্ব সময় ও পরিস্থিতির বিকাশের মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। তার মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির স্বার্থে তাকে বদলে নিতে হয়। অন্যদিকে মূলগত সঠিক তত্ত্বাবলীতে অসম্পূর্ণতা থাকে, এমনকি কখনো কখনো কিছু কিছু ভুল উপাদান যুক্ত থাকে। তাই নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি হয়ে MLM-এর ভা"ারকে শুধু স্ফীতই করে না, সময়ে সময়ে তা পুরনো তত্ত্বকে Negate করে উচ্চতর স্ড়রে মূলগত তত্ত্বকে উন্নীত করে।

তাই, MLM-এর বিকাশের প্রশ্নে মাওবাদীদেরকে অবশ্যই "মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে যন্ত্রটাকে চালু করতে হবে"– মাও যেমনটা শিখিয়েছেন। বিপ্লবী মাওবাদীদেরকে চিন্ড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাহসী হতে হবে, গবেষণা-বিতর্ক চালাতে অগ্রণী হতে হবে– সর্বহারা বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া ও তার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনকে সামনে রেখে। বিপ্লবী লাইন, তত্ত্ব, মতবাদ সেটাই যা সর্বহারা শ্রেণির আন্ড়র্জাতিক স্বার্থকে ও সর্বহারা শ্রেণির বিশ্ব বিপ্লবকে এগিয়ে দেবে– যার মীমাংসা তত্ত্বগত বিতর্ক-সংগ্রামে প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন করতে হলেও এর চূড়ান্ড় সমাধান সম্ভব বিপ্লবী অনুশীলনের অগ্নিপরীক্ষায়।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে সর্বহারা বিপ্লব রূপ নিচ্ছে দেশ-ভিত্তিক। তাই, বিশ্ব বিপ্লবের অংশ হিসেবে চালিত নির্দিষ্ট দেশের বিপ্লব পরিচালনার মধ্য দিয়েই MLM-এর বিকাশের কাজ শুর" হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দেশের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা, আর আন্ড়র্জাতিকতাবাদী মতাদর্শ MLM এক নয়। এক্ষেত্রেও একটা দ্বন্দ্ব বিরাজমান। MLM হলো আন্ড়র্জাতিক চরিত্র সম্পন্ন মতবাদ ও মতাদর্শ। সুতরাং বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা এই সাধারণ মতাদর্শকে কীভাবে বিকশিত করে তা খুব গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ থেকে সাধারণীকরণ একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার– যা সংশ্লেষণ ও সাধারণীকরণের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শুধু এগোতে পারে।

অন্যদিকে আমাদের মতবাদ, MLM জাতীয়ভাবে বিকশিত হতে পারে না, কারণ তা আন্ড়র্জাতিক– এবং আন্ড়র্জাতিক পরিসরের সাধারণ তত্ত্ব আকারে বিকশিত না হওয়া পর্যন্ড় তা নির্দিষ্ট কোন দেশের জন্য শুধু দেশজভাবেও বিকশিত হতে পারে না। এটা সরাসরিই আমাদের মতাদর্শের আন্ড়র্জাতিকতাবাদী চরিত্রের সাথে যুক্ত।

প্রতিটি সফল বিপ্লবে MLM-এর সৃজনশীল প্রয়োগ বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও অস্ত্রভা"ারকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু এমনটা হলেই আন্ড়র্জাতিক তাৎপর্যসম্পন্ন সাধারণ শিক্ষা আসবেই তার কোন কথা নেই। আর আন্ড়র্জাতিক তাৎপর্যসম্পন্ন কিছু

কিছু শিক্ষা তা আনলেও অবধারিতভাবে তা আমাদের বিশ্বজনীন মতাদর্শের বিকাশ ঘটায় না। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোন দেশে MLM-এর সৃজনশীল প্রয়োগ অথবা তা থেকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক তাৎপর্যসম্পন্ন কিছু কিছু শিক্ষা– আর MLM-এর বিকাশ এক কথা নয়। কারণ, MLM হলো বিশ্বজনীন সর্বহারা মতাদর্শ যা তার তত্ত্বাবলীর মধ্যে প্রকাশিত। তাই, MLM-এর বিকাশ বলতে বোঝায় এ তত্ত্বাবলীর ক্ষেত্রে বিকাশ যা গুণগত চরিত্রসম্পন্ন। নতুন তত্ত্বগত অবদানগুলো MLM-কে সমৃদ্ধ করতে যে ভূমিকা রাখে তাকে MLM-এর প্রেক্ষিতে পরিমাণগত বিকাশ বলা যেতে পারে। কারণ এমন কিছু কিছু অবদান সত্ত্বেও MLM সাথে সাথেই নতুন স্তরে উন্নীত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সমগ্রভাবে– তার তিনটি মূল অংশেই (রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র ও দর্শন) গুণগত নতুন স্তরে উন্নীত না হচ্ছে।

* '৭৬ সালে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন বিপর্যস্ত হবার পর থেকে প্রায় ৩০ বছর পার হয়ে গেছে যখন বিশ্বে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই। ৬০/৭০-দশকের বিপ্লবী আন্দোলনের সামগ্রিক বিপর্যয়ের পর বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিগত সময়ে বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। যার মাঝে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মাঝে রয়েছে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের পতন এবং মার্কিনের নেতৃত্বে প্রায় একক সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উদ্ভব, বিশেষত "বিশ্বায়ন", "উদারীকরণ" ও "বিরাষ্ট্রীয়করণ"-এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ, কম্পিউটারসহ প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার বিরাট বিকাশ ও পরিবর্তন প্রভৃতি। এসব কিছু সাম্রাজ্যবাদের Functioning, তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, বিপ্লবের রণনীতি ও কৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন চিন্তা বিপ্লবী মাওবাদীদের মাঝে নিয়ে এসেছে।

আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ, প্রযুক্তির বিকাশ, শ্রেণিসমূহের পরিবর্তন ও কৃষিতে রূপান্তরের সমস্যাগুলোর প্রেক্ষিতে আমাদের পার্টি ... ... মনে করে যে, সনাতন মাওবাদী লাইন অনুযায়ী প্রধান দ্বন্দ্ব (সামন্তবাদী ভূস্বামী শ্রেণির সাথে কৃষকের দ্বন্দ্ব), গ্রামাঞ্চলের শ্রেণি-বিন্যাস (বিশেষত সামন্তবাদী ভূস্বামী শ্রেণি) ও কর্মসূচির প্রধান বিষয় (সামন্তবাদী ভূস্বামীদের জমি কেড়ে নেয়া ও কৃষকের মাঝে তা বণ্টন)– এ সবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও আমরা মনে করি যে, বিপ্লবের স্তর নয়াগণতান্ত্রিক, গ্রাম প্রধান ক্ষেত্র, কৃষক প্রধান শক্তি এবং 'খোদ কৃষকের হাতে জমি'র নীতি– এ বিষয়গুলো অব্যাহত থাকতে হবে। আমাদের দেশে ও বিশ্বব্যাপী মাওবাদী আন্দোলনে এ প্রশ্নে চূড়ান্ত উপসংহার ভবিষ্যতে যা-ই হোক না কেন, এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে খুব জোরালোভাবে এই অভিমত ব্যক্ত হচ্ছে যে, ৪০-দশকের চীন বা ৬০-দশকের ভারতবর্ষের মত পরিস্থিতি এখন বিরাজ করছে না; এবং কৃষিসহ সমগ্র অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ও তার ফলে সৃষ্ট রূপান্তরগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে (যা সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী ফাংসানিং-এর সাথে যুক্ত) এবং মাওবাদী লাইনকে উচ্চতর স্তরে উন্নত করতে হবে।

তেমনি, রণনীতির প্রশ্নেও এদেশের মাওবাদীদের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছে তা

আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণা ও বিতর্কগুলোর সাথে যুক্ত। এমনকি ষাট-সত্তর দশকেই ক. CM ও ক. SS গ্রাম-শহরে যুগপৎ সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেন ও প্রয়োগ করেন। ক. SS দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম ও সশস্ত্র হরতালকে প্রয়োগ করেন এবং সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরেন। অবশ্য সে সময়ে-তো বটেই, এমনকি বিগত শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের মাওবাদী সংগ্রামে ঘাঁটি এলাকার প্রশ্নটি এদেশে উপেক্ষিত থেকেছে– যা এদেশে একটা সফল গণযুদ্ধ গড়ে না ওঠার জন্য বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে বলে আমরা এখন মনে করি। তা সত্ত্বেও গ্রাম-শহরে যুগপৎ সশস্ত্র সংগ্রাম, দেশব্যাপী গণযুদ্ধ, জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও কৌশলগত কর্মসূচি, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের সাথে অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করা– প্রভৃতি বিষয়কে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এসব ক্ষেত্রে নেপাল-গণযুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করি। আমাদেরও ধারণা হলো এই যে, চীনের অভিজ্ঞতাকে conservatively ও traditionally গ্রহণ করলে ও প্রয়োগ করলে আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় বিপ্লবকে সফলতার সাথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না– যদিও দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ (PPW) ও গ্রামে ঘাঁটি– একে আমরা রণনীতি হিসেবে সুদৃঢ়ভাবে বজায় রাখতে চাই। তবে উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে তার বিকাশ প্রয়োজন। উপরন্তু আমাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, এই বিকাশটা জড়িত ৩য় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ও তার ফলে আর্থ-সামাজিক নতুন রূপান্তরগুলোর সাথে– কম্পিউটার, প্রযুক্তি এগুলো হলো যার কিছু প্রকাশমাত্র। ... ...

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও যে মৌলিক সমস্যা আজ বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির দরজায় কড়া নাড়ছে তাহলো সর্বহারা একনায়কত্বের প্রশ্ন। নেপালে আজ সর্বহারা বিপ্লব বিজয়ের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, যা কিনা সুদীর্ঘকাল পর পুনরায় সর্বহারা একনায়কত্বের অভিজ্ঞতায় বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণিকে নিয়ে যেতে পারে। বিগত শতকে সর্বহারা একনায়কত্বাধীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে মহান গৌরবময় ও বিশাল অগ্রগতি সত্ত্বেও খুব বেশি সময় পার না হতেই, বিশেষত প্রধান নেতৃত্বের অনুপস্থিতি মাত্র বিপ্লবগুলোতে পরাজয়ের সারসংকলনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। GPCR-কালে মাও যার সূচনা করেছিলেন তাকে অবশ্যই এগিয়ে নিতে হবে ও বিকশিত করতে হবে। কিন্তু এ বিকাশের প্রশ্ন MLM-এর, বিপ্লবের তথা সর্বহারা একনায়কত্বের, ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের; এর বিপরীত কিছুর নয়।

* সুতরাং বোঝামুক্ত মাথা দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন অবশ্যই বিপ্লবী মাওবাদীদের হতে হবে। মাও বলেছিলেন, মার্কসবাদ হলো Wranglism। মাওবাদী হিসেবে সর্বহারা বিশ্ব বিপ্লবের প্রয়োজনে নতুন সব প্রশ্নে বিতর্ক চালাতে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। আর এর মধ্য দিয়েই বিপ্লবের লাইন বিকশিত হবে, বিপ্লব বিজয়ী হবে ও এগিয়ে যাবে, এবং আমাদের মতাদর্শেরও বিকাশ ঘটবে।

নিশ্চয়ই তত্ত্বগত কাজকে এগিয়ে নিতে হবে, তত্ত্বেরও বিকাশ ঘটবে। কিন্তু তা করতে হবে মার্কসবাদের মূলগত তাত্ত্বিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, দেড় শতাব্দীর কমিউনিস্ট

বিপ্লবের বিপুল রক্তে-ঘামে কেনা মূল্যবান ও ঐতিহাসিক শিক্ষাকে রক্ষা করে। মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ বা তার বিকাশের কথা বলে প্রায়ই তার মূলগত সত্যই বর্জিত হয়– বা তার থেকে বিচ্যুতি গড়ে ওঠে যা পরবর্তীকালে বিপ্লব বর্জনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটা মার্কসবাদের দেড়শ' বছরের ইতিহাসে অসংখ্যবার দেখা গেছে। বাংলাদেশের মাওবাদী আন্দোলনেও বহুবার দেখা গেছে যে, লাইনের ভুল সংশোধনের নামে বিপ্লবকে বর্জন করা হয়েছে। আবার লাইনকে বিকশিত না করে বিপ্লবকে রক্ষা করা যায়নি, বরং তা গোঁড়ামিবাদ হয়ে সংস্কারবাদ বা অনুশীলন-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী তত্ত্বালোচনায়, এমনকি স্থূল সংশোধনবাদে পরিণত হয়েছে। তাই, এই দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা অত্যধিক গুরত্বপূর্ণ। আর তা করা সম্ভব সর্বহারা শ্রেণি-স্বার্থ ও শ্রেণি-চরিত্র, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিপ্লব তথা সর্বহারা একনায়কত্ব এবং বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে কোনভাবেই বিচ্যুত না হয়ে। আর তেমন কিছু ঘটলে তা দ্রুত সংশোধন করার বিনয়ী ও সাহসী, আত্ম-পর্যালোচনামুখী ও আত্মসমালোচনামুখী মনোভাবকে ও মেথডলজিকে বিকশিত করে।

বিশ্ব নিয়ত পরিবর্তনশীল। তার সাথে মিলিয়ে তত্ত্বেরও প্রতিনিয়ত বিকাশ ও উন্নয়ন প্রয়োজন। যা সম্ভব বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের স্বার্থে বিশ্বকে রূপান্তরের সংগ্রামে অংশ নিয়ে, অভিজ্ঞতার মার্কসবাদী সারসংকলন করে এবং তাকে পুনরায় প্রয়োগে নিয়ে গিয়ে। এ প্রক্রিয়ায় বহুবার আবর্তনের পরই শুধু নির্দিষ্ট জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ❑

প্রথম অধ্যায়ের নোট ঃ

১. পূবাকপা ঃ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)।

২. ইপিসিপিঃ EPCP–ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি। ষাটের দশকে ক্রুশ্চভপন্থী সংশোধনবাদী পার্টি।

৩. পিবিএসপি ঃ PBSP (Purbo Banglar Shorbohara Party)–পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি।

৪. বিএসডি/এমএল ঃ BSD/ML–বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল)।

৫. 'রিম' ঃ 'RIM'–Revolutionary Internationalist Movement.

৬. এমবিআরএম ঃ MBRM– Maoist Bolshevik Revolutionary Movement.

৭. ১৯৭১ সালের ১৪ জুন কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত পূবাকপা'র একটি কেন্দ্রীয় সভায় সিএম-শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টির মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

৮. পরে শাসক শ্রেণির পার্টি আওয়ামী লীগের এমপি ও শেষদিকে ক্রুশ্চভপন্থী সংশোধনবাদী সিপিবি-তে যোগদান।

৯. 'নিরীশ্বরবাদীদের ঈশ্বর' ঃ বৌদ্ধ ধর্ম প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এই ধর্মের অনুসারীগণ গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন। এখান থেকে কথাটা এসেছে যে, গৌতম বুদ্ধ হলেন নিরীশ্বরবাদীদের ঈশ্বর। এখানে রূপক অর্থে কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে।

১০. তিন বিশ্ব তত্ত্ব ঃ বাস্তবে তিন বিশ্ব তত্ত্ব মাওয়ের লাইন নয়। তাহলো মাওয়ের একটি সঠিক কৌশলগত লাইনকে সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিকৃত করার দৃষ্টান্ত।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কৌশলগতভাবে বিশ্ব-বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মাও সেতুঙ বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করার কথা বলেছিলেন। তাতে তখনকার পরিস্থিতিতে আমেরিকা-রাশিয়া– এই দুই পরাশক্তি ছিল প্রথম বিশ্ব, জাপানসহ ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব, আর জাপান বাদে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশ এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব।

মাওয়ের মৃত্যুর পর তেংপন্থী সংশোধনবাদীরা চীনের ক্ষমতা দখলের পর মাও কর্তৃক বিশ্বের এই তিন বিভাজনকে "তিন বিশ্ব তত্ত্ব" নাম দিয়ে বিশ্ব রণভূমে বিপ্লবের রণনৈতিক লাইন আকারে প্রচার করে এবং তাকে মাওয়ের লাইন বলে দাবী করে। এভাবে একে তারা মাও সেতুঙ চিন্তাধারার অংশ বলে।

আসলে তিন বিশ্ব তত্ত্ব হচ্ছে শ্রেণি সমন্বয়বাদী ও বিপ্লব বর্জনকারী সংশোধনবাদী তত্ত্ব। যে লাইন প্রথম বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৃতীয় বিশ্বকে বিপ্লবের প্রধান শক্তি ও দ্বিতীয় বিশ্বকে দোদুল্যমান মধ্যবর্তী শক্তি বলে। এভাবে এটা প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরস্থ শ্রেণি সংগ্রামই যে বিপ্লবের চাবিকাঠি তা কার্যত বাতিল করে দেয় এবং শাসক শ্রেণির সাথে শাসিত-নিপীড়িত শ্রেণির সমঝোতা-ঐক্যের লাইন নিয়ে আসে। এভাবে শ্রেণি সমন্বয় ঘটায়।

১১. ৯ম কংগ্রেসে যুগ সম্পর্কে ঃ যুগ সম্পর্কে চীনা পার্টির ৯ম কংগ্রেস (১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত) রিপোর্টে বলা হয়েছিল– "বর্তমান যুগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রের

বিশ্বব্যাপী বিজয়ের যুগ"। আর "মাও সেতুঙ চিন্ড়াধারা" হলো এই নতুন যুগের মার্কসবাদ। এভাবে ৯ম কংগ্রেসের রিপোর্টে যুগ সম্বন্ধে একটি নতুন বক্তব্য ছাড়াও মতবাদের বিকাশের বিষয়টিকে ভুলভাবে যুগের বিকাশের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১০ম কংগ্রেসে এই ভুলকে সংশোধন করা হয়েছিল।

১২। ১০ম কংগ্রেসের মূল্যায়ন ঃ মাওয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা পার্টির ১০ম কংগ্রেসে 'যুগ' সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয়েছিল তার কথা এখানে বলা হয়েছে। ১০ম কংগ্রেসের মূল্যায়ন ছিল "... ... লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে বিশ্ব পরিস্থিতির বিরাট বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই যুগের পরিবর্তন হয়নি।" অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লব"-এর যুগই বিরাজ করছে।

১৩। সুন্নত ঃ ইসলাম ধর্মানুসারীদের মতে নবী মোহম্মদের বিবিধ জীবন-যাপন প্রণালীর অনুসরণ করাকে সুন্নত পালন করা বলা হয়।

১৪। সমাজতান্ত্রিক দেশ থাকা অবস্থায় বিশ্বের ৪টি মৌলিক দ্বন্দ্ব ঃ

(১) সাম্রাজ্যবাদের সাথে নিপীড়িত জাতি ও জনগণের দ্বন্দ্ব।

(২) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব।

(৩) পুঁজিবাদী শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব।

(৪) সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্টির নেতৃত্বে আন্ড়র্জাতিক পরিসরে লাইনগত সংগ্রামের কয়েকটি দলিল সংকলিত হয়েছে।

প্রথমেই নেপাল পার্টির সাথে আমাদের পার্টির দুই লাইনের সংগ্রামের (2LS) দলিল। প্রচন্ডের নেতৃত্বাধীন নেপাল পার্টির ডানপন্থীরা আজকে খোলামেলা সংশোধনবাদীতে অধপতিত হলেও এ অধপতনের সূচনা হয়েছিল অনেক আগে, যখন এ পার্টিটি নেপাল-বিপ্লবকে সফলতার সাথে এগিয়ে নিচ্ছিল। ২০০৩ সালে "২১ শতকের গণতন্ত্র" নামে মালেমা'র বিকাশ বলে একটি নতুন সূত্রায়ন থেকে তাদের এ অধপতন লাইন আকারে প্রকাশিত হতে থাকে, যে সম্পর্কে তখনো আন্ড়র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন খুব কমই সচেতন ছিল। আমাদের পার্টি একে উদারনৈতিক বুর্জোয়া ডান লাইন হিসেবে উন্মোচন করে ২০০৫ সালেই "২১ শতককে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের শতকে পরিণত কর"ন"– এই দলিলটি রচনা করে। তখনো আমাদের পার্টি এবং নেপাল পার্টি RIM-এর সদস্য। তাই লেখাটি ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের নীতিমালা অনুযায়ী রচনা করা হয়েছিল। RIM-এর অভ্যন্ড়রে 2LS চালানোর পত্রিকা "স্ট্রাগল"/৫নং সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।

নেপাল-পার্টির প্রচ"-নেতৃত্বাধীন অংশটি ডান বিচ্যুতির পথে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ড় পরিপূর্ণ সংশোধনবাদে অধপতিত হয়। সারা বিশ্বের মত আমাদের দেশেও লক্ষ লক্ষ কর্মী-জনগণ নেপালের অগ্রসরমান বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে প্রচন্ডের সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতক লাইন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য পার্টিকে জটিল সংগ্রাম করতে হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন ধরনের দলিলপত্র-পত্রিকায় ক. আনোয়ার কবীর অনেক লেখা লিখেছেন। সেই সব লেখা থেকে কিছু নির্বাচিত দলিল এতে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে পাঠক প্রচন্ডের সংশোধনবাদী লাইনটা বুঝতে পারেন; একই সাথে এ লাইনের সাথে আমাদের পার্টির পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটিও ধারণা করতে পারেন।

এই অধ্যায়ে আরও একটি দুই লাইনের সংগ্রামের দলিল যুক্ত করা হয়েছে। এটি রচিত হয়েছিল ইরানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএলএম)-এর সাথে আমাদের পার্টির মতপার্থক্যের উপর। পের"র গণযুদ্ধ বিপর্যস্ড় হওয়ার পর পের"র গণযুদ্ধের সমর্থক প্রবাসী পের"বাসীদের সংগঠন এমপিপি (Peru peoples Movement)-এর নীতিহীন RIM-বিরোধী কার্যকলাপকে Handling-এর প্রশ্ন নিয়ে এই বিতর্ক রিম-অভ্যন্ড়রে এসেছিল। এ দলিলটি "স্ট্রাগল"/৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

পের"-নেপালের গণযুদ্ধের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে RIM-এর অভ্যন্ড়রে বহু গুর"ত্বপূর্ণ লাইনগত প্রশ্নে বিতর্ক প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। পাশাপাশি আমেরিকার মাওবাদী পার্টি RCP-USA রিম-অনুশীলনের সারসংকলনের সূত্র ধরে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিছু মৌলিক সারসংকলন পেশ করে, যা এই বিতর্কে বর্ধিত মাত্রা যুক্ত করে। এ সমস্ড় গুর"ত্বপূর্ণ লাইনগত বিষয়ে অবস্থান নেয়ার জন্য পার্টি অভ্যন্ড়রে "আন্ড়র্জাতিক নতুন লাইন বিতর্ক এবং আমাদের কিছু অবস্থান" শীর্ষক একটি দলিল কমরেড আনোয়ার কবীর রচনা করেন। দলিলটির কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো। বড় একটি অংশ, যাতে আরসিপি-লাইন, তথা এ্যাভাকিয়ানের "নিউ সিনথেসিস"-এর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা ও প্রাথমিক অবস্থান প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে প্রকাশ করা হলো না। এগুলো এখনো আমাদের পার্টিতে পর্যালোচনাধীন। এবং আরসিপি'র সাথে এ বিষয়ে আমাদের পার্টির পর্যালোচনা এখনো চলমান।

পরিশেষে আমাদের "নতুন থিসিস" থেকে "মাও-পরবর্তী সিকি শতাব্দী" অংশটি যুক্ত করা হয়েছে। এ থেকে পাঠক আইসিএম (আন্ড়র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন) সম্পর্কে সে সময়কাল পর্যন্ড় আমাদের পার্টির পর্যবেক্ষণ ও সারসংকলন বুঝতে পারবেন।

– সম্পাদনা বোর্ড]

২১-শতককে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার শতকে পরিণত কর ন!

(সেপ্টেম্বর, '০৫)

আধুনিক যুগে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন হলো বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের মতবাদ আবিষ্কার যা বিগত শতাব্দীতে মালেমা-তে বিকশিত হয়েছে। গত শতকে এ মতবাদ পৃথিবীর চেহারা বারবার বদলে দিয়েছে। মহান র শ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ও সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব– এই তিন মাইলফলক অতিক্রম করে এই মতবাদ যেমন মালেমা-তে উন্নীত হয়েছে, তেমনি পৃথিবীর এক বিশাল অংশ জুড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক সমাজের দৃষ্টান্ড় দেখিয়েছে যা মানবজাতির এক অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাস্ড়ব জীবনের এই অর্জনকে ধরে রাখা যায়নি। বিশ্ব যখন নতুন শতাব্দীতে– ২১-শতকে– প্রবেশ করেছে, তখন সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের অধীনেই ন্যস্ড়। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিজমের বির দ্ধে সাময়িক জয় পেয়ে বিশ্বকে শোষণ-লুণ্ঠন-নিপীড়নের জন্য আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী মোড়ল মার্কিনের নেতৃত্বে একদিকে তারা বিশ্ব জনগণের বির দ্ধে অন্যায় যুদ্ধের এক নতুন ঢেউ-এর সূচনা করেছে। অন্যদিকে বিশ্বের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে দরকষাকষি ও বিভাজন পুনরায় বেড়ে চলেছে। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদের পালের গোদা মার্কিন নিজেদের গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে মাড়িয়ে ফ্যাসিবাদের দিকে এগুতে শুর করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এ শতাব্দী কি বিগত শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে অন্যায় যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের যাঁতাকলে পড়ে মার খাবে? আর, একদিকে 'গণতন্ত্র' নামের তথাকথিত 'আধুনিক' মতবাদের প্রতারণা, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মতাদর্শের বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত সংগ্রামের কোশেশ অসহায়ের মত দেখে চলবে? নাকি বিশ্ব জনগণ, বিশেষত ইতিহাসের সবচাইতে অগ্রসর বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণি এক নতুন আলোকিত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় এগিয়ে আসবেন, এবং শেষ পর্যন্ড় তা প্রতিষ্ঠায় সফল হবেন?

বিগত শতকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বার বার মরো মরো অবস্থায় চলে গেছে; কিন্তু এই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ পতন ঘটেনি। বরং বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবগুলোকে সাময়িকভাবে পরাজিত করতে পেরে গত শতকের ৮০-দশক থেকে সে গলাবাজি করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে যে, কমিউনিজম মৃত।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত-শোষিত জনগণের সংগ্রাম, উত্থান ও জাগরণ, এবং সাম্রাজ্যবাদের নিজ সংকটগুলোর প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদকারী একটি প্রকৃত বিপ্লবের বিপুল পটেনশিয়াল থাকলেও বিপ্লবী শক্তি এখনো দুর্বল। এ অবস্থায়– ২১-শতকে মালেমা-র ভূমিকা কী হবে– যে মতবাদ কিনা বিগত

শতকে সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র সর্বব্যাপী বিরোধী বিপ্লবী মতবাদ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে। কীভাবে মালেমা এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করবে? এই প্রশ্নটি বিশ্বজুড়ে মালেমা-বাদীদের সামনে উঠে আসতে ও তার উপর বিতর্কের উদ্ভব ঘটাতে বাধ্য। কারণ, বিগত শতকের ৭০-দশকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্বিক বিপর্যয়ের পর সুদীর্ঘ প্রায় তিন দশক পেরিয়ে গেছে। এবং এর মধ্যে বিশ্ব পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তনও ঘটেছে। মালেমা-বাদীদের দায়িত্ব হলো এ বিতর্ককে ভালভাবে পরিচালিত করা এবং বিপ্লবী শ্রেণিসংগ্রামকে এগিয়ে নেবার মধ্য দিয়ে মালেমা-র মতবাদকে আরো বিকশিত করে তাকে ২১-শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্পূর্ণ সক্ষম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

এই ধরনের এক সার্বিক বিতর্ক সর্বদাই আমাদের শ্রেণির যে মতবাদ– মালেমা– তার ভিত্তি মূলে স্পর্শ করে। চলমান বিশ্বব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্য, তাকে উচ্ছেদের জন্য কমিউনিজমের আদর্শকে ২১-শতকে আমরা কীভাবে তুলে ধরবো, এবং কীভাবে তাকে বিকশিত করবো– সেটা এ আলোচনা, গবেষণা ও বিতর্কে চলে আসতে বাধ্য। যা কিনা অনিবার্যভাবে কমিউনিজমের মতবাদের কার্যকারিতার প্রশ্নের সাথেই জড়িত।

কমিউনিজমের আদর্শের বিপরীতে বৈশ্বিক যে 'আধুনিক' মতাদর্শটিকে তুলে ধরা হয় তাহলো 'গণতন্ত্র'-র মতবাদ। গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্ড়িকর মোহ আকাশছোঁয়া– এটা সত্য। যা কিনা বিকশিত হতে পেরেছে বিগত শতকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপর্যয়ের পরবর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। কিন্তু এটাও সত্য যে, মার্কসবাদ এ বিভ্রান্ড়িকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্মোচন করেছে তার উদ্ভবের যুগেই, এবং বিগত শতক জুড়ে তা সফলভাবে করা হয়েছে। তদুপরি বিপ্লব যখন ব্যর্থ হয় তখন দানবেরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; সেই সাথে বেড়ে চলে বিভ্রান্ড়ি। আমরা এখনো সে সময়টা পেরিয়ে যাইনি। সুতরাং 'গণতন্ত্র'-র মতবাদের বিপরীতে কমিউনিজমের মতবাদকে পুনরায় বোঝার প্রয়োজন রয়ে গেছে। এবং ২১-শতকে মালেমা-র যাবতীয় ভূমিকার মাঝে এটা হলো এক প্রধানতম কাজ।

মার্কসবাদ তার সূচনাতেই শিখিয়েছে যে, গণতন্ত্র কোন সার্বজনীন বিষয় নয়, বরং শ্রেণি বিভক্ত সকল সমাজে তা নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যেই শুধু প্রযোজ্য। বিপরীত শ্রেণির উপর একনায়কত্ব ছাড়া কোন শ্রেণির জন্য গণতন্ত্র হতে পারে না, যেমন সর্বহারা শ্রেণির উপর একনায়কত্ব ছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্র হয় না, এবং বুর্জোয়া শ্রেণির উপর একনায়কত্ব চালানো ছাড়া সর্বহারা শ্রেণির গণতন্ত্র হয় না। যখন একনায়কত্বের প্রয়োজন পড়বে না, বিশ্ব এক শ্রেণিহীন সমাজ কমিউনিজমে প্রবেশ করবে, তখন গণতন্ত্রের কথা বলাটাও হবে অর্থহীন। তাই, ক্ষমতার, কাজে কাজেই রাষ্ট্রের মূল প্রশ্নটা হলো একনায়কত্বের প্রশ্ন; কোন শ্রেণির একনায়কত্ব বিপরীত কোন শ্রেণির উপর। কমিউনিস্ট মতাদর্শের এই মৌলিক ভিত্তিকে আমরা কীভাবে এগিয়ে নেবো সে প্রশ্নটা মতবাদিক বিকাশের জগতে এসে হানা দিতে বাধ্য। বিশ্বে যখন পুনরায় সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্র গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তখন এ প্রশ্নটি সর্বহারা শ্রেণি ও মালেমা-বাদীদের মধ্যে গুর ত্বপূর্ণ

আলোচ্য হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এই নিবন্ধও আমরা এ বিষয়টিতেই কেন্দ্রীভূত করবো।

গণতন্ত্র ধারণাটি বাস্ড়বে আধুনিক বিশ্বের নয়, বরং সুদূর অতীতে দাস আমলে এর উদ্ভব ঘটেছিল। অবশ্য বুর্জোয়া যুগে এসে এ ধারণা উচ্চতর অর্থ ও রূপ পেয়েছে। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের দাস আমলে তৎকালীন শাসক শ্রেণি দাসমালিকরা তাদের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র চর্চা করতো। আজকের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গুর"ত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান "সংসদ" দাস সমাজে সিনেটের অনুশীলন থেকেই এসেছে। এতে দাসদের অংশগ্রহণ দূরের কথা, তাদেরকে মনুষ্য প্রজাতির অংশ বলেও ভালভাবে স্বীকার করা হতো না।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রও সারবস্তুগতভাবে একই জিনিষ। আধুনিক শোষক শ্রেণির ক্ষমতা চালানোর একটি আধুনিক উপায় ছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্র অন্য কিছু নয়। অবশ্য সার্বজনীন ভোটাধিকার আজকের যুগে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটি গুর"ত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু শুর"তে বহু জায়গাতে গণতন্ত্রে এটা ছিল খুবই খ"িত। এমনকি সমাজের অর্ধেক নারীদের ভোটাধিকারও বুর্জোয়া গণতন্ত্রে এসেছে অনেক পরে– বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে।

সুতরাং, প্রথমেই যা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেটা হলো, চলমান বিশ্বে আধুনিক গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র। আর এর প্রকৃত অর্থ তখনই পরিষ্কার হয় যখন বুর্জোয়া একনায়কত্ব হিসেবে এর চরিত্রকে উপলব্ধি করা হয় ও উন্মোচন করা হয়। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের উপর একনায়কত্ব চালানো ছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্র জিনিষটাই হতে পারে না।

এই বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিপরীতে কমিউনিজমের মতাদর্শ সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের রাজনীতিকে তুলে ধরে। এই একনায়কত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, ইতিহাসে এই প্রথম এটা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব– সংখ্যালঘুর উপর– যা ইতিপূর্বে ছিল বিপরীত। এবং এই একনায়কত্ব মানবজাতিকে শ্রেণিহীন সমাজে এগিয়ে নেয়া, অর্থাৎ সব ধরনের শ্রেণি একনায়কত্ব, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিলুপ্তির পথে একটি ব্রীজ মাত্র। সুতরাং বিশ্বব্যাপী শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মতবাদ কমিউনিজমের মতাদর্শে সজ্জিত না হলে সর্বহারা একনায়কত্ব হয় না, যেমন কিনা সর্বহারা একনায়কত্ব ব্যতীত কমিউনিজমের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

২১-শতকে আমাদের এই কমিউনিস্ট মতবাদকে অনেক বেশি জোরালোভাবে তুলে ধরা জর"ী। এবং গণতন্ত্রের বুর্জোয়া মতবাদকে আরো বেশি উন্মোচন করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্নটা হলো এই যে, একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র– এ দুইকে যখন বিপরীতধর্মী ও পৃথক দুটো বিষয় হিসেবে দেখানো হয়, তখনকি বুর্জোয়া শ্রেণিই নিজেকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক হিসেবে দেখাবার সুযোগ পায় না? যখন কিনা বাস্ড়বে সর্বহারা একনায়কত্বে সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণের জন্য গণতন্ত্র অনেক বেশি ব্যাপক? আমরা-কি 'সর্বহারা গণতন্ত্র' দ্বারাই 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'-কে সংগ্রাম করতে পারি না? এবং সেটাই কি নীতিগত ও কৌশলগতভাবে বেশি সঠিক হয় না?

প্রথমত সর্বহারা গণতন্ত্র যে অনেক বেশি ব্যাপক এক গণতন্ত্র তা আমরা তুলে

ধরতে নিশ্চয়ই পারি, এবং সেটা অবশ্যই আমরা করবো। আমরা অবশ্যই দেখাবো যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র কীভাবে ১০% মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করে ও মূলত তাদের ক্ষমতাকেই পরিচালনা করে। আর বিপরীতে সমাজতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব করে ৯০%-কে। কিন্তু মতবাদিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র-সম্পর্কিত বুর্জোয়া ব্যাখ্যা– গণতন্ত্র সার্বজনীন– তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্মোচন না করলে ক্ষমতা, রাষ্ট্র ও 'গণতন্ত্র' সম্পর্কিত আমাদের তত্ত্বকে আমরা চূড়ান্ড় অর্থে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না। এবং জনগণের বিভ্রান্ড়ি ও মোহকে কাটিয়ে তাদেরকে নিজেদের ক্ষমতা দখল ও তা প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত করতে পারি না। আমাদের ব্যাপক ও প্রকৃত গণতন্ত্র দিয়ে তাদের সংকীর্ণ ও বোগাস গণতন্ত্রকে বিরোধিতা করায় সীমাবদ্ধ থাকা, অথবা শত্র"র অস্ত্রে শত্র"কে ঘায়েল করার 'কৌশল' এক্ষেত্রে বিতর্কের মর্মবস্তুতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। যা হলো– গণতন্ত্র হলো একনায়কত্বেরই একটা দিক মাত্র। এর বিপজ্জনক রাজনৈতিক দিকটা হলো সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণ বুর্জোয়া শ্রেণির উপর নিজেদের একনায়কত্ব প্রয়োগ সম্পর্কে কম সচেতন হয়ে পড়বেন এবং ফলে তা ব্যর্থ হবে।

তাই, মূল বিষয়টা হলো সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে 'গণতন্ত্র'-র স্লোগান তোলা নয়, বরং এই একনায়কত্বটা কীভাবে আরো ভালভাবে পরিচালনা করা যায় সে বিষয়। এরই অঙ্গাঙ্গি দিক হলো সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণের নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র কীভাবে আরো ভালভাবে অনুশীলন করা যায় এই গুর"ত্বপূর্ণ সমস্যাটি। এ দুটো হলো একটি ব্যবস্থার দুটো দিক, এবং এ দু'য়েরই নিজ নিজ বিশিষ্ট সমস্যা নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু শ্রেণি বিভক্ত সমাজে, এবং সমাজতন্ত্রেও একনায়কত্বের সমস্যাটিই হলো ক্ষমতার সারবস্তু। সেজন্যই ফ্যাসিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র সারবস্তুতে একই– বুর্জোয়া একনায়কত্ব– যদিও এ দু'য়ের মাঝে শাসন পদ্ধতিতে কিছু গুর"ত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। আর সমাজতন্ত্রে এটা আরো বেশি গুর"ত্বপূর্ণ এজন্য যে, নবীন সমাজতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদী সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার শক্তির বির"দ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে ও এগিয়ে চলতে হয়; এবং সমাজতন্ত্র নিজে একটা উৎক্রমণকাল বিধায় এখানে অর্থনীতি-রাজ-নীতি-সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে অসংখ্য বুর্জোয়া সম্পর্ক বজায় থাকে যা থেকে প্রতিনিয়ত নতুন বুর্জোয়ার সৃষ্টি হয়। তাই, একনায়কত্বের প্রশ্নটা সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদী সমাজের চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি গুর"ত্বপূর্ণ, এবং তাকে সেভাবে না দেখলে পরাজয় ঘটতে বাধ্য।

২১-শতকে এসে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে যা গুর"ত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে বাধ্য, এবং ইতিমধ্যেই তা উঠেছে, তাহলো, বিগত শতকে সমাজতন্ত্র, তথা সর্বহারা একনায়কত্বের থেকে অভিজ্ঞতার সারসংকলনের বিষয়টি। এই বিপ্লবগুলো কিছুদূর এগিয়ে পরে পরাজিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী শত্র" প্রবল ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু এ পরাজয়ে আমাদের নিজেদের ভুল-ভ্রান্ড়ির সারসংকলন করারও ভীষণ গুর"ত্ব রয়েছে। কিন্তু এ সারসংকলন করতে হবে মৌলিক মতবাদিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, তারই সাহায্যে, এবং এর মধ্য দিয়েই আবার মতবাদের বিকাশ ঘটাতে হবে। বুর্জোয়া মতবাদের সাথে সমন্বয়সাধনে আমাদের মতাদর্শের বিকাশ ঘটে না, বরং তাতে এর

মাঝে অনিরাময়যোগ্য ক্ষতের জন্ম হয়, যা উপযুক্ত শর্তে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই, সর্বপ্রথম এ ব্যাপারেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

২১-শতক মানবজাতির ইতিহাসে এক অতিগুরুত্বপূর্ণ সময় হয়ে উঠবে। সাম্রাজ্যবাদ বিগত এক শতাব্দী ধরে টিকে থাকলেও শুরু থেকেই সে সংকটের মধ্য দিয়ে আগাচ্ছে। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সে সাময়িক জয় পেলেও নিজ কর্মতৎপরতা দ্বারা সে তার নিজ কবর খুঁড়ে চলেছে। এ শতাব্দীর শুরু থেকে তার 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' বিশ্বব্যাপী জনগণকে তার বিরোধী করে তুলেছে। এ ছাড়া বিশ্বায়ন ও নিজ দেশে ফ্যাসিবাদের দিকে যাত্রার মত বিশ্বজনগণবিরোধী কর্মসূচি ও পলিসি তার চরিত্র দিন দিন উন্মোচিত করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব নিয়মেই এক নতুন আন্ড় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধেও নামতে পারে। এবং তা হবে তাদের জন্য বিগত শতাব্দীর ফলাফলের চেয়েও বেশি মারাত্মক। বিশ্বজনগণের সচেতনতা, অন্যায়-যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব, তথ্য প্রবাহের গতি ও ব্যাপকতা, এবং প্রযুক্তি– সবই তাদের ধ্বংসকে বি-পুলভাবে ত্বরান্বিত করবে।

এ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী রাজনীতি ও কমিউনিজমের মতবাদের প্রসার বৈশ্বিক পরিসরে এখনো দুর্বল হলেও নেপাল-ভারত-ফিলিপিন-পেরুর গণযুদ্ধ, তুরস্ক-ইরান-আফগান-বাংলাদেশ-ভূটানে সম্ভাব্য গণযুদ্ধের পদধ্বনি, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাওবাদী আন্দোলনের বিকাশ এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করছে। এভাবে একটা নতুন বিপ্লবী ঢেউ-এর আগমন বার্তা শোনা যাচ্ছে যার শীর্ষদেশ ইতিমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে নেপালসহ দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে।

এ অবস্থায় ২১-শতকে বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিপুল পরিবর্তনকারী ঘটনা ঘটবে অতি দ্রুত লয়ে। এ শতকের প্রথম পাঁচ বছরেই তার প্রচুর আলামত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসবের গতি আরো বৃদ্ধি পাবে। চিন্ড়ার জগত ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানবজাতির আজকের বিকাশ বিশ্বজুড়ে এমন কদর্য ও জঘন্য এক ব্যবস্থাকে সুদীর্ঘদিন বয়ে চলতে পারে না। ২১-শতকের প্রথমার্ধ জুড়েই বিশ্বব্যাপী অনেক অনেক গণযুদ্ধ গড়ে উঠবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিপর্যয় ও পতন সত্ত্বেও অনেক গণযুদ্ধ জয়লাভ করবে এবং বহু দেশে তা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবে। কিছু কিছু সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও পুঁজিবাদের পুনরুত্থান সত্ত্বেও অনেক সমাজতন্ত্র এগিয়ে যাবে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাই হবে ২১-শতকের ভাগ্য। অন্ড়ত এ লক্ষ্যেই বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণিকে আজ এগিয়ে চলতে হবে। তাই, এ শতকে কমিউনিজমের স্লোগান তুলতে হবে বিগত দেড় শতাব্দীর চেয়ে অনেক জোরালোভাবে, এবং অনেক বেশি করে বৈশ্বিক ধরনে। আর সেজন্য এ শতাব্দীতে মালেমা-কেই ভিত্তি করতে হবে, তাকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে হবে।

* আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খোদ সর্বহারা একনায়কত্বের অতীত অভিজ্ঞতার সারসংকলন অবশ্যই প্রয়োজন– যখন কিনা পৃথিবীর একটি দেশ নেপালে সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতা দখলের স্বপ্নকে পুনরায় বাস্ড়বে রূপ দেবার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। শুধু তাই

নয়, বিশাল ভারতের অনেকগুলো রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী ভূটান-বাংলাদেশসহ প্রায় অর্ধশত কোটি জনগণ অধ্যুষিত বিশাল এক অঞ্চলব্যাপী বিপ্লবের সম্ভাবনা জেগে উঠেছে, তখন সর্বহারা একনায়কত্বের প্রশ্নটিকে অবশ্যই জোরালোভাবে হাতে নিতে হবে।

স্ট্যালিনের রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নির্মাণে বিরাট ও মহান অগ্রগতি ঘটলেও মৌলিক মতাদর্শিক ও রাজনীতিক ভ্রান্ড়িও সেখানে ঘটেছিল। পরে মাও এ ত্রুটিকে সংশোধন করেন। তিনি চীনে জিপিসিআর চালিয়েছিলেন। এবং সর্বহারা একনায়কত্ব পরিচালনায় নতুন ও উচ্চতর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল যা আমাদের তত্ত্বকে বিপুল মাত্রায় সমৃদ্ধ করে তাকে মালেমা-এ উন্নীত করেছিল।

বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণিকে প্রায় তিন যুগ পরে সম্ভাব্য নতুন সমাজতন্ত্রে শুধু উপরোক্ত অতীত অভিজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষত চীনের পরাজয়ের অভিজ্ঞতাকে মনোযোগ দিয়ে ও গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কীভাবে আরো ভালভাবে এই একনায়কত্বকে পরিচালনা করা যায়– তাকে একটা মৌলিক সমস্যা হিসেবেই নিতে হবে। আর এক্ষেত্রে সিরিয়াস পার্টি ও নেতৃত্বগণ ইতিমধ্যে মনোযোগ দিচ্ছেন যাকে বিকশিত করা প্রয়োজন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একটি উচ্চতর সংশ্লেষণে উন্নীত হওয়া প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে– এর অর্থটা এটা নয় যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও একনায়কত্বকে দুর্বল করার মধ্য দিয়ে তাকে শুকিয়ে ফেলা যাবে। এতে ফল হবে বিপরীত। দুর্বল সর্বহারা একনায়কত্বকে সহজেই বুর্জোয়া শ্রেণি (পার্টির ভেতরের, দেশের ভেতরের ও আন্ড়র্জাতিক পরিসরের বুর্জোয়ারা) উচ্ছেদ করে দিতে সক্ষম হবে, এবং দুর্বল নয়, বরং অতীব শক্তিশালী বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। সর্বহারা একন-ায়কত্ব ও রাষ্ট্র– আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনেকটা সময় ধরে রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্ড়রেই থাকতে বাধ্য– যদি আমরা বিশ্ববিপ্লবের প্রক্রিয়াকে মাও-বর্ণিত গণযুদ্ধের তিনটি স্ড়রের মত করে বিভক্ত করতে চাই। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রণনৈতিক ভারসাম্য ছাড়িয়ে যখন রণনৈতিক আক্রমণের স্ড়রে অনেকটা এগিয়ে যাবে, এবং সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের আশু কর্মসূচিকে হাতে নিয়ে এগুবে, বাস্ড়বে তখনই শুধু বিশ্বব্যাপী একনায়কত্ব ও রাষ্ট্রগুলোর শুকিয়ে পড়ার প্রশ্ন সামনে আসবে। রাষ্ট্র শুকিয়ে মরা অর্থ হলো শ্রেণিহীন সমাজ তথা কমিউনিজমে প্রবেশ করা– যে সমাজে সমগ্র মানবজাতি প্রবেশ করবে, নতুবা কেউই করবে না। সেটা হবে বিশ্ববিপ্লবের এক ভিন্ন স্ড়র। যে সম্বন্ধে এখনি আমরা খুব ভালভাবে সবকিছু নির্ধারণ করে দিতে পারি না।

সেজন্য সমাজতন্ত্রে, অর্থাৎ, সর্বহারা একনায়কত্ব ও সর্বহারা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেই শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদের পুনরুত্থানকে ঠেকানো সম্ভব, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট মিশনকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

কিন্তু সর্বহারা রাষ্ট্র ও সর্বহারা একনায়কত্ব শুধু তার শ্রেণি চরিত্রে/স্বার্থে বুর্জোয়ার বিপরীত তাই নয়, রূপ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রেও একে মূলত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে ভিন্ন হতে

হবে, এবং সেটা তা হতেও বাধ্য। তাই, সর্বহারা একনায়কত্ব ও রাষ্ট্র শক্তিশালী করার অর্থ সরলরৈখিকভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মত আমলাতন্ত্র ও গণবিচ্ছিন্নভাবে স্থায়ী সেনাবাহিনীকে শক্তিশালীকরণ বোঝায় না। স্ট্যালিনীয় রাশিয়ায় এ ধরনের বিচ্যুতি সর্বহারা একনায়কত্বকে শক্তিশালী না করে বরং দুর্বল করেছিল– কারণ বুর্জোয়া সম্পর্কগুলোই এতে জোরালো হয়ে উঠেছিল। সুতরাং কীভাবে সর্বহারা একনায়কত্বকে শক্তিশালী করা যায়– তার সর্বহারা চরিত্রের সাথে ও কমিউনিস্ট মিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সেটা একটা বড় গবেষণা, আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়। মাও-এর নেতৃত্বে চীনা সর্বহারা শ্রেণি জিপিসিআর-কালে এক্ষেত্রে অনেক 'সমাজতান্ত্রিক নতুন জিনিষ'-কে গড়ে তুলেছিল। এসবকে বিকশিত করতে হবে। এবং ধাপে ধাপে এসবকে তত্ত্বায়িতও করতে হবে। এ ভাবেই শুধু আমাদের মতবাদের আরো বিকাশ ঘটতে পারে।

সুতরাং সর্বহারা শ্রেণি ও মালেমা-বাদীদেরকে ২১-শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অবশ্যই সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্বকে বিকশিত করার দায়িত্ব সাহসের সাথে হাতে নিতে হবে।

* মালেমা-বাদীদের সামনে আরো বেশকিছু মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্ন ও বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে যে সবের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা এ নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। তবে সে বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদের গতি বিষয়ে আলোচনা এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় সর্বহারা বিপ্লবে নিয়োজিত। তাই সাম্রাজ্যবাদের নিয়মবিধিকে ভালভাবে উদ্ঘাটন ও আত্মস্থ করার উপর এ বিপ্লবের সাফল্য নির্ভরশীল। মহান লেনিন শতবর্ষ আগে সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত মার্কসবাদী তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বিগত প্রায় একশ' বছরে সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম ও গতি সম্পর্কে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে যার সঠিক সারসংকলন হওয়া প্রয়োজন। মাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূল্যায়ন অবশ্যই করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের নিয়মকে আরো ভালভাবে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। এর সাথে সাম্রাজ্যবাদের সংকট, বিপ্লবী পরিস্থিতি, বিশ্ব পরিসরে প্রধান দ্বন্দ্ব, ৩য় বিশ্বে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, বিপ্লবের রণনীতি, পাশাপাশি একসারি দেশে বিপ্লবী সোভিয়েত গঠন, শত্রুর দ্বন্দ্ব ব্যবহারে কৌশলগত লাইনের বিকাশ– ইত্যাদি এক সারি গুরুতর রাজনৈতিক লাইনগত সমস্যা জড়িত। এক দেশে বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ– এ দু'য়ের দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার বিষয়ও এর সাথে যুক্ত। এ বিষয়গুলোতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভিন্ন মত রয়েছে। এই মতভিন্নতাকে মীমাংসার জন্য ২১-শতকে মালেমা-কে অবশ্যই বিকশিত করতে হবে। আর এজন্য মালেমা-বাদীদের মধ্যকার বিতর্ককে এগিয়ে নিতে হবে।

মাওবাদীদের এই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে পরিচালনা করতে হবে সুস্থভাবে। কারণ অসুস্থ বিতর্ক ও সংগ্রাম চূড়ান্তভাবে শত্রুকেই সাহায্য করে। আমরা এখনি বলতে পারি না ২১-শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের মালেমা-বাদী মতাদর্শকে তার বিকাশের চতুর্থ স্তরে উন্নয়ন অপরিহার্য কিনা। কিন্তু কিছু মৌলিক প্রশ্ন ও বিতর্ক

ইতিমধ্যে চলে এসেছে যা কিনা বিকাশমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবে প্রকৃত মালেমা-বাদীদেরকে মোকাবেলা করতে হবে তার মতবাদের বিকাশের দ্বারা, নিছক তার অতীত অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বাবলীর গোঁড়ামিবাদী সমর্থন দ্বারা নয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। যেমন– বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার আদর্শের আন্তর্জাতিকতাবাদী চরিত্র– যার থেকে উদ্ভূত হয় যে, এ মতাদর্শ শুধুমাত্র বৈশ্বিক পরিসরেই বিকশিত হতে পারে।

মালেমা-কে ২১-শতকে তার চতুর্থ, পঞ্চম ... এভাবে নতুন নতুন উচ্চতর স্তরে বিকশিত করার বিষয়কে তত্ত্বগতভাবে বিরোধিতা করা যায় না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আজকের অনেক বিকশিত 'বিশ্বায়ন'-এর যুগে এ বিকাশ ঘটতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মাওবাদী বিপ্লবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে। বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লব এক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম/পারে– যাকে বিশ্বজুড়ে মাওবাদীরা আত্মীকরণ ও সংশ্লেষণ করে মতবাদকে উচ্চতর স্তরে এগিয়ে নিতে পারেন। এ বিষয়টি এখন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, বিশ্ব মাওবাদীদের একটি ঐক্যকেন্দ্র রিম রয়েছে। যা একটি নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক গঠনের কাজকে এগিয়ে নিচ্ছে। তাই, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের মতাদর্শকে কী নামে ডাকবো সে প্রশ্নটিও উঠে আসতে পারে এক বাস্তব সমস্যা আকারে। সেটা অবশ্য আরো ভবিষ্যতেরই সমস্যা। কিন্তু বর্তমানে প্রয়োজন হলো গবেষণা, আলোচনা ও বিতর্কের মৌলিক বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা ও বিপ্লবী সংগ্রামকে ভিত্তি করে ও সুস্থ বিতর্ককে বিকশিত করে আমাদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক লাইনকে বিকশিত করে তোলা। আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণি তার মূল্যবান বৈশ্বিক সংগঠন রিম-এর নেতৃত্বে এ পথে নিজেকে বিকশিত করতে সক্ষম হবে এটাই আমরা আশাকরি। এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ও মানবজাতির ইতিহাসের আমূল রূপান্তরকারী ২১-শতকে মালেমা-কে এভাবেই কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে, এবং এক নতুন জগতে সমগ্র মানবজাতি প্রবেশ করতে পারবে– এমন আশা আমরা করতে পারি। যখন কিনা শোষণহীন শ্রেণিহীন এক কমিউনিস্ট বিশ্বে গুণগতভাবে নতুনতর সংগ্রামের যুগে মানবজাতি সগর্বে প্রবেশ করবে এবং প্রকৃত সভ্যতা ও আধুনিক জীবনের সূত্রপাত করবে। ❑

নেপাল পার্টির লাইন ও নেপাল পরিস্থিতির উপর কয়েকটি দলিল

(১)

নেপাল ও ভারতের মাওবাদী পার্টির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে

নেপাল পার্টির দ্বারা উত্থাপিত পেপারের উপর কিছু প্রাথমিক মন্তব্য

(১৪ ডিসেম্বর, ২০০৬)

সর্বপ্রথম, ২০-শতকের সর্বহারা বিপ্লবগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহের সারসংকলন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সিপিএন-মাওবাদী, যারা কিনা বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজকে হাতে নিয়েছে, এবং এই সেমিনার হলো এই প্রক্রিয়ায় একটি পদক্ষেপ। আমরা তাদেরকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

সিপিএন-মাওবাদীর পেশকৃত এ্যাপ্রোচ পেপারের সংক্ষিপ্তসারের উপর কিছু প্রাথমিক মন্তব্য নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে। এগুলো হলো প্রধানত সমালোচনা অথবা দ্বিমত। আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার সাথে আমরা একমত, সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি না।

১। বিশ্ব পরিস্থিতি ঃ বস্তুগত অবস্থা–

"বিপ্লবের জন্য বস্তুগত পরিস্থিতি যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি পরিপক্ক হয়ে উঠছে"– এই অভিমত মনে হয় খুবই সরলীকৃত ও একতরফা। আমরা একমত যে, বস্তুগত পরিস্থিতি ভাল, কিন্তু বহু সমস্যা ও জটিলতাও রয়েছে। এটা "যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি পরিপক্ক হয়ে উঠছে"– এমন নয়।

২। আত্মগত অবস্থা ঃ বিপ্লবী শক্তি–

"সকল বস্তুগত ও আত্মগত শর্ত তৈরি হবার জন্য সর্বহারা অগ্রগামী শক্তির অপেক্ষা করে থাকা উচিত নয়, বরং তার উচিত গণযুদ্ধ শুরু করার বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা... ... ..."– আমরা এই বক্তব্যের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করছি।

কিন্তু "নতুন মডেল" বিষয়ে প্রচুর আলোচনা প্রয়োজন। প্রতিটি দেশের প্রতিটি বিপ্লবে "নতুন মডেল" প্রয়োজন নেই। যাহোক, আজকের বাস্তবতায় আমরা প্রস্তাবিত মডেলের উপর গুরুতর আলোচনা করতে পারি।

৩। সাম্রাজ্যবাদ– অতীতে ও বর্তমানে

ক) সাম্রাজ্যবাদ টিকে রয়েছে কারণ, ..."*সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতায় থাকাকালের শেষ দিকে পুঁজিবাদের উপরে নিজের উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারেনি*"... ... এই বক্তব্যের বিষয়ে, আমরা খুবই দ্বিমত পোষণ করি। এটা আমাদের মতাদর্শ ও ইতিহাসকে গুরুতরভাবে নেতিকরণ করে। এটা শ্রেণি অবস্থানের সাথেই জড়িত।

সর্বহারা শ্রেণি সর্বদা সকল ক্ষেত্রে– অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র– সবক্ষেত্রে তার উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছে। অবশ্যই এ সবকেই বিকশিত করতে হবে। কিন্তু একে সাম্রাজ্যবাদের সাথে কোনক্রমেই তুলনা করা চলে না।

খ) *"সমগ্র বিশ্বকে একটি একক বিশ্বায়িত রাষ্ট্রে"*... ... এই বক্তব্যের মাধ্যমে, কিছু ভুল উপলব্ধি আবির্ভূত হতে পারে।

প্রথমত সাম্রাজ্যবাদ, তার সূচনা থেকেই, ছিল ও রয়েছে বৈশ্বিক। এটা সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এবং বিগত যুগের পুঁজিবাদের থেকে পার্থক্য। তাই, বিশ্বায়ন মূলত নতুন কোন বিষয় নয়। যদিও, ৯০-দশকের থেকে নতুন বৈশিষ্ট্য আবির্ভূত হয়েছে, যার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়ত এটা একজনকে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বকে নেতিকরণের দিকে চালিত করতে পারে। এবং চলমান বিশ্বে, বিশেষত আগামী বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই দ্বন্দ্বের গুরুত্বকে কমিয়ে দেবার দিকে চালিত করতে পারে।

৪। বিপ্লবের রাজনৈতিক-সামরিক রণনীতি

আমরা এই অবস্থানের সাথে একমত যে, অভ্যুত্থানমূলক কৌশলের কিছু দিককে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ-র রণনীতির সাথে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু, এটা নতুন একটা রণনীতি তৈরি করে কি করে না তা আমাদের আরো বোঝা প্রয়োজন।

নিশ্চয়ই লেনিনের রণনীতি ও কৌশলকে আরো অধ্যয়ন করা উচিত। কিন্তু, আমরা মনেকরি, গণযুদ্ধ-র সার্বজনীনতা হলো গুরুত্বপূর্ণ, যখন কিনা আমরা রণনীতির কথা বলি। এবং, এখান থেকে আমাদের উচিত গণযুদ্ধ-র রণনীতিকে বিকশিত করা।

৫। গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব

এটাই মনে হয় সারসংকলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিপিএন-মাওবাদী কিছু ধারণাকে উপস্থাপন করেছে যার উপর সামগ্রিকভাবে বিতর্ক চালানো উচিত।

সর্বহারা পার্টি দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। তেমনি, সমাজতান্ত্রিক সমাজও বিভিন্ন মতের মধ্যকার– অর্থাৎ, রাজনীতি, মতাদর্শ, ধারণা, লাইন, পরিকল্পনা, পলিসি, কৌশল ইত্যাদির মধ্যকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে পারে ।

এথেকে উদ্ভূত হয় এই সমস্যা যে, কীভাবে একে সঠিকভাবে মীমাংসা করা যায়। পার্টি ও রাষ্ট্রের রং বদল না করা; পাশাপাশি মতের বিভিন্নতার মধ্যকার সংগ্রামকে নিশ্চিত

করা। এটা হলো শত্র“ শ্রেণির উপর একনায়কত্ব ও জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র'র সমস্যা।

কিন্তু কোনটা প্রধান দিক? আমরা মনেকরি যদি একনায়কত্বকে প্রধান দিক হিসেবে আঁকড়ে ধরা না হয়, তাহলে সমগ্র দিশাটাই পথভ্রষ্ট হবে।

"বহুদলীয় প্রতিযোগিতা" সঠিক দিশাকে প্রকাশ করে কিনা তাতে আমাদের গভীর সন্দেহ রয়েছে। মাও বলেছেন, "বহুদলীয় সহযোগিতা"। আমাদের উচিত একে বিকশিত করা। আমাদের শুধুই সহযোগিতা প্রয়োজন তা নয়, সংগ্রামও প্রয়োজন। "প্রতিযোগিতা" যতনা সর্বহারা, তার চেয়ে বেশি বুর্জোয়া– আমাদের মনেহয়। ❑

(২)

নেপাল পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু মূল পয়েন্ট

(প্রথম রচনা ঃ আগষ্ট, ২০০৭
আংশিক সংশোধিত ঃ জানুয়ারি, ২য় সপ্তাহ, ২০০৮)

ক)

১। নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুর“ত্বপূর্ণ বাঁক নেয় '০৬-সালের এপ্রিল মাসে গণঅভ্যুত্থানের মুখে রাজার পিছু হটা ও পুরনো পার্লামেন্ট পুনস্থাপনের মধ্য দিয়ে।

– তারপর মাওবাদীরা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ও ৭-দলীয় বুর্জোয়া সংসদীয় সরকারের সাথে আলোচনা শুর“ করে।

২। পরিস্থিতি আরো গুর“ত্বপূর্ণভাবে মোড় নেয় কয়েকমাস পরে সরকারের সাথে মাওবাদীদের চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।

– এর মধ্য দিয়ে মাওবাদীরা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অস্ত্র ব্যবস্থাপনায় রাজি হয়, বিপ্লবী সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়, মাওবাদীদেরকে শরীক করে নতুন এক আইনসভা গঠন করা হয়, নতুন একটি অন্তর্ব্বর্তীকালীন সংবিধান গ্রহণ করা হয়, মাওবাদীদেরকে যুক্ত করে নতুন একটি অন্তর্ব্বর্তীকালীন সরকারও গঠন করা হয়।

– এরপর নভেম্বর, '০৭-এ সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু মাওবাদীরা কিছু দাবি উত্থাপন করে সরকার থেকে বেরিয়ে আসে, যার মাঝে প্রধানতম দাবি ছিল অবিলম্বে রাজতন্ত্রকে বিলোপ করা ও নেপালকে গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা। এ অবস্থায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

– গত বছরের শেষে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা বিষয়ে সরকারের সাথে মাওবাদীদের সমঝোতা হয়। এবং তারা পুনরায় সরকারে যোগ দেন।

– এখন ১০এপ্রিল,'০৮-এ সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংবিধান সভা নতুন একটি সংবিধান রচনা করবে। যার ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে।

৩। মাওবাদীরা রাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ অবসান ও নেপালকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার আনুষ্ঠানিকীকরণের কর্মসূচি নিয়ে এখন কাজ করছে।

খ)

১। নেপাল পরিস্থিতি বলতে আমরা বুঝিয়ে থাকি নেপাল বিপ্লবের পরিস্থিতি। সেক্ষেত্রে নির্ধারক বিষয় হলো নেপালের মাওবাদী পার্টির নেয়া লাইন, নীতি, কৌশলসমূহ।

২। নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরোক্ত বিকাশগুলোর সাথে নেপাল পার্টির লাইন, নীতি, কৌশলসমূহ অন্যতম নির্ধারক ভূমিকা পালন করছে।

– যদিও ২০০৬-এর এপ্রিল থেকে পরিস্থিতির নতুন বিকাশগুলো দেখা যায়, কিন্তু এর লাইনগত সূচনা হয়েছিল '০৫-সালের নভেম্বরে । তখন ৭-দলীয় বুর্জোয়া সংসদীয় জোটের সাথে মাওবাদীদের ১২-দফা চুক্তি হয়। সে চুক্তিই এপ্রিল/'০৬-এর অভ্যুত্থানের লাইনগত ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

৩। নেপাল পার্টি লাইনগত ক্ষেত্রে যে নতুন বিকাশগুলোর কথা বলছে তার শুর“ হয়েছিল '০১-সালে পার্টির ২য় জাতীয় সম্মেলনে।

– তখন তারা মতাদর্শ হিসেবে "প্রচন্ড পথ" গ্রহণ করেন।

– এ সময় থেকেই পার্টি "ফিউশন" তত্ত্বের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ ও অভ্যুত্থান– এ দুই রণনীতির মিশ্রণে নতুন রণনীতির কথা বলা শুর“ করে।

– '০৩-সালের সিসি-মিটিঙে পার্টি "২১-শতকের গণতন্ত্র" নামে আরেকটি নতুন ধারণার প্রকাশ ঘটায়।

– এরপর থেকে পার্টি ক্রমাগত জোরালোভাবে মালেমা'র বিকাশের কথা বলছে।

– '০৫-সালের শেষদিকে সিসি-মিটিঙের পর থেকে পার্টি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বের বিকাশের কথা বলছে।

৪। নেপাল পার্টির উপরোক্ত নতুন লাইন, তত্ত্বগত ধারণা ও অবস্থানগুলোর সাথে নেপাল পরিস্থিতিতে তাদের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলো– কৌশল, নীতি, ধারণাগুলো-যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

– সুতরাং মালেমা'র ভিত্তিতে সেই সব লাইন/তত্ত্বের মূল্যায়নের সাথে নেপাল পরিস্থিতির মূল্যায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

– তবে মালেমা বিকাশের সেই সাধারণ সমস্যাগুলোর উপর আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করতে চাই।

– এখানে আমরা আলোচনা করবো মূলত নেপাল পরিস্থিতির উপর ও তার সাথে সরাসরি যুক্ত নেপাল পার্টির দেশীয় লাইনগুলোর উপর। তবে স্বভাবতই সেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপরোক্ত সাধারণ তত্ত্বগুলোকে স্পর্শ না করে পারবে না।

গ)

১। ১২-দফা চুক্তির নির্ধারক বিষয় ছিল রাজতন্ত্রের বির"দ্ধে যুগপৎ আন্দোলন। কিন্তু তার সাথে ভবিষ্যত কর্মসূচির কিছু ইঙ্গিতও সেখানে ছিল।

– তার মাঝে কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল, রাজতন্ত্রের অবসানের পর সংবিধান সভার নির্বাচন আয়োজন করা, যার মাধ্যমে নেপালের ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে।

– এই কর্মসূচির ক্ষেত্রে পার্টির "২১-শতকের গণতন্ত্র" ধারণার অন্যতম প্রধান গুর"ত্বপূর্ণ প্রস্ড়াবনা "বহুদলীয় প্রতিযোগিতা" ক্রিয়াশীল ছিল তা বলাই বাহুল্য।

* সমস্যার উৎস নিহিত ছিল এখানেই। এটা নেপাল বিপ্লবের বর্তমান সমস্যাকে কার্যত রাজতন্ত্রে সীমিত করে ফেলে। যাকিনা নেপাল বিপ্লবের বর্তমান স্ড়রে মূল গণশত্র" সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্ড়বাদকে আড়ালে ঠেলে দেয়। এটা শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গির বদলে কর্মসূচি হাজির করে গণশত্র" শাসক শ্রেণিগুলোর রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ, তথা রাজতন্ত্রকে কেন্দ্রে রেখে।

– রাজতন্ত্র বিলোপ হলেও ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ড় উপরোক্ত মূল শত্র"গুলো উচ্ছেদ না হবে।

– বিপ্লবের মূল শত্র"গুলো ও তাদের রাষ্ট্র মূলত অব্যাহত রেখে কোন ধরনের সার্বজনীন নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজ-সমস্যার সমাধানের কর্মসূচি হাজির করাটা বুর্জোয়া সংসদীয়বাদকেই সামনে নিয়ে আসতে বাধ্য। সেটা মাওবাদীরা চান বা না চান তার উপর তা নির্ভরশীল নয়।

২। সংবিধান সভার নির্বাচনের জন্য বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় যাওয়াটা প্রমাণ করে এই দলগুলোর শ্রেণি চরিত্রের বদলে তাদের শাসন-পদ্ধতির উপর পার্টি প্রধান গুর"ত্ব দিয়েছে ও দিচ্ছে।

– পরিস্থিতির চাপে এখন যদি এই দলগুলো, এবং তারা যে শ্রেণিগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে সেই সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্ড়বাদ তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেটা হবে শুধুমাত্র একটা সংস্কার– তাদের এই ব্যবস্থাটিকে পরিশোধন করে আরো ভালভাবে চালাবার জন্য। এরা কোন জাতীয় বুর্জোয়া শক্তির প্রতিনিধিও নয়। বরং বিপ্লবের শত্র"দের প্রতিনিধি।

– পার্টি এদেরকে 'বিপ্লবে'র মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিলেই শুধু এই দলগুলোর সাথে "বহুদলীয় প্রতিযোগিতা" চালাতে পারে। পার্টি-যে এটা গ্রহণ করে নিয়েছে তা প্রমাণ করে যে তত্ত্বগতক্ষেত্রে তারা এমন এক কৌশল গ্রহণ করেছে যা তাদেরকে এই দলগুলোর শ্রেণি-প্রকৃতি সম্পর্কে এক বিপজ্জনক ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। তারা কার্যত এদেরকে প্রজাতন্ত্রের মিত্র শক্তি বলে গ্রহণ করেছে। যদিও এরা হলো প্রকৃত "গণপ্রজাতন্ত্র"-র শত্র"। "কে শত্র" কে মিত্র"– এটা হলো বিপ্লবের সর্বপ্রধান প্রশ্ন– মাও-এর এই প্রাথমিক শিক্ষাটিকেই তারা এর মাধ্যমে কার্যত গুলিয়ে ফেলেছেন।

৩। প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে নেপাল পার্টির ধারণা খুবই গোলমেলে ও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

– সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত সকল দেশে রাজতন্ত্র, বা অন্য যেকোন ধরনের প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্র, যেমন, সামরিক শাসন, জর"রী অবস্থা ইত্যাদি থেকে প্রজাতন্ত্রে উত্তরণ বুর্জোয়াদের কাছে সংস্কারের বিষয়। আর মাওবাদীদের কাছে তা হলো বিপ্লবের বিষয়। তাই, শুধুমাত্র স্লোগানের ঐক্য ছাড়া ও রাজতন্ত্রের বির"দ্ধে যুগপৎ আন্দোলনের কিছু কিছু বাস্ড়বতা ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচিতে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল ৭-দলীয় সংসদীয় বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলোর জোটের সাথে কোন ঐক্য হবার সুযোগ বিপ্লবীদের নেই।

– আজকের বিশ্বে রাজতন্ত্র, সামরিক স্বৈরতন্ত্র বা অন্যবিধ স্বৈরতন্ত্র ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিদ্যমান ব্যবস্থা (সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্ড়বাদের ব্যবস্থা) তথাকথিত গণতন্ত্রের পদ্ধতিতেও বজায় রয়েছে। এর বড় দৃষ্টান্ড়হলো ভারত– যা কিনা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় "সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র" নামে পরিচিত। আমাদের বাংলাদেশও একটি "গণ প্রজাতন্ত্র"। তাই, নেপালে রাজতন্ত্র অবসান হলেও ব্যবস্থা মূলত একই থাকবে প্রজাতন্ত্রের নামে, যদিনা "নয়া গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা হয়। তাই, প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচি হতে হবে মূলত নয়া গণতন্ত্রের কর্মসূচি, আর এতে উপরোক্ত সংসদীয় বুর্জোয়া দলগুলো কখনই একমত হবে না। তাদের সহকারে নেপালকে প্রজাতন্ত্র বানানোর কর্মসূচি বাস্ড়বে নেপালকে একটি ক্ষুদে ভারত বা বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে নেবারই কর্মসূচি। এটা কোন বিপ্লবী কর্মসূচি নয়।

– পার্টি বলেছে, এই প্রজাতন্ত্র হবে না নয়া গণতন্ত্র, না বুর্জোয়া সংসদতন্ত্র।

আমাদের প্রশ্ন হলো এর শ্রেণি চরিত্রটা কী হবে? নয়া গণতন্ত্র (যার নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রেণি) আর বুর্জোয়া সংসদতন্ত্র (যার নেতৃত্বে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালেরা)– এ দু'য়ের মাঝে একটিমাত্র ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় যার নেতৃত্ব দেবে জাতীয় বুর্জোয়ারা। কিন্তু নেপালে সেই শক্তির প্রতিনিধি কোথায়? তারাতো হয় সংসদীয়বাদ, নতুবা নয়াগণতন্ত্র– এ দু'য়ের মাঝে বিলীন হয়ে আছে। আজকের বিশ্বে সেটাই হতে বাধ্য। যে কারণে বুর্জোয়া নেতৃত্বে কোন গণতান্ত্রিক বিপ্লব বর্তমান বিশ্বে আর হতে পারে না।

– বাস্ড়বে পার্টি রাজতন্ত্রের বিপরীতে আর যে প্রধান শক্তিটিকে প্রজাতন্ত্রের দিকে নিতে চাইছে ও মৈত্রী স্থাপন করেছে, তা হলো বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলো, যারা প্রকৃত জনগণতন্ত্রের শত্র" শ্রেণিগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে।

৪। আমরা নেপাল পার্টির বিভিন্ন দলিলে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপস্ড়র-এর কথা উত্থাপিত হতে দেখেছি।

– আমরা এখনো পরিষ্কার নই যে, এই কথিত উপস্ড়রটা কী?

যেমন, বর্তমানে মাওবাদীদের শরীক করে যে যুক্ত সরকার চলছে, একটা অন্ড়র্বর্তীকালীন সংবিধান কার্যকর হয়েছে, এটাই-কি সেই উপস্ড়র? নাকি নির্বাচনের

পর যদি মাওবাদীরা প্রাধান্য পায়, রাজতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে নেপালকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় তাহলে সেটা হবে উপস্ড়র?

– যেভাবেই ঘটুক না কেন, আমরা দেখছি যে, বিপ্লবের শত্র“ শ্রেণিগুলোকে অব্যাহত রেখে ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মৈত্রী রেখে (শুধুমাত্র সম্ভবত রাজতান্ত্রিক শক্তিগুলো বাদে), তাদের সাথে "প্রতিযোগিতা"র সম্পর্ক বজায় রেখেই এটা করা হচ্ছে বা হবে। কারণ, স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এটা নয়া গণতন্ত্র নয়।

– সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, এটা বিদ্যমান ব্যবস্থার রাজতান্ত্রিক অংশগুলোকে বাদ দিয়ে একটা রাজনৈতিক সংস্কার মাত্র। এটা বিপ্লবের কোন উপস্ড়র নয়, কারণ, ব্যবস্থাকে মূলত অব্যাহত রেখে রাজতন্ত্রের অবসান বিপ্লবের কোন বিষয় নয়।

– র“শ বিপ্লবের প্রথম স্ড়র ফেব্র“য়ারি বিপ্লবের পূর্বকালে বলশেভিকদের কৌশলের সাথে নেপাল পরিস্থিতিকে তুলনা করতে দেখা যায়।

এক্ষেত্রে মূল বিভ্রান্ড়িটা হলো, র“শ সমাজের সাথে নেপাল সমাজের মূলগত পার্থক্যটা এখানে দেখা হয় না। রাশিয়ায় সামন্ড়তান্ত্রিক রাজতন্ত্র থাকলেও তা ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশও বটে, এবং তখনও সর্বহারা বিপ্লবে বিশ্ব প্রবেশ করেনি। বিপরীতে নেপাল হলো সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত একটি দেশ এবং এখানকার বুর্জোয়ার মূল অংশ হলো সাম্রাজ্যবাদের দালাল শ্রেণি। নেপালে রাজতন্ত্র সামন্ড়তন্ত্রের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, আবার রাজতন্ত্র শুধুমাত্র সামন্ড়তন্ত্রের প্রতিনিধিও নয়। নেপালে সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্ড় যে ব্যবস্থা বজায় রয়েছে তারই প্রতিনিধি হলো রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র অবসান করেও এ ব্যবস্থা চলতে পারে, যা ভারত বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বেশির ভাগ তৃতীয় বিশ্বের দেশেই এখন চলছে। অন্যদিকে রাজতন্ত্র সামন্ড়বাদকে প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদকেও প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং রাজতন্ত্র অবসানের মাধ্যমে সামন্ড়বাদের অবসান ও একটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্ড়া আজকের বিশ্ব ও নেপালী বাস্ড়বতার প্রেক্ষিতে এক অলীক কল্পনা মাত্র।

৫। ১২-দফা চুক্তি, ২৮-দফা সমঝোতা ও অসংখ্য সাক্ষাতকার দলিলপত্রের মাধ্যমে পার্টি সুস্পষ্টভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও বারংবার ঘোষণা করেছে যে, অনুষ্ঠিতব্য সংবিধান সভার নির্বাচনে জনগণ যে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করবেন সেটা তারা মেনে চলবেন। অবশ্য পার্টি সর্বদাই দাবি করে আসছে যে, নির্বাচনে জনগণ তাদেরই বিজয়ী করবেন, এবং এভাবে পার্টি তাদের কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের ম্যান্ডেট পাবে। বাস্ড়বে নির্বাচনে মাওবাদীদের বিজয়ী হবার সম্ভাবনাও একসময়ে উজ্জ্বল বলেই মনে হতো। এখন সে অবস্থাটি কী দাঁড়িয়েছে তা আমরা নিশ্চিত নই।

– এই কর্মসূচি ভয়ংকরভাবে পার্টির বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

নির্বাচনে মাওবাদীরা জিততে পারবে কি পারবে না তার চেয়ে গুর“ত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, এর মধ্য দিয়ে মাওবাদীরা ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখে তার অধীনে নির্বাচনকে পরম করে ফেলেছে। যা কিনা সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্ড় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মুৎসুদ্দি

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ভোট সম্পর্কে মার্কসের সময় থেকে সর্বহারা শ্রেণির শিক্ষাগুর“রা এতকিছু বলেছেন যে, সে সম্পর্কে পুনর“ক্তি না করে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই 'কৌশল' শুধুই কৌশল নয়, এটা পার্টির আজকের রাজনৈতিক কর্মসূচির একটা মূল স্ড়ম্ভ হয়ে পড়েছে, এবং এটা হয়ে পড়েছে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়।

৬। ইতিমধ্যে পার্টি তার বাহিনীর অস্ত্রসম্ভারকে ঘোষিতভাবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জমা রেখেছে, যখন কিনা পুরনো রাষ্ট্রের বাহিনী প্রধানত অক্ষুণ্ন রয়েছে। পার্টি নতুন বিপ্লবী রাষ্ট্রের ভ্রূণ বিপ্লবী কাউন্সিল বিলুপ্ত করেছে। পার্টি গ্রামাঞ্চলে গণযুদ্ধের দশ বছরে কৃষকদের দ্বারা দখলকৃত জমি-সম্পত্তি পূর্ব মালিকদের ফেরত দিতে স্বীকৃত হয়েছে (অন্ড়ত আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও)।

এসমস্ড় চুক্তি বিপ্লবী বাহিনী ও বিপ্লবী ক্ষমতাকে অন্ড়ত মৌখিকভাবে হলেও সমর্পণ করে দেবার সামিল।

৭। ১২-দফা চুক্তির পর, এপ্রিল বিদ্রোহের পর ও যুক্ত সরকার গঠনের পর পার্টি ও নেতৃত্বগণ এমনকিছু বক্তব্য প্রকাশ করেছেন যা উপরোক্ত রাজনীতির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর বিপ্লবী রাজনীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা এখানে নির্ধারক একটা প্রশ্ন শুধু উত্থাপন করতে চাই।

– পার্টির নেতৃত্বগণ বারংবার বলেছেন যে, পার্টি আর যুদ্ধে ফেরত যাবে না। পার্টি শান্ড়িপূর্ণ পদ্ধতিতেই শুধু আন্দোলন করবে।

এ জাতীয় বক্তব্য ভয়ংকরভাবে পার্টি ও জনগণকে নিরস্ত্র করে দেবার সামিল। এবং তা বিপ্লবী মার্কসবাদকে নাকচ করে দেয়।

– পার্টি গণযুদ্ধ আর অভ্যুত্থানের ফিউশন ঘটিয়ে নতুন যে রণনীতি নির্মাণের কথা বলছে তাকে আমরা যদি বিপ্লবী বিকাশ বলে গ্রহণ করেও নেই, তাহলেও উপরোক্ত বক্তব্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যাবে না, এবং তা বরং এই ফিউশনকেও লংঘন করবে।

বিপ্লবী অভ্যুত্থান কখনোই শান্ড়িপূর্ণ ছিল না ও হতে পারে না। তা সশস্ত্র অভ্যুত্থান না হয়ে বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে না, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে না, এবং তা জনগণের ক্ষমতাকে সৃষ্টি ও রক্ষা করতে পারে না। বাস্ড়বে বিপ্লবী অভ্যুত্থান নিজেই গণযুদ্ধের একটা রূপ। এবং তা গণযুদ্ধকে নতুন মাত্রায় শুর“ ও উন্নীত করার উপায় মাত্র।

অন্যদিকে আজকে পার্টির প্রভাব ও ক্ষমতা গড়ে উঠেছে যে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের গর্ভ থেকে, সেই গণযুদ্ধে সৃষ্ট গণক্ষমতাকে যদি পার্টি এগিয়ে নিতে আন্ড়রিক হয় তাহলে আজকের সমঝোতা যেকোন সময় ভেঙ্গে যেতে বাধ্য, এবং পার্টিকে অবশ্য অবশ্যই আবার গণযুদ্ধে ফেরত যেতে হবে। সেটা কথিত অভ্যুত্থান সৃষ্টির পূর্বে, সময়ে বা পরে যেকোন সময়ে ঘটতে পারে। এবং সেজন্য পার্টিকে পূর্ণ প্রস্তুতি রাখতে হবে যার প্রধান বিষয় হলো পার্টি ও বিশেষত জনগণের রাজনৈতিক প্রস্তুতি।

পার্টি বাস্ড়বে উপরোক্ত ঘোষণা দিয়ে পুরনো রাষ্ট্র ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগুলোর রাজনীতি ও মতাদর্শকেই শক্তিশালী করে দিয়েছে।

ঘ)

১। পার্টি প্রথম থেকেই ঘোষণা করছে যে, উপরোক্ত যাকিছু পার্টি করেছে ও করছে, বলেছে ও বলছে, তা সবই হলো কৌশল। বিপ্লবের রণনীতিকে সেবা করার জন্য।

– এর পক্ষে কৌলশগত প্রশ্নে পার্টির বর্তমান রাজনীতির পক্ষে চীনা বিপ্লবে মাও সেতুঙ-এর নেয়া চিয়াং কাই শেকের সাথে জাপবিরোধী যুদ্ধকালে যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলের কথাটি বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। বিশেষত বলা হয় যে, যুদ্ধের পরেও মাও কোয়ালিশন সরকারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, স্বয়ং চিয়াং কাই শেকের সাথে দিনের পর দিন বৈঠক করেছেন সমঝোতায় পৌঁছবার জন্য। ভারতের এনবি (নক্সালবাড়ী গ্রুপ) নেপাল পার্টির এ কৌশলকে একটি নতুন অভিজ্ঞতা হিসেবে সমর্থনও করেছেন ও তার পক্ষে কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা দেখাচ্ছেন যে, মার্কিন ও কুওমিনতাং-এর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মাও-এর সে প্রচেষ্টা বাস্ড়ব রূপ লাভ করেনি বটে, কিন্তু যদি পরিস্থিতি ভিন্ন হতো তাহলে মাও নিশ্চয়ই যুক্ত সরকারে যেতেন, যেমন কিনা এখন নেপাল পার্টি গিয়েছে। মাও নিশ্চয়ই সরকারে না যাবার জন্য এই কৌশলগুলো গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, চিয়াং কাই শেকের সাথে সমঝোতায় পৌঁছবার জন্য মাও জাপবিরোধী যুদ্ধকালে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে বহু জায়গায় চিয়াং ও কুওমিনটাং-এর নেতৃত্বও মেনে নিয়েছিলেন। এবং পরে বাহিনীকে কিছু পরিমাণে সংকুচিত করা বা কর্মসূচিকে কিছুটা কাটছাট করাকেও গ্রহণ করেছিলেন।

– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে চীনা বিপ্লবে মাও-এর জাপবিরোধী রণকৌশল এখন আর কোন বিতর্কিত বিষয় নয়। সারা পৃথিবীর মাওবাদীরাই একে গ্রহণ করেন।

তবে যুদ্ধের পরে স্বল্প সময়ের জন্য মাও কুওমিনতাং ও চিয়াং-এর সাথে সেই যুক্তফ্রন্টকে এগিয়ে নেবার যে প্রক্রিয়া চালিয়েছিলেন তার উপর সমগ্র আন্দোলনে পরে আর তেমন কোন আলোচনা হয়নি।

– কিন্তু এর সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো ২য় বিশ্বযুদ্ধকালে ৩য় আন্ড়র্জাতিকের নেয়া বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী সাধারণ লাইনের প্রশ্নটি।

এটাও একটা রণকৌশল হিসেবেই এসেছিল। রিম গঠনের সময় এ প্রশ্নে রিম সারসংকলন করে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের এই সাধারণ লাইনটিকে রিম সমালোচনা করে। এর গুরুতর খারাপ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি ইউরোপের শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর। যুদ্ধকাল থেকেই যা শুরু, পরে যুদ্ধের শেষে তা বিলোপবাদে পরিণত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিগুলো স্ট্যালিনের নীতি অনুযায়ী স্ব স্ব দেশের বুর্জোয়াদের সাথে যুক্ত সরকারে যোগ দেয়, এ ঐক্যের স্বার্থে যুদ্ধকালে সৃষ্ট নিজেদের বাহিনী ও ক্ষমতাকে বর্জন করে। এভাবে প্রায় সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলন সে সব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতায় অধপতিত হয়।

চীনের ক্ষেত্রেও স্ট্যালিন একই প্রস্ড়াব করেছিলেন। সুতরাং চীনে যুদ্ধ পরবর্তীকালের সমঝোতা প্রচেষ্টা স্ট্যালিনের পরামর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল তা ভাবলে ভুল করা হবে। কিন্তু মাও স্ট্যালিনের পরামর্শ অনুযায়ী নিঃশর্ত ঐক্য করেননি।

তিনি কিছুটা আপোষে রাজি থাকলেও মূলত বিপ্লবী বাহিনী ও ক্ষমতাকে রক্ষা করে সমঝোতার চেষ্টা চালান, এবং আলোচনা যে ব্যর্থ হয়েছিল তার মৌলিক কারণ ছিল এটাই। মাও যদি রাজনীতিকভাবে ও মতাদর্শিকভাবে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া পথকে গ্রহণ করে নিতেন, সমঝোতাকে পরম করে ফেলতেন, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে চরম স্থান দিতেন তাহলে নিশ্চয়ই আলোচনা ভেঙে যেতো না। এবং তাহলে আমরা একটা চীন বিপ্লবকে পেতাম না।

তাসত্ত্বেও এ অভিজ্ঞতা আমাদের আন্দোলনে আরো পর্যালোচনার দাবি রাখে। বিশেষ কোন কোন অবস্থায় মুৎসুদ্দিদের সাথে কোন সরকারে অংশ নেয়া যাবে কি যাবে না তা খুবই ভাল পর্যালোচনার দাবি রাখে।

কিন্তু নেপালের অভিজ্ঞতাকে আমরা আদৌ কৌশল হিসেবে আলোচনা করিনি। কৌশলগতভাবে বিভিন্ন প্রশ্নে শত্রুর সাথে আলোচনা, প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে গৌণ শত্রুগুলোর সাথে সমঝোতা, যুগপৎ আন্দোলন, এমনকি কোন কোন অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট গঠন– এসবই বিপ্লবী কমিউনিস্টরা যুগ যুগ ধরেই করেছেন। কিন্তু নেপালের ক্ষেত্রে আমরা যা আলোচনা করেছি তাহলো, তাদের বর্তমান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচির প্রশ্ন। যার কেন্দ্রে রয়েছে সর্বহারা একনায়কত্বের কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির বদলে উদারনৈতিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনা, যা থেকে এসেছে প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে কার্যত মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচিকে পথ করে দেয়া, বিপ্লব সাধন না করেই এবং মুৎসুদ্দি দলগুলোর সাথেও "বহুদলীয় প্রতিযোগিতা"-র নীতি গ্রহণ করা, ব্যবস্থার অধীনে ভোটকে পরম করে ফেলার দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার করা, এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে বিপ্লবী বাহিনী ও ক্ষমতাকে মিলিয়ে দেয়া, তার অবলুপ্তি বা সমর্পণ– ইত্যাদি।

ঙ)

১। নেপাল পার্টির লাইন/নীতি/কৌশলগুলো জানা/বোঝা ও নেপালের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করি, যদিও সে সব পর্যাপ্ত নয়। এই সব অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় নেপাল পার্টির খুবই দায়িত্বশীল স্ড়র থেকে আমরা যা জানতে/বুঝতে পেরেছি তার কিছু উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন।

প্রথমত তারা বারংবার যা বলতে ও বুঝাতে চেয়েছেন তাহলো, তারা কৌশলগতভাবে যেখানে যাই বলুন না কেন, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই তাদের কর্মসূচি ও লক্ষ্য, তারা একটা অভ্যুত্থানের লক্ষ্যে কাজ করছেন, এখনকার কাজকর্ম ও কথাবার্তা সবই কৌশলগত, নির্বাচন আদৌ হবে বলে তারা মনে করেন না, তারা বর্তমান ক্ষমতাকে তেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না, বিপ্লবের প্রতি তারা আন্ড়রিক– ইত্যাদি।

অস্ত্র ব্যবস্থাপনা, বিপ্লবী সরকার ও ক্ষমতার বিলুপ্তি, কৃষকের জমি-সম্পত্তি ফেরত প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো এগুলো সবই শত্রুর সাথে খেলা, শত্রু খেলছে আমরাও খেলছি। বাহিনী মূলত রক্ষা করা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার বাইরে, ব্যবস্থাপনার

অধীনস্ড় বাহিনীকেও প্রয়োজনে দুই ঘণ্টার নোটিশে প্রস্তুত করা সম্ভব, কৃষকের জমি-সম্পত্তি কার্যত ফেরত দেয়া হচ্ছে না, অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিস্বরূপ বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে, তারা আন্ড়র্জাতিকভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন– ইত্যাদি।

প্রশ্নটা বিপ্লবের প্রতি আন্ড়র্জাতিকতা অনান্ড়র্জাতিকতার বিষয় নয়। আসল সমস্যাটা হলো লাইনের। মাও কেন লাইনের উপর সবচেয়ে বেশি গুর"ত্ব দিয়েছেন? যদিও বিপ্লবী আন্ড়র্জাতিকতারও পৃথক তাৎপর্য রয়েছে। ভুল পরিত্যাগ করে সঠিক লাইন গ্রহণ করার জন্য বিপ্লবী আন্ড়র্জাতিকতার অবশ্যই গুর"ত্ব রয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের পথ পরিক্রমায় বাস্ড়ব ফলটা কী হবে তা এই আন্ড়র্জাতিকতার উপর নির্ভরশীল নয়। সেটা নির্ভর করে একটা পার্টির দ্বারা গৃহীত ও অনুসৃত লাইনের উপর।

নেপাল পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি ও দৃষ্টিভঙ্গির যে সমালোচনা আমরা উপরে করেছি সেটা একটা বিজ্ঞানের বিষয়। যদি তাদের এসব ভুল থেকে থাকে, যা আমাদের পর্যালোচনায় গুর"তর সব ভুল, তাহলে সে ভুলগুলো সংশোধন না করলে তার জন্য গভীর মূল্য দিতে তারা বাধ্য। সেটা কীভাবে ঘটবে তা নিশ্চিতভাবে অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু ধারণা করা যায়।

ভুল লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক দিক হলো পার্টি ও জনগণের মাঝে সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়া। ফলত আজ হোক বা কাল হোক, এজন্য সর্বহারা বিপ্লবকে কঠিন মূল্য দিতে হবে।

সর্বহারা বিপ্লবের আন্ড়র্জাতিক শত্র"রা বিশ্বজুড়ে আজ অনেক আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রয়েছে। নেপালের অভ্যন্ড়রীণ শত্র"রা বিশ্ব প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যদিও তারা নেপালে আপাতত আত্মরক্ষাত্মক ভূমিকায় যেতে বাধ্য হয়েছে গণযুদ্ধের ১০ বছরের ফলাফলের কারণে। তাই, এই চরম ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলরা, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্ড়বাদ এবং তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক সামরিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিবর্গ, রাজতন্ত্র যার একটা মাধ্যম মাত্র, নেপালে মাওবাদীদের উপর একটা চরম মরণকামড় যেকোন সময় বসিয়ে দিতে পারে। যার প্রথম ও প্রধান আক্রমণটা হবে বিপ্লবী নেতৃত্বের উপর। ইন্দোনেশিয়া, চিলির ঘটনাবলীকে কখনো বিপ্লবীদের ভুলে যাওয়া চলবে না। বাস্ড়বে চলমান ভুল 'কৌশল'গুলো সহকারে যত বেশি করে তারা বিপ্লবের আন্ড়র্জাতিক প্রচেষ্টা চালাবেন, তত বেশি করে তাদের উপর প্রতিক্রিয়াশীল মরণ আঘাত আসার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে।

দ্বিতীয়ত পার্টি যখন তার পুরনো বিপ্লবী ভিত্তির উপর দাঁড়ানো থাকে, আবার পাশাপাশি নতুন অবস্থায় ভুল লাইন/নীতি আনতে থাকে তখন অনিবার্যভাবে পার্টিতে দুটো লাইন/দুটো রাজনীতি পাশাপাশি ক্রিয়া করতে থাকে। এটা পার্টির মাঝে ভাঙন ঘটিয়েই রাখে, যা যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতি বা উল্লম্ফনমূলক পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। বিশেষত নেপাল পার্টির মত শক্তিশালী এক পার্টিতে এ ধরনের ঘটনা শত্র"র

সক্রিয় মনোযোগ ও তৎপরতার বাইরে থাকতে পারে না। তদুপরি যদি একই কারণে পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের স্ড়রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহলে, সেই পার্টির পক্ষে অস্ড়িত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হতে পারে।

আমাদের ধারণা নেপাল পার্টি আজ উপরোক্ত দুই ধরনের সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

২। কিন্তু ভিন্ন সম্ভাবনাও রয়েছে।

বাস্ড়বে নেপাল পার্টি ও নেপাল রাজনীতি এখন ঠিক কোন জায়গাটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং তার আগামী সম্ভাবনাটা কী?

পার্টির অভ্যন্ড়রীণ আলোচনাকে যদি আমরা প্রাধান্য দেই তাহলে এটা ধরতে হবে যে, পার্টি খুবই সিরিয়াসলি অভ্যুত্থানের একটা প্রকল্প নিয়ে আগাচ্ছে। উপরোক্ত ভুলগুলো সহ তেমন কোন অভ্যুত্থান হতে পারে কিনা, বা নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিনা।

তার সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায় না। অর্থাৎ, এই পথে এগিয়ে নেপালে একটা বিপ্লব ঘটতেও পারে।

কিন্তু সর্বহারা বিপ্লবের মিশনটা শুধু এটুকু নয়; আরো অনেক বড় ও ব্যাপক।

উপরোক্ত ধরনে নেপাল পার্টি ক্ষমতা দখল করে নিলেই-যে সেটা তাদের উপরোক্ত ভুলগুলোকে ভুলের বদলে সঠিক প্রমাণ করবে তা নয়।

অবশ্যই ক্ষমতা হলো নির্ধারক প্রশ্ন। কিন্তু কার ক্ষমতা সেটা হলো ক্ষমতা-প্রশ্নেরও কেন্দ্রীয় বিষয়। এবং ক্ষমতা হলো একটা চলমান প্রক্রিয়া, যার পথ পরিক্রমায় তার রঙ বদলে যাওয়া ঠেকিয়ে ক্ষমতা-দখলের চূড়ান্ড় লক্ষ্য, তথা বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই হলো কেন্দ্রীয় গুর"ত্বসম্পন্ন বিষয়। একবার পার্টির ক্ষমতা দখলই বিপ্লবের গ্যারান্টি নয়। পার্টি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারবে কিনা, এবং আরো গুর"ত্বপূর্ণ হলো, সে পার্টি ক্ষমতাকে বিপ্লবী হিসেবে বজায় রাখতে পারবে কিনা তার নির্ধারক বিষয় হলো পার্টির মতাদর্শ ও রাজনীতি। তাতে যদি বিচ্যুতি থাকে, বা গুর"তর বিচ্যুতি থাকে, তাহলে বিপ্লব ফিকে হয়ে যেতে থাকবে, এবং একসময় হয় তার রঙটাই বদলে যাবে (যেমন, ভিয়েতনামে ঘটেছে), নতুবা ভিতর থেকে নেতিবাচক উল্লম্ফন দ্বারা চলমান মিশ্রণের অবসান ঘটবে (যেমন, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ঘটেছে)। নেপাল পার্টি অবশ্যই সে ঝুঁকিগুলো সৃষ্টি করেছে এবং তার মধ্যেই বসে রয়েছে।

৩। নেপাল পার্টি তাদের বর্তমান 'কৌশল'গুলোকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য তাদের অতীতের কিছু কৌশলের কথা নিয়ে আসে যাকে আন্ড়র্জাতিক আন্দোলন ভুল বলে সমালোচনা করেছিল, বিশেষত '৯০-সালের নির্বাচনে অংশ নেবার প্রশ্ন।

'৯০-সালের নির্বাচনে তাদের সীমিত অংশ গ্রহণ নেপালের বিশেষ অবস্থায় তখন সঠিক ছিল না বেঠিক ছিল আমরা সে আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত হচ্ছি না। এখানে যে বিষয়টা গুর"ত্বপূর্ণ তাহলো, নেপাল পার্টি যেভাবে দেখাতে চাইছে যে, তাদের কৌশলের

কারণে তারা বিপ্লব ত্যাগ করবে এমন আশংকা সঠিক নয়, অতীতেও এমন আশংকা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। এটা একদিকে যুক্তিবাদকে নিয়ে আসে, অন্যদিকে তা প্রয়োগবাদকে প্রকাশ করে।

নেপাল পার্টি সে সময় ('৯০-সালে) বিপ্লব ত্যাগ না করে বরং '৯৬-সালে একটা মহান গণযুদ্ধ সূচনা করেছিল। এটা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু এই তথ্য আবশ্যিকভাবে এটা প্রমাণ করে না যে, তাদের সে কৌশল ('৯০-সালের নির্বাচনী লাইন) সঠিক ছিল। শুধু এ প্রশ্নই নয়, আরো অনেক প্রশ্নে নেপাল পার্টির বিভিন্ন ভুল বা দুর্বল অবস্থানের উপর আন্তর্জাতিক সমালোচনার প্রেক্ষিতে বরং পার্টি তখন তার সঠিক জায়গাগুলোকে পোক্ত করতে পেরেছিল। অন্তত ভুলের চূড়ান্ত বিকাশ করেনি। বিষয়টাকে এভাবেও দেখার অবকাশ রয়েছে।

চ)

১। এই দলিলের সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নেপাল পরিস্থিতিতে নেপাল পার্টির উত্থাপিত লাইন/নীতি/কৌশলগুলো তাদের সামগ্রিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের বিকাশগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যেগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটেছে।

বেশ কিছু সময় ধরে তারা মালেমা-র বিকাশের কথা বলছেন।

আমাদের আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শের বিকাশের প্রশ্নকে ঘিরে নেপাল পার্টি যে প্রধানতম প্রশ্নগুলোকে তুলে ধরছে সেগুলোর প্রায় সবই নেপাল পরিস্থিতিতে তাদের চলমান কৌশল-এর সাথে সংযুক্ত।

এগুলো হলো– "২১-শতকের গণতন্ত্র"-র ধারণা, ফিউশন তত্ত্ব, এবং সাম্রাজ্যবাদের নতুন বিকাশের তত্ত্ব। মতাদর্শের ক্ষেত্রে "প্রচন্ড পথ"-কে অন্তর্ভুক্তকরণের থেকে এর জোরালো সূচনা। সুতরাং মালেমা বিকাশের ক্ষেত্রে নেপাল-পার্টির এসব লাইন/নীতির আলোচনা ব্যতীত নেপাল-পরিস্থিতিতে তাদের লাইনের পর্যালোচনা সম্পূর্ণ হবে না।

তাই, নেপাল-পরিস্থিতিকে আরো ভালভাবে বোঝা, এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির মতবাদের রক্ষা ও বিকাশের প্রয়োজন থেকে, এবং বিপরীতভাবেও, নেপাল পার্টির উত্থাপিত উপরোক্ত ধারণা ও তত্ত্বাবলীর উপর পৃথক ও গভীর আলোচনা আমাদেরকে করতে হবে।

ছ)

১। নেপাল পার্টির উপরোক্ত ভুলগুলো সৃষ্টি ও বিকাশের মধ্যে সে পার্টির কিছু দৃষ্টিভঙ্গিগত ও মেথডলজিক্যাল বিচ্যুতি বা দুর্বলতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের ধারণা এসবের উপরও ভাল আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ন্যায্য কৌশলকে অতিগুরুত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে নীতির সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা,

এবং নীতিকে খেয়ে ফেলার ভুলে তারা জড়িয়ে পড়েন।

মধ্যশক্তিকে টেনে আনার সঠিক নীতিকে গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণি অবস্থানের বদলে তারা ব্যাপকভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক উদারনৈতিকতার অবস্থান গ্রহণ করেন।

এভাবে রাজনীতিক রণনীতির ক্ষেত্রে তারা সর্বহারা শ্রেণি অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলেন। এমনকি অজান্তে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া রাজনীতির খপ্পরে পড়েন।

জাতীয় ও সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাগুলোকে তারা দ্রুত সাধারণীকরণের দিকে এগিয়ে যান। যা কিনা প্রয়োগবাদকে ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিকে প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে পেরুর পার্টি ও গনজালো চিন্তাধারার থেকে প্রাপ্ত "থট" সংক্রান্ত বেঠিক ধারণা তাদের মাঝে গুরুতর বিরূপ প্রভাব হিসেবে কাজ করেছে।

উপসংহার

নেপাল গণযুদ্ধ ও নেপাল বিপ্লবের অগ্রগতি বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণের মাঝে এক বিপুল আশার সঞ্চার করেছিল। এটা ছিল মাওবাদীদের কাছে এক অশেষ শিক্ষার ক্ষেত্র। আমাদের পার্টিও নেপাল পার্টির এইসব অবদান থেকে শিক্ষা নেবার এক সক্রিয় প্রচেষ্টা বিগত বছরগুলোতে চালিয়েছে।

কিন্তু বিগত বছর দু'য়েকের ঘটনাবলী আমাদেরকে গুরুতরভাবে শংকিত করে তুলেছে।

আমরা বার বার জানা ও বোঝার চেষ্টা করেছি যে, আমাদের শেখার ক্ষেত্রে কোন ভুল বা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে কিনা, যা কিনা আমাদেরকে নেপালের অগ্রসরতম অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে দিচ্ছে না।

কিন্তু মালেমা'র বিজ্ঞান নিয়ে আমরা যতই পর্যালোচনা করেছি, ততই আমরা নেপাল পার্টির সাম্প্রতিক বিকাশগুলো নিয়ে হতাশ হয়েছি।

দীর্ঘ পর্যালোচনা করেই আমরা উপরোক্ত অবস্থানগুলোতে উপনীত হয়েছি। আমাদের এই পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে ভুল হতে পারে বটে। সে সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকছি। তাই, আমরা বিশ্বের ও দেশের সকল মাওবাদী, রিম-কমিটি, বিশেষত নেপাল পার্টির সাথে আমাদের এই অবস্থানের ভিত্তিতে গুরুতর বিতর্ক-পর্যালোচনাকে এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক। এ প্রক্রিয়ায় নেপাল পার্টি যদি উপকৃত হয়, নেপালের মাটিতে সর্বহারা বিপ্লব যদি টিকে থাকে ও বিকশিত হয়, অথবা আমরা আমাদের ভুল বা দুর্বলতাকে যদি ধরতে পারি, এবং সর্বোপরি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন যদি এগিয়ে চলে তাহলে সেটাই হবে আমাদের এ মূল্যায়ন ও আলোচনার গুরুত্ব। ❑

(৩)

নেপাল-নির্বাচনে মাওবাদীদের বিজয় সম্পর্কে বিবৃতি

(২২ এপ্রিল, ২০০৮)

গত ১০ এপ্রিল নেপালে সংবিধান সভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতিমধ্যে তার প্রায় সব ফলাফলই প্রকাশ পেয়েছে। ২৪০টি আসনের মূল নির্বাচনে মাওবাদীরা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। অন্য দুটো প্রধান পার্টি বুর্জোয়া নেপালী কংগ্রেস ৩০-এর ঘরে, এবং ইউএমএল নামের সংশোধনবাদী পার্টি কাছাকাছি আসন পেয়ে পরাজিত হয়েছে। তবে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মাওবাদীরা এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবেন না। কারণ, নির্বাচন-পূর্ব সমঝোতা অনুযায়ী সংবিধান সভার মোট আসন হবে ৬০১টি। যার মাঝে ৩৩৫টিতে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে আসন বণ্টিত হবে। আর বাকি ২৬টি আসন পরে মন্ত্রীসভায় চূড়ান্ড় করা হবে। মাওবাদীরা শতকরা ৩০ভাগের কিছু বেশি ভোট পাওয়াতে যদিও তারাই ৩৩৫টি আসনেরও প্রধান অংশ পাবেন, কিন্তু অন্যদের আসন সংখ্যা তখন আনুপাতিকভাবে বেড়ে যাবে, এবং মাওবাদীদের একক সংখ্যাগুর"র স্থান বজায় থাকবে না। এখনও পর্যন্ড় যা দেখা যাচ্ছে, তাতে ৬০১ আসনের সংবিধান সভায় একক সংখ্যাগুর", অর্থাৎ, ৩০১টি আসনের চেয়ে তাদের আসন সংখ্যা ৫০/৫৫টির মত কম থাকবে। এ অবস্থায় মাওবাদীদেরকে সরকার গঠন করতে হলে অন্য কারও সাথে কোয়ালিশন করতে হবে, যদিও তাতে নেতৃত্ব থাকবে মাওবাদীদের হাতে।

এই সংবিধান সভা আগামী দুই বছর ক্ষমতায় থাকতে পারবে, অর্থাৎ অন্ড়র্বর্তীকালীন সংসদ হিসেবে কাজ করবে এবং এর মাঝে তাকে নেপালের নতুন সংবিধান রচনা ও অনুমোদন করতে হবে। যার ভিত্তিতে পরে আবার সংসদ নির্বাচন করা হবে।

অবশ্য পূর্বতন চুক্তি অনুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনেই নেপালকে একটি "গণ প্রজাতন্ত্র" হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে মাওবাদীরা বলছেন। অর্থাৎ, এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

** নেপালে সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের লক্ষ্যে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার কর্মসূচি নিয়ে ১৯৯৬-সালের ১৩ ফেব্র"য়ারিতে গণযুদ্ধের সূচনা করা হয়েছিল। দেশীয় কিছু অস্ত্র হাতে একটি ছোট আকারের পার্টি তখন শুধুমাত্র জনগণ ও বিপ্লবী মতাদর্শ-রাজনীতির উপর নির্ভর করে এই গণযুদ্ধের সূচনা করে ১০ বছরের মধ্যে এক দেশপ্লাবী বিপ্লবী জোয়ার সৃষ্টি করে। দেশের ৮০% গ্রামাঞ্চল মাওবাদীদের দখলে চলে

আসে, ৪০ হাজার নিয়মিত সৈন্য সহ প্রায় ১ লক্ষাধিক মিলিশিয়ার বিশাল গণবাহিনী গড়ে ওঠে, রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় বাহিনী পরাজিত হতে হতে শহরাঞ্চল ও ক্যান্টনমেন্টগুলোতে কোণঠাসা হয়ে যায়, সমগ্র শাসকশ্রেণি সম্পূর্ণ উচ্ছেদের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

মুক্ত এলাকাগুলোতে একদা দলিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের নতুন জীবন শুর" হয়। বহু শত-সহস্র বছর পর এই প্রথম নিপীড়িত জনগণ ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে বিপুলভাবে জেগে ওঠেন। কৃষক, নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলো, লাঞ্ছিত নারী, দলিত জনতাসহ শহরের শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষের সাথে সাথে বিপুল মধ্যবিত্ত জনগণও এই চলমান বিপ্লবের সমর্থনে দলে দলে সামিল হতে থাকেন।

বিশ্বের এক দরিদ্রতম দেশে মার্কসবাদী সর্বহারা বিপ্লবের এই নতুন মহিমা ও আলোকচ্ছটায় স্ড়ম্ভিত ও আতংকিত হয়ে ওঠে বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। তারা হাজারটা চক্রান্ড়-ষড়যন্ত্র শুর" করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নেপালের মাওবাদী পার্টিকে "সন্ত্রাসবাদী" সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রযাত্রাকে কোনক্রমেই তারা রোধ করতে পারেনি। সারা বিশ্বে মাওবাদীদের আন্ড়র্জাতিক সংগঠন 'রিম'-এর মাধ্যমে নেপাল গণযুদ্ধ ও নেপাল বিপ্লবের বার্তা আরো বিস্ড়ৃত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি নেপালের শাসকশ্রেণিকে গুর"তর সংকটে ফেলে দেয়। রাজতান্ত্রিক শক্তি ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সংসদীয় রাজনীতিক শক্তির মাঝে গুর"তর ফাটল দেখা দেয়। মাওবাদীরা এই ফাটলকে কাজে লাগানোর জন্য ২০০৫-সালের নভেম্বরে ৭-দলীয় বুর্জোয়া রাজনীতিক জোটের সাথে ১২-দফা সমঝোতা করেন এবং রাজতন্ত্রের বির"দ্ধে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

এই সমঝোতার ভিত্তিতে '০৬-সালের এপ্রিলে যে দেশব্যাপী গণবিদ্রোহের সৃষ্টি হয় তাতে রাজতন্ত্র পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আন্দোলনকারী জনতার হাতে যেন ক্ষমতা উঠে না যায় সেজন্য ২৪ এপ্রিল রাজা পুরনো বুর্জোয়া পার্লামেন্ট পুনর্বহাল করার ঘোষণা দেয়। মার্কিন-ভারতসহ আন্ড়র্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলরা একে স্বাগত জানায়, ৭-দলীয় জোট ক্ষমতা গ্রহণ করে, এবং মাওবাদীরা সঠিকভাবেই একে একটি বিশ্বাসঘাতকতা বলে নিন্দা করেন।

কিন্তু মাওবাদীরা একে নিন্দা জানালেও রাজতন্ত্রের বির"দ্ধে জেগে ওঠা জনগণকে মরণাপন্ন ও সংকটগ্রস্থ শাসকশ্রেণি, এবং পতনোন্মুখ রাষ্ট্রের বির"দ্ধে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও চূড়ান্ড়যুদ্ধের জন্য আহ্বান না জানিয়ে গণযুদ্ধকে স্থগিত করেন এবং নতুন শাসকদের সাথে দরকষাকষির কৌশল গ্রহণ করেন। এ প্রক্রিয়ায় কিছু দাবি আদায়ের ভিত্তিতে মাওবাদীরা অন্ড়র্বর্তী সরকারের অংশ হন, এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকের নির্বাচনে সংখ্যাগুর" পার্টি হিসেবে আবির্ভূত হন।

** নির্বাচনের ফলাফলও সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে, মাওবাদীরা দশ বছরব্যাপী গণযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় দেশব্যাপী কতটা প্রভাব সৃষ্টি করেছেন, কী ধরনের সাংগঠনিক শক্তি তারা অর্জন করেছেন, এবং নিপীড়িত জনগণ তাদের থেকে কতটা আশা করেন। গণযুদ্ধ

ও মাওবাদীরা গণবিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রাসবাদী বলে মার্কিন ও ভারত সহ সারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়ারা যে অপপ্রচার চালায় সেটা-যে কত বড় মিথ্যা ও বাস্ড়বতাবর্জিত সেটা নির্বাচনের ফলাফলও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মাওবাদ, সমাজতন্ত্র অভিমুখী নয়াগণতন্ত্র এবং গণযুদ্ধই যে নেপালের মত পশ্চাদপদ দেশগুলোতে নিপীড়িত জনগণের একমাত্র ভরসা তা নেপালের উদাহরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

** কিন্তু যা এখন গুর"ত্বপূর্ণ তা হলো নেপালের মাওবাদীরা এপ্রিল,'০৬-অভ্যুত্থানের পর, বিশেষত এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কোন পথে এখন চলেছেন? নেপালের ভবিষ্যতটাই বা কী?

মাওবাদীরা নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হবার দ্বারপ্রান্ড়ে।

কিন্তু নেপালে বিপ্লব এখনো অসম্পন্ন।

প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি এখনো বজায় রয়েছে, যদিও রাজতন্ত্রের পতন আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে।

নেপালী জনগণের মূল যে শত্র", যারা জনগণের সকল দুর্দশার জন্য দায়ী, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্ড়বাদ– এখনো বজায় রয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান রাজকীয় বাহিনীর শুধু নামটা বদল হয়েছে, কিন্তু সেই বাহিনী অক্ষুণ্ন রয়েছে। আমলাতন্ত্র পূর্বেরটাই রয়ে গেছে। বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের দালাল বড় বুর্জোয়া শ্রেণি রয়ে গেছে। তাদের হাতের বুর্জোয়া মিডিয়াও অব্যাহত। এবং এদের রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী হস্ড়ক্ষেপ উচ্ছেদ হয়নি। এমনকি সামন্ড়তান্ত্রিক সম্পর্কগুলো মুক্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ হলেও দেশব্যাপী তা এখনো বিরাজমান। অর্থাৎ, শুধুমাত্র রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ছাড়া পুরনো পুরো ব্যবস্থাটি অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থায় নেপালকে "গণপ্রজাতন্ত্র" ঘোষণা করলেও ব্যবস্থার মৌলিক কোন হেরফের হচ্ছে না।

রাজতন্ত্রের অবসান, তথা, "প্রজাতন্ত্র" ঘোষণা নিজে থেকেই কোন বিপ্লব নয়। যদিও সেটা এক বড় পরিবর্তন, কিন্তু সেটা বিদ্যমান ব্যবস্থার একটা সংস্কার মাত্র। বিপ্লবের অংশ হিসেবে সম্পন্ন হলে, তথা রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম বিপ্লবে পরিচালিত করলেই মাত্র সেটা সমাজের গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে। নতুবা তা একই শাসকশ্রেণির ও ব্যবস্থার নতুন রূপের শাসন কায়েম করবে। সেটা কোন পার্টির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে সেটা বড় কোন বিষয় নয়।

মাওবাদীরা নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই পুরনো ব্যবস্থাটি চালানোর দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। তারা কি এই মরণোন্মুখ ব্যবস্থাটিকেই সংস্কার করে তাকে নতুন জীবন দেবেন, নাকি তারা এ ব্যবস্থাটিকে এবার পুরোপুরি ভেঙে ফেলবেন?

দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষতো হয়ইনি, বরং নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্ড়রেও তার মৌলিক কাজ এখনো বাকি রয়েছে। মাও শিখিয়েছেন যে, এমনকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষ হয় না। বরং কমিউনিজম

প্রতিষ্ঠা পর্যন্ড় রাজনৈতিক সংগ্রামই হলো চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক কাজ তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। নেপাল কোন ব্যতিক্রম নয়।

নেপালের বিপ্লব ৯০ বছর পূর্বেকার র"শ বিপ্লবের অনুরূপ হবে সেটা কেউ দাবি করবে না। এমনকি তা ৬০ বছর পূর্বেকার চীন বিপ্লবের মতও হতে পারে না। কিন্তু যে মৌলিক জায়গায় নেপাল বিপ্লবসহ বিশ্বের যেকোন দেশের সর্বহারা বিপ্লব র"শ ও চীন বিপ্লবের অনুরূপ তাহলো– একে হতে হবে প্রকৃতই একটি বিপ্লব, অর্থাৎ, পুরনো রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণিকে উচ্ছেদের মাধ্যমে নিপীড়িত জনগণকে ক্ষমতাসীন করা। বিপ্লব যে স্ড়রেই থাকুক না কেন তাকে অতি দ্র"ত সমাজতন্ত্রের দিকে চালিত করাটাই হলো সর্বহারা শ্রেণির মিশন। পুরনো ধরনের কোন পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা বা পুঁজিবাদ সুসংহত করার কর্মসূচি নিয়ে সর্বহারা বিপ্লব চালিত হতে পারে না। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও ব্যাপক পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক উপাদানকে ধারণ না করে সর্বহারা বিপ্লবের অংশ হতে পারে না।

** বিপ্লব সম্পন্ন না করে ও তাকে অব্যাহতভাবে না এগিয়ে ব্যাপক সাধারণ জনগণের আকাংখা মেটানো ও তাদের সমস্যার সমাধান কি সম্ভব? মোটেই না।

মাওবাদীরা ১০ বছরের গণযুদ্ধকালে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের মাধ্যমে শাসকশ্রেণিকে ও তার রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিলেন বলেই কৃষক ও নিপীড়িত জনগণের স্বার্থানুসারী কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই এই জনগণ মাওবাদীদেরকে সমর্থন করেছিলেন এবং এখনো করছেন। কারণ, তার মধ্য দিয়ে তারা আংশিকভাবে হলেও তাদের সমস্যার সমাধান পেয়েছিলেন। এবং তার চেয়েও বেশি ক'রে, সমাজ ও জীবনের আমূল পরিবর্তনের এক দিশা পেয়েছিলেন। দেশব্যাপী বিপ্লব সম্পন্ন করার মাধ্যমে তারা সেটা বর্ধিতভাবে বাস্ড়বায়ন করার সংকল্প ও চেতনা নিয়ে এগিয়েছেন, যা আরো বৃহত্তর লক্ষ্য অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র ও বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে চলতো।

উপরন্তু বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়া অর্থ হলো বিপ্লবের শত্র"পক্ষ ক্ষমতায় থেকে যাওয়া, সমাজে থেকে যাওয়া, তার সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বেশি শক্তিমত্তাসহ। এই শত্র"পক্ষ তাদের রাজনৈতিক সমর্থনহীনতার পরিস্থিতিতে মরণোন্মুখ ব্যবস্থাকে রক্ষা ও সুসংহতকরণের একটা প্রক্রিয়ায় এখন রয়েছে। এ লক্ষ্যে এখন তাদের জন্য অসুবিধাজনক মাওবাদী রাজত্ব মেনে নিতে রাজি হলেও তাদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ড়অব্যাহত থাকতে বাধ্য। তারা মাওবাদী শাসনে হাজারো রকমের সংকট সৃষ্টি ও তাকে ব্যবহার করার অব্যাহত অপচেষ্টা চালিয়ে যাবেই।

তাই, মাওবাদীরা বিপ্লব অব্যাহত রাখলে, এবং সেজন্য আপোষহীন থাকলে নেপালের রাজনীতিতে আগামীতে রক্তাক্ত সংঘর্ষ অনিবার্য। কারণ, প্রতিক্রিয়াশীলরা মাওবাদীদের সে কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রক্তাক্তভাবে তাকে প্রতিরোধ না করে পারে না। তাই, শান্ড়ি জনগণ চাইলেও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা, সামন্ড়বাদীরা ও তাদের বিদেশী প্রভুরা তাদেরকে শান্ড়িতে থাকতে দেবে না। শুধুমাত্র বিপ্লব অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে, এবং তার জন্য অনিবার্য যুদ্ধকে চালানোর মধ্য দিয়েই নিপীড়িত

জনগণ আপেক্ষিক শান্তি অর্জন করতে পারেন। অন্য কোনভাবে নয়।

** মাওবাদীরা এখনো-পর্যন্ত-প্রতিক্রিয়াশীল একটা ব্যবস্থার উপরে ক্ষমতাসীন হতে যাচ্ছেন। উপর থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব কিনা সেটা এক গুরুতর প্রশ্ন।

মার্কস বহু আগেই বলেছিলেন, তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে দখল করেই সর্বহারা শ্রেণি তার কাজে লাগাতে পারে না। প্রয়োজন হলো তার ধ্বংস সাধন।

সেটা হয়নি বলে চিলি ও ইন্দোনেশিয়ার বিয়োগান্ত ঘটনা আমাদের দেখতে হয়েছে।

অন্যদিকে ভেনেজুয়েলা'র মতো দেশে ব্যবস্থাটিকে ধ্বংসের কোন প্রচেষ্টা না চালিয়ে তাকে কার্যত মেনে নেয়া হয়েছে, এবং নিপীড়িত জনগণের জন্য কিছু গণমুখী সংস্কার করে জনগণকে পক্ষে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নেপালে কী ঘটতে যাচ্ছে?

– মাওবাদীদেরকে প্রথম যে গুরুতর সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে তা হলো বাহিনী একীকরণের বিষয়।

এখনো পর্যন্ত প্রাক্তন রাজকীয় বাহিনী সংখ্যাগত ও অস্ত্রাদির বিচারে অনেক শক্তিশালী। এই বাহিনী সম্পর্কে কমরেড প্রচন্ড যথার্থই বলেছিলেন যে, এই বাহিনী শুধু দুটো কাজে যোগ্য– এক, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা, দুই, নারীদেরকে ধর্ষণ করা। এই ধরনের এক বাহিনীর সাথে বিপ্লবী বাহিনীর একীকরণ যদি হয়ও তবে তা জনগণের বাহিনীর বিপ্লবী সত্তাকে খেয়ে ফেলবে, নতুবা সেই একীভূত-বাহিনী নিজ অভ্যন্তরে বিভক্ত অবস্থায় থেকে কোন এক সময় তার বৈরিতা নিয়ে ফেটে পড়বে। বিপ্লবী বাহিনীর অস্তিত্ব ছাড়া জনগণের কিছুই থাকে না। সেক্ষেত্রে বিপ্লবী বাহিনীর সত্তাকে রক্ষা ও বিকশিত করা এবং পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীকে কীভাবে চূর্ণ করা হবে?

মাওবাদীরা কীভাবে পুরনো রাষ্ট্রের চরম গণবিরোধী আমলাতন্ত্রকে সামাল দেবেন?

কীভাবে তারা ভারতের সাথে সম্পাদিত অসম চুক্তিগুলো বাতিল করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করবেন?

বিশেষত কীভাবে তারা মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী, ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও খবরদারিকে উচ্ছেদ ঘটাবেন শান্তিপূর্ণভাবে?

কীভাবে তারা বিদেশী দালাল বড় বুর্জোয়াদের খপ্পর থেকে দেশের অর্থনীতি, তথা ব্যাংক, শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদন, পরিবহনকে মুক্ত করবেন? কীভাবে তারা এই গণশত্রুদের নিয়ন্ত্রণভুক্ত প্রচার মাধ্যমকে মুক্ত করবেন? কীভাবে তারা কৃষিতে বিপ্লবী ভূমিসংস্কারকে সম্পূর্ণ করে তাকে যৌথকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবেন?

– তাই, বিপ্লব অনিবার্যভাবে রক্তাক্ত ও যুদ্ধযুক্ত হতে বাধ্য। মাওবাদীরা বিপ্লবী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে ও বিপ্লব অব্যাহত রাখলে তা অনিবার্য। সেজন্য মাওবাদীরা প্রস্তুত থাকতে পারবেন না যদি কোন বিপ্লবী বাহিনী তাদের না থাকে। এ রকম এক পরিস্থিতির জন্য আরো বর্ধিত প্রস্তুতি ছাড়া বিপ্লব এক সমূহ সংকটের মুখোমুখি হবে

বলেই ধারণা করা যায়।

– আর সে ধরনের রক্তাক্ত সংগ্রামের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি না থাকলে ব্যবস্থার সাথে মাওবাদীরা নিজেদেরকে মিলিয়ে নিতে বাধ্য হবেন– সেটা সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই ঘটুকনা কেন। অথবা তারা শত্রুর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ দ্বারা সমূহ ধ্বংসের মুখে পড়ার অবস্থায় নিজেদেরকে ফেলে দিতে পারেন। সারা দুনিয়ার প্রকৃত মাওবাদী ও বিপ্লবাকাংখী প্রগতিশীল মানুষ কেউই এগুলো চান না।

এমনকি উপরোক্ত ধরনের সমন্বয়বাদী পথেও মাওবাদীরা যদি হাঁটতে থাকেন তবুও সংসদীয় বুর্জোয়া রাজনীতির যাবতীয় ক্লেদ ও জঘন্যতা তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে। একটি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার যাবতীয় গণবিরোধিতা ও ব্যর্থতার দায় মাওবাদীদের অনিবার্যভাবে বইতে হবে, যেজন্য অবশ্যই অন্য সকল ঘরানার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকবে। শুধুমাত্র বিপ্লবকে অব্যাহত রাখা ও এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের দমনের পদক্ষেপ ছাড়া মাওবাদীরা এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পারবেন না। এইসব চিহ্নিত প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার রাজনীতি মাওবাদীদের গুরুতর ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে বাধ্য। এমনকি সেটা তাদের একটা বড় অংশকে ঐসব প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রায় সমকাতারে নিয়ে গেলে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না।

** এটা সত্য যে, আজ সারা দুনিয়ার কোথাও প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই, যারা একটি বিপ্লবী নেপালকে নৈতিক ও বৈষয়িকভাবে মদদ দেবে। এটাও ঠিক যে, বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনও এ মুহূর্তে তেমন শক্তিশালী নয়। অন্যদিকে নেপাল হলো দুই বিশাল প্রতিক্রিয়াশীল দেশ ভারত ও চীন দ্বারা বেষ্টিত একটি ছোট দেশ। এ অবস্থায় নেপালে বিপ্লব সম্পূর্ণ করা, এবং তাকে সফলভাবে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বিপুল প্রতিকূলতা রয়েছে।

কিন্তু মার্কসবাদের রয়েছে এক অসীম আদর্শগত শক্তি। যা কিনা নিপীড়িত জনগণের সুপ্ত অপরিমেয় শক্তিমত্তাকে মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেকারণেই এক ছোট সামরিক শক্তি নিয়ে শুরু করেও দশ বছরের গণযুদ্ধে মাওবাদীরা অব্যাহত বিজয় অর্জন করেছে নেপালের শিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে– তাদের প্রতি মার্কিন, ভারত ও ইসরায়েলসহ বিশ্বের সকল প্রতিক্রিয়াশীলদের হাজারো মদদ সত্ত্বেও।

একটি বিপ্লবী গণযুদ্ধে অনেক গুণ শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব। মাও-এর নেতৃত্বে রণনৈতিক আক্রমণাত্মক স্তরে চীনা বিপ্লবীরা চিয়াংকাইশেকের ৮০ লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছিল অনেক ছোট শক্তি নিয়ে।

বিপ্লবী নেপাল কৃষিকে ভিত্তি ক'রে জাতীয় শিল্প গঠন ক'রে এগিয়ে যেতে সক্ষম। এক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা, সক্রিয়তা, উদ্যম ও উদ্যোগ হলো চাবিকাঠি যা মাওবাদ বিপ্লবী পার্টিকে শিক্ষা দেয়, এবং যা দশ বছরের গণযুদ্ধকালে নেপাল পার্টি সফলভাবে প্রদর্শন করেছে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের রয়েছে গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব, গণবিচ্ছিন্নতা

ও সর্বোপরি গণবিরোধিতা। এ থেকে উদ্ভূত হয় তাদের হাজারো দুর্বলতার।

বিপ্লবী নেপাল দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও চীনের দ্বন্দ্বকেও সুচারুরূপে ব্যবহার করতে পারে। সে ব্যবহার করতে পারে সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে। বিশেষত বিপ্লবী নেপাল শুধু নেপালের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন বিপ্লবকে প্রতিনিধিত্ব করবে না। বরং করবে বিশ্ব বিপ্লবকে, যা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিশ্ব জনগণের বিপুল সংগ্রামকে তার জীবনের জন্য কাজে লাগাবে।

সুতরাং, এ কথা বলা উচিত যে, প্রতিকূলতা বিপ্লব থেকে পিছিয়ে যাবার কোন যুক্তি হতে পারে না।

বিপ্লবের আগু-পিছু হবে, বিপ্লবী উপায়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করেও তা মাওবাদীরা সাময়িকভাবে হারাতে পারেন, পুনঃ দীর্ঘকালীন গণযুদ্ধে ব্যাপৃত হতে তারা বাধ্য হতে পারেন। কিন্তু এ সবই বিশ্ববিপ্লবকেই আরো কাছিয়ে আনবে।

তাই, নেপালের মাওবাদী বিপ্লবীদের সামনে বিপ্লবের পথে হাঁটা ছাড়া কোন ইতিবাচক পথ নেই। তা কাম্যও নয়।

নেপালের বিপ্লব ও গণযুদ্ধ সারা দুনিয়া, বিশেষত দক্ষিণ-এশীয় নিপীড়িত জনগণের বুকে এক আকাশ সমান আশা ও স্বপ্নের সঞ্চার করেছিল। একে এগিয়ে নেয়াটাই হবে নেপালের মাওবাদীদের জন্য যৌক্তিক কাজ। সেক্ষেত্রে তারা কী করেন তা দেখার জন্য সারা বিশ্বই এখন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ❑

কেন্দ্রীয় কমিটি, সিপিআই (এমএলএম)[১]-এর প্রতি চিঠি

(অক্টোবর, '০৫)

কমরেডগণ,

লাল সালাম,

আগষ্ট, '০৫-এ প্রকাশিত স্ট্রাগল[২]/৬ নং সংখ্যায় রিম কমিটি (করিম)-কে পাঠানো আপনাদের চিঠি আমরা পড়েছি। চিঠিটি লেখা হয়েছে এমপিপি[৩] বিষয়ে প্রস্তাবিত বিবৃতি[৪]র সূত্র ধরে এ সমগ্র বিষয়ে আপনাদের মত জানানোর জন্য।

আপনাদের চিঠির শেষ প্যারাগ্রাফে উক্ত বিষয়ে আমাদের পার্টি ও এনবি[৫]-এর মতাবস্থানের উপর আপনাদের তীব্র সমালোচনা আমাদের মনোযোগ কেড়েছে। আমাদের ও এনবি-এর– উভয়ের মতাবস্থান স্ট্রাগল/৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা আপনাদের সমালোচনা ও উদ্বেগের প্রেক্ষিতে আমাদের মতামত জানানোর জন্য এ চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

রিম-অভ্যন্তরে বহু গুরুত্বপূর্ণ লাইন প্রশ্নে যে নতুন পর্যায়ের বিতর্ক ও সংগ্রাম গড়ে উঠেছে তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের প্রতি আপনাদের পার্টির উক্ত খোলামেলা সমালোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ, এটা বিতর্ককে গভীর করতে সহায়ক হবে এবং আমাদের সবাইকেই তা উপকৃত করবে একটি সঠিক ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে পৌঁছতে।

– আপনাদের সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে আমদের প্রতি যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে আমরা প্রথমে তার উত্তর দেবো। তবে এ উত্তর দেয়াটাই আমাদের এ চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বরং এ উত্তরের সূত্র ধরে এমপিপি-সংশ্লিষ্ট লাইন সমস্যাগুলোকে আমরা কীভাবে দেখি, এবং কীভাবে তা হ্যান্ডলিং করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের মতামতকে আমরা এখানে কিছুটা তুলে ধরতে চাই।

* আপনারা প্রশ্ন করেছেন, আরসিপি ও তার নেতা কমরেড এ্যাভাকিয়ান-এর ব্যাপারে এমপিপি যা করছে, তেমনি যদি আমাদের পার্টির নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন গ্রুপ করে (সিআইএ-এর ট্যাগ লাগিয়ে নেতৃত্বের ছবি টাঙায়), যদি আজ ক. প্রচন্ডের সম্পর্কে তেমনি করে (কুৎসিত অবমাননাকর কার্টুন এঁকে তাকে নেপালের শাসকশ্রেণি বা সিআই-এর দালাল/চর বলে) এবং সেটা করে চলে বছরকে বছর তাহলে আমাদের আন্দোলনের কী করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

ভাল কথা! প্রশ্নটার যথার্থ উত্তর দেবার জন্য একে আরো বেশ কিছুটা গভীরে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

এমন সব গ্রুপ ও ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপের কোন অভাব এ দেশে নেই যারা আমাদেরকে ও আমাদের পার্টির নেতাকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করে থাকে। তাদের অনেকের সম্পর্কেই আমাদের মূল্যায়নও পরিষ্কার। যারা সুস্পষ্টভাবেই প্রতিবিপ্লবী ও সংশোধনবাদী, তাদের এ ধরনের কার্যকলাপকে আমরা প্রকাশ্যেই সংগ্রাম করি ও নিন্দা করি। কিন্তু তাদের এ জাতীয় কার্যকলাপের নিন্দা করাটাই আমাদের সংগ্রামের শুরু বা শেষ নয়, অথবা এতেই আমরা সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করি না। বাস্তবে এর উপর আমরা কমই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা মূলত সংগ্রাম করি তাদের অন্তর্নিহিত রাজনীতিকে, যার একটা প্রকাশ মাত্র আমাদের বিরুদ্ধে তাদের কুৎসা বা অপপ্রচার। বাস্তবে ব্যক্তিতাবাদী ধরনের কুৎসা, অপপ্রচার ও আক্রমণকে আমরা প্রায় সময়েই এড়িয়ে চলি, এইসব প্রতিবিপ্লবী ও সংশোধনবাদী ব্যক্তি আক্রমণে আমরা তাড়িত হই না যাতে রাজনৈতিক সংগ্রামকে সামনে আনা যায়।

কিন্তু এ জাতীয় চিহ্নিত প্রতিবিপ্লবী বা সংশোধনবাদীদের আক্রমণ ছাড়াও অন্য ধরনের পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে। আর সেটাই হলো বেশি জটিল। পার্টির অভ্যন্তরে বা মাওবাদী শিবিরের মধ্যে টুএলএস থেকে যে ভাঙন ধরে, তার অংশ হিসেবেও এমন ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। বিশেষত দায়দায়িত্বহীন ব্যক্তি/গোষ্ঠী/গ্রুপের পক্ষ থেকে। এ সব ক্ষেত্রে টুএলএস-কে গভীর করা ছাড়া কোন পথ নেই। কারণ তা না করে আমরা চূড়ান্ত কোন মূল্যায়ন বা উপসংহারে পৌঁছতে পারি না; বিশেষত আমরা আমাদের সারিকেই লাইনগতভাবে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারি না। বিপরীত পক্ষে যুক্ত থাকা বিভ্রান্ত আন্তরিক বিপ্লবীদেরকে প্রভাবিত, শিক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যা তো রয়েছেই।

নিশ্চয়ই ব্যক্তিতাবাদী আক্রমণ, কুৎসা-অপপ্রচার, বিশেষত শত্রুর সাথে বিভক্তি রেখাকে গুলিয়ে ফেলাকে সংগ্রাম করাও এ বৃহত্তর সংগ্রামের অংশ। কিন্তু কোনক্রমেই এটা দিয়ে সংগ্রাম শুরু করা যায় না বা একেই লাইন-সংগ্রামের কেন্দ্রে আনা যায় না। আনলে মূল মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনগত পার্থক্য ও তার উপর সংগ্রাম চাপা পড়ে ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

আপনারা স্মরণ করুন, মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভ চক্র যে গরল ঢেলে দিয়েছিল ২০-তম কংগ্রেসে ও তার পরে, সে অবস্থায় মাও ও চীনা পার্টি কীভাবে এগিয়েছিল। তখনও, প্রায় এখনকার মতই, এক সারি লাইন সমস্যা জমা হয়েছিল যা কিনা খোদ স্ট্যালিনের সারসংকলনের সাথেও যুক্ত ছিল। এমন জটিল এক অবস্থায় চীনা বিপ্লবীরা সুদৃঢ়ভাবে স্ট্যালিনকে রক্ষা করেছিলেন, এবং সামগ্রিক টুএলএস-কে বিকশিত করার অংশ হিসেবে ক্রুশ্চেভের এই আক্রমণকে সংগ্রাম করেছিলেন।

আপনারা আপনাদের প্রশ্নে যে অবস্থার উল্লেখ করেছেন সে ধরনের এক বিশাল অভিজ্ঞতা আমাদের পার্টিতে সাম্প্রতিক বৃহৎ টুএলএস-কালে ও পার্টি-ভাঙনের[৬] সময়ও আমাদের হয়েছে। আপনাদের পার্টির যেসব গুরুত্বপূর্ণ কমরেড আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে কাজ করেন তারা বিলক্ষণ জানেন যে, সে সময়ে আমাদের নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে

বিরোধিতাকারী কমরেডগণ ও কেন্দ্রগুলো অনেকে কী ধরনের ভাষা ও ভঙ্গিতে আক্রমণ করেছিলেন। তারা আমাদের নেতৃত্ব ও কেন্দ্রকে সংশোধনবাদীই শুধু বলেননি, এমনকি প্রতিবিপ্লবী, রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ, সাম্রাজ্যবাদের দালাল এসব বলেও গালাগালি করেছিলেন। সে সময়ে রিম কমিটির একজন কমরেড আমাদেরকে একটা মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন– তিনি বলেছিলেন, টুএলএস-এর এ পর্যায়ে আমাদের চামড়া মোটা করতে হবে, যাতে আমরা এসব গালাগালে তাড়িত না হয়ে টুএলএস-কে গভীর করতে পারি। এই পরামর্শ আমাদের সে সময়কার কিছু দুর্বলতাকে কাটাতে সহায়ক হয়েছিল। এবং আমরা ভিন্নমতকারীদের সাথে আমাদের লাইনগত পার্থক্যের মূলে পৌঁছার চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছিলাম।

আমাদের নেতৃত্বকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, তুলে ধরা, জঘন্য ব্যক্তিতাবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টসুলভ নীতিগত সংগ্রাম চালানো– এগুলো অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এ সবই বৃহত্তর টুএলএস-এর ব্যাপ্তির মধ্যে তাকে বিকশিত করার জায়গা থেকে করতে হবে। নিছক ব্যক্তি আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তি নেতৃত্বকে তুলে ধরাটাকে আমরা সঠিক মনে করি না। এটা-যে প্রকারান্তরে জেফেতুরা[৭]-সংক্রান্ত এমপিপি-র ভুল লাইনেরই একটা ধরন হয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে আমরা সতর্ক থাকতে চাই।

– আমাদের ও এনবি-র চিঠি/মতামতে আমাদের উভয় পার্টিই সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছিল যে, এমপিপি-র এমনতরো আক্রমণকে আমরা কোনক্রমেই সঠিক মনে করি না, এবং তাকে অবশ্যই সুদৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বলেছি যে, তাকে বিচক্ষণভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং মেথডলজিক্যালি তাকে সঠিকভাবে এগোতে হবে। এর কারণ হলো, এমপিপি যেন তেন একটা গ্রুপ নয়; বা ঐতিহাসিকভাবে এটা কোন প্রতিবিপ্লবী বা সংশোধনবাদী সংগঠন নয় যারা কিনা উন্মত্তভাবে ক. এ্যাভাকিয়ান, আরসিপি ও রিম কমিটি-কে আক্রমণ করে যাচ্ছে। প্রথমত সবাই জানে যে, এমপিপি ছিল পিসিপি-র জেনারেটেড সংগঠন, যে পিসিপি কিনা আরআইএম-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এবং ক. গনজালোর গ্রেফতারের আগে, পরে এবং রোল[৮] আবির্ভূত হবারও দীর্ঘদিন পর পর্যন্ত এমপিপি আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে পিসিপি-কে প্রতিনিধিত্ব করেছে– যে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে অন্তত ২০০০-সাল পর্যন্ত কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং এমপিপি-র সমস্যাটা যে কোন একটি প্রতিবিপ্লবী গ্রুপের সাথে এক করে দেখলে গুরুতর ভুল হবে। দ্বিতীয়ত উপরোক্ত কারণেই আমরা মনে করি যে, এমপিপি-র এ আক্রমণের গভীরে নিহিত রয়েছে তাদের এক সারি সুসংহত, কিন্তু ভুল মতাদর্শগত-রাজনৈতিক মতাবস্থান ও লাইন। যে লাইনসমূহের প্রধানতম উৎস হিসেবে পিসিপি'র ঐতিহাসিক লাইনের কোন না কোন ভূমিকা রয়েছে, বিশেষত রয়েছে পিসিপি-তে উদ্ভূত টুএলএস[৯]-এর সম্পর্ক। তাই, এমপিপি'র এই ভূমিকাকে কোন ক্রমেই পিসিপি-সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর বিতর্ক ও টুএলএস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সঠিক হবে না।

এখানে উল্লেখ করা উচিত হবে যে, উপরোক্ত লাইন প্রশ্নগুলোতে একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ড়ও (বিশেষত করিম-এর ৩য় প্লেনামের পূর্ব পর্যন্ড়) রিম-পরিসরে সার্বিক ও ব্যাপক কোন টুএলএস পরিচালনা করতে রিম পারেনি (আমরা এখানে করিম-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি মূল প্রশ্নে পিসিপি'র সাথে দ্বিপাক্ষিক সংগ্রাম, এবং রিম-এর বিভিন্ন পার্টির নিজ নিজ বিবিধ মূল্যায়ন ও অবস্থানের গুর"ত্বকে বাতিল করছি না)। বরং এটাও বলা চলে যে, বিশেষত '৯৩-সাল পর্যন্ড়পিসিপি'র লাইন সম্পর্কে বেশ পরিমাণে নন-ক্রিটিক্যাল এ্যাটিচুডই রিম ও রিম-সমর্থক বিবিধ গোষ্ঠীর মাঝে সুদৃঢ়ভাবে বজায় ছিল। এ সমস্ড় কিছু এমপিপি-সমস্যার বিকাশে বড় ধরনের শর্ত দিয়েছে। এবং এমপিপি-সমস্যার সাথে এগুলোর যোগসূত্র রয়েছে। শুধু তাই নয়, রিম-পরিসরে উপরোক্ত নন-ক্রিটিক্যাল মনোভাবের ব্যাপক প্রাধান্য, এবং পরবর্তীকালে টুএলএস-কে ভালভাবে পরিচালনা না করায় সমগ্র রিম-এর মাঝে এ সবের গুর"তর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তাই, রিম-পরিসরে বৃহত্তর বিতর্ক ও টুএলএস-এর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এমপিপি-সমস্যার মীমাংসার প্রচেষ্টা ভাল ফল দিতে পারে না।

আমরা অবাক হয়েছি, আপনাদের চিঠিতে এমন কিছু মন্ড়ব্যে যাতে কিনা এমপিপি'র এ ন্যক্কারজনক ভূমিকাকে টুএলএস-এর অংশ হিসেবে প্রায় অস্বীকার করে একে একটি পরিকল্পিত প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ড়ের মত করেই শুধু দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আবারো দুঃখ প্রকাশ করছি এটা বলার জন্য যে, এক্ষেত্রেও এমপিপি'র ধরনটাকেই অনেকটা অনুসরণ করা হয়েছে, যারা কিনা পিসিপি'র অভ্যন্ড়রে টুএলএস-কে প্রথম থেকেই কার্যত অস্বীকার করে চলেছে, এবং রোল-সহ সমস্ড়টাকেই নিছক শত্র"র একটা ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে।

– আপনাদের চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে কিছু অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে পিসিপি'র কিছু ঐতিহাসিক লাইন সম্পর্কে। এমনকি রোল-এর সাথে কমরেড গনজালোর যুক্ত থাকার বিষয়ে ও সংশ্লিষ্টভাবে মিলেনিয়াম বিবৃতি[১০] সম্পর্কেও আপনারা সুনির্দিষ্ট সারসংকলনমূলক কিছু অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এ সব মূল্যায়ন গুর"ত্বপূর্ণ ও আলোচনার দাবি রাখে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমরা পূর্বেই যা বলেছি তার পুনর"ল্লেখ করে বলতে হয় যে, সমগ্রভাবে রিম কখনো এ ধরনের অভিমতে পৌঁছেনি। এবং দুঃখজনক বিষয় হলো এই যে, এমপিপি যখন প্রকাশ্যে রিম-এর সাথে কার্যত বিচ্ছেদ টেনে দিয়েছে শুধুমাত্র তখন রিম-এর সদস্য বিভিন্ন পার্টির পক্ষ থেকে রিম-পরিসরে আলোচনার জন্য এ বিষয়গুলো উঠছে। এটা প্রমাণ করে যে, সমগ্রভাবে রিম এই টুএলএস-কে গভীর, বিকশিত ও পরিচালনা করতে ভালভাবে সফল হয়নি।

আমরা পুনরায় বলতে চাই যে, আমরা অবশ্যই '৯৪-থেকে পিসিপি ও পরে এমপিপি-র সাথে করিম-এর বিতর্ক ও সংগ্রামকে বাতিল করছি না। কিন্তু অতি সম্প্রতি আরসিপি ও ক. এ্যাভাকিয়ানের চিঠি ও আলোচনার কপি বিতরণের পূর্ব পর্যন্ড় কোন সামগ্রিক আলোচনা রিম-পরিসরে এর আগে কখনই তোলা হয়নি। নিশ্চয়ই বিভিন্ন পার্টির

বিভিন্ন অবজারভেশন ছিল, যেমন কিনা বেশ কিছু গুর"ত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমাদের পার্টিরও কিছু মতাবস্থান ছিল ও কিছু অবজারভেশন ছিল। এ সবের কিছুকেই আমরা বাতিল করছি না। কিন্তু আপনারা বলতে পারেন না যে, আপনারা আজ চিঠিতে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নে যে ধরনের স্পষ্ট নির্দিষ্ট মতগুলো রেখেছেন সেগুলো রিম-পরিসরে ইতিপূর্বে সার্বিকভাবে উঠেছে, গুর"ত্ব দিয়ে আলোচিত হয়েছে বা সেসব সম্পর্কে কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়েছে। বরং বিপরীতটাই অনেকাংশে সত্য– যা মিলেনিয়াম বিবৃতির ভুলের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আজ এমপিপি আরো এক পা এগিয়ে গেছে তাদের ভুল কার্যক্রমের পথে। এ অবস্থায় রিম হঠাৎ করে তার জায়গায় এক দৌড়ে চলে যেতে পারে না। এটা রিম-এর বাস্ড়বতা নয়। বরং রিম-কে সমগ্রভাবে বেশ কিছুটা পিছন দিককার কাজগুলো থেকেই শুর" করতে হবে। আগের ভুলগুলোকে লাইনের দিক থেকে সংশোধন না করে বিচ্ছিন্নভাবে এমপিপি-কে প্রকাশ্যে নিন্দা করার মধ্য দিয়ে কাজ শুর" করাটা মেথডলজিক্যালি কতটা সঠিক হতে পারে?

– আপনাদের চিঠিতে এমপিপি-কে ইউরোপের অল্প কিছু ব্যক্তির একটা বিচ্ছিন্ন গ্র"প হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তাদের সৃষ্ট বিরাট গ"গোলকেই আপনারা সঠিকভাবে গুর"ত্ব দিয়েছেন।

আমরা এমপিপি'র আয়তন ও স্ট্যাটাস সম্পর্কে ধারণা রাখি না। অন্ড়ত আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় সে সম্পর্কে আমরা আগ্রহীও নই। বরং তাদের লাইন ও কার্যক্রম-যে বড় বিভ্রান্ড়ির সৃষ্টি করছে– তাকেই আমরা গুর"ত্ব দিয়ে বিবেচনায় রাখতে চাই।

নিশ্চয়ই এই সব বিভ্রান্ড়ি এমপিপি'র নিজ আয়তন বা অবদান থেকে মূলত হচ্ছে না। বরং এর কারণ হলো পিসিপি'র প্রেসটিজ ও লাইনগত ঐতিহাসিক ভূমিকা– যে পিসিপি কিনা রিম-এর এক গুর"ত্বপূর্ণ সদস্য; এবং অন্যদিকে '৯৩-থেকে পরবর্তীকালে পিসিপি'র জীবনে দুঃখজনক বিকাশগুলো[১১]।

আপনারা বলেছেন, এমপিপি পিসিপি'র প্রেসটিজ-কে ব্যবহার করছে। আজকে এমপিপি তার নেতিবাচক কার্যকলাপে পিসিপি'র প্রেসটিজ-কে ব্যবহার করছে তাতে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বিরাট প্রশ্ন হলো এই যে, এমপিপি-ই সেটা করছে, নাকি খোদ আজকের পিসিপি (বা তার কোন অংশ) সেটা করতে দিচ্ছে। প্রশ্নটা হলো পিসিপি'র ভূমিকা কী, যে পিসিপি কিনা রিম-এর সদস্য। এটা কেউ জানে না– এমপিপি'র একঘেঁয়ে প্রচার ছাড়া। আপনারাই বলেছেন পিসিপি-কে প্রতিনিধিত্ব করা ও কথা বলার কেউ নেই। তা-ই যদি বাস্ড়বতা হয়, তাহলে এমন একটি পার্টি, যে কিনা ৮০-দশকে রিম-এর এক উজ্জ্বল সদস্য ছিল এবং বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে এক মহান গণযুদ্ধকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তার সম্পর্কে রিম-এর বক্তব্য ও মূল্যায়ন কী ?

এ সব কিছু থেকে আমাদের কাছে আলোচনার মূল বিষয় হলো পিসিপি, মোটেই এমপিপি নয়। আমরা যাকে পিসিপি বলি তা কীভাবে এখন অস্ড়িত্বশীল, কীভাবে সে সক্রিয় এবং এমপিপি'র সাথে তার সম্পর্কটা কী– এ সবই বিরাট অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ড়ে

পৌছানোর বিষয়। আমাদের মনে হয় না আপনারা সেটা সম্পূর্ণ করেছেন। অথবা তা করে থাকলেও সে সম্পর্কে সমগ্র রিম একটা সুস্থিত মতে পৌছেছে বলে আমরা জানি না।

এ সমগ্র অবস্থায় এমপিপি-সমস্যাকে এখনো পিসিপি-সমস্যার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে আমরা প্রস্তুত নই (যা কিনা আপনাদের চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে), এবং এমপিপি-সমস্যাকে পিসিপি-সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর টুএলএস-এর অধীনে বিচার ও মীমাংসা করতে চাই (যা কিনা আপনাদের চিঠিতে কার্যত উপেক্ষিত হয়েছে)। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে– "ঝি-কে মেরে বৌ-কে বোঝানো"। এটা কোন মার্কসবাদী মেথডলজি নয়। এবং আপনারা তা করছেন বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু বিশ্বে বহু লোকই রয়েছে, এবং এমপিপি-ই হতে পারে সে ক্ষেত্রে অগ্রণী– যারা ভাবতে পারে ও যারা মানুষকে বোঝাতে পারে যে, আপনারা এটাই করছেন।

* এখন পিসিপি-সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর সমস্যার কিছু জর"রী লাইন প্রশ্নে আমরা আমাদের কিছু অভিমত নিচে ব্যক্ত করতে চাই খুবই সংক্ষেপে। এতে এ বিষয়ে রিম-পরিসরে বিতর্কে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে আপনারাসহ অন্যদের সঠিক ধারণা গড়ে উঠবে, এবং এ বিতর্ককে গভীর করার মধ্য দিয়ে আমরাও সঠিকতর অবস্থানে পৌছতে পারবো।

– পিসিপি-টুএলএস-কে মূল্যায়ন ও সারসংকলন করতে হলে পিসিপি-লাইনের বিকাশের পর্যায়গুলোতে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

'৯২-পর্যন্ড় (কেইজ-ভাষণের[১২] পূর্ব পর্যন্ড়) পিসিপি-লাইনকে তার ঐতিহাসিক লাইন বলে চিহ্নিত করা যায় যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক. গনজালো। এতে কোন সন্দেহ বা বিভ্রান্ড়ি নেই। কেইজ-ভাষণের পর, বিশেষত '৯৩-সাল থেকে, অর্থাৎ, রোল আবির্ভূত হবার পর থেকে আরেকটি পর্যায়ের শুর"। এ পর্যায়কে আবার দুটো অংশে বিভক্ত করা যায়। একটা হলো পিসিপি/সিসি-র সাথে রিম-এর সংযোগ থাকার সময়কাল– যখন কিনা পিসিপি/সিসি'র লাইনকে আমরা সরাসরি বা মাধ্যমে জানতে পারি– যদিও ক্রমান্বয়ে এ সংযোগ ও জানাজানিটা দুর্বল হয়ে আসছিল– পিসিপি ও গণযুদ্ধের বিপর্যয় ঘনীভূত হবার সাথে সাথে। বাস্ড়বে ২০০০-সালের ইএম[১৩]-এর পূর্বেই এ সংযোগ ছিন্ন হয়, এবং এমপিপি-মাধ্যমে পিসিপি-কে জানতে আমরা বাধ্য হই। এটাও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়তে থাকে ২০০০-ইএম-এর কিছু পর থেকে এমপিপি'র বর্ধিত বিভেদাত্মক কার্যকলাপ ও সম্প্রতি রিম পার্টি ও নেতৃত্বের উপর সর্বাত্মক প্রকাশ্য আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

উপরোক্ত মূল দুটো পর্যায়, এবং টুএলএস উদ্ভূত হবার পরবর্তী পর্যায়ের দুটো অংশ– এ সমগ্র সময়কালে পিসিপি লাইন সম্পূর্ণ একই ছিল না। বিশেষত '৯৩-থেকে নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পিসিপি/সিসি'র (ও পরে এমপিপি'র) প্রচারিত লাইন ও কার্যক্রমে অনেক বিশেষত্ব স্বভাবতই ছিল ও রয়েছে যাকে পিসিপি'র ঐতিহাসিক লাইনের উপর চাপানো যায় না।

কিন্তু এই সব বিশিষ্টতা সত্ত্বেও এ সমগ্র সময়কালে লাইনের কিছু মৌলিক ঐক্যও রয়েছে। তাই, বিভিন্ন পর্যায়ে পিসিপি-লাইনের এই ঐক্য ও বিশিষ্টতাগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। পিসিপি'র ঐতিহাসিক লাইনের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণরূপে যেমন এমপিপি'র উপর ন্যস্ড় করা যায় না, যা কিনা সে দাবি করে, তেমনি তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্নও করা চলে না।

– আজকে এমপিপি-ভূমিকা বিষয়ে, বিশেষত পিসিপি-টুএলএস সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে সবচাইতে গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় যা সামনে আসবে তা সম্ভবত জেফেতুরা বিতর্ক। যা আবার জিটি[১৪]-এর সাথেও যুক্ত বিষয়। এ প্রশ্নেও উপরোক্ত দুটো পর্যায়ে, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের দুটো উপপর্যায়ে পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু এ লাইনের মূল ভিত্তিটা পিসিপি'র ঐতিহাসিক লাইনের মধ্যেই ছিল– যদিও আমরা মনে করি যে, এমপিপি পরবর্তীকালে একে স্থূলভাবে ও খারাপভাবে বিকশিত করেছে।

এই জেফেতুরা ও সংশ্লিষ্টভাবে থট্ প্রশ্নে বিতর্কটা জর"রী এ কারণে যে, আজ এমপিপি'র সমগ্র ন্যক্কারজনক কার্যক্রমের পেছনে এ মতাদর্শের গুর"তর বা প্রধানতম চালিকা ভূমিকা রয়েছে বলে আমরা ধারণা করি।

তাই, আমরা এ বিষয়ে আমাদের পার্টির অবস্থান ও মূল্যায়নকে সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরবো। প্রসঙ্গক্রমে অন্য কিছু মৌলিক লাইন প্রশ্নকেও আমরা উত্থাপন করবো যা কিনা– আমাদের ধারণামতে এমপিপি-ভূমিকার পিছনে গুর"তর উৎস হিসেবে কাজ করছে। আমরা মনে করি, রিম-পরিসরে এইসব লাইন-প্রশ্নকে আজ জর"রীভাবে আলোচনা করতে হবে।

*** প্রথমত জেফেতুরা।**

এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শগত লাইনের বিষয়। এটা লাইনের ঊর্ধ্বে ও পার্টির ঊর্ধ্বে নেতৃত্বকে স্থাপন করে। এটা ভাবতে বাধ্য হয় যে, জেফে স্ড়রের নেতৃত্ব ভুল বা গুর"তর ভুল করতে পারেন না। ফলে এটা দ্বন্দ্ববাদ থেকে বিচ্যুত হয়। এবং বস্তুগত তথ্য থেকে শুর" না করে আত্মগত বিশ্বাস থেকে শুর" ও শেষ করার ভাববাদে আশ্রয় নেয়। এটা সুস্পষ্টভাবেই অমার্কসবাদী। বাস্ড়বে এটা মার্কসবাদের নামে এক ধরনের পীরবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস পার্টির মধ্যে নিয়ে আসে।

পিসিপি-টুএলএস-কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমপিপি'র মাঝে এখন এই লাইন যেভাবে কাজ করছে তা হলো ক. জি[১৫] যেহেতু জেফেতুরা, সেহেতু তিনি ডান লাইন (রোল) দিতে পারেন না। তাই রোল তারই দেয়া– এমন যে প্রচার হয়েছে সেটা সম্পূর্ণই শত্র"র ষড়যন্ত্র। আর এক্ষেত্রে কোন সংশয় প্রকাশ করার মানেই হলো শত্র"র ষড়যন্ত্রের প্রতিধ্বনি করা, শত্র"র লাইনকে নিয়ে আসা। এভাবে পিসিপি-টুএলএস-কে অনুসন্ধান করা, তথ্য থেকে সত্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালানো, এমনকি একে কোন টুএলএস হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও তারা নারাজ।

এভাবে একটা জটিল টুএলএস-কালে এবং পার্টি ও বিপ্লবের এক ঘনায়মান দুর্যোগকালে প্রকৃত পরিস্থিতি জানা, মূল্যায়ন করা ও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে এ

লাইন এমপিপি-কে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও ব্যর্থ করে দেয়।

– সমস্যা হলো এই প্রশ্নে এমপিপি'র গুর"তর স্থূলতা ও নেতিবাচক বিকাশ ঘটলেও এর মূলগত লাইনের ভিত্তিটা পিসিপি'র ঐতিহাসিক লাইনের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। এর অর্থ হলো, এমপিপি এ সংক্রান্ড় নতুন কোন লাইন উদ্ভাবন করেনি, যদিও আগের লাইনের সম্ভবত গুণগত বিকাশ তাদের দ্বারা ঘটেছে যা কিনা মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৌলিকভাবে সরে গেছে।

– আমাদের দেশে, এবং ভারতীয় উপমহাদেশে হুবহু এমন না হলেও এ জাতীয় মতাদর্শগত ধারার সাথে আমাদের দীর্ঘ পরিচয় রয়েছে। আমাদের পার্টিতেই পার্টি-প্রতিষ্ঠাতা ক. এস.এস.[১৬]-কে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে এ ধরনের মতাদর্শগত ধারাকে আমাদের সুদীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমাদের পার্টির বিগত টুএলএস-এ এটা একটা বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

আমাদের পার্টির বাইরে ক. সি.এম.[১৭]-প্রশ্নেও একই ধরনের মতাদর্শগত ধারা আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনে এখনো একটা বড় সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। এখানে জেফে না বলে ভাষাটা ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলো 'কর্তৃত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব', যাতে 'নেতৃত্ব' থেকে 'কতৃত্ব'-কে পৃথক করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে এমন একটি ব্যক্তিতাবাদী লাইনের মূল উৎস ছিল লিন পিয়াও লাইনের মাঝে। লিন পিয়াও-ইজমকে যথেষ্ট ভালভাবে সংগ্রাম ও উপলব্ধি না করার সাথে এর গুর"তর সম্পর্ক রয়েছে বলে আমাদের ধারণা। এটা বিজ্ঞানের বদলে ধর্মীয় বিশ্বাসের মত দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার দিকে বিচ্যুত হয়।

– এটা সত্য যে, নেতৃত্বের ভূমিকা বিভিন্ন রকম হতে পারে ও হয়ে থাকে। যে কোন পার্টির একজন প্রধান নেতৃত্ব থাকেন। কিন্তু তেমন নেতৃত্ব, আর বিপ্লবের সঠিক লাইন নির্মাতা ও সফল বিপ্লবের পরিচালক নেতৃত্ব একই স্ড়রের নয়। আর এটাও সত্য যে, এমন লাইন ও বিপ্লব জনগণ, সর্বহারা শ্রেণি ও পার্টি, এবং পার্টির মধ্যকার অনেক গুর"ত্বপূর্ণ নেতৃত্বের সম্মিলিত অবদানে গড়ে উঠলেও প্রায় ক্ষেত্রেই প্রধানতম নেতৃত্বের বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা গুর"ত্বপূর্ণ। লাইন, পার্টি, বিপ্লব ও জনগণের ভূমিকা ও ঐক্যকেও এমন নেতৃত্ব প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই, নেতৃত্বের নামে লাইন পরিচিতি পায়, নেতৃত্বের জনপ্রিয়তার ও রক্ষার দায়িত্ব পৃথকভাবে উঠে আসে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সব ধরনের নেতৃত্বই পার্টি, জনগণ, শ্রেণি ও বিপ্লবের ফসল। তাই, তার অধীন। এবং সব ধরনের নেতৃত্ব, এমনকি লাইন, পার্টি ও বিপ্লবই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিয়মের মধ্যে ক্রিয়াশীল। জেফেতুরা-লাইন কার্যত একে বাতিল করে দেয়। সব ধরনের নেতৃত্বই 'এক দুই-এ বিভক্ত হয়'-নিয়মের অধীন। জেফেতুরা-লাইন একে বাতিল করে দেয়।

এমপিপি'র আজকের যাবতীয় কার্যকলাপের এক গুর"তর উৎস হলো এই জেফেতুরা লাইন– যা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এখনো পর্যন্ড় ভালভাবে আলোচিত হয়নি। তাই সমগ্র রিম-পরিসরে এ প্রশ্নটি ভালভাবে আলোচিত ও পরিষ্কার হওয়া

প্রয়োজন এবং পিসিপি'র দ্বিতীয় পর্যায়ে কীভাবে এটা গুর"তর সমস্যা আকারে হাজির হয়েছে তার সুগভীর মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, এমপিপি-তে যুক্ত আন্ড়র্জাতিক কমরেডগণ এ আলোচনা ও বিতর্কে গঠনমূলকভাবে আদৌ ফিরতে এখন সক্ষম কিনা। কিন্তু পিসিপি যে অগণিত বিপ্লবী ও জনগণকে দেশে ও বিশ্বে শিক্ষিত করেছে তাদের মাঝে এমন লাইনের নেতিবাচক অস্ড়িত্ব বা প্রভাবকে গঠনমূলক সংগ্রাম করার দায়িত্ব রিম-কে অবশ্যই নিতে হবে। আর এজন্য এই প্রশ্ন ও সম্পর্কিত অন্য সব প্রশ্নে এক সামগ্রিক বিতর্ককে এগিয়ে নিতে হবে। এর মধ্য দিয়েই এমপিপি-সমস্যাকে মীমাংসা করতে হবে।

* পিসিপি-তে টুএলএস সম্পর্কে সারসংকলন ও মূল্যায়ন করার সময় ক. জি-এর ভূমিকার বিষয়টি উঠে আসতে বাধ্য। সুদীর্ঘ ১২ বছর পর রিম-কে অবশ্যই আজ সক্ষম হতে হবে এ প্রশ্নে সুস্পষ্ট কিছু বলার জন্য– যেক্ষেত্রে শত্র" ও রোল ১২ বছর ধরে এক ধরনের কথা বলে চলেছে, এবং এমপিপি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কথা বলছে।[১৮]

আমরা এখনো তথ্যগতভাবে সুনিশ্চিত নই যে, ক. জি নিজেই রোল-কে নেতৃত্ব দিয়েছেন– যেমনটা আপনারা বলেছেন, অথবা আরসিপি বলতে চায়। সম্ভবত আপনাদের হাতে অধিক তথ্য ও তার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ রয়েছে যা আমাদের ভালভাবে নেই। ক. জি-এর ভূমিকা যা-ই হোক না কেন, এ সমস্যাকে দেখার ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গি ও লাইনের উপর আমরা জোর দিতে চাই, ব্যক্তির উপর নয়। তবে ক. জি-এর ঐতিহাসিক গুর"ত্বপূর্ণ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত ভূমিকা পের" ও আন্ড়র্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনে গুর"ত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারে বলে আমরা মনে করি। তাই, গুর"ত্বসহকারে তার অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতে হবে– বিশেষত এমন পরস্পরবিরোধী দাবি ও প্রচারের প্রেক্ষিতে। এবং এই সমস্যাকে নীতিগত ও কৌশলগতভাবে সঠিক উপায়ে মোকাবিলা করায় রিম-কে যত্নবান হতে হবে।

লাইন-প্রশ্নে এ ক্ষেত্রে বিষয়টা হলো এই যে, ক. জি রোল-এর উদ্গাতা– এটা আমরা জেফেতুরা লাইন থেকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেবো, নাকি সেটা অনুসন্ধান করবো ও পর্যালোচনা করবো।

অবশ্যই আমরা শত্র" পক্ষ থেকে বিপ্লব, বিপ্লবী পার্টি ও নেতৃত্ব সম্পর্কে একটা কিছু নেতিবাচক প্রচার হওয়া মাত্র তাকে গুর"ত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিতে পারি না। কারণ, আমাদের ধূর্ত ও শক্তিমান শত্র" পক্ষ মিথ্যা, কুৎসা, বিকৃতি ও অপপ্রচারে খুবই দক্ষ। কিন্তু বিগত সুদীর্ঘ সময়কালে এমন সব তথ্য সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে– যার মাঝে বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ হলো, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় ও ঐতিহাসিক নেতৃত্বদের একটা বড় অংশ রোল-পক্ষে অবস্থান নিয়েছে– বিশেষত বন্দী হবার পর– যা প্রমাণ করে যে, নিছক শত্র" অপপ্রচার বা ষড়যন্ত্র নয়, পিসিপি-অভ্যন্ড়রস্থ একটা বৃহৎ টুএলএস সূচনা থেকেই এসেছে। এটা স্বাভাবিক যে, এতে শত্র" ভূমিকা রাখতে বাধ্য নিজ স্বার্থ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী। কিন্তু তাই বলে পিসিপি-থেকে উদ্ভূত টুএলএস-টাকে অস্বীকার করা যায় না। আর এ টুএলএস-এ এমন সব নেতৃত্ব রোল-এর সাথে যুক্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে, যা কিনা

এমপিপি-ও স্বীকার করে নিচ্ছে, এবং সংশ্লিষ্ট আরো সব তথ্যাবলী, ক. জি-এর ভূমিকার ক্ষেত্রে গুরুতর প্রশ্ন সৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু এমপিপি এ সব কিছুকেই অস্বীকার করছে– জেফেতুরা লাইন থেকে, কোন তথ্য-উপাত্ত থেকে নয়। এমপিপি'র এই অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে বর্জন করতে হবে।

* জেফেতুরা লাইন থট্-সম্পর্কে এমপিপি-লাইনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে আমাদের ধারণা। এটাও মূলগতভাবে পিসিপি'র লাইন, নিছক এমপিপি-লাইন নয়।

আমাদের শ্রেণি আন্ড়র্জাতিক, এবং তার মতাদর্শ হলো আন্ড়র্জাতিকতাবাদী। তাই আমাদের শ্রেণির মতাদর্শ জাতীয়ভাবে বিকশিত হতে পারে না, ও জাতীয়ভাবেই শুধু প্রযোজ্য হতে পারে না। যদিও বিভিন্ন দেশের সফল বিপ্লবগুলো আমাদের মতাদর্শ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, কিন্তু এ অবদান তখনই মতাদর্শ বিকাশে ভূমিকা রাখে যখন তার আন্ড়র্জাতিক তাৎপর্য থাকে, এবং কোন দেশের সফল সর্বহারা বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবের অংশ হিসেবে ঘটে বলেই এটা হয়ে থাকে।

পিসিপি তার সকল পর্যায়ে, '৯৩-পূর্ব ও পরবর্তী পর্যায়ে, এবং এমপিপি-যুগে জিটি[১৯]-কে যেভাবে তুলে ধরেছে তার মাঝে বিবিধ প্রবণতা ও স্ববিরোধিতা ছিল। তারা ক. জি-কে একদিকে চতুর্থ তরবারি, শ্রেষ্ঠতম জীবিত মালেমা-বাদী– এভাবে যখন তুলে ধরেছে তখন তারা জিটি-এর আন্ড়র্জাতিক তাৎপর্যকে সামনে আনতে চেয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা জিটি-কে প্রধানত পেরুর বিশিষ্টতায় মালেমা-র প্রয়োগ বলে চিহ্নিত করেছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, পেরুতে তাদের থট্-কে তুলে ধরার পাশাপাশি অন্যান্য সব দেশেও পৃথক পৃথক থট্-এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। এভাবে জিটি-কে তারা একদিকে জাতীয় রূপ দিয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি একে মতাদর্শের প্রধান দিক হিসেবেও তুলে ধরেছে। এভাবে মতাদর্শের ক্ষেত্রে আন্ড়র্জাতিকতাবাদ কেটে ছেটে পড়েছে।

আন্ড়র্জাতিক কাজ, তথা রিম-প্রশ্নে তাদের পূর্বাপর যে শীতল ও দূরত্ব বজায়কারী সম্পর্ক ছিল তা তাদের থট্-প্রশ্নের সাথে জড়িত জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল– এমন ভাবাটা ভুল হবে। যদিও ক. জি মুক্তাবস্থায় শেষ দিকে রিম-এ পিসিপি'র অংশগ্রহণ কিছুটা বেড়েছিল, তার কেইজ-ভাষণে তিনি রিম-এর সাথে ঐক্যের আহ্বান জানান– কিন্তু সার্বিকভাবে আন্ড়র্জাতিকতাবাদী ঐক্য ও সেখানে টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে লাইন ও সংগঠনের (আন্ড়র্জাতিক) বিকাশ সাধনে পিসিপি'র ভূমিকাকে কোন ক্রমেই আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য বলা চলে না। এটা জাতীয়তাবাদের প্রভাব ও প্রবণতা, এমনকি পরবর্তীকালে গুরুতর বিচ্যুতির সাথে জড়িত– যা কিনা থট্-সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির মূল মতাদর্শগত লাইনের সাথে যুক্ত বলে আমাদের ধারণা। আজ এমপিপি'র উপদলীয় বিভেদাত্মক তৎপরতা ও রিম-বিরোধী কার্যকলাপের সাথে তাদের এই জাতী-য়তাবাদী প্রবণতা ও বিচ্যুতির একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই রয়েছে– যদিও এটা এখন গুণগতভাবে বিকশিত হয়ে সমগ্র রিম-স্পিরিটের জন্য এক গুরুতর হুমকি হয়ে উঠেছে।

তাই, আমরা মনে করি, থট্-প্রশ্নে পিসিপি'র ঐতিহাসিক অবস্থান, ও পরবর্তীকালে এমপিপি-লাইনের উপর সুগভীর পর্যালোচনা ও বিতর্ক প্রয়োজন। কারণ, এর গুরুতর প্রভাবও সমগ্র রিম-এর মধ্যে রয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

* এমপিপি'র আজকের ন্যক্কারজনক ভূমিকার পিছনে আরো যে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো ক্রিয়াশীল তার মাঝে আরো দুটো বিষয়ের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই। বিশ্ব পরিস্থিতির মূল্যায়ন, তথা সাম্রাজ্যবাদের সংকট ও বিপ্লবী পরিস্থিতি, এবং গণযুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি– এ দুটো হলো মৌলিক দুটো বিষয়।

এ সম্পর্কে এখানে আমরা বিস্ড়রিত আলোচনা করবো না। কিন্তু যে কথাটা বলা প্রয়োজন, তাহলো, এ দুটো মৌলিক বিষয়ে বিশ্ব জুড়ে মাওবাদীদের কিছু মৌলিক ঐক্যমতের ভিত্তি সত্ত্বেও সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের মাঝে ব্যাপক বিভিন্নতা রয়েছে। এটা সুদীর্ঘ অতীত থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আরসিপি-নেতা ক. এ্যাভাকিয়ান এ প্রশ্নগুলোতে মৌলিক কিছু সারসংকলনমূলক মতামত তুলে ধরেছেন। এর উপর সুগভীর বিতর্ক-পর্যালোচনা প্রয়োজন।

এমপিপি এ বিতর্ককে সুস্থভাবে পরিচালনার বদলে দায়দায়িত্বহীন বিভেদ, বৈরিতা ও কুৎসাকে অবলম্বন করছে। একে আমরা কঠোরভাবে বিরোধিতা করি। কিন্তু আমরা স্বীকার করি যে, এটা নিছক করিম, আরসিপি বা ক. এ্যাভাকিয়ানকে নিন্দা করার সুপরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত নয়– যেমন কিনা আপনারা উল্লেখ করেছেন– যদিও কেউ না কেউ– এমপিপি'র ভেতরে বা বাইরে সেভাবে এগোতে পারে, এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে– যে সম্পর্কে আমরা অসচেতন নই।

আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলনেও আমরা দেখেছি যে, যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংগ্রামকেই সবকিছুকে মূল্যায়ন করার মূল মানদন্ড করে ফেলে যারাই এখন যুদ্ধ করছে না তাদেরকে গণযুদ্ধবিরোধী, মাওবাদ বিরোধী, বিপ্লব বিরোধী, এমনকি সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে চিহ্নিত করার মত লাইনগুলো সুদীর্ঘদিন ক্রিয়াশীল ছিল, এখনো যার সবল অস্ড়িত্ব রয়েছে। এটা মাওবাদ নয়। কিন্তু এখনো বহু আন্ড়র্জাতিক মাওবাদী এভাবে চিন্ড়া করেন যার সুগভীর মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ভিত্তি ও অতীত ধারাবাহিকতা রয়েছে।

* এ সমগ্র অবস্থায় আমরা মনে করি, এমপিপি'র আজকের গুরুতর নেতিবাচক ভূমিকার লেজ ধরে না দৌড়িয়ে এক সারি গুরুতর লাইন-প্রশ্নের উপর বিতর্ক-পর্যালোচনার উপর রিম-কে বিশেষ জোর দিতে হবে। আর তা করার জন্য এমপিপি'র মত সংগঠনগুলোকে আরো ধ্বংসাত্মক কাজের কোন সুযোগ করে দেয়া যাবে না। কারণ, এইসব প্রশ্নের উপর রিম এখনো ঐক্যবদ্ধ কোন মতাবস্থানে পৌঁছতে পারেনি। প্রকৃত সত্য হলো, এ বিষয়গুলোতে ভাল কোন বিতর্ক শুধুমাত্র সাম্প্রতিক কিছু মাসের আগ পর্যন্ড় রিম-পরিসরে পরিচালিত হয়নি। এ দুর্বলতার সাথে এমপিপি-সমস্যার একটা গুঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা এটা বলছি এ কারণে যে, রিম শুধু বিশ্ব মাওবাদীদের অগ্রসর লাইনকেই প্রতিনিধিত্ব করে না, তা সকল আন্ড়রিক মাওবাদীদের ঐক্যকেও প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের দায়িত্ব হলো অমীমাংসিত বহুবিধ মৌলিক প্রশ্নে গবেষণা, পর্যালোচনা, বিতর্ক ও টুএলএস-কে বিকশিত করে তোলা। যার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে পিসিপি-টুএলএস-এর মূল্যায়ন ও সারসংকলন। বিশ্ব পরিসরে এ কাজকে সম্পন্ন করা একটা জটিল ও কঠিন কাজ। কিন্তু সেটা আমাদেরকে করতে হবে। করিম ইতিমধ্যে তার সূচনাও করেছে। এমনি এক অবস্থায় এমপিপি'র মত দায়িত্বহীন তৎপরতায় তাড়িত হয়ে সমস্যার অতি সরল সমাধান মোটেই বিজ্ঞচিত নয়। আমরা মনে করি না, বিভিন্ন লাইনের দিক থেকে এমপিপি যা কিছুর কথা বলে তার কোন প্রভাব বা অস্তিত্ব রিম-অভ্যন্তরে নেই। বরং, আমাদের ধারণা, বিবিধ ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রূপে তার ব্যাপক অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের দেশেই রিম-সমর্থক একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে যারা এমপিপি-লাইনের বহু কিছুকে প্রতিনিধিত্ব করে। এর মূল কারণ হলো, এমপিপি এমন অনেক কিছুই বলে যা পিসিপি'র ঐতিহাসিক লাইনেরই ধারাবাহিকতা। অন্তত তার বিরোধী নয়। এবং এমন অনেক বিষয়ই রয়েছে যা কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুদীর্ঘদিন ধরে মীমাংসিত হয়নি। অন্যদিকে রিম-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এমনকিছু লাইন ও সারসংকলনকে পেশ করেছে ও করছে যা অনেকের কাছে আকস্মিকভাবে নতুন মনে হতে পারে, এবং যা বাস্তবে অনেকক্ষেত্রে বিগত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিরোধীও বটে।

এ অবস্থায়, রিম যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ধাপে ধাপে এই সব মৌলিক লাইনগত প্রশ্নকে ধরে ধরে মীমাংসার দিকে এগোতে সক্ষম হয়, তাহলে এমপিপি-জাতীয় সমস্যাকেও আমরা সঠিকভাবে সমাধান করতে পারবো। আর সেটাই হবে পেরুতে আমাদের কমরেডদের প্রতি এবং বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের প্রতি প্রকৃত দায়িত্ব পালন ও সহায়তা। এই মূল কাজের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় চরম বিভেদাত্মক ও দায়িত্বহীন অপতৎপরতা থেকে অবশ্যই রিম-কে মুক্ত করতে হবে ধাপে ধাপে। তাকে আমরা বাদ দিতে বলছি না। আমরা অবশ্যই আমাদের আন্তর্জাতিক নেতাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না। কিন্তু সেজন্য আমাদের পদক্ষেপগুলো হওয়া চাই সুবিবেচিত ও বিজ্ঞ। আমরা আশাকরি এ চিঠি থেকে আমাদের মতাবস্থানগুলো আপনাদের সংগ্রামী ও পোড় খাওয়া পার্টি বুঝতে পারবে, এবং অহেতুক কোন আতংক থেকে মুক্ত হতে পারবে। ❑

আন্তর্জাতিক নতুন লাইন-বিতর্ক এবং আমাদের কিছু অবস্থান সম্পর্কে

(রচনা ঃ ডিসেম্বর,'০৮। প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় সপ্তাহ, ২০০৯)

১৯৭৬-সালে চেয়ারম্যান মাও-এর মৃত্যুর পর, বিশেষত চীনে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান ও আলবেনিয়ার হোক্সাপন্থী অধপতনের প্রেক্ষিতে বিশ্বের মাওবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং একটি নতুন আন্তর্জাতিক গঠনের লক্ষ্য নিয়ে '৮৪-সালে রিম গঠিত হয়েছিল। আমাদের পার্টি শুরু থেকেই তার সদস্য হয় এবং রিমের অগ্রগতিতে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রিম '৯৩-সালে একটি বর্ধিত সভায় মালেমা সূত্রায়ণ গ্রহণ করে। মালেমা'র ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত রিম বিশ্বের প্রকৃত মাওবাদীদের প্রধানতম কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। রিম মালেমা'র উপলব্ধি ও প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটায়। এ অগ্রগতির পথে সর্বদাই বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্ব ছিল, দুই লাইনের সংগ্রাম ছিল, যা একটি প্রাণবন্ত বিপ্লবী কমিউনিস্ট সংগঠনের বিকাশে চালিকাশক্তির কাজ করে। এবং রিম-কমিটির নেতৃত্বে রিম মূলত/প্রধানত ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলে। কিন্তু বিগত কয়েকবছর ধরে রিম-অভ্যন্তরস্থ মতপার্থক্য একটা গুণগত স্তরে উন্নীত হয়েছে। এর শুরু হয়েছিল '৯৩-সালে পেরু-পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের সংগামের উদ্ভব ও তার মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে। প্রথম দিকে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও সাময়িক-আংশিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে কিছুদিন এগোলেও এ শতাব্দীর শুরু থেকে এ বিষয়ক দ্বন্দ্ব রিম কমিটিসহ রিমের প্রধানতম অংশের সাথে পেরু-পার্টির প্রতিনিধিত্বের দাবিদার এমপিপি'র গুরুতর ভাঙন সৃষ্টি করে।

এ সত্ত্বেও রিম-কমিটি মূলত ঐকবদ্ধভাবে রিম-কে গতিশীল নেতৃত্ব দিয়ে চলছিল। কিন্তু ২০০৩-সাল থেকে পেরু-প্রশ্নের বাইরে অন্য নতুন প্রশ্নে রিম-কমিটির অভ্যন্তরস্থ মতপার্থক্য ও বিতর্ক গুণগত রূপ নিতে থাকে। কমরেড প্রচন্ডের নেতৃত্বে নেপাল-পার্টি বেশ কিছু নতুন লাইন ও নীতি উত্থাপন করে যা ক্রমান্বয়ে রিম-অভ্যন্তরে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। এ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল '২১-শতকের গণতন্ত্র'-নামে পরিচিত হয়ে ওঠা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন কিছু নীতি ও লাইন, যাকে নেপাল পার্টি মালেমা'র বিকাশ বলে উত্থাপন করছে।

* এই বিতর্কের প্রাথমিক পর্যায়ে রিম-কমিটি তার অভ্যন্তরীণ বিতর্কের পত্রিকা "স্ট্রাগল"-এর মাধ্যমে বিভিন্ন পার্টির বিতর্কমূলক কিছু দলিলাদি প্রকাশ করে, যাতে আমাদের পার্টির একাধিক দলিলও প্রকাশ পেয়েছে। নতুন পর্বে ৯নং সংখ্যা পর্যন্ত 'স্ট্রাগল' প্রকাশিত হয়।

* ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বিতর্কে নতুনতর বিকাশ ঘটে। নেপাল পার্টি রাজতন্ত্রের

পতনের পর '০৭-সালের শুর"তে প্রকাশ্যে চলে আসে এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ব্যবস্থার অধীনে তাদের সাথে যৌথভাবে সরকারে অংশ নেয়। পরে তারা '০৮-সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। এভাবে নেপাল পার্টির নতুন লাইনগুলো বাস্ড়ব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নতুন পর্বে প্রবেশ করে। যা রিম-ভুক্ত বিভিন্ন পার্টির মাঝে গুর"তর বিতর্ক ও অনাস্থার সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে রিম-কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্য আরসিপি'র প্রধান নেতা কমরেড বব এ্যাভাকিয়ান এ সময়টাতেই তার বেশ কিছু মতাবস্থানকে সংশ্লেষিত করে গুণগতভাবে এগিয়ে নেন, যাকে তারা "নয়া সংশ্লেষণ"(নিউ সিনথেসিস) নামে মালেমা'র বিকাশ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। এমনকি এর বিরোধিতা করে আরসিপি'র মধ্যে ভাঙনও ঘটে '০৭-সালে। উল্লেখ্য যে, নেপাল পার্টির লাইনকে আরসিপি গুর"তরভাবে বিরোধিতা করে, এবং এ্যাভাকিয়ানের নয়া সংশ্লেষণের একটা দিক হলো এই বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যে বিকাশ সেটা।

অর্থাৎ, রিম-কমিটির প্রধানতম দুই সদস্য-পার্টি আপাতভাবে দুই বিপরীতধর্মী অবস্থান থেকে মালেমা'র বিকাশ সাধনের দাবি করছে।

পাশাপাশি পের"-পার্টির কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার এমপিপি এই পরিস্থিতিতে রিম-কমিটি, প্রচন্ড পথ ও এ্যাভাকিয়ানের নয়া সংশ্লেষণের বির"দ্ধে প্রকাশ্য বৈরী আক্রমণ বাড়িয়ে তোলে, যা তারা অনেক আগেই শুর" করেছিল।

এই সমগ্র পরিস্থিতিতে বাস্ড়বে রিম-কমিটি কার্যকরভাবে ও ঐক্যবদ্ধভাবে কোন ভূমিকা বিগত দুই বছর ধরে রাখতে পারেনি। এটা সুস্পষ্ট যে, এই লাইন-বিতর্কের অন্ড়ত প্রাথমিক একটি মীমাংসা ব্যতীত রিম-কমিটি ও রিম পুনরায় গতিশীল ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

* আমাদের পার্টি রিম-গঠনের শুর" থেকেই আমাদের সাধ্যমত আন্ড়র্জাতিক বিতর্কে অংশ নিয়ে আসছে। কারণ, প্রকৃত আন্ড়র্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্ট সংগঠন হিসেবে আমাদের পার্টি মনে করে যে, আমাদের লাইন হলো আন্ড়র্জাতিকতাবাদী ও প্রধানত আন্ড়র্জাতিক। সুতরাং আন্ড়র্জাতিক বিতর্কে সঠিক অবস্থান গ্রহণ না করে দেশীয় কর্মক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়।

সেজন্য আমাদের পার্টি রিম-পরিসরের এই নতুন বিতর্ক, লাইন-সংগ্রাম ও পর্যালোচনাকে অত্যন্ড় গুর"ত্ব দিয়ে দেখছে। আমরা প্রথমদিকে প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম "স্ট্রাগল"-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা, অন্ড়তপক্ষে তার প্রধান রচনাগুলো বাংলায় প্রকাশ করা। এটা আমাদের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব ছিল না। তাই আমরা এদেশের বিভিন্ন মাওবাদী কেন্দ্র, শক্তি ও ব্যক্তির সাথে আলোচনা করি, যাতে যৌথ সামর্থ্যে এ কাজটা করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে কিছু কিছু সাড়া পাওয়া গেলেও এ কাজে সক্ষম অনেক কমরেডই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেননি। আমাদের পার্টি একক উদ্যোগে অথবা অন্য কিছু শক্তির সাথে যৌথভাবে যতটা সম্ভব কাজটিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা চালায় যা এখনো চলমান।

কিন্তু পরবর্তীকালে লাইন-বিতর্ক এতবেশি ব্যাপকতা অর্জন করেছে যে, শুধুমাত্র মৌলিক গুর"ত্বসম্পন্ন দলিলাদির একটা প্রাথমিক তালিকা করলেও সেগুলো আমাদের সামর্থ্যে অনুবাদ করা ও প্রকাশ করা জর"রীভাবে সম্ভব নয়।

অথচ এই বিতর্কে সমগ্র পার্টিকে, অন্ড়ত পক্ষে পার্টির নেতৃত্ব ও কেডার শক্তিকে সমাবেশিত করা খুবই জর"রী। শুধু পার্টিরই নয়, এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের প্রধান স্ড়রগুলোতে এই বিতর্ক আলোচনা করাটা অতি জর"রী। এটা আন্ড়র্জাতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশীয় আন্দোলন পুনর্গঠিত করার জন্য এক জর"রী করণীয়। একইসাথে আন্ড়র্জাতিক পরিসরে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্যও এটা অপরিহার্য।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টির প্রধান নেতৃত্ব-স্ড়রে যতটা অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা হয়েছে তার নির্যাস তুলে এনে সমগ্র পার্টি ও দেশীয় আন্দোলনের অভ্যন্ড়রে তা উত্থাপন করা প্রয়োজন বলে সিসি মনে করছে। এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা মাও-মৃত্যুর পরবর্তী মহাবিতর্কেও পড়েছিলাম। যখন কিছু সার্কুলারের মাধ্যমে প্রধানতম বিষয়াবলী ও তার বিতর্ককে, একইসাথে আমাদের প্রাথমিক মতাবস্থানকে প্রকাশ করা হয়েছিল। যা আমাদের পার্টিকে তখনকার মত কিছুটা সচেতন হতে ও এদেশের আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম করে তুলেছিল।

আমাদের পার্টির নেতৃত্ব-স্ড়রে যতটা অধ্যয়ন করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আমরা মনে করি যে, এই বিতর্ক বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে অতীতের বিভিন্ন মহাবিতর্ক, যেমন, '৬০-দশকে র"শ-চীন মহাবিতর্ক নামে পরিচিত মতাদর্শগত মহাবিতর্ক, অথবা মাও-মৃত্যুর পর রিম-গঠনের প্রক্রিয়ায় ও পরে মাওবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার যে মহাবিতর্ক– সেসবের মতই, বা তার চেয়ে বেশি জটিল, গুর"ত্বপূর্ণ, ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যসম্পন্ন এক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক।

তাই, এই লাইন-বিতর্কে মৌলিক কিছু অবস্থান গ্রহণ করাটা রিম-সদস্য হিসেবে আমাদের পার্টির জন্য জর"রী ও গুর"ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গুর"ত্বপূর্ণ আন্ড়র্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব হয়ে পড়েছে বিশেষত মালেমা-বিরোধী নীতি ও লাইনকে সংগ্রাম করা, তাকে পরাজিত করা এবং মালেমা'র পতাকা উড্ডীন রাখা। দায়িত্ব হয়ে পড়েছে এই সংগ্রামে দেশে ও দেশের বাইরে– সর্বত্র অন্যদের থেকে শিক্ষা নেয়া, অন্যদেরকে জয় করা, বিভ্রান্ড়দেরকে সংশোধনে ভূমিকা রাখা এবং একেবারে অসংশোধিতদেরকে বিচ্ছিন্ন করা।

পাশাপাশি দায়িত্ব এসে পড়েছে প্রকৃত মালেমা-বাদীদের অভ্যন্ড়রস্থ মতপার্থক্যের উপর, পর্যালোচনার উপর ভূমিকা রাখা। কারণ, নিজেদের অবস্থান ও উপলব্ধিকে উচ্চতর লেবেলে উন্নীত না করে মালেমা-বিরোধী নীতি ও লাইনকে চূড়ান্ড়ভাবে পরাজিত করা সম্ভব নয়।

আমাদের পার্টি বিগত কয়েক বছর ধরে এই ভূমিকাটি পালনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে। পার্টি "স্ট্রাগল"-সহ বিভিন্ন মুখপত্রে লেখা দিয়েছে, চিঠিপত্র দিয়েছে,

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে কথা বলেছে, এবং দেশে এই বিতর্কগুলোকে পরিচিত করানো ও বিভিন্ন ভুল অভিমতগুলোকে সংগ্রাম করার মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে। তবে এখন কিছু বিষয়ে বিভক্তি রেখা টানারও সময় এসেছে এবং নতুনতর বিষয়কে হাতে নেবার সময় এসেছে।

* তাই, এই বিতর্ককে পার্টিব্যাপী আরো সুনির্দিষ্টভাবে ও সার্বিকভাবে পরিচিত করানো এবং আমাদের কেন্দ্রের মৌলিক ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক মতাবস্থান-গুলোকে উত্থাপনের মাধ্যমে পার্টিকে সচেতন ও সজ্জিত করা, দেশের মাওবাদীদের মাঝে সুস্থ, সচেতন ও সুব্যবস্থিত বিতর্ক ও পর্যালোচনাকে ছড়িয়ে দেয়া এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে এই বিতর্কে সক্রিয় অংশ নেবার মাধ্যমে তার পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়াশ থেকে এ দলিলটি রচনা করা হচ্ছে।

ইতিপূর্বেও আমরা বিভিন্ন দলিলে খন্ড খন্ডভাবে বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্নে আমাদের প্রাথমিক মতাবস্থান বা পর্যালোচনা উত্থাপন করেছি। বিশেষত পেরু-পার্টির কিছু লাইন এবং পেরু-পার্টিতে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রামের বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট কিছু মতাবস্থান ছিল, যা মৌলিকভাবে রিম-কমিটির মতাবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অবশ্য সমস্যাকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতপার্থক্যও রিম-ভুক্ত বিভিন্ন পার্টির সাথে আমাদের ছিল। কিন্তু পেরু-পার্টির প্রতিনিধিত্বের দাবিদারদের কিছু নগ্ন ও সুস্পষ্ট রিম-বিরোধী, মার্কসবাদবিরোধী অবস্থান ও কার্যকলাপকে বিরোধিতার ক্ষেত্রে রিম-এর ঐক্যে আমরা সামিল ছিলাম ও রয়েছি।

এই দলিলে আমরা প্রধানত উত্থাপন করবো নেপাল পার্টি উত্থাপিত নতুন নীতি, লাইন ও কৌশলগুলোর কেন্দ্রীয় প্রশ্ন যাকে আমরা মনে করি, সেই '২১-শতকের গণতন্ত্র' তত্ত্বটির উপর। ... ...

এছাড়া নেপাল পার্টি উত্থাপিত আরো কিছু বিষয়– সাম্রাজ্যবাদ-তত্ত্বের বিকাশ, ফিউশন, কৌশলগত তত্ত্ব, প্রভৃতিকেও আমরা সম্ভবমত আলোচনা করবো।

পেরু-পার্টি বা এমপিপি এখন যাকে প্রতিনিধিত্ব করে সেসবের মৌলিক প্রশ্নাবলীতে আমরা মূলত রিম-কমিটির ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিতে চাই। সে সবেরও সারসংকলনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য রয়েছে। তবে তা এখন কম গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক প্রশ্নাবলীতে ঐকমত্য অর্জন এখন জরুরী, যার ভিত্তিতে গৌণ প্রশ্নাবলী ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া ব্যতীত অন্য উপায় খোলা নেই। তাই, এ বিষয়গুলোতে আমরা বড় কোন আলোচনা ও বিতর্ক এখন করবো না। তবে নতুনতর পরিস্থিতিতে তার কিছু উত্থাপন এখানে হতে পারে। পেরু-পার্টির মৌলিক লাইনের অংশরূপে থট/পথ প্রশ্ন, জেফেতুরা-... ... ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মৌলিক অবস্থানকে এখানে পুনউত্থাপন ভাল হবে।

১। '২১-শতকের গণতন্ত্র'

গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব প্রশ্ন

নেপাল পার্টি এ ধারণাটি প্রথম উত্থাপন করে ২০০৩-সালে। এ সময়টাতেই

রিম-এর দক্ষিণ-এশীয় এক সম্মেলনে নেপাল-পার্টি তাদের এ ধারণাকে প্রাথমিকভাবে ও মৌখিকভাবে প্রকাশ করে ও কিছুটা আলোচনা করে। তখনো তারা এ বিষয়ে সামগ্রিক কোন অবস্থান-পত্র বা দলিলাদি পেশ করেনি।

সে সময়টাতে নেপাল-গণযুদ্ধ বিরাটাকারে বিকশিত হয়ে উঠেছিল এবং গ্রামাঞ্চলে বিশাল অঞ্চল মুক্ত হয়ে পার্টির নেতৃত্বে প্রশাসন চালু হয়েছিল। বাহিনীরও ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। পার্টি তখন দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের জন্য রণনৈতিক ভারসাম্যের স্তর ছাড়িয়ে আক্রমণাত্ম স্তরে যাবার চিন্তা করছিল। এ অবস্থায় নেপাল পার্টি একটি বিপ্লবী ক্ষমতাসীন পার্টির জরুরী আগামী সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিল যা বাস্তব সম্মত, দুরদর্শী ও বিজ্ঞচিত ছিল।

তারা এ সময়ে যে বিষয়টিকে আঁকড়ে ধরেন তাহলো, চীনে জিপিসিআর সত্ত্বেও বিপ্লব কেন পরাজিত হলো, পার্টি কেন সংশোধনবাদী হলো। মাও-মৃত্যুর পর যে ব্যাখ্যা মাওবাদীরা দিয়েছেন তাতেই সীমিত না থেকে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং সর্বহারা রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার দ্বান্দ্বিক সারসংকলন করার এ প্রচেষ্টাকে ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

পার্টি ইতিমধ্যে নিজেদের ক্ষমতা, বাহিনী ও পার্টির মধ্যে উদ্ভূত আমলাতন্ত্রের সমস্যার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অভিমতের দিকে চালিত হতে থাকে যে, সমাজতন্ত্রের অধীনে জনগণের গণতন্ত্রকে যথোপযুক্তভাবে প্রসারিত করতে না পারার মধ্যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ নিহিত। এভাবে তারা বিংশ শতকের বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের অভিজ্ঞতার সারসংকলনের ভিত্তিতে নতুন ধারণা হিসেবে ২১-শতকের বিপ্লবের জন্য নতুন নীতি-পদ্ধতির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

রিম-পরিসরে সীমিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা ও উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নেপাল-পার্টি কিছু কিছু দলিলাদি হাজির করতে থাকে যার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের অধীনে জনগণের গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার জন্য স্থায়ী বাহিনী ও একনায়কত্বকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশিত হতে থাকে। তারা গুরুত্ব দিয়ে যে কথাটি উত্থাপন করতে চান তাহলো, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র একদিকে পুরনো শাসকশ্রেণির রাষ্ট্রের মতই একনায়কত্ব চালাবার হাতিয়ার, কিন্তু একইসাথে সেটা তার চেয়ে ভিন্নতর– কারণ, তা সব ধরনের রাষ্ট্র ও একনায়কত্ব বিলোপ করারও প্রক্রিয়া।

এজন্য তারা রাষ্ট্রীয় স্থায়ী সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের বিপরীতে সশস্ত্র জনগণের ধারণাকে গুরুত্ব দিতে থাকেন, জনগণের গণতন্ত্র/ক্ষমতাকে সামনে আনতে থাকেন, যাকিনা প্যারি কমিউনে ঘটেছিল, এবং তারা রুশ বিপ্লবের পূর্ব সেই অভিজ্ঞতাকে বরং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশি মূল্য দিতে থাকেন। বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (রুশ ও চীন) অভিজ্ঞতাকে তারা নেতিবাচকভাবে মূল্যায়নের দিকে চালিত হতে থাকেন।

এটা সত্য যে, সকল শ্রেণি বিভক্ত সমাজের সকল ধরনের রাষ্ট্রের থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রগত পার্থক্য সম্পর্কে তাদের উপরোক্ত চিন্তা ভুল নয়। কিন্তু

তাসত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রথমত একটি রাষ্ট্র, যা একনায়কত্বের হাতিয়ার ব্যতীত অন্য কিছু নয়, হতে পারে না। বিশেষত যতদিন সাম্রাজ্যবাদ রয়েছে ততদিন একনায়কত্বের প্রশ্নকে কোনভাবে দুর্বল করার অর্থ হলো সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে শক্তি জোগানো– সেটা সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই ঘটুক না কেন। সেজন্যই মাও জিপিসিআর কালে সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্ব অধ্যয়নের উপর এত বেশি জোর দিয়েছিলেন।

নেপাল-পার্টি যে প্রকৃত প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেছে তার উপর গুরুত্বদান তাদেরকে রাষ্ট্র, বিপ্লব ও একনায়কত্ব সংক্রান্ত আরো মৌলিক প্রশ্নের উপর নতুন চিন্তাভাবনায় চালিত করে। এভাবে '২১-শতকের গণতন্ত্র' ধারণাটি তার প্রথমাবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের রং বদলানো ঠেকানোর বাস্তব ও জরুরী প্রয়োজন থেকে একটি সাধারণ ধারণার দিকে এগিয়ে যায়, যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব প্রশ্নটির মত মার্কসবাদের একেবারে মৌলিক প্রশ্নটি।

নেপাল পার্টি দাবি করতে থাকে যে, মালেমা'র তত্ত্ব সমাজতন্ত্রের এই পরাজয়ের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ সক্ষম নয়। এমনকি চীনে জিপিসিআর কালে তার কিছু অগ্রগতি ঘটলেও সেটা মীমাংসিত হয়নি। তাই, তত্ত্বকে বিকশিত করতে হবে। এবং তারা এই '২১-শতকের গণতন্ত্র' তত্ত্বটিকে তার বিকাশ বলেও ধারণা দিতে থাকেন।

তাদের এই স্লোগান একনায়কত্ব সম্পর্কিত মার্কসীয় মৌলিক ধারণাকে দুর্বল করে বা বাতিল করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তারা তাদের স্লোগানটিকে '২১-শতকের গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব'– এভাবেও প্রকাশ করতে শুরু করেন।

* ইতিমধ্যে নেপাল-বিপ্লবের পরিস্থিতিতেও তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলনের কৌশল হিসেবে পার্টি '০৫-সালের শেষদিকে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সাথে ১২-দফা সমঝোতা স্থাপন করে। এরপর নেপাল পরিস্থিতি ও পার্টির নীতি ও পদক্ষেপগুলো দ্রুত এগিয়ে যায়। '০৬-সালের এপ্রিলে রাজতন্ত্র পিছু হটে। পার্টি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্যে আসে; মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও বিদ্যমান রাষ্ট্রের মধ্যে তারা সরকারে অংশ নেয়; পরে নির্বাচনে অংশ নেয়, জয়লাভ করে ও সরকার গঠন করে।

এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় বহুদলীয় ব্যবস্থা, 'প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থা'র ধারণাটিকে তারা নিয়ে আসেন, যা '২১-শতকের গণতন্ত্র' ধারণার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির এখনকার প্রয়োগকে প্রতিনিধিত্ব করে। দেশীয় ক্ষেত্রে এই লাইন কীভাবে কৌশলের নামে বিপ্লবী নীতিকে খেয়ে ফেলে সেটা আমরা বিভিন্ন দলিলপত্রে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে, এটা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রকে সরিয়ে বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র, শাসকশ্রেণি ও সমাজব্যবস্থাকে মূলত বজায় রাখে, কিছু কিছু সংস্কার চালিয়ে, এবং, তার অধীনে প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে। এটা বিদ্যমান ব্যবস্থার নির্বাচনকে একটি প্রতিযোগিতার পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। এটা কার্যত সংসদীয়বাদকে লাইন হিসেবে গ্রহণ করে। যদিও পার্টি বলছে এটা একটা কৌশলমাত্র। এক্ষেত্রে পার্টিকে আদি সর্বহারা বিপ্লবী লাইন, এবং এখনকার বুর্জোয়া সংসদীয়বাদের মধ্যে একটা

মিলঝিল করার জন্য ব্যাপকভাবে সমন্বয়বাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা উপস্তরের আবিস্কার করতে হয়েছে, কিন্তু এটা বরং তাদের স্ববিরোধিতাকেই প্রকাশ করছে আরো স্থূলভাবে। সবচাইতে মারাত্মক হলো– এটা রাষ্ট্র, বিপ্লব ও একনায়কত্ব সম্পর্কে মৌল মার্কসবাদী তত্ত্বকে ধোঁয়াশা করে দিয়েছে, তার থেকে সরে গেছে, মালেমা'র বিকাশের নাম করে।

এটা যদি হয় প্রচন্ড পথের প্রধানতম একটা স্তম্ভ, তাহলে এই প্রচন্ড পথ মালেমা'র বিকাশ নয়, বরং মালেমা থেকে সরে পড়া।

* পার্টি '২১-শতকের গণতন্ত্র' ধারণাটি প্রথম যখন উত্থাপন করে তখনকার আগ্রহটি ভুল ছিল না। কেন সমাজতন্ত্র পরাজিত হলো– জিপিসিআর সত্ত্বেও।

একে শুধু অনিবার্য পরাজয় বলাটা যথেষ্ট কিনা। জিপিসিআর-ই এর সমাধান কিনা– যে পর্যন্ত মাও করে দিয়ে গিয়েছেন? নাকি জিপিসিআর-এর তত্ত্ব-কে বিকশিত করতে হবে। এমনকি জিপিসিআর-কালেও কোন গুরুত্বপূর্ণ ভুল ছিল কিনা সে প্রশ্ন উঠানো যায় কিনা।

এ বিষয়গুলো আলোচনার দাবি রাখে, উড়িয়ে দেয়া যায় না। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান থেকে বব এ্যাভাকিয়ান ও আরসিপি[২০] এই বিষয়টিকে উত্থাপন করেছেন, যা আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু নেপাল-পার্টি শুরু থেকে এ সমস্যাটির উত্তর দিয়েছে মালেমা থেকে সরে গিয়ে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিভ্রান্তমূলক মধ্যবিত্ত ধারণা থেকে।

তারা বলেছেন, সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের কারণ আমলাতন্ত্র– পার্টির একচ্ছত্র নেতৃত্ব ও স্থায়ী শক্তিশালী বাহিনী– যার ভেতর থেকে এই আমলাতন্ত্র আসে, এবং যা সংশোধনবাদ এনে পার্টির ও দেশের রং বদলে দেয়। সুতরাং তারা এই আমলাতন্ত্রকে দুর্বল করার সমাধান হিসেবে শক্তিশালী স্থায়ী বাহিনীর বিপরীতে সশস্ত্র জনগণ, এবং পার্টির একচ্ছত্র নেতৃত্বের বিপরীতে প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থা হাজির করেন। এক্ষেত্রে তারা প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতায় ফেরত যাবার সমাধানের কথাও বলেছেন। যাকিনা জনগণের এক নতুন গণতন্ত্রের সৃষ্টি করবে। একেই তারা '২১-শতকের গণতন্ত্র' বলছেন।

– তাদের উপরোক্ত ধারণাগুলো জিপিসিআর-এর অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, প্যারী কমিউনের সারসংকলন এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তীকালের রুশ ও চীন বিপ্লবের ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলোকে সর্বহারা শ্রেণি লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা **না বোঝা**কে প্রকাশ করে। এবং উল্টোপথে হাঁটার মাধ্যমে ১৮-শতকের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে গিয়ে ঠেকে।

নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাজনৈতিক লাইনের ভুলের কারণে আমলাতন্ত্রের বড় বিকাশ ঘটেছিল। চীনেও আমলাতন্ত্র ছিল। কিন্তু আমলাতন্ত্র পুঁজিবাদ-সংশোধনবাদে অধপতনের প্রকৃত কারণ নয়। বরং বলা ভাল যে, আমলাতন্ত্র রোগের প্রকাশ, সেটা নিজেও রোগ বটে, কিন্তু মৌলিক রোগ এটা নয়। যতদিন রাষ্ট্র

থাকবে, পার্টি থাকবে, একনায়কত্ব থাকবে– ততদিন আমলাতন্ত্রও থাকবে। সমস্যা হলো তার উৎপত্তিস্থলকে আঘাত করা। নইলে যতই আমলাতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম করা হোক না কেন, তার থেকে সৃষ্ট বিপদকে কাটানো যাবে না।

আমলাতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের পৃথক তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। যার কথা লেনিন পর্যন্ড়ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু জিপিসিআর-এর যেটা বিকাশ তাহলো, বুর্জোয়া-অধিকারগুলোকে সীমিত করা– তার চূড়ান্ড় বিলুপ্তির লক্ষ্যে; এবং সেজন্য রাজনৈতিক সংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা। মার্কস বহু আগেই তার বিখ্যাত "৪-সকলসমূহ"[২১]-কে বিলুপ্ত করার কথায় এটাই এনেছিলেন। আমলাতন্ত্র বুর্জোয়া সম্পর্কের একটা দিকমাত্র, যা অর্থনৈতিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে বিদ্যমান বুর্জোয়া সম্পর্কগুলোর থেকে সৃষ্ট ও তার থেকেই বেড়ে ওঠে। জিপিসিআর সেই জায়গাটাকেই তুলে ধরেছে। এবং দেখিয়েছে যে, এর একমাত্র সমাধান হলো বিপ্লবকে অব্যাহত রাখা, বিপ্লবকে তীক্ষ্ণ করা। এর অর্থ হলো, সর্বহারা একনায়কত্বকে শক্তিশালী করা, তাকে দুর্বল করা নয়; এর অর্থ হলো পার্টির নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করা, তাকে নড়বড়ে করা নয়। আর এসবই করা যেতে পারে ব্যাপক জনগণকে পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে জাগরিত করে, রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয়ে তাদের হস্ড়ক্ষেপ ও অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তুলে– যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে, নির্বাচনে, সংসদে কখনই ঘটে না। নির্বাচন, সংসদ, বহুদলীয় অংশগ্রহণ এসবের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু উপাদান হতে পারে বটে, কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন হলো পার্টির নেতৃত্ব, পার্টির নেতৃত্বে জনগণের উত্থান, সর্বহারা রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকরণ, একনায়কত্বকে শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় এর কোন বিকল্প নেই। এথেকে বিচ্যুতিই বরং প্রথম ধাপেই রং বদলে ফেলা। এটা রং বদলানো ঠেকানোর কোন সমাধান নয়।

নেপাল-পার্টি আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাদের এই মধ্যবিত্ত/বুর্জোয়া উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়ে অবধারিতভাবে নোঙর করেছে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বন্দরে, যা সর্বহারা একনায়কত্ব ও পার্টি-নেতৃত্বকে দুর্বলই করে না, তাকে বর্জন করে। কার্যত তা চর্চা করে বুর্জোয়া একনায়কত্ব। যা বহু আগে সমাজ-গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে মার্কসবাদী আন্দোলনে দেখা গেছে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হলো আজকের নেপালে বিপ্লব-বর্জিত সংসদীয়বাদের অনুশীলন। যা ১০ বছরের বিপ্লবের ফলকে খেয়ে ফেলার দিকে এগিয়ে চলছে।

* এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব সম্পর্কে, তথা রাষ্ট্র ও বিপ্লব সংক্রান্ড় মৌল মার্কসীয় তত্ত্বাবলীকে আমাদের সুগভীরভাবে পুনঅধ্যয়ন ও সঠিকভাবে আত্মস্থকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

অতিসংক্ষেপে– গণতন্ত্র কোন সার্বজনীন বিষয় নয়, যেমনটা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র শিখিয়ে থাকে। সার্বজনীন গণতন্ত্রের ধারণা হলো একটি বুর্জোয়া ধারণা। বুর্জোয়া শ্রেণি তার একনায়কত্বকে ধামাচাপা দেয় 'গণতন্ত্র' স্লোগানের মাধ্যমে– যাতে জনগণকে

বিভ্রান্ড় করার শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার হলো তাদের সার্বজনীন ভোট। গণতন্ত্র একনায়কত্ব ছাড়া হয় না। কোন না কোন শ্রেণির একনায়কত্বই সেই শ্রেণির জন্য গণতন্ত্র সৃষ্টি করে। লেনিন শিখিয়েছেন, যখন একনায়কত্ব থাকবে না, তখন গণতন্ত্রেরও কোন অর্থ থাকবে না।

মার্কসবাদ শেখায় যে, রাষ্ট্র হলো একনায়কত্বের হাতিয়ার মাত্র। সুতরাং যতদিন রাষ্ট্র রয়েছে ততদিন তাহলো এক শ্রেণি কর্তৃক বিপরীত শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখার যন্ত্র। আর বাহিনী হলো যেকোন রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উপাদান। তাই, রাষ্ট্র থাকলে তার স্থায়ী বাহিনী থাকতে বাধ্য।

বিপ্লব হলো প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা, সেজন্য তার বাহিনীকে ধ্বংস করা, এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করা। এভাবে ক্ষমতাসীন শ্রেণির একনায়কত্বকে ধ্বংস করা। এবং তার স্থলে জনগণের নতুন একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। নতুন রাষ্ট্র, নতুন বাহিনী সৃষ্টি করা। এ ছাড়া বিপ্লবের আর কোন সংজ্ঞা নেই, আর কোন বিপ্লব হতে পারে না।

তাই, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করা, অর্থাৎ, বুর্জোয়া একনায়কত্বকে খোলাসা করা এবং জনগণের মাঝে এ সম্পর্কে যে বিভ্রান্ড়ি ও মোহ রয়েছে তা কাটানোর কাজ হলো মার্কসবাদী রাজনীতির প্রাথমিক কর্তব্য। এটা হলো বিপ্লব করার প্রথম ধাপ।

নেপাল-পার্টি '২১-শতকের গণতন্ত্র' ধারণা উত্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র, বাহিনী, বিপ্লব, একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র সম্পর্কে উপরোক্ত মার্কসবাদী মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে ঝাপসা করে তার থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। এটা বুর্জোয়া সংসদীয়বাদকে সামনে নিয়ে এসেছে– যা নেপালসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বদলে বুর্জোয়া সংসদীয়বাদী সংস্কারকে সামনে আনে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশে কর্মসূচি হিসেবে আনবে সমাজ-গণতান্ত্রিক সংস্কার। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে এটি সর্বহারা একনায়কত্বকে দুর্বল করা ও পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলো শক্তিশালীকরণের পুঁজিবাদের পথগামী কর্মসূচি আনবে।

আর সকল ক্ষেত্রেই এটা সর্বহারার পার্টি-নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার বদলে তাকে দুর্বল করা, বুর্জোয়া নির্বাচনকে পরম করে ফেলা, নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়া, বুর্জোয়ার সাথে তাকে তথাকথিত প্রতিযোগিতায় ফেলা– ইত্যাদি নীতি সামনে আনে। যা বুর্জোয়া নেতৃত্ব বাধাহীনভাবে চলে আসবার পথ প্রশস্থ করতে বাধ্য। এবং যা সর্বহারা বিপ্লবকে সুদূর পরাহত করতে বাধ্য।

* নেপাল পার্টি সরলভাবে উপরের রাজনীতিগুলো অনুসরণ করবে, করতে বদ্ধপরিকর– বিষয়টা এরকম নয়। তাদের তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ/প্রয়োগ ও পরিণতিগুলো হলো এগুলো। কিন্তু যখন বুর্জোয়া ব্যবস্থা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়, অথবা বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব আঘাত করে, তখন সদ্য বিপ্লব সাগর থেকে উঠে আসা এক বিশাল পার্টি ও জনগণের সম্বিতে আঘাত লাগে। এটা তাত্ত্বিক বিতর্কের পর্যায়ে ঘটেছে। এখন

তাদের তত্ত্বের বাস্ড়ব প্রয়োগের সময়ও ঘটছে। এ কারণে নেপাল পার্টিকে বিপুলভাবে সমন্বয়বাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে ও হচ্ছে। এর শেষ পরিণতি দেখতে আমাদের আরো সময় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, নেপাল-পার্টির 'গণতন্ত্র' সম্পর্কিত নয়া ধারণা বা তত্ত্বটিও, তাদের এ সংক্রান্ড় লাইন ও নীতিগুলোও, দেখার বিষয়। এগুলো দেখার বিষয় নয়। এগুলো সুস্পষ্টভাবেই অমার্কসবাদী। তাই, এ মুহূর্তেই তা পরিতাজ্য। নেপাল পার্টি এই অমার্কসবাদী লাইন, যার নির্যাস হলো বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতান্ত্রিকতা– তাকে বর্জন না করে কমিউনিস্ট বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে পারবে না। এটা মালেমা'র বিকাশ নয়, মালেমা থেকে সরে পড়া।

ফ্রন্টগঠনের বিষয়টি মার্কসবাদে, বিশেষত মাওবাদে এক বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। ফ্রন্টের কাজ ছাড়া বিপ্লবে ব্যাপক জনগণকে সমাবেশিত করা সম্ভব নয়, তাই, বিপ্লব করাও সম্ভব নয়। ফ্রন্ট রণনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে যেমন হয়, রণকৌশলগতভাবেও হতে পারে। কিন্তু ফ্রন্টের কাজ আদর্শগত/পার্টিগত কাজকে শক্তিশালীকরণেরই তাগাদা দেয়। যখন ফ্রন্ট ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়, তখন বেশি প্রয়োজন হয় পার্টি কাজ, মালেমা'র শিক্ষা, আদর্শগত কাজ, এবং সর্বহারা শ্রেণি লাইনের দৃঢ়তাকে এগিয়ে নেয়া। বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের সময় যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সাথে কৌশলগত সমঝোতা/ঐক্য হয়, তখন বেশি প্রয়োজন হয় সকল বুর্জোয়া ব্যবস্থার উন্মোচন, বিপ্লবের রণনৈতিক কর্মসূচিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার প্রশ্ন। নেপাল পার্টি রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলোর সাথে যে ঐক্য/সমঝোতা গড়ে তুলেছিল, তখন সে 'কৌশল' তাদের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনৈতিক কর্মসূচি, তথা তাদের নীতিকে খেয়ে ফেলতে থাকে। এটা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে অতীতেও ঘটেছে– ২য় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্যাসিবাদের বির"দ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সাথে সাধারণ ঐক্য-লাইন বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদ ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবী কর্মসূচিকে খেয়ে ফেলেছিল এবং ইউরোপের একসারি দেশে কমিউনিস্ট আদর্শের কবর রচনা করেছিল। যা কিনা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতেও গুর"তরভাবে বেড়ে উঠেছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে র"শ পার্টি ও সমাজতন্ত্রের পুঁজিবাদে অধপতনের একটা বড় মৌলিক কারণ এখানে নিহিত ছিল।

এই খেয়ে ফেলাটা 'কৌশলগত লাইন'-এর ভুল থেকে যতটা না আসে, তার চেয়ে বেশি আসে মৌলিক নীতি, বিপ্লব, তথা মালেমা'র মৌল আদর্শের প্রশ্নে দুর্বলতা ও তা থেকে বিচ্যুতি থেকে। নেপাল-পার্টির সমস্যাটিও কৌশলগত লাইনজাত নয়। হতে পারে তার শুর" হয়েছে এখান থেকে। কিন্তু তাদের মৌলিক সমস্যা ঘটেছে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব প্রশ্নে মৌল মার্কসবাদী নীতিমালা থেকে সরে পড়া থেকে। আর এই সরে পড়াকে তারা উত্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন মালেমা'র বিকাশ সাধনের স্লোগান তুলে।

মালেমা'র বিকাশ অপরিহার্য। কারণ, মার্কসবাদ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান সতত বিকাশশীল। বিকাশশীল না হয়ে সে বিজ্ঞান হিসেবে নিজ সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম

নয়। মার্কসবাদও এর অন্যথা নয়। মার্কসবাদের বিকাশের প্রশ্নটি আজকের বিশ্বে আরো গুর"ত্ব দিয়ে সামনে এসেছে, কারণ, প্রথমত সমাজতন্ত্র বিগত শতকে বহু বিজয় সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ড় পরাজিত হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত বস্তুগত বাস্ড়বতা উপযোগী নীতি আবিষ্কার ছাড়া বিপ্লব এগোতে পারবে না। বিগত কয়েক দশকে, বিশেষত 'বিশ্বায়ন'-পরবর্তীকালে বিশ্বের বস্তুগত বাস্ড়বতারও বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। যাকে আমাদের তত্ত্ব ও লাইনে ধারণ করতে হবে। কিন্তু মালেমা'র এই বিকাশ মালেমা'র মৌল নীতিগুলোকে ভিত্তি করেই হতে হবে। মালেমা বলে পঠিত, গৃহীত সববাক্যই/সবকিছুই মালেমা নয়। তদুপরি গুণগত বিকাশ অতীত থেকে রাপচারও দাবি করে। কিন্তু সেটা তখনই মার্কসবাদী হবে, যদি তা মার্কসবাদী মৌল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। নইলে তা মার্কসবাদ থাকে না, মার্কসবাদ বিরোধী মতাদর্শ হয়ে পড়ে। নেপাল পার্টি এখানেই বিচ্যুত হয়েছে।

... ...

অন্যান্য লাইন-বিতর্কের বিষয়াবলী

মতবাদিক প্রশ্ন

১। প্রধানত মাওবাদ

পের"-পার্টি কমরেড গনজালোর নেতৃত্বে আমাদের মতাদর্শের তৃতীয় স্ড়রকে মালেমা, বা মাওবাদ হিসেবে সূত্রায়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। এরই প্রক্রিয়ায় '৯৩-সালে রিম সম্মিলিতভাবে মাওবাদ-সূত্রায়ন গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু মালেমা গ্রহণ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে রিম-এর অভ্যন্ড়রে গুর"ত্বপূর্ণ মতপার্থক্য প্রথম থেকেই বিরাজমান ছিল। প্রথমত মাওবাদ-ই প্রথম আমাদের মতবাদের তৃতীয় স্ড়রকে সূত্রায়িত করে, এবং মাওচিন্ড়াধারার সাথে তার গুণগত ও স্ড়রগত পার্থক্য রয়েছে। নাকি মাওচিন্ড়াধারা-সূত্রায়ন প্রথমে এই তৃতীয় স্ড়রকে সংজ্ঞায়িত করে, যদিও মাও-মৃত্যুর পর মাওবাদ গ্রহণ করা এই তৃতীয় স্ড়রের উচ্চতর উপলব্ধিকে প্রকাশ করে, যা মাওচিন্ড়াধারা করতো না। আমরা মালেমা গ্রহণের ক্ষেত্রে শুর" থেকেই দ্বিতীয় মতটিকে তুলে ধরি। কিন্তু পের"-পার্টি প্রথমটির ধরনে মত ধারণ ও প্রকাশ করতো, এবং এর একটা ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল রিম-পার্টিগুলোর একাংশের মধ্যে।

এরই ভিন্ন প্রকাশ ছিল মতাদর্শকে 'মালেমা, প্রধানত মাওবাদ'– এই সূত্র দ্বারা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। আমাদের পার্টি 'প্রধানত মাওবাদ' সূত্রায়নকে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে, যা কিনা মালেমা'র "অখ" সমগ্রতা"-কে খ"িত করে দেয়। পের"-পার্টির এই ভুল সূত্রায়নের প্রভাবও রিম-ভুক্ত অনেক পার্টির উপর ব্যাপকভাবে পড়ে। এরই একটা প্রকাশ হলো 'প্রধানত'-এর স্থলে 'বিশেষত' শব্দটি ব্যবহার করে একই প্রবণতাকে প্রকাশ করা।

২। থট/পথ

পের"-পার্টির মতবাদিক লাইনে আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মতবাদকে

'মালেমা ও গনজালো থট'– এভাবে প্রকাশ করা, যেক্ষেত্রে গনজালো থটকে তারা দাবি করতো পের"র নির্দিষ্ট অবস্থায় মালেমা'র প্রয়োগ হিসেবে। দেশীয় ক্ষেত্রে গনজালো থটকে মতবাদের প্রধান দিক বলেও তারা উল্লেখ করতো।

এই চেতনা/প্রবণতার ব্যাপক প্রভাব রিম-ভুক্ত অনেক পার্টিতে পড়ে, আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়ে। আমাদের পার্টি একে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে। আমরা মনেকরি, সর্বহারা শ্রেণি একটি আন্ড়র্জাতিক ও আন্ড়র্জাতিকতাবাদী শ্রেণি। তার মতাদর্শ ও স্বার্থও আন্ড়র্জাতিক। তাই, প্রতিটি দেশে তার মতাদর্শ পৃথক হতে পারে না। প্রতিটি দেশে নিজ নিজ থট থাকতে হবে, এই চিন্ড়া সর্বহারা আন্ড়র্জাতিকতাবাদী নয়। প্রতিটি দেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লাইনে যে বিশেষত্বগুলো থাকে সেটা আন্ড়র্জাতিক অভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে, তার অধীনে আসে এবং তাকে এগিয়ে দেয়। সুতরাং, গনজালো বা পের"-পার্টির বৈশ্বিক অবদানের স্বীকৃতি, আর থট সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। এটা জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি আনে যা বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির মাঝে মতবাদিক বিভক্তির দিকে চালিত করে।

অনেকের মত নেপাল-পার্টিও এই থট চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়, এ চেতনাকে মূলত গ্রহণ করে এবং 'প্রচন্ড থট' হিসেবে মতবাদ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়। এ সময় রিম-ভুক্ত কিছু পার্টির সংগ্রামের মুখে তারা ২০০১-এর জাতীয় সম্মেলনে 'থট'-এর বদলে 'পথ' গ্রহণ করে। যদিও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নেপাল পার্টি কিছু ভিন্নতা আনে, কিন্তু আমাদের মতে সারবস্তুগতভাবে তারা পের" পার্টির বিচ্যুতিকে একবার গ্রহণ করার পর তা থেকে সরতে সক্ষম হয় না, তাকে অব্যাহত রাখে, এবং সমন্বয়বাদী অবস্থান গ্রহণ করে।

বর্তমানে অবশ্য নেপাল পার্টি '২১-শতকের গণতন্ত্র', 'সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ড় তত্ত্ব', 'ফিউশন তত্ত্ব', 'কৌশলগত তত্ত্ব'– প্রভৃতি নামে মালেমা'র ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন কিছু নতুন বিকাশের কথা দাবি করছে। এইসব 'বিকাশ' নিয়ে আলোচনা-মূল্যায়নের উপর নির্ভর করবে 'প্রচন্ড পথ/থট' কীভাবে গ্রহণীয় হয় বা হয় না। এ বিষয়গুলো আন্ড়র্জাতিক পরিসরে বিতর্ক ও মীমাংসার এখনো বাকি।

৩। জেফেতুরা বা মহান-নেতৃত্ব তত্ত্ব

পের"-পার্টির পক্ষ থেকে এই লাইনটি উত্থাপিত হয়। বিশেষত কমরেড গনজালো গ্রেফতার হবার পর পের"-পার্টিতে উদ্ভূত টুএলএস-এর মূল্যায়ন, তাতে গনজালোর ভূমিকা কী তার মূল্যায়ন– ইত্যাদিকে ঘিরে পরবর্তীতে পের"-পার্টির প্রতিনিধিত্ব দাবিকারী প্রবাসী সংগঠন এমপিপি এই চিন্ড়াকে বিপুলভাবে বিকশিত করে তোলে।

এই মতবাদিক দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যে, বিপ্লব ও পার্টির নেতৃত্ব মহান নেতার স্ড়রে উন্নীত হলে তিনি নীতিগত ভুল করতে পারেন না। গনজালো-ও এই স্ড়রের নেতা, তাই তিনি গুর"তর বা নীতিগত কোন ভুল করতে পারেন না। সুতরাং পিসিপি-তে উদ্ভূত রোল (ডান সুবিধাবাদী লাইন), যাকিনা গণযুদ্ধকে স্থগিত করা ও রাজনৈতিক

মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রের সাথে আলোচনার প্রস্ড়াব পেশ করেছে, তার সাথে কমরেড গনজালোর সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তিনিই এই শান্ড়ি প্রস্ড়াবটি দিয়েছেন– এই বক্তব্য শত্র"র ষড়যন্ত্র মাত্র। পিসিপি-তে টুএলএস উদ্ভূত হয়েছে তেমন কোন বক্তব্যও আসলে শত্র"র কথারই প্রতিধ্বনি করা। গনজালো এমন কোন প্রস্ড়াব দিয়েছেন কিনা, যাকিনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত, এবং বহু ধরনের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করাও হলো শত্র"র বক্তব্যে পরিচালিত হওয়া।

আমরা জেফেতুরা লাইনকে মার্কসবাদী মনে করি না। এটা একদিকে ব্যক্তিতাবাদী, লাইন ও পার্টির ঊর্ধ্বে ব্যক্তিকে স্থাপন করে, পীরবাদী, অন্যদিকে এটা প্রকৃত বাস্ড়ব থেকে সিদ্ধান্ড় না টেনে আত্মগত আকাংখা থেকে সিদ্ধান্ড় টানে।

রাজনৈতিক বিষয়াবলী

১। সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ

নেপাল-পার্টি ২০০৪-সালে এটি যখন প্রথম উত্থাপন করে তখন তারা বলতে চেয়েছিলেন যে, এটাই মালেমা-বিকাশে প্রধানতম বিষয়। কিন্তু পরবর্তীতে এ প্রশ্নটি ততটা আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়নি।

তবে ২০০৬-সালের ডিসেম্বরে একটি আন্ড়র্জাতিক সেমিনারে নেপাল-পার্টি যে অবস্থান-পত্র উত্থাপন করে তার বক্তব্য থেকে কিছু প্রবণতাকে আমাদের নিকট ত্র"টিপূর্ণ মনে হয়েছে। (দেখুন, ডিসেম্বর, '০৬-এ সিপিএন আহুত আন্ড়র্জাতিক সেমিনারে নেপাল-পার্টির অবস্থান-পত্র এবং তার উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত মন্ড়ব্য। এই গ্রন্থের পৃ–)

তারা 'বিশ্বায়ন' ফেনমেননকে আলোচনা করা, তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুধাবন করা ও সে অনুযায়ী রণনীতি ও রণকৌশলকে আলোচনা করতে চেয়েছেন যুক্তিসঙ্গতভাবেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের 'বিশ্বায়িত রাষ্ট্র' বা 'বিশ্বায়িত অবস্থা' আলোচনা করার মধ্য দিয়ে আন্ড়-সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব-কে, তা থেকে উদ্ভূত যুদ্ধের সম্ভাবনাকে গুর"তরভাবে কমিয়ে ফেলে দেখিয়েছেন বলে আমাদের ধারণা হয়।

২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ ৬০-বছরের বেশি সময়ে পুনরায় বিশ্বযুদ্ধ-যে হয়নি, একইসাথে ৭০-দশক পরবর্তীতে বিপ্লবও হয়নি, সেটা বিশ্লেষণ ও নতুন আলোচনার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে লেনিনবাদকে বিকাশের প্রশ্ন ওঠানো সম্ভবত অন্যায্য নয়– যাকিনা বাস্ড়ব বিশ্ব পরিস্থিতির নতুন বিকাশগুলোকে, বিশেষত বিশ্বায়নকে ধারণ করতে পারে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আন্ড়সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব-যে মৌলিক, এবং এটা কোন না কোন রূপে ও ধরনে বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ সৃষ্টি করে রেখেছে, রেখে যাবে– লেনিনবাদের এই মৌলিক প্রতিপাদ্য মোটেই অকেজো হয়ে যায়নি।

নেপাল-পার্টির উপস্থাপনায় একে নেতিকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

২। ফিউশন তত্ত্ব

দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ ও নগর-কেন্দ্রীক অভ্যুত্থান– এই দুই রণনীতির সংমিশ্রণে নতুন রণনীতি বিকাশ করার দাবি করেছে নেপাল-পার্টি। এটিই হলো ফিউশন তত্ত্ব।

পরবর্তীতে এই নয়া রণনীতির প্রয়োজনীয়তাকে তারা 'বিশ্বায়ন' ও সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ-এর সাথে সংযুক্তভাবে উত্থাপন করতে চেয়েছে।

প্রথমত নেপাল বিপ্লবের দশ বছরে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের সাথে রাজনৈতিক আন্দোলন-গণসংগ্রাম-গণঅভ্যুত্থানের সংযুক্তকরণের প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতাকে আমরা উচ্চ মূল্য দেই। সামরিক ও রাজনৈতিক অগ্রাভিযান পরপর চালানো, জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ, এবং কৌশলগত তত্ত্বের গুরুত্ব– এই তিনটি বিষয়ে নেপাল-বিপ্লবের অভিজ্ঞতা আমাদের মত দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে ও সামরিক নীতি-কৌশলের বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই গুরুত্ব ধরে। আমরা এটাও মনেকরি যে, শুধুমাত্র 'বিশ্বায়ন'-ই নয়, যদিও এ সময়কালে তার গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বেড়েছে, বরং ৩য় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের বর্ধিত অনুপ্রবেশের ফলে নগরায়ণ, পুঁজিবাদের বিকাশ, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব ও চূড়ান্ত ক্ষমতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং বিশেষত সাম্প্রতিককালে ফোন, মোবাইল ও যাতায়াতের বিপুল বিকাশ এবং কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিকাশ (যেমন, কৃষিতে হাইব্রিড বীজ, সেচ ব্যবস্থা, যান্ত্রিক চাষ প্রভৃতি) উপরোক্ত দুই রণনীতির সমন্বয়ের বিপুল গুরুত্বকে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু একইসাথে গণযুদ্ধ ও সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান– এইভাবে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির রণনীতিকে দুই ধরনে বিভক্ত করার বদলে গণযুদ্ধের সার্বজনীনতাকে তুলে ধরার ধারণাও এ সময়ে বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কমরেড গনজালোর নেতৃত্বে পিসিপি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যদিও এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও ৩য় বিশ্বের দেশে গণযুদ্ধ-প্রশ্নে মৌলিকভাবে দুই রণনীতির পার্থক্য করণকে নেতিকরণের একটা প্রবণতাও তাদের মাঝে দৃশ্যমান– যাকে আমরা সঠিক মনে করি না।

তাই, গণযুদ্ধের সাধারণ রণনীতি কীভাবে প্রযুক্ত হবে তার উপর আলোচনা ও বিকাশ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন বলে আমাদের ধারণা। সে অনুযায়ী ৩য় বিশ্বের দেশে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রণনীতিকে বিকশিত করার প্রশ্ন হিসেবেই তাকে আনা যথার্থ হবে বলে আমাদের মনে হয়।

ফিউশন এবং নতুন রণনীতি হিসেবে এর আবির্ভাব ঘটবে কিনা সেটা আরো গভীর বিবেচনার বিষয়। নেপাল-পার্টি চটজলদি কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ভুল করতে পারে এবং তা গণযুদ্ধকে দুর্বল করতে পারে। নেপাল-পার্টির লাইনে ও নেপাল বিপ্লবে সর্বশেষ নেতিবাচক বিকাশগুলো 'গণতন্ত্র' সংক্রান্ত মূল সমস্যা থেকে উদ্ভূত হলেও ফিউশন সংশ্লিষ্ট ডান-প্রবণতা বা বিচ্যুতি তাকে আরো প্রভাবিত করেছে কিনা তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনাযোগ্য।

৩। দক্ষিণ-এশীয় সোভিয়েত

দক্ষিণ-এশীয় সোভিয়েতের ধারণা প্রথম নেপাল-পার্টি উত্থাপন করে।

'কমপোসা' গঠনে নেপাল-পার্টির দিক থেকে এই ধারণার পরিচালিকা ভূমিকা ছিল বলে অনুমান করা যায়।

পর্যালোচনার পর আমাদের পার্টি একে সমর্থন করে, আঞ্চলিক যুদ্ধের ধারণাকে এর সাথে উত্থাপন করে।

এর কিছু পর নেপাল পার্টি 'বিশ্ব-সোভিয়েত ফেডারেশন'-এর ধারণাটি পেশ করে।

কিন্তু এর উপর কোন আলোচনায় ব্যাখ্যা তারা উত্থাপন করেনি। আমরাও এটার আলোচনায় তাদের সাথে প্রবেশ করতে পারিনি। তার আগেই অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সমস্যা সামনে চলে আসে।

নেপাল পার্টি ২০০৫-সালে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সাথে সমঝোতায় প্রবেশ করে, এবং তার পর থেকে নেপাল-পার্টির দিক থেকে 'সোভিয়েত' সংক্রান্ত আলোচনা দুর্বল হয়ে যায়। এমনকি 'কমপোসা' কার্যক্রমেও ভাটা পড়তে থাকে।

আমরা মনেকরি, দক্ষিণ-এশীয় সোভিয়েত ধারণাটিকে আমাদের এগিয়ে নেয়া উচিত। এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ও প্রয়োগযোগ্যতার আলোচনা হওয়া উচিত, যেমন, আরব অঞ্চলের সোভিয়েত, বা ল্যাটিন আমেরিকান সোভিয়েত– ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সাথে সাথে 'বিশ্ব সোভিয়েত ফেডারেশন' প্রস্তাবনাটিকে ভালভাবে জানা ও পর্যালোচনা করা উচিত।

৪। পেরু-পার্টিতে উদ্ভূত টুএলএস-এর মূল্যায়ন

এ প্রশ্নে পেরু-পার্টির সাথে রিম-কমিটি ও রিম-ভুক্ত পার্টিগুলোর গুরুতর মতভেদ বিকশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এমপিপি'র পক্ষ থেকে এ প্রশ্নকে ঘিরে রিম-কমিটি, বিশেষত আরসিপি, কমরেড এ্যাভাকিয়ান এবং সাধারণভাবে রিম-কার্যক্রম ও তার ঐক্যের বিরুদ্ধে গুরুতর আক্রমণাত্মক ও বিভেদবাদী তৎপরতা চালানো হয়।

রিম-ভুক্ত পার্টিগুলোর নিজেদের মাঝে পেরু-পার্টির টুএলএস-কে দেখা ও মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী প্রবণতা থাকলেও মৌলিক কিছু প্রশ্নে ঐকমত্য বিরাজ করছিল যাকে আমাদের পার্টিও সমর্থন করে।

প্রথমত পেরু-পার্টির ভেতরে উদ্ভূত কোন টুএলএস হিসেবে একে দেখা হবে, নাকি নিছক শত্রুর ষড়যন্ত্র (হোক্স[২২]) হিসেবে দেখা হবে। পিসিপি ও পরে স্থূলভাবে এমপিপি হোক্স-লাইনকে প্রচার করে, যার সাথে রিম-কমিটি, রিম-ভুক্ত অধিকাংশ পার্টি এবং আমাদের পার্টি একমত ছিল না।

দ্বিতীয়ত পেরুর গণযুদ্ধ ও বিপ্লবে গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছে কিনা, যাতে এই টুএলএস, ভাঙন, ইত্যাদি গুরুতর বা প্রধান ভূমিকা রেখেছে। নাকি পেরুর গণযুদ্ধ অব্যাহতভাবে বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, গনজালো থট যার গ্যারান্টি– যেমনটা প্রাথমিকভাবে পিসিপি, ও পরে এমপিপি বলেছে ও বলে থাকে। আমাদের পার্টি রিম-কমিটির দায়িত্বশীল পার্টিগুলোর এমন অবস্থানের সাথে একমত যে, এটা ঘটেছে, এবং এর কারণ নিহিত রয়েছে গনজালো পরবর্তী পিসিপি'র লাইনের মাঝে,

টুএলএস-কে হ্যান্ডলিং করার মাঝে, গনজালো থটের মাঝেও, এমনকি কোন না কোন মাত্রায় পিসিপি'র ঐতিহাসিক লাইনের মাঝেও।

তৃতীয়ত এই টুএলএস-এ কমরেড গনজালোর ভূমিকা কী?

এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে রিম-কমিটি বলেছে যে, "লাইন-ই গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রণেতা নন।" আমরা এই স্লোগানকে তুলে ধরাটা পেরু-পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

বহু বিভিন্ন তথ্যাবলীতে যা প্রকাশিত তা থেকে আমাদের পার্টি মনে করে যে, এমপিপি কমরেড গনজালোর যে ভূমিকাকে তুলে ধরে তার সাথে একমত হওয়া যায় না। রোল বা এ জাতীয় লাইনের সাথে কমরেড গনজালোর কোন না কোন মাত্রায় ভূমিকা ছিল ও/বা রয়েছে বলে সন্দেহ করার ব্যাপক কারণ রয়েছে।

* এই সমগ্র পরিস্থিতিতে রিম-কমিটি সর্বদাই ঐক্যবদ্ধভাবে ও পূর্ণাঙ্গ সঠিকভাবে ভূমিকা রেখেছে তা নয়, এবং রিম-কমিটি ও রিম-ভুক্ত পার্টিগুলোর মাঝে বিভিন্ন বিতর্ক ছিল ও রয়েছে। কিন্তু এমপিপি'র মৌলিক লাইনের বিরুদ্ধে রিম-কমিটির অবস্থান শেষ পর্যন্ত ছিল মৌলিকভাবে ইতিবাচক ও মূলত সঠিক।

এটা সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন বিশেষত আজকের এমপিপি'র চলমান বিভেদাত্মক ও অনৈতিক রিম-বিরোধী আক্রমণকে সংগ্রাম করা ও পরাজিত করার প্রয়োজন থেকে।

এমপিপি এখন পিসিপি-কে প্রকৃতই প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা, করে থাকলে তার কোন অংশকে, সেই অংশের দেশাভ্যন্তরে ভূমিকা কী ও প্রকৃত লাইনটা কী, পিসিপি'র বিভিন্ন অংশের পরিস্থিতি কী ও তাদের লাইনগুলো কী– এসবই খুব বিতর্কিত ও জানার বিষয়। এমপিপি-মাধ্যমে এসব সম্বন্ধে কোন সামগ্রিক ও সন্দেহমুক্ত চিত্র বিগত এক/দেড় দশকে কখনো পাওয়া যায়নি ও যাচ্ছে না। তারা একঘেঁয়েভাবে বলে চলেছে, পেরুর গণযুদ্ধ বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, পার্টিতে কোন টুএলএস নেই, এবং গনজালো থট এই বিজয়ের গ্যারান্টি। এবং যারাই গনজালোর ভূমিকা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলছে তারাই শত্রুর কথাই বলছে, এমনকি শত্রুর হাতের হাতিয়ার।

সুতরাং এমপিপি-কে পিসিপি'র কোন বিপ্লবী লাইনের ও অংশের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে গ্রহণ করা বিপজ্জনক। হতে পারে তারা আন্তরিকভাবে বিপ্লব চান, কিন্তু তাদের লাইনগত অবস্থান গুরুতর বিপজ্জনক।

আমরা মনেকরি, আজ নেপাল-পার্টি ও আরসিপি কর্তৃক উত্থাপিত নতুনতর যে লাইন-প্রশ্নগুলোতে রিম-ভুক্ত পার্টিগুলোতে লাইনগত পর্যালোচনা ও বিতর্ক বিকশিত হয়ে উঠেছে, কার্যত কিছু বিভক্তি ঘটে গেছে, তখন এমপিপি'র মত সংকীর্ণতাবাদী ও বিভেদবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে উল্লসিত হওয়া ও প্রকৃত মাওবাদীদের মধ্যে ভাঙন-সৃষ্টির ইন্ধনকে সুস্পষ্টভাবে বিরোধিতা করতে হবে। এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

একইসাথে রিম-অভ্যন্তরের বিতর্ককে যৌক্তিক পরিণতিতে নেয়ার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে উচ্চতর লেবেলে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী কমিউনিস্টদের নতুনতর দৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। আমাদের পর্যালোচনা ও বিতর্ক সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যেই পরিচালনা করতে হবে।

(এরপর এ্যাভাকিয়ানের 'নিউ সিনথেসিস' নিয়ে একটি বড় আলোচনা ছিল, যা এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। অধ্যায়ের সূচনা নোট দ্রষ্টব্য– সম্পাদনা বোর্ড।)

উপসংহার

উপরে আলোচিত ও উত্থাপিত লাইনগত প্রশ্নাবলী ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে উঠে আসছে। এছাড়া অবধারিতভাবে এ বিষয়গুলো কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুদীর্ঘ দেড়শ' বছরের আরো অনেক অভিজ্ঞতার আলোচনাকেও তুলে আনতে পারে।

তবে আমরা মনেকরি, সব প্রধান লাইনগত বিতর্ককালেই উঠে আসা অসংখ্য বিষয় ও মতপার্থক্যের মধ্যে প্রধানতম সূত্রগুলোকে বেছে বের করা ও সেগুলোকে আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন। সেটা এই ধরনের বিতর্কে সঠিক অবস্থান নিতে পারার প্রধানতম এক সমস্যা। আমাদের পার্টি এবারো প্রথম থেকেই সেভাবেই এগুনোর চেষ্টা করেছে।

নতুন এই মতপার্থক্যগুলো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন মহা-বিতর্ককে প্রতিফলিত করে। নীতিকে বর্জনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে বিভক্তির উদ্ভব এবং নীতিকে রক্ষা করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে উচ্চতর লেবেলে উন্নীত করা এ ধরনের মহাবিতর্কের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। এর মধ্য দিয়ে সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুন পর্যায়ে বিকশিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সংগ্রামে সফলতার উপর নির্ভর করে আগামী ভবিষ্যতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিশ্ববিপ্লব কোন পথে এগুবে। যার সাথে আবার আমাদের দেশীয় আন্দোলনের বিকাশও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

সেজন্য আমরা সমগ্র পার্টিকে খুবই গুরুত্ব সহকারে এই মহাবিতর্কে সচেতন অংশ নেয়া ও সেজন্য উপযুক্তভাবে নিজেদের গড়ে তোলা ও ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। এজন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ্যগুলো মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়ন করার কাজকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং সেগুলো সমাপ্তির পর তাকে ছাড়িয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যকে হাতে নিতে হবে। তদুপরি, নতুন নতুন যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসবে সেগুলোকেও অধ্যয়ন করতে হবে।

এটা শুধু আমাদের পার্টির একান্ত সমস্যা নয়। সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন, তথা সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এ বিতর্কে যথা সম্ভব বেশি করে যুক্ত করতে হবে। আলোচনা করতে হবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পরিসরে। এ বিতর্কের বেশ কিছু বিষয় দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা-অধ্যয়ন-গবেষণার বিষয় বলেই আমরা ধারণা করি, যদিও কিছু মৌলিক বিষয়ে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আশা করি পার্টিব্যাপী ও মাওবাদী আন্দোলনে এই বিতর্ক ও আলোচনা ছড়িয়ে দিতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার্টির সর্বস্তরের নেতৃত্বগণ এবং সচেতন মাওবাদী কেডারগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। ❑

বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের মাও-পরবর্তী সিকি শতাব্দী

বিপর্যয় থেকে বের"বার প্রচেষ্টা– সফলতা ও ব্যর্থতা

(রচনা ঃ মে, ২০০৯। সংশোধিত ঃ জানুয়ারী, ২০১১)

১৯৭৬-সালে মাও-এর মৃত্যুর অল্প পরেই তেং-হুয়া চক্র একটা সামরিক কূ্যদেতা ঘটায়, চ্যাং চুন চিয়াও ও চিয়াং চিংসহ প্রকৃত মাওবাদী নেতৃত্বদের গ্রেফতার করে, অসংখ্য হত্যা-গ্রেফতার ও দমনের মধ্য দিয়ে নিজ ক্ষমতাকে সুসংহত করে এবং চীনকে একটি সংশোধনবাদী ও পুঁজিবাদী দেশে পরিণত করে। ঠিক এ সময়টাতেই আলবেনিয়ার এনভার হোক্সা শঠতাপূর্ণভাবে মাওবাদের উপর এক সার্বিক আক্রমণ শুর" করে, গোঁড়ামিবাদী সংশোধনবাদের আশ্রয় নেয় এবং কমিউনিস্ট বিপ্লব ও ঐক্য থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এক সামগ্রিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়। ভিয়েতনামী জনগণের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধে এক মহান বিজয় ঘটলেও হোচিমিন ও ভিয়েতনামী পার্টির দ্বারা ইতিপূর্বেই গৃহীত মধ্যপন্থা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির পথ থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল। যা এই নবতর পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে পথ হারিয়ে ফেলে পূর্বতন কিউবা-বিপ্লবের মতোই, এবং মার্কিন-মুক্ত ভিয়েতনামকে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের পথে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এভাবে পৃথিবীজুড়ে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ আর রইলো না। বরং সোভিয়েত নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের নামে একটি শক্তিশালী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের অস্ড়িত্ব এই বিভ্রান্ড়িকে আরো বাড়িয়ে দিল।

১৯১৭ সালে র"শ বিপ্লবের পর যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গড়ে উঠেছিল, বিশ্বজুড়ে যে শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে বিপ্লবী জোয়ার ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে, তা এক সার্বিক বিপর্যয়ে নিপতিত হলো। মধ্য ৫০-দশকে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের অধপতনের পর প্রাক্তন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নে পুঁজিবাদের আবির্ভাবকে সারসংকলন ক'রে মাওবাদের ভিত্তিতে যে নতুন উত্থান ষাট/সত্তর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীনসহ বিশ্বকে নতুন রক্তে ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল তা-ও এক সার্বিক অধপতনে আচ্ছন্ন হয়। এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের তাৎপর্য বিশ্ব রাজনীতির বিকাশে বিপুল। যাকে উপলব্ধি না করলে আমরা তার পরবর্তীকালের উদ্যোগসমূহের ঐতিহাসিক গুর"ত্ব, এবং পাশাপাশি তার সমস্যাগুলোর অসীম জটিলতাকে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবো না। এবং বিশ্ব পরিস্থিতির নেতিবাচক

বিকাশগুলোকেও বুঝতে ব্যর্থ হবো।

বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলন ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই ঘটনা বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন ছিল, যা পরবর্তীকালের বিশ্ব ইতিহাসকেই এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। সুতরাং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতি এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা মাওবাদী আন্দোলন এক্ষেত্রে কীভাবে এগিয়েছে, কী তার সফলতা ও ব্যর্থতা, তা খুব গুর"ত্ব সহকারে আলোচনার দাবি রাখে।

* মাও-মৃত্যুর পর এই সার্বিক বিপর্যয়কর মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ড়ে প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা চীনা-তেং ও আলবেনীয়-হোক্সা সংশোধনবাদের বির"দ্ধে লাইনগত সংগ্রামে জাগরিত হতে শুর" করেন। যেসব দেশ ইতিমধ্যেই বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং তারপর ইতিমধ্যে সার্বিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়েছিল, সেসব দেশে এই মতাদর্শগত-লাইনগত সংগ্রাম নিজ নিজ দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে পুনর্জাগরিত করার সাথে অনিবার্যভাবেই যুক্ত ছিল। এভাবে শুধুমাত্র লাইনগত সংগ্রামই নয়, এক নতুন বিশ্ববিপ্লবী সংগ্রাম জাগরিত করবার এক নব প্রচেষ্টা শুর" হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ড়ের মাওবাদীরা পরস্পরের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হন, পারস্পরিক মত বিনিময়, পর্যালোচনা, বিতর্ক ও লেনদেনের এক নতুন অধ্যায়ের শুর" করেন। এ প্রক্রিয়ায় যেমন প্রতিটি দেশের নিজ নিজ বিপ্লবী আন্দোলনের সারসংকলন গড়ে উঠতে থাকে– যা কিনা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আমাদের পূর্ব আলোচনা থেকে পরিষ্কার হবে, তেমনি আন্ড়র্জাতিক সাধারণ লাইনের ক্ষেত্রেও সারসংকলন ও বিকাশের এক নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

১৯৮৪-সালে আন্ড়র্জাতিক মাওবাদীদের ঐক্যের কেন্দ্ররূপে "রিম" গঠন ছিল এমনই একটি অতি গুর"ত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ। আরসিপি নেতা কমরেড বব এ্যাভাকিয়ান ১৯৪৩-এর তৃতীয় আন্ড়র্জাতিক বিলোপের দীর্ঘ ৪০ বছর পর এই প্রথম বিশ্বের প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর একটি নতুন আন্ড়র্জাতিক সংগঠন গঠনের লক্ষ্য থেকে রিম-গঠনে ও তার লাইনগত ভিত্তি গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যদিও মাওবাদ সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধির অভাব রিম-ভুক্ত বা বহির্ভূত সকল পার্টিতেই বিভিন্ন মাত্রায় ও রূপে তখন বিরাজমান ছিল। কমরেড এ্যাভাকিয়ান কমরেড স্ট্যালিন কর্তৃক ৩য় আন্ড়র্জাতিক বিলুপ্তির যে সারসংকলন করেন, তার সাথে সকলে একই রকমভাবে একমত না থাকলেও রিম-গঠনে এগিয়ে আসা সকল পার্টি ও গ্র"পই এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, বর্তমান বিশ্ব বাস্ড়বতায় বিশ্বের প্রকৃত সর্বহারা বিপ্লবীদের, তথা মাওবাদীদের একটি নতুন আন্ড়র্জাতিক গঠনে এগিয়ে আসতে হবে এবং রিম গঠন করা হয় তারই এক প্রস্তুতি সংগঠনরূপে। রিম শুধুমাত্র তেং ও হোক্সা সংশোধনবাদের নতুন সমস্যাকে সংগ্রাম ক'রে মাওকে তুলে ধরলো তা নয়, বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বেশ কিছু গুর"ত্বপূর্ণ প্রশ্নে সে সারসংকলন করে, যার একটি প্রধানতম বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ৩য় আন্ড়র্জাতিকের দ্বারা গৃহীত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাধারণ লাইন। এই সারসংকলনের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল ও রয়েছে, যা বিশ্ব কমিউনিস্ট

আন্দোলনে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নটিকে একটি উচ্চতর নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছিল।

– এখানে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহলো, রিম বিশ্ব মাওবাদীদের ঐক্যের জন্য একটি ভ্রূণকেন্দ্র হিসেবে গঠিত হলেও মাওবাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর বাইরেও থেকে যায়– যার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ভারতের প্রধান মাওবাদী পার্টি পিডব্লিউ– যা পরে সিপিআই/মাওবাদী-তে রূপান্তরিত হয়; এবং ফিলিপিনের মাওবাদী পার্টি। রিম-বহির্ভূত এই পার্টিগুলো একটি নতুন আন্তর্জাতিক গঠনের সাথে একমত ছিল না, যদিও তারা আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের সংযোগ-সমন্বয়-সমঝোতা-শিক্ষাগ্রহণের উপর গুরুত্ব রাখে। এটা বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারসংকলন, তথা লাইনগত বিকাশের সাথে জড়িত ছিল। তাই দেখা যাবে যে, শুধু এই প্রশ্নই নয়, একসারি মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনগত প্রশ্নে রিম-বহির্ভূত মাওবাদীদের বিভিন্ন অংশের সাথে রিম-এর মতপার্থক্য অব্যাহত থাকে।

রিম তার পরিচালনাকারী কমিটির নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত মাওবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ কাজকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়। এবং এই সংশ্লেষিত উচ্চতর অবস্থান ও লাইন/নীতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। রিম-বহির্ভূত মাওবাদীদের সাথেও রিম একদিকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালায়, অন্যদিকে তাদের সাথে সুস্থ বিতর্ক গড়ে তোলে। এটা রিম-বহির্ভূত অনেক পার্টির উপরই ইতিবাচক প্রভাবে ফেলে– যদিও রিম-এ সাংগঠনিকভাবে যোগ দেবার মত স্তরে অনেকের ক্ষেত্রে তা এগোতে পারেনি। কিন্তু এটা বলা চলে যে, বিকাশের গতি ছিল ইতিবাচক এবং নিঃসন্দেহেই রিম এতে নেতৃত্বকারী ও অগ্রসর ভূমিকা পালন করে।

– এর অর্থ এটা নয় যে, রিম-এর অভ্যন্তরে তেমন কোন মতপার্থক্য ছিল না। বরং বিপরীতটাই সত্য। রিম-অভ্যন্তরে গুরুতর বিভিন্ন মতপার্থক্যর অস্তিত্ব ছিল। রিম-অভ্যন্তরস্থ এইসব বিতর্ক, অগ্রসর অভিজ্ঞতাসমূহের সাধারণীকরণ, এবং সমগ্রভাবে সেগুলোকে রিম-এর সাধারণ লাইনে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের একটি ফয়সালা-ই শুধু করেনি, নিজেকেও লাইনের ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে এগিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয় ছিল মালেমা ও গণযুদ্ধ প্রশ্ন।

– মাওবাদ সূত্রায়ন ও গণযুদ্ধের সার্বজনীনতা, এইসাথে গণযুদ্ধের কিছু সাধারণ নীতিমালা বিকশিত করার ক্ষেত্রে পেরুর পার্টি ৮০-দশকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যদিও এ প্রশ্নগুলোতে পিসিপি'র সামগ্রিক ধারণাগুলোকে– যার মাঝে বেশ কিছু গুরুতর দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল– রিম কখনো গ্রহণ করেনি, এবং বেশ কিছু গুরুতর মতপার্থক্য অব্যাহত ছিল, যা পরবর্তীকালে রিম-এর সংকটে অবদান রাখে। তাসত্ত্বেও মাওবাদ-সূত্রায়ন গ্রহণ, গণযুদ্ধের সার্বজনীনতা গ্রহণ এবং গণযুদ্ধের কিছু নীতির বিকাশ সাধনে ৮০-দশকে পেরু পার্টি ও তার তৎকালীন নেতৃত্ব কমরেড গনজালোর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

– মতবাদিক ক্ষেত্রে মাওবাদ-সূত্রায়নে পেরু পার্টি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও তারা এমনভাবে একে উপস্থাপিত করে যা থেকে মনে হতে পারে যেন, ৬০/৭০-দশকে 'মাওচিন্তাধারা' আমাদের মতবাদকে তৃতীয় স্তরে বিকশিত করাকে সূত্রায়িত করেনি, এবং 'মাওবাদ'ই সর্বপ্রথম এটা করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে তারা 'মাওচিন্তাধারা' ও 'মাওবাদ'-কে মতবাদের বিকাশে দুটো ভিন্ন স্তরের মত ক'রে তুলে ধরে, এমনকি এ দুটোকে পরস্পর বিপরীত বলে উত্থাপন করে। পরবর্তীকালে তারা 'চিন্তাধারা'-কে দেশীয় ক্ষেত্রে মালেমা'র প্রয়োগজাত সাধারণ শিক্ষা বলে যে ধারণা পেশ করে, এবং প্রতিটি দেশে নিজ নিজ 'চিন্তাধারা' প্রয়োজন ও তার উদ্ভব অনিবার্য বলে যে গুরুতর ভ্রান্তিপূর্ণ ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিসম্পন্ন বক্তব্য রাখে তা 'মাওবাদ' সম্পর্কে তাদের উপরোক্ত ভুল ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

তারা মতবাদের ক্ষেত্রে শুধু উপরোক্ত ভুলকে নিয়ে আসে তা নয়, তারা 'প্রধানত মাওবাদ' বলে একটি নতুন সূত্র মতবাদের সাথে জুড়ে দেয়। তারা বলতে থাকে যে, মতবাদ/মতাদর্শ হলো– "মালেমা, প্রধানত মাওবাদ"। এই সূত্রায়ন দ্বারা তারা 'মালেমা'-যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা, তাকে কার্যত অপলাপ ক'রে বসে। এবং মাও-এর অবদানকে অন্য দু'জন শিক্ষাগুরু যথা– মার্কস ও লেনিন– তাঁদের অবদানগুলো থেকে শ্রেষ্ঠতর ভাবার পথ করে দেয়। এভাবে তারা মাও-এর অবদানকে সংশ্লেষণ আকারে গ্রহণ না ক'রে তাকে মার্কস ও লেনিনের অবদানের সাথে যোগফল আকারে উত্থাপনের পথও করে দেয়।

'মালেমা' শব্দমালা আমাদের মতবাদ বিকাশের তিনটি স্তরকে প্রকাশ করে– যাতে পরবর্তী স্তরগুলো তার পূর্ববর্তীর চেয়ে স্বভাবতই উচ্চতর। কিন্তু আমাদের মতবাদ তিনটি নয়, একটি– মালেমা। লেনিনবাদ হলো প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ; এবং মাওবাদ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। আজকের যুগে মাওবাদ বলার অর্থ হলো মালেমা বলা। প্রচলিত আলোচনা ও প্রয়োজনে সাধারণত মাওবাদ বলা হলেও এটা কোনক্রমেই তার আগের স্তরগুলো থেকে তাকে পৃথক করে দেখায় না। কিন্তু 'প্রধানত মাওবাদ' বলা হলে মাও-এর অবদানকে পূর্ববর্তী মতবাদিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ থাকে। সূত্রায়নের এই ত্রুটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গুরুতর বিচ্যুতি ডেকে আনতে পারে। 'শুধু মাও-কে অধ্যয়ন করা'– জাতীয় লিনপন্থী ফর্মূলার মাধ্যমে এটা মার্কস ও লেনিনের মৌলিক শিক্ষাগুলো থেকে সর্বহারা শ্রেণি ও পার্টিকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি সাধন করতে পারে। এটা এক ধরনের লিনপন্থার প্রভাবকেই প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে পিসিপি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন গ্রুপিং থেকে আমরা যে গুরুতর ব্যক্তিতাবাদী ও একতরফাবাদী লিনপন্থী বিচ্যুতির প্রকাশ দেখেছি তার উৎসমূলে এই সূত্রায়নের সমস্যা ছিল বলেই ধারণা করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি দেশে তারা পৃথক পৃথক 'চিন্তাধারা' গড়ে ওঠার অপরিহার্যতা ও অনিবার্যতার কথা তুলে ধরেছে। এরই অনুসরণে পিসিপি 'গনজালো চিন্তাধারা'-কে তাদের মতাদর্শের সাথে যুক্ত করে। এক্ষেত্রে যা ভয়ংকর

তাহলো, দেশীয় ক্ষেত্রে তারা গনজালো চিন্ড়ধারা-কে মতবাদের প্রধান দিক বলে উল্লেখ করে। অর্থাৎ, তারা দেশীয় ক্ষেত্রে মতবাদকে উল্লেখ করে এভাবে– 'মালেমা, গনজালো চিন্ড়ধারা, প্রধানত গনজালো চিন্ড়ধারা'।

এর মধ্য দিয়ে মতবাদ-সূত্রায়নে পিসিপি আরেকটি গুর"তর গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সর্বহারা শ্রেণি একটি আন্ড়র্জাতিক ও আন্ড়র্জাতিকতাবাদী শ্রেণি। তাই, তার মতাদর্শও আন্ড়র্জাতিক চরিত্রসম্পন্ন হতে বাধ্য। এটা আন্ড়র্জাতিকভাবে একরকম, আর দেশীয় ক্ষেত্রে অন্যরকম হতে পারে না।

উপরন্তু, আন্ড়র্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির বিভিন্ন পৃথক দেশের যে বাহিনী, তাদের পৃথক পৃথক 'চিন্ড়ধারা' থাকার বক্তব্য গুর"তরভাবে সর্বহারা শ্রেণির আন্ড়র্জাতিকতাবাদী সংহতি ক্ষতিগ্রস্থ করে। তা 'শ্রমিক শ্রেণির কোন দেশ নেই'– এই মৌলিক মার্কসবাদী সিদ্ধান্ড়েরও বির"দ্ধে যায়। শুধু পরবর্তীকালেই নয়, সূচনা থেকেই পিসিপি'র পক্ষ থেকে সর্বহারা শ্রেণির আন্ড়র্জাতিকতাবাদী সংহতির ক্ষেত্রে খুব একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন না ক'রে বরং নিজ 'চিন্ড়ধারা' থেকে সবকিছু যাচাই-এর যে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি আমরা লক্ষ্য করি তা তাদের এই মতবাদিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

* গণযুদ্ধের সার্বজনীনতাকে উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পিসিপি'র অগ্রণী ভূমিকা সত্ত্বেও একইরকমভাবে তাতে কিছু গুর"তর সমস্যা সূচনা থেকেই বিরাজ করছিল– তা বলাটা ভুল হবে না। এটা সত্য যে, তারা বলেছে, 'বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী' গণযুদ্ধ 'যথাসম্ভব দ্র"ত' শুর" করতে হবে– যা সাধারণ বক্তব্য হিসেবে সঠিক ছিল। কিন্তু এটা একটা বিমূর্ত ও সাধারণ দিক নির্দেশনার বেশি কিছু ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশ– এই দুয়ের মাঝে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য বিপ্লবী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা থেকে মৌলিকভাবে দুই রণনীতির মূর্তকরণ ব্যতীত সর্বহারা শ্রেণি বাস্ড়ব বিপ্লবী কর্মকা" এগোতে পারে না। 'গণযুদ্ধের সার্বজনীনতা'র সঠিক তত্ত্বের দ্বারা একে অপলাপ করা যায় না। গণযুদ্ধ পরিচালনা করাটিই পরিস্থিতি নির্বিশেষে বিপ্লবী হবার প্রধানতম মানদ" নয়। একটি পার্টির মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের দ্বারা সে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র নির্ধারিত হয়– অবশ্যই যাতে গণযুদ্ধের লাইন অন্যতম নির্ধারক স্থান দখল ক'রে রয়েছে (যাকে বাদ দিয়ে বা গুর"ত্বহীন ক'রে বিমূর্তভাবে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের কথা বলারও কোন অর্থ নেই)। কিন্তু যেকোন সময়ে একটি পার্টি গণযুদ্ধ পরিচালনা করছে কিনা তা দ্বারা পার্টির বিপ্লবী চরিত্র নির্ধারণ করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে তো বটেই, ৩য় বিশ্বের বহু দেশেও ভুল মূল্যায়ন দ্বারা চালিত হতে হবে। আপনি তাহলে একটি বিপ্লবী পার্টিকেও অবিপ্লবী বলে তার প্রতি বিষোদ্গার করবেন। এবং একটি পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামে রয়েছে বলেই আপনি তার সামগ্রিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত না ক'রে একটি সংস্কারবাদী/অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতিকেও, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের পার্টিকেও

বিপ্লবী পার্টির সার্টিফিকেট দিয়ে গুর"ত্বারোপ করবেন। পরবর্তীকালে পিসিপি-উদ্ভূত অনেক শক্তির থেকে এটা আমরা স্থূলভাবে দেখতে পাই– যার সূচনা অতীতেই ঘটেছে বললে ভুল হবে না। এই মতাবস্থানটি হলো অন্যতম কারণ, যার জন্য পিসিপি'র প্রবাসী সংগঠন এমপিপি খুবই স্থূলভাবে রিম-ভুক্ত অনেক পার্টির বির"দ্ধে শত্র"র মত আচরণ করেছে এবং রিম-এর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টিতে প্রথম বড় ধরনের নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

* যাহোক, উপরোক্ত বিচ্যুতি ও ভুল প্রবণতাগুলো সত্ত্বেও গোটা ৮০-দশক জুড়ে এবং ৯০-দশকের সূচনা পর্যন্ড় পের"র গণযুদ্ধ এগিয়ে চলে, বিকশিত হয় দেশজুড়ে, রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্ড়র অতিক্রম করে এবং দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পের"র গণযুদ্ধ রিম-গঠন ও বিকাশে বিরাট অবদান রাখে। তা রিম-উত্থাপিত সাধারণ লাইনের বিকাশে বিরাট অবদান রাখে। রিম-ভুক্ত ও রিম-বহির্ভূত পার্টিগুলোর লাইনগত বিকাশে এটা গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যার প্রধানতম প্রকাশ হলো '৯৩-সালে রিম-এর এক বর্ধিত সভায় রিম-কর্তৃক সম্মিলিতভাবে 'মাওবাদ' সূত্রায়ন গ্রহণ এবং '৯৬-সালে নেপালের গণযুদ্ধের সূচনা– যা কিনা ৯০-দশকের শেষার্ধ ও এ শতাব্দীর সূচনাকাল জুড়ে আরেকটি বিজয়ী গণযুদ্ধে নেপালকে প্লাবিত করে দেয় এবং বিশ্ব জনগণের সামনে আরেকটি নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণি ও নিপীড়িত জনগণের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। '৭০-দশকের মহাবিপর্যয় কেটে যেতে থাকে।

* নেপাল পার্টি পের"র গণযুদ্ধ থেকে অগ্রসর অভিজ্ঞতাগুলো গ্রহণের পাশাপাশি তার কিছু নেতিবাচক দিককেও নিজের মাঝে টেনে নেয়– যার মাঝে প্রধানতম বিষয়টি ছিল 'চিন্ড়ধারা' সংক্রান্ড় বিচ্যুতি। নেপাল পার্টি গণযুদ্ধের বিকাশের এক ধাপে এসে পার্টির মতবাদের সাথে 'প্রচন্ড পথ' জুড়ে দেয়, যাকিনা সারবস্তুগতভাবে পের" পার্টির অনুসৃত 'চিন্ড়ধারা'-কেই প্রকাশ করতো। এটা– আমরা যেমন আগেই বলেছি– মালেমা'র সাধারণ তত্ত্বকে মতবাদিক ক্ষেত্রে দুর্বল করে দেয়, জাতীয়তাবাদকে বিকশিত ক'রে তোলে, মালেমা'র বিকাশের নামে নিজস্ব 'পথ'/'থট'-কে সামনে নিয়ে আসে– যার বিষময় ফল আমরা পরে নেপাল বিপ্লবের বিপথগামী হবার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই।

* ইতিপূর্বেই ৯০-দশকের সূচনায় পের"-বিপ্লব সামগ্রিক বিপর্যয়ে প্রবেশ করে। '৯২-সালে পার্টি ও গণযুদ্ধের প্রধান নেতা কমরেড গনজালো শত্র"র হাতে গ্রেফতার হন– যা কিছু আংশিক লসের মধ্য দিয়ে ইতিপূর্বেই সূচিত হয়েছিল, এবং গনজালো-গ্রেফতার পরবর্তীকালে তা আরো বেড়ে চলে, যা ৯০-দশক জুড়ে অব্যাহত থাকে।

শত্র"র দ্বারা আরোপিত এই ক্ষতির চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ওঠে পার্টিতে উদ্ভূত 'রোল' (ROL– Right Opportunist Line/ডান সুবিধাবাদী লাইন), যা কিনা গনজালো-গ্রেফতার পরবর্তীকালে গণযুদ্ধকে থামিয়ে দেবার নসিহত করে। ইতিমধ্যেই পার্টির গ্রেফতারকৃত প্রধানতম অংশের এই ডান-লাইনের সাথে সম্পর্কিত থাকার খবর প্রকাশিত হয়। এমনকি কমরেড গনজালো নিজেই এই শান্ড়ি-চুক্তি লাইনের উদ্গাতা কিনা, বা

তিনি কোন না কোনভাবে এজাতীয় লাইন তুলে ধরছেন কিনা তার দাবি ও প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হয়। কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি টুএলএস-এর এই জটিল পরিস্থিতিকে লাইনগত সংগ্রামের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তারা চোখ-কান বুঁজে বলতে থাকেন যে, এটা কোন টুএলএস নয়, শত্রুর ষড়যন্ত্র মাত্র, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে কমরেড গনজালোর যুক্ত থাকার প্রশ্নই আসে না, কারণ তিনি জেফেতুরা, যার অর্থ হলো মহান নেতৃত্ব, যিনি কিনা বিপ্লবের বিজয়ের গ্যারান্টি। এভাবে তারা পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তথ্যভিত্তিক যেকোন সঠিক উপসংহারকে পার্টির মধ্যে আলোচনা করা, এবং পার্টি ও জনগণকে দিশা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এমনকি যা আরো ভয়ংকর তাহলো, এই টুএলএস-কে গভীরতর করবার স্বার্থে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের জন্য এবং গণযুদ্ধ এগিয়ে নেবার জন্য সারসংকলনের প্রয়োজনকেও তারা কার্যত অস্বীকার করে। রিম-কমিটির হাজারো আন্তরিক ও কঠিন প্রচেষ্টা এবং প্রস্তাবকে পেরু-পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে শত্রুর ষড়যন্ত্রে পা দেয়া, অথবা এমনকি শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করা হতে থাকে।

এভাবে সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ৯০-দশকের মধ্যেই বলা চলে যে, পেরু পার্টির প্রথম সারির প্রায় সকল নেতৃত্ব হয় শহীদ হন, নতুবা গ্রেফতার হয়ে যান। কিন্তু আরো বেদনাদায়ক যে ঘটনা তাহলো, গ্রেফতারকৃত সকল প্রধান নেতাই– যারা মুক্ত অবস্থায় গণযুদ্ধ চালিয়ে যাবার লাইনের সুদৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন, তারা গ্রেফতারের পর শান্তি-চুক্তি লাইনে চলে যান, এবং তারা বলতে থাকেন যে, কারাগারে কমরেড গনজালো তাদেরকে এই লাইনে আস্থা স্থাপনে ভূমিকা রেখেছেন। এমনকি কেউ কেউ এ অবস্থার অজুহাত দেখিয়ে কমিউনিজমের ব্রতই খোলামেলাভাবে বর্জন করেন।

বাস্তবে এই পরিস্থিতি পেরুর গণযুদ্ধকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। বিকাশমান ও দেশব্যাপী এক গণযুদ্ধ মার খেয়ে যায়– যেমনটি আমাদের দেশে '৭৪-পরবর্তীকালে ঘটেছিল। পার্টি একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায়– জেলের ভেতরে ও বাইরে। বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র এ্যাকশন এখনও বিরাজমান বলে জানা যায়, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক লাইন পরিস্কার নয়, এবং তার সবই একই কেন্দ্র থেকে পরিচালিত, এবং গণযুদ্ধ অব্যাহত রাখবার লাইন থেকে চালিত তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। রাজনৈতিক সমাধানের জন্য গণযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া– এমন একটা সারবস্তুতে শান্তি-লাইনও যে সশস্ত্রভাবে এখনো সক্রিয় সেটা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে।

বিপজ্জনক বিষয় হলো এই যে, শান্তিচুক্তি লাইন ও গণযুদ্ধ লাইন– এই দুই বিপরীত পক্ষই নিজেদেরকে গনজালোর অনুসারী বলে দাবি করতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে একাধিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, '৯২-সালে গ্রেফতারের অব্যবহিত পর, এবং শান্তি-চুক্তি আসবার আগে, "খাঁচার ভাষণ" নামে বিখ্যাত ভাষণটিতে খুবই বলিষ্ঠভাবে গণযুদ্ধ অব্যাহত রাখবার আহ্বান ব্যতীত, কমরেড গনজালোর পক্ষ থেকে সরাসরি কোন বিস্তৃত ভাষণ বা বিবৃতি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। শান্তিচুক্তি লাইনের পক্ষে

গনজালোর চিঠিপত্র বা টিভি-ছবি জাতীয় যাকিছু প্রকাশ পেয়েছে তার সবকিছুকেই অন্যপক্ষ শত্রুর ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছে।

এই পরিস্থিতি একদিকে গণযুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব আন্দোলনের নতুন সূচিত উত্থানকে গুঁড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে পেরু-পরিস্থিতির একটা ঘোলাটে চিত্র উপস্থাপন, যেকোন অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ও টুএলএস-কে আঁকড়ে ধরার প্রস্তাবকে শত্রুর ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে কার্যত রিম-পরিসরে পেরু-পরিস্থিতি নিয়ে একটি নতুন দুই লাইনের সংগ্রামের উদ্ভব ঘটে। পিসিপি'র প্রতিনিধিত্বকারী দাবিদার প্রবাসের সংগঠন এমপিপি ন্যক্কারজনকভাবে রিম, রিম-কমিটি ও তার অন্যতম প্রধান সদস্য আরসিপি-কে এবং তার নেতৃত্ব কমরেড এ্যাভাকিয়ানকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ চালায়, একটি চরম বিভেদাত্মক ব্যক্তিতাবাদী অপপ্রচার পরিচালনা করে, রিম-শক্তির মধ্যে পেরুর পার্টি, গনজালো ও গণযুদ্ধের সম্মানকে ব্যবহার ক'রে জঘন্য উপদলীয় অপতৎপরতা শুরু করে।

এসব সত্ত্বেও রিম-কমিটির নেতৃত্বে রিম মূলত ঐক্যবদ্ধ থেকে অত্যন্ত ধৈর্যশীলভাবে এবং বিজ্ঞচিতভাবে পেরু-পরিস্থিতি মূল্যায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। রিম রোল-লাইনকে লাইনগতভাবে খন্ডন করে, গণযুদ্ধ চালিয়ে যাবার লাইনকে পেরু ও বিশ্বের বিপ্লবীদের কাছে বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরে, গনজালোর জীবন রক্ষার জন্য ও পরবর্তীকালে প্রেসে তার নিজ বক্তব্য প্রচারের দাবি নিয়ে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে।

– পেরু-পার্টি ও গণযুদ্ধের এই বিয়োগান্তক পরিস্থিতির কারণ নিছক পার্টি ধ্বংস ও গনজালো হত্যার শত্রু-ষড়যন্ত্রে খুঁজলে চলবে না। শত্রু সেটা সর্বদাই করেছে, এখনো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু শুধু এটাই পরিস্থিতির এই গুরুতর নেতিবাচক বিকাশের কারণ হতে পারে না। কারণ, সব দেশের সকল বিপ্লব শত্রুর ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করেই বিজয়ের দিকে বিকশিত হয়। পেরুর পার্টি ও বিপ্লবও ৮০-দশকে তেমনি করেই এগিয়েছিল। তাই, পেরু-অভিজ্ঞতার সারসংকলন পেরু-বিপ্লবসহ বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রগতির জন্যই আজ অপরিহার্য।

এখনো পেরুতে মাওবাদী বাহিনী ও তাদের সশস্ত্র তৎপরতা রয়েছে বলে তথ্য প্রকাশিত হয়, যদিও তা পূর্বতন মাত্রা থেকে অনেক নিম্নস্তরের। কিন্তু সেগুলোও একই কেন্দ্র থেকে চালিত কিনা, তাদের নেতৃত্বকারী রাজনীতি কী, কমরেড গনজালোর মতাবস্থান কী, এবং পার্টি-পরিস্থিতি কী (তার কেন্দ্র ও নেতৃত্বসহ)– এসব বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, প্রবাসে পিসিপি'র প্রতিনিধিত্বকারী দাবিদার সংগঠনটি (এমপিপি) বহু আগেই তার গোঁড়ামিবাদী, বিভেদাত্মক, ব্যক্তিতাবাদী তৎপরতা দ্বারা রিম-বিরোধী একটি পেটি-বুর্জোয়া শক্তিতে নিজেকে অধপতিত করেছে, যার থেকে বস্তুগত পরিস্থিতির কোন সঠিক চিত্র পাওয়া দুষ্কর। বস্তুত এ ধরনের তৎপরতাকে শত্রু সর্বদাই স্বাগত জানায়। অন্যদিকে, এই কাজকে এগিয়ে নেবার যে একমাত্র গতিশীল কেন্দ্র রিম-কমিটি, তার নেতৃত্বে রিম

একাজে কিছুটা এগোতে সক্ষম হলেও এখন তাতে নতুন সংকট উদ্ভবের ফলে সামগ্রিকভাবে রিম এক জটিল ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে। আমরা এখন সংক্ষেপে সেই আলোচনায় প্রবেশ করবো।

* ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পের-গণযুদ্ধের ইতিবাচক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নেপাল পার্টি '৯৬-সালে সেদেশে গণযুদ্ধের সূচনা করে, যা অতিদ্রুত দেশপ্লাবী এক প্রচণ্ড শক্তি ও উত্থানে পরিণত হয়। গণযুদ্ধের লাইন আত্মস্থকরণ, তার সূচনা ও এগিয়ে নেবার প্রথম পর্যায়গুলোতে রিম-কমিটির ঘনিষ্ঠ পরামর্শ ও গাইডেন্স গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। নেপাল পার্টি এবং তার নেতৃবৃন্দ বহু জায়গাতেই তার উল্লেখ করেছেন।

– একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, রিম গঠিত না হলে এই গণযুদ্ধটি এইভাবে সৃষ্ট হতো না। বিশ্ববিপ্লবের একটি সাধারণ লাইন গড়ে তোলা এবং তার আলোকে বিভিন্ন দেশের পার্টি ও সংগ্রামকে পরিপুস্ট করা; আবার বিপরীতভাবে, দেশগুলোতে অর্জিত পার্টি ও সংগ্রামের অগ্রসর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগুলো দ্বারা বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির উপলব্ধি ও সংগ্রামকে উচ্চতর লেবেলে উন্নীত করা– এরই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো রিম ও নেপাল গণযুদ্ধের সম্পর্ক। বিশেষত নেপাল গণযুদ্ধ এমন এক সময়ে সূচিত হয় যে সময়ে বিপ্লবী যুদ্ধের নতুন এই উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ৯০-দশকের শুরুতে প্রাক্তন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েতের পতন হয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব কর্তৃক বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে এক মতাদর্শগত অভিযান শুরু হয় এই দশকের শুরুতে। একইসাথে 'বিশ্বায়ন' কর্মসূচি/পলিসির নামে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নতুনতর অনুপ্রবেশ, শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই সময়কালেই নেপাল গণযুদ্ধ বিশ্বজনগণের মাঝে এক ভিন্ন পৃথিবীর বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়, কমিউনিজমের আদর্শের এক নতুন জয়গান নিয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে চলে।

– আবার ঠিক এ সময়টাতেই পেরুর গণযুদ্ধ সার্বিক বিপর্যয়ে প্রবেশ করেছিল। যা বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে একটি বড় ধাক্কা সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নেপাল গণযুদ্ধ রিম, মাওবাদী আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান রেখেছিল। বিগত শতক পার হয়ে নতুন একবিংশ শতাব্দীতে মাওবাদী আন্দোলন প্রবেশ করেছিল সত্যিকার এক বিপ্লবী ঢেউ-এর বাস্তব সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু পূর্বেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, এ শতাব্দীর শুরু থেকেই নেপাল পার্টি একটা একটা করে গুরুতর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে থাকে, যাকিনা মালেমা থেকে বিচ্যুতিপূর্ণ। এর যাত্রা শুরু হয় পেরু পার্টি ও গনজালো চিন্তাধারার অনুসরণে ভুলভাবে পার্টির মতাদর্শে মালেমা'র সাথে 'প্রচন্ড পথ' যুক্ত করার মধ্য দিয়ে। এটা সত্য যে, কমরেড প্রচন্ড নেপাল পার্টির বিপ্লবী লাইন বিনির্মাণে, গণযুদ্ধের সূচনায় ও তাকে গতিশীল নেতৃত্বদানে বিরাট ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এজন্য তিনি

নেপালের বিশেষ অবস্থায় মালেমা'র সৃজনশীল প্রয়োগ করেন, বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণযুদ্ধ, বিশেষত পেরুর গণযুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হন এবং নেপাল-বিপ্লবের বহু গুরুত্বপূর্ণ লাইন/নীতি নির্মাণে নেতৃত্ব দান করেন। এই অবদানসমূহকে কোন বিশেষ নামে চিহ্নিত করা ও তাকে নেপালের পরিস্থিতিতে জনপ্রিয় করার প্রয়োজন থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির একটি পার্টির মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মালেমা'র সার্বজনীন সত্যগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দেবার যে ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে পার্টিটি পড়ে যায় তা পেরুর মতই নেপালে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এরপর থেকে নেপাল পার্টি মালেমা'র বিকাশের নাম ক'রে একের পর এক নতুন নীতি/লাইন পেশ করা ও তাকে সাধারণীকৃত আকারে তুলে ধরা শুরু করে যা কিনা নেপালে-তো বটেই, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন সংকটের সূচনা ঘটায়।

নেপাল পার্টি দ্বারা আনীত নতুন সাধারণীকৃত অভিমতগুলোর মাঝে সবচাইতে মৌলিক, আর সবচাইতে বিপজ্জনক হিসেবে সামনে উত্থাপিত হয় '২১-শতকের গণতন্ত্র' নামক এক নতুন তত্ত্ব– যাকিনা তারা ২০০৩-সাল থেকে পার্টিতে গ্রহণ করেন। এই তত্ত্ব সম্পর্কে প্রথমদিকে মৌখিক ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত বিস্তারিত, গভীর ও লিখিত কিছু জানা যায়নি। ২০০৪ ও '০৫-সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক কিছু সম্মেলন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও কিছু কাগজপত্রে (বিশেষত নেপাল পার্টির ইংরেজী মুখপত্র "দি ওয়ার্কার"-এর ৯নং সংখ্যায় কমরেড বাবুরাম ভট্টারাই-এর নামে প্রকাশিত "নতুন রাষ্ট্র" নামীয় নিবন্ধে) তাদের যে অভিমতগুলো উঠে আসতে থাকে তা-যে মার্কসীয় 'সর্বহারা একনায়কত্ব'র মূলসূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক, সেটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমদিকে মৌখিক আলোচনায়, পরবর্তীকালে কিছু কিছু লেখায় একে ঘিরে টুএলএস গড়ে ওঠে। রিম-বহির্ভূত পার্টি, বিশেষত সিপিআই/মাওবাদীও এই প্রশ্নে তাদের ভিন্নমতের ও সমালোচনার প্রকাশ করতে থাকে। আমাদের পার্টিও একে বিরোধিতা করতে থাকে। বিশেষত আরসিপি তাদের লিখিত দলিলাদির উপর টুএলএস-মূলক দলিল তৈরি করে। রিম-কমিটি রিম-এর অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মুখপত্র 'স্ট্রাগল'-এর মাধ্যমে পেরু-পরিস্থিতিকে প্রথমে আলোচনায় হাইলাইট শুরু করলেও দ্রুতই নেপাল-লাইনকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

– এই যখন অবস্থা, রিম-অভ্যন্তরস্থ এক নতুন টুএলএস জাগরিত হয়ে উঠছিল, সে সময় নেপাল-পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটতে থাকে। '০৫-সালের নভেম্বরে নেপাল পার্টি ৭টি সংসদীয় বুর্জোয়া পার্টির সাথে ১২-দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে, এবং রাজতন্ত্রবিরোধী এক যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলে। তার প্রক্রিয়ায় '০৬-সালের এপ্রিলে রাজতন্ত্র পিছু হটে, প্রধান সংসদীয় বুর্জোয়া পার্টি কংগ্রেসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, মাওবাদীরা গণযুদ্ধ স্থগিত করে, উক্ত সরকারে যোগ দেয়, নিজ বাহিনীকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নিরস্ত্র করে, সংবিধান সভার নির্বাচনে অংশ নেয়, নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে নতুন যুক্ত সরকার গঠনে নেতৃত্ব দেয়। তারপর এক

বছরের কম সময়ে সে সরকারেরও পতন হয়। সরকার পতনের পর বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির গ্রুপিং-লবিং চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে প্রাক্তন বিপ্লবী বাহিনীর একীকরণ, এবং নতুন সংবিধান রচনা। নেপাল পার্টিতে প্রাধান্যকারী লাইনটি বুর্জোয়া সংসদীয় পথকে বর্জন করেছে বা করবে বলে কোন আশাবাদ দেখা যাচ্ছে না। তবে পার্টি-অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতের সংঘাত বড় হয়ে উঠেছে। এই লাইন-সংগ্রামে কোন বিপ্লবী লাইন বেরিয়ে আসে কিনা, মাওবাদী বাহিনীর তথাকথিত একীকরণ প্রক্রিয়ার শেষটা কী দাঁড়ায়, এসবের প্রক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলরা মাওবাদী, তথা পার্টির বিপ্লবী অংশের দমনে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে সবের জন্য আমাদের আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে প্রাধান্যকারী ডান লাইনটি ইতিমধ্যেই পার্টি ও বিপ্লবের যে গুরুতর ক্ষতি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২৩]

এভাবে কমরেড প্রচন্ডের নেতৃত্বে নেপাল পার্টি এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় বিগত কয়েক বছর ধরে একটি ধারাবাহিক ডান লাইন অনুসরণ করে চলেছে, যা কিছু কিছু সংস্কারের বিনিময়ে বিপ্লবকে কার্যত বর্জন করেছে। বিপ্লবী ক্ষমতার প্রধান স্তম্ভ বিপ্লবী বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে মিশিয়ে দিলে, বা তাকে অন্য কোন উপায়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করলে বিপ্লব অন্তত এ পর্যায়ের জন্য সমাধিগ্রস্থ হতে পারে। যদিও পাঁড় প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষীণতম সংস্কারকেও সহজে মেনে নিতে পারছে না। উপরন্তু মাওবাদীরা পুনরায় বিপ্লবে ফিরে যাবে না, অন্তত তার কোন অংশ, তাতে তারা আস্থা রাখতে পারছে না। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। ব্যবস্থার সাথে পার্টির মানিয়ে নেয়া সম্পন্ন করার পরিপূর্ণ বুর্জোয়া অধপতন ছাড়াও, পার্টির মধ্যে বিপ্লবী ভাঙন, প্রতিক্রিয়াশীলদের এই বা ওই অংশের দ্বারা পার্টি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক হামলা, ফলশ্রুতিতে মাওবাদীদের পুনরায় যুদ্ধে ফিরে যেতে অথবা সবল অভ্যুত্থানে যেতে বাধ্য হওয়া– ইত্যাদি, এবং এসবকিছুরই মিশ্রণ– এর কোনটাকেই বাতিল করা যাবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের বিকাশ যেদিকেই হোক না কেন, এটা স্পষ্টভাবেই বলা উচিত যে, বর্তমানের নেতৃত্বকারী লাইনটি হলো একটি বুর্জোয়া লাইন, এটা কোন সর্বহারা লাইন নয়, এটা কোন বিপ্লবী লাইন নয়। এই বুর্জোয়া লাইনের বর্জন ব্যতীত সর্বহারা বিপ্লব নেপালে আর এগিয়ে যেতে পারে না।[২৪]

নেপাল পার্টির প্রাধান্যকারী লাইনের এই অধপতন ও মালেমা থেকে সরে পড়া শুরু হয়েছিল সুস্পষ্টভাবে '২১-শতকের গণতন্ত্র' গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। সেটা হলো বাস্তবে সর্বহারা একনায়কত্বের বিপ্লবী মার্কসবাদী তত্ত্বের বিপরীতে বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব। তৃতীয় বিশ্বের দেশে এটা 'প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থা'র নামে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া সংসদীয়বাদের লেজুড়বৃত্তি করে, উন্নত বুর্জোয়া দেশগুলোতে এটা হলো সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসী, এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে এটা পুঁজিবাদের পথগামী লাইনকে প্রকাশ করে। অবশ্যই আজকের যুগে এই ধরনের অভিধা নগ্নভাবে সে ধারণ করে না। সেকারণে '২১-শতকের একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র'– এই শিরোনামে নিজেকে প্রকাশ করতে

চেয়েছে।

* নেপাল পার্টির বর্তমান প্রাধান্যকারী লাইনের এই অধপতন স্বভাবতই রিম-এর এক প্রকৃত ও গুরুতর সংকট ডেকে এনেছে। পেরু-পার্টি রিম-এর প্রতিষ্ঠা থেকেই কখনো রিম-এর সাথে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ কোন পার্টি ছিল না। কিন্তু বিপরীতে নেপাল পার্টি রিম-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য সদস্য ছিল। বিগত দশকের শেষ থেকেই রিম-কমিটিতে তার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল। কমপোসা-তেও তার নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল। এ অবস্থায় নেপাল পার্টির বর্তমান নেতৃত্বকারী লাইনের এই অধপতন সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন, রিম এবং বিশেষভাবে আমাদের দক্ষিণ-এশীয় এই অঞ্চলের বিপ্লবী সংগ্রাম বিকাশের পথে এক নির্ধারক আঘাত হেনেছে।

* প্রথমে ৯০-দশকে পেরুর বিপর্যয় ও পিসিপি দাবিদার এমপিপি'র ক্রমান্বয়িক রিম-বিরোধী ধ্বংসাত্মক ভূমিকা, এবং তারপর নেপালের প্রধান লাইনের অধপতন– এ দুই কারণে আন্তর্জাতিক মাওবাদী অগ্রসর কেন্দ্র হিসেবে রিম-এর ভূমিকাকে আগের পর্যায়ে আর অব্যাহত রাখতে সক্ষম নয়। রিম-এর দুই দশক-ব্যাপী কাজের সামগ্রিক সারসংকলনের ভিত্তিতে নতুন ও উচ্চতর স্তরে রিম-কে পুনর্গঠিত করা ব্যতীত বিশবিপ্লবী আন্দোলনকে নেতৃত্বদান ও ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে না– এটা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[২৫]

এই পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু মৌলিক প্রশ্নকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে, তাকে ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। প্রথমত, রিম গঠনের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরতে হবে; দ্বিতীয়ত, দুই দশক-ব্যাপী রিম-কমিটির নেতৃত্বে প্রধানত/মূলত ইতিবাচক অগ্রগতি ও ভূমিকাকে তুলে ধরতে হবে; তৃতীয়ত, পেরু পরিস্থিতি ও পেরু-পার্টির টুএলএস-এ রিম-কমিটির প্রধানত/মূলত বিপ্লবী অবস্থানকে কার্যকর রাখতে হবে; চতুর্থত, নেপাল পার্টির চলমান লাইন দ্বারা 'সর্বহারা একনায়কত্ব' কার্যত বর্জন ও তার অধপতনকে চিহ্নিত করতে হবে; পঞ্চমত, দুই দশকব্যাপী রিম-এর দুর্বলতাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে চিহ্নিত করতে হবে এবং কাটিয়ে তুলতে হবে; এবং ষষ্ঠত, পেরু ও নেপাল পার্টির উপরোক্ত নেতিবাচক বিকাশের কারণ অনুসন্ধান এবং সে প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিগত শতকের মালেমা আন্দোলনের সারসংকলন কাজকে এগিয়ে নিয়ে মতাদর্শের বিকাশের প্রশ্নটিকে হাতে তুলে নিতে হবে।

* ইতিমধ্যে আরসিপি'র পক্ষ থেকে বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনের বেশ কিছু তাত্ত্বিক ও লাইনগত সারসংকলন উত্থাপন করা হয়েছে যাকে তারা 'এ্যাভাকিয়ানের নয়া সংশ্লেষণ' (Avakian's New Synthesis) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা বিগত শতকের মালেমা-বাদী আন্দোলনের সাথে এক ধরনের রাপচার ঘোষণা করেছে। সুতরাং তারা একে মালেমা'র বিকাশ বলেও উল্লেখ করছেন।

– মালেমা'র বিকাশের প্রশ্নটি আজ উঠছে কেন তার উপর কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। কয়েকটি প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ যার পুনঃপর্যালোচনার যুক্তি রয়েছে। বিগত শতকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পুঁজিবাদে অধপতিত

হলো তখন মাও সেতুঙ শুধু এই সংশোধনবাদকে সংগ্রাম করলেন তা নয়, তিনি এই অধপতনের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি স্ট্যালিনের সারসংকলন করলেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এক সম্পূর্ণ নতুন স্ড়রে বিকশিত করলেন– যাকে মাওবাদ বলে আমরা অভিহিত করি। তিনি জিপিসিআর পরিচালনা করলেন চীনে পুঁজিবাদের পুনর"খানকে প্রতিহত করবার জন্য। কিন্তু মাও-এর মৃত্যুর পর পরই চীনও পুঁজিবাদে অধপতিত হয়। এটাকি অনিবার্য ছিল, নাকি আমাদের কোন ভুল বা অসম্পূর্ণতা সেখানে কাজ করেছে? সুতরাং সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও নীতি/পদ্ধতির পুনপর্যালোচনা এবং তার বিকাশের প্রশ্ন এখান থেকে চলে এসেছে, যাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত এসেছে সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের বিকাশের প্রশ্নটি। লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আন্ড়ঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে। এবং সে তত্ত্ব অনুসারে স্বভাবত প্রতিয়মান হয় যে, অচিরেই আরো বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্ত হতে বাধ্য। যা তার মৃত্যুকে কাছিয়ে আনবে। অথবা বিপ্লবের অগ্রগতি সেরকম বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকিয়ে দেবে। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ৬০ বছর পার হলেও আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ আর হয়নি। ৭০-দশকে মাওবাদীদের দ্বারা বিশ্ব পরিস্থিতির বিশ্লেষণে যুদ্ধ বা বিপ্লবকে যেভাবে আসন্ন বলে মনে করা হয়েছিল সেভাবে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ড় এগিয়ে যায়নি। বিশ্বযুদ্ধ বা বিপ্লব ছাড়াই অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েতের পতন হয়েছে, যদিও তার পিছনে প্রক্সিযুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধ-উপাদানই কাজ করেছে।

এছাড়া পের"র বিপর্যয় ও নেপালের প্রধান লাইনের পথচ্যুত হবার পেছনে খোদ মতাদর্শের কোন দুর্বলতা রয়েছে কিনা যার সংশোধন বা বিকাশ প্রয়োজন সে প্রশ্নও উঠে এসেছে।

এই প্রশ্নগুলোকে এড়ানো যাবে না। কিন্তু এসবের সুগভীর ও বিচক্ষণ পর্যালোচনা প্রয়োজন। যেকোন তড়িঘড়ি ও ভাসাভাসা মূল্যায়ন বেশি খারাপের দিকে চালিত করতে পারে এবং বৃহত্তর ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। তবে একইসাথে ধাপে ধাপে কিছু নতুন ধারণাকে অবশ্যই বিকশিত করতে হবে, যা না করলে আমরা বিকাশমান পরিস্থিতি ও প্রয়োজনকে মোকাবেলা করতে পারবো না।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে কমরেড এ্যাভাকিয়ানের "নয়া সংশ্লেষণ" উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং এর উপর খুবই গুর"ত্ব সহকারে ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী অধ্যয়ন-গবেষণা-পর্যালোচনা-বিতর্ক প্রয়োজন। বিশেষত আমাদের দেশে বিগত শতকের আন্দোলনে টুএলএস পরিচালনার ক্ষেত্রে যে গুর"তর সংকীর্ণতাবাদ, একতরফাবাদ ও বিভেদবাদ দেখা গিয়েছিল, যা কিনা এদেশে একটি সামগ্রিক সঠিক বিপ্লবী লাইন গড়ে তুলতে না পারা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ও একক পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় বিরাট ভূমিকা রেখেছিল, সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু আমাদের আন্দোলন তার প্রথম যুগের উত্থানের মৌলিক সমস্যাগুলো থেকে এখনো বের"তে ব্যর্থ হয়েছে, সেগুলো এখনো আন্দোলনে বিরাজ করছে পুরনোদের মাঝে এবং নতুনদের মাঝেও, যেহেতু বিশেষত পের"র এ জাতীয়

ভ্রান্ড়িগুলোর এক ব্যাপক প্রভাব এদেশে এখনো রয়ে গেছে, এবং যেহেতু আন্ড়র্জাতিকভাবে রিম এখন এক ক্রান্ড়িকাল অতিক্রম করছে, তার পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়নি বা তার প্রথম গুর"ত্বপূর্ণ ধাপও পার হতে পারেনি, এবং আন্ড়র্জাতিকভাবে বহুবিধ ভুল লাইনগুলো বিবিধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে রয়েছে, তাই, এই সমস্যা সম্পর্কে অতিশয় সতর্কতা প্রয়োজন।

নিঃসন্দেহেই রিম-কে নতুন ও উচ্চতর লেবেলে পুনর্গঠিত করতে হবে। এর অর্থ হলো, রিম তার প্রথম ঐতিহাসিক স্ড়র পার হয়ে এসেছে। উচ্চতর স্ড়রে রিম-কে পুনর্গঠন করার জন্য প্রতিটি দেশের প্রকৃত মাওবাদী বিপ্লবীর পাশাপাশি আমাদের দেশের মাওবাদীদেরকেও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।[২৬]

* বিশ্ব আন্দোলনের এই বিকাশের সাথে আমাদের দেশের আন্দোলনের পরিস্থিতি অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। এটা সম্ভবত অনিবার্য ছিল না, কিন্তু এটা বিচ্ছিন্ন কোন বিষয়ও নয়। আমাদের আন্দোলনের বিগত শতকের স্ড়র সম্পর্কে যে মূল্যায়ন ইতিপূর্বেই পেশ করা হয়েছে তার মাঝে বিশ্বব্যাপী মাওবাদী আন্দোলনের সাধারণ কিছু সমস্যার আলোচনাও রয়েছে, যদিও তা দেশীয় প্রেক্ষিতে করা। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা এদেশের মাওবাদী আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করতে চাই, যা অবশ্যই আন্ড়র্জাতিক পুনর্গঠনেরও অংশ হবে। ❑

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নোট ঃ

১। সিপিআই (এমএলএম) ঃ [CPI (MLM)]– Communist Party of Iran (Marxist-Leninist-Maoist); ইরানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী)। এই পার্টি রিম-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সেই সময়ে পার্টির নাম ছিল ইউনিয়ন অব ইরানিয়ান কমিউনিস্টস (ইউআইসি)– সারবেদারান। পরবর্তীতে কংগ্রেসের মাধ্যমে পার্টির নাম পরিবর্তন করে এই নতুন নাম রাখা হয়।

২। স্ট্রাগল ঃ RIM-এর অভ্যন্তরে পার্টি টু পার্টি পারস্পরিক মতপার্থক্য নিয়ে বিতর্ক ও দুই লাইনের সংগ্রাম (2LS) পরিচালনার জন্য একটি পত্রিকা। এখানে এই পত্রিকার ৬নং সংখ্যার কথা বলা হয়েছে।

৩। এমপিপি ঃ (MPP– Peru Peoples Movement) পেরু পিপল্স মুভমেন্ট সংক্ষেপে এমপিপি। পেরুর গণযুদ্ধের সমর্থক প্রবাসী পেরুভিয়ানদের গণসংগঠন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পেরুর গণযুদ্ধ জনপ্রিয় করতে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

৪। প্রস্তাবিত বিবৃতি ঃ পেরু পার্টির চেয়ারম্যান কমরেড গনজালোর গ্রেপ্তারের পর এমপিপি ক্রমান্বয়ে RIM-বিরোধী অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে তারা রিম-কমিটি ও রিম-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমেরিকার মাওবাদী পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অপপ্রচারে নামে। এ অবস্থায় RIM-কমিটি এমপিপি'র অপতৎপরতা সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদানের লক্ষ্যে RIM-এর সদস্য পার্টি ও সংগঠনগুলোর নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করে। তাকেই "প্রস্তাবিত বিবৃতি" বলা হয়েছে।

৫। এনবি ঃ (NB– Naxal Bari) নকশালবাড়ী। ভারতের একটি মাওবাদী পার্টি, যা RIM-এর সদস্য সংগঠন ছিল। পুরো নাম সিপিআই (এম-এল)(নকশালবাড়ী); সংক্ষেপে এনবি বলা হয়। প্রধানভাবে ভারতের কেরালায় সক্রিয়।

৬। পার্টি ভাঙন ঃ ১৯৯৮ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৯৯ সালের প্রথমদিকে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (PBSP) তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাকে বুঝানো হয়েছে।

৭। জেফেতুরা ঃ এটি স্প্যানিশ শব্দ। মহান নেতার তত্ত্ব। পেরুর পার্টি উত্থাপিত লাইন। তবে কমরেড গনজালো গ্রেপ্তারের পর এমপিপি একে বিপুলভাবে বিকশিত করে। এই লাইন-দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে পার্টির নেতৃত্ব মহান নেতার স্তরে উন্নীত হলে তিনি নীতিগত কোন ভুল করতে পারেন না। কমরেড গনজালো হচ্ছেন তেমন স্তরের নেতা। তাই তিনি কোন গুরুতর ভুল করতে পারেন না। সুতরাং পেরুর পার্টিতে উত্থাপিত শান্তি প্রস্তাবের ডান লাইনের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

৮। রোল ঃ (ROL– Right Opportunist Line) রাইট অপরচুনিস্ট লাইন– সংক্ষেপে রোল। অর্থ হলো ডান সুবিধাবাদী লাইন। কমরেড গনজালো গ্রেপ্তারের কিছু পর ১৯৯৩ সালে গণযুদ্ধ স্থগিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পেরুর পার্টিতে এই ডান লাইনের আবির্ভাব ঘটে। পেরুর ফুজিমোরি সরকার প্রচার করে কমরেড গনজালো হচ্ছেন এই শান্তি-লাইন বা 'রোল'-এর প্রবক্তা।

৯। টুএলএস ঃ (2LS– Two Line Struggle) টু লাইন স্ট্রাগল, সংক্ষেপে টুএলএস। বাংলায় দুই লাইনের সংগ্রাম।

১০। মিলেনিয়াম বিবৃতি ঃ RIM-এর তৃতীয় বর্ধিত সভা (EM) অনুষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে। সেই সভার পক্ষ থেকে বিশ্ব-জনগণের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে প্রকাশিত বলে সেই বিবৃতিকে মিলেনিয়াম (সহস্রাব্দ) বিবৃতি বলা হয়। পরবর্তীতে এই বিবৃতি নিয়ে রিম-অভ্যন্তরে মতপার্থক্য গড়ে ওঠে।

১১। দুঃখজনক বিকাশগুলো ঃ ১৯৯২ সালে পেরু-পার্টির প্রধান নেতা কমরেড গনজালোর গ্রেপ্তার-পরবর্তীতে পার্টিতে ডান লাইনের আত্মপ্রকাশ, গ্রেফতারকৃত অন্যান্য নেতৃত্বদের দ্বারা তার সমর্থন, পরবর্তী পার্টি-চেয়ারম্যান ফেলিসিয়ানোর গ্রেফতার এবং কমিউনিজম-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ, পার্টিতে বিভক্তি, পেরু-বিপ্লবের সার্বিক বিপর্যয়, প্রবাসে এমপিপি'র RIM-বিরোধী অপতৎপরতা প্রভৃতি বিকাশগুলোকে বলা হয়েছে।

১২। কেইজ ভাষণ ঃ কেইজ স্পিচ, বাংলায় খাঁচার ভাষণ। কমরেড গনজালো গ্রেফতার হন '৯২ সালে। গ্রেফতারের কয়েকদিন পরই তৎকালীন ফ্যাসিস্ট ফুজিমোরী সরকার কমরেড গণজালো ও তৎকালে পেরুর চলমান বিপ্লবকে অপদস্থ করার জন্য জেলগেটের সামনে একটি লোহার খাঁচায় পুরে তাকে বাছাই-করা বুর্জোয়া মিডিয়ার সামনে হাজির করে। কিন্তু কমরেড গণজালো শত্রুর এই অসৎ পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেন। তিনি এই সুযোগটি কাজে লাগান তার পার্টি, বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলন ও জনগণের কাছে সে অবস্থায় তার রাজনৈতিক বক্তব্য ও দিশা তুলে ধরার জন্য। তিনি একটি তেজোদীপ্ত ভাষণ দেন, যা ফুজিমোরীর চক্রান্ত সত্ত্বেও পরে বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচার হয়ে যায়। এই ভাষণটিই পরে ঐতিহাসিক "কেইজ ভাষণ" নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৩। ইএম ঃ (EM– Expanded Meeting) এক্সপান্ডেড মিটিং, সংক্ষেপে ইএম অর্থাৎ বর্ধিত অধিবেশন (ব/অ)। ২০০০ সালে RIM-এর তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে RIM-এর প্রথম ব/অ হয়েছিল ১৯৮৭ সালে এবং দ্বিতীয় ব/অ হয়েছিল ১৯৯৩ সালে।

১৪। জিটি ঃ (GT– Gonjalo Thought)– গনজালো থট, সংক্ষেপে জিটি, অর্থাৎ গনজালো চিন্তাধারা।

১৫। জি ঃ (G– Gonjalo) গনজালো নামের আদ্যক্ষর ধরে জি বলা হয়ে থাকে।

১৬। ক. এস.এস. ঃ (C. SS– Com. Siraj Sikder) কমরেড সিরাজ সিকদার সংক্ষেপে এস. এস। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (PBSP)-'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

১৭। ক. সি. এম. ঃ (C. CM– Com. Charu Majumder) ক. চারু মজুমদার– সি.এম। ভারতের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি– সিপিআই (এম-এল)-এর প্রতিষ্ঠাতা।

১৮। বিপরীতধর্মী ঃ পেরুতে ডান লাইন অনুসারীরা যুদ্ধ স্থগিত করে শান্তি প্রস্তাবের কথা বলছে, এবং তারা দাবি করছে যে, কমরেড গণজালোই এই শান্তিলাইনের প্রবক্তা; তাই যেহেতু তিনি জেফেতুরা তাই এ লাইনই সঠিক। আর এমপিপি বলছে এর বিপরীতটা, অর্থাৎ গনজালো যেহেতু জেফেতুরা সেহেতু তিনি এই ধরনের শান্তি প্রস্তাব দিতে পারেন না, কারণ এটা ডান লাইন।

১৯। জিটি ঃ ১৪নং দ্রষ্টব্য।

২০। আরসিপি ঃ (RCP– Revolutionary Communist Party) রেভোলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি– আরসিপি অর্থাৎ আমেরিকার বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, সংক্ষেপে আরসিপি। এই পার্টিটি রিম-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

২১। ৪ সকলসমূহ ঃ এই ৪-সকলসমূহের কথা বলেছিলেন মার্কস। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ হতে হলে পুঁজিবাদের এই ৪ ধরনের **সকল** সম্পর্কগুলোর বিপ্লবী রূপান্তর প্রয়োজন। সেগুলো হলো– সাধারণভাবে **সকল** শ্রেণি পার্থক্য বিলোপ, যে উৎপাদন সম্পর্কসমূহের উপর এগুলো দাঁড়িয়ে তার **সকল**গুলোর বিলোপ, এই উৎপাদন

সম্পর্কসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ **সকল** সামাজিক সম্পর্কের বিলোপ, এই সামাজিক সম্পর্কসমূহ থেকে জন্ম নেওয়া **সকল** ধারণাসমূহের বিপ্লবীকরণ।

২২। হোক্সঃ (Hoax– গুজবের মাধ্যমে ধোঁকা দেয়া)। পের"তে জেলখানা থেকে গনজালো গণযুদ্ধ স্থগিত করে শান্ড়ি কার্যকরী করার আহ্বান দিয়েছেন বলে তৎকালীন ফুজিমোরি সরকার ব্যাপক প্রচার দিয়েছিল। পার্টির একাংশও তাই মনে করেন। কিন্তু পার্টির অন্য অংশ তা গ্রহণ করেন না। তারা বলেন, যেহেতু গনজালো জেফেতুরা নেতৃত্ব তাই তিনি এই ডান লাইন/শান্ড়িপ্রস্ড়াব দিতেই পারেন না। তারা (প্রবাসে এমপিপিসহ) একে শত্র"র গুজব ও ষড়যন্ত্র (হোক্স) বলে আখ্যায়িত করেছিল। এভাবে এমপিপি খোদ শান্ড়ি-লাইনটি বিপ্লবী লাইন নাকি বিপ্লব বর্জনকারী ড † ন সুবিধাবাদী লাইন এই লাইনগত বিতর্ক/সংগ্রামে না গিয়ে ব্যক্তিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আগায়। পক্ষান্ড়রে RIM কমিটি ও RIM-এর সদস্য অন্যান্য পার্টি বিতর্কটা লাইনে কেন্দ্রীভূত করার মত ব্যক্ত করে।

২৩। প্রচন্ডের নেতৃত্বাধীন নেপাল পার্টির এই ডান লাইনটি পরবর্তীতে পার্টি ও বিপ্লবের ভয়ংকর ক্ষতি সাধন করে। তারা পার্টির নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী বাহিনীকে নিরস্ত্র করে এবং রাজনৈতিকভাবে বিপ্লবী কর্মসূচি বর্জন করে একটি সংসদীয় পার্টিতে পরিণত হয়। এভাবে এই সংশোধনবাদী লাইনটি অগ্রসরমান একটি বিপ্লবকে ধ্বংস করে দেয়। পার্টির বিপ্লবাকাঙ্খী বামপন্থী অংশ পরে নতুন মাওবাদী পার্টি গঠন করেছে।

২৪। এই দলিলের রচনাকাল ছিল ২০০৯ সালের প্রথমার্ধ। তার অল্প সময়ের ব্যবধানেই দলিলের আলোচনা ও মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নেপাল পার্টির অভ্যন্ড়রে দুই লাইনের সংগ্রাম আরো বিকশিত হয় এবং ২০১২ সালে পার্টির বামপন্থী অংশ প্রচ"-ভট্টরাই নয়া-সংশোধনবাদকে বর্জন করে পৃথক মাওবাদী পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির নেতৃত্বে নেপালের বিপ্লবীরা সংগঠিত হচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি সঠিক বিপ্লবী লাইন ও সংগ্রাম নেপালে পুনরায় জাগরিত হয় কিনা তা আগামীতে দেখার বিষয়।

২৫। এই দলিল যখন রচিত হয় তখনও বিভিন্ন মতপার্থক্যসহ RIM সক্রিয় ছিলো। এতে যে নেতিবাচক সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে এখন তা বাস্ড়ব রূপ নিয়েছে। RIM অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এর সারসংকলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধারা-উপধারা সৃষ্টি হয়েছে।

২৬। কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্ড়র্জাতিক। আন্ড়র্জাতিক গড়া কমিউনিস্টদের অপরিহার্য দায়িত্ব। তাই আমাদের পার্টিকে তথা আমাদের দেশের অন্যান্য মাওবাদীদেরও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে লাইনগত ক্ষেত্রে এবং বাস্ড়ব সাংগঠনিক ক্ষেত্রে।

তৃতীয় অধ্যায়

["গণযুদ্ধ" বুলেটিনটি হচ্ছে পার্টির গণরাজনৈতিক মুখপত্র। হাফ ডিমাই সাইজে মাত্র দুই পৃষ্ঠার প্রচারমূলক বুলেটিন আকারে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয় মূলত গ্রামাঞ্চলের কেডার ও জনগণের উদ্দেশে। ৩/৪ মাসের মধ্যে প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। গ্রামাঞ্চলে হাটে-বাজারে বিক্রি করা হয়– কখনো কখনো দেয়ালে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়।

এতে লাইনের আলোকে আমাদের বাস্ড়ব অনুশীলনের সমস্যা ভিত্তিক বিভিন্ন গাইডমূলক লেখা লিখে থাকেন পার্টির সম্পাদক ক. আনোয়ার কবীর। সেই সব লেখায় রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, সামরিক ও সাংগঠনিক বিবিধ সমস্যাকেই আলোচনা করা হয়।

পত্রিকার আয়তন ছোট বলে সাধারণত সর্বোচ্চ ১ হাজার শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখাগুলো রচিত হয়। এর মাধ্যমে কর্মী-জনগণ পার্টি-লাইনে সজ্জিত হন। তাদের বাস্ড়ব কাজের অনুশীলন সঠিকভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা হয়। নেতৃত্বগণও সহজভাবে কাজের দিশা পান।

পার্টিতে "নতুন থিসিস" গ্রহণের কিছু আগ থেকে যে লেখাগুলো এই বুলেটিনে এসেছে সেগুলোর কয়েকটি এখানে ছাপা হলো। জুন, '১২ পর্যন্ড় লেখাগুলো এই অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

এর পরে লেখক গণযুদ্ধ-তে একটি সিরিজ লিখছেন– বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী বিচ্যুতি ও প্রবণতাকে সংগ্রাম করে, যা কিনা আমাদের দেশে বর্তমানে একটি মাওবাদী বিপ্লবী পার্টি গঠনের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের সাথে যুক্ত বিষয়। এই সিরিজের ৪টি লেখা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সিরিজটি সমাপ্ত হয়নি। সে কারণে ঐ লেখাগুলো এখানে যুক্ত করা হলো না। পরে অন্য কোথাও সেগুলো সংকলিত হবে।

– সম্পাদনা বোর্ড]

(১)

সশস্ত্র সংগ্রামের অঞ্চলে বিপ্লবী গণসংগঠন গড়ার সমস্যা

(এপ্রিল, ২০০৯)

সমস্যাটির একটি তত্ত্বগত-লাইনগত দিক রয়েছে। অন্যদিকে তার ব্যবহারিক সমস্যার দিকও রয়েছে। উভয়টিতেই আমাদের পরিষ্কার হতে হবে।

এর তাত্ত্বিক-লাইনগত প্রশ্নে আমাদের দেশের বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলনে সূচনা থেকে বিগত শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা/বিচ্যুতি ছিল। যার সাথে আমাদের বাস্ড়ব কাজের ত্র"টি জড়িত। কয়েক বছর ধরে এ প্রশ্নে আমাদের পার্টিতে লাইনগত সারসংকলন হলেও অতীতের সুদীর্ঘকালের অনুশীলন থেকে আসা অভ্যাস আমাদের বাস্ড়ব কাজে এখনো প্রাধান্য বিস্ড়ার ক'রে রয়েছে। এর কারণ হিসেবে নেতৃত্বদের লাইনগত অসচেতনতাও ভূমিকা রাখছে। কারণ, একটি সঠিক সারসংকলন পার্টি গ্রহণ করলেও সে সম্পর্কে ভাল সচেতনতা গড়ে উঠেছে তা বলা যাবে না, এমনকি নেতৃত্ব স্ড়রেও।

* আমাদের এ পর্যন্ড়কার বাস্ড়ব অনুশীলনে সশস্ত্র অঞ্চলগুলোতে প্রকৃতপক্ষে পার্টি ও বাহিনী গঠনটিই গুর"ত্ব পেয়েছে, যুক্তফ্রন্ট ততটা নয়। কিন্তু পার্টি, বাহিনী ও যুক্তফ্রন্ট– এই তিনটিকে মাও বিপ্লবের যাদুকরী অস্ত্র বলেছেন; শুধু প্রথম দুটোকে নয়। অথবা বিষয়টা এরকমও নয় যে, দুটো অস্ত্র দ্বারা বিপ্লব বেশ কিছুটা এগোনোর পরই মাত্র তৃতীয় অস্ত্রটি লাগবে, তার আগে নয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে আমরা যাই বলি না কেন, অনুশীলনে কার্যত আমরা দুটো অস্ত্রকে নিয়েই কাজ করেছি।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নটি পার্টির নেতৃত্বে অন্যান্য গণসংগঠন গড়ার কাজের সাথে যুক্ত। ঠিক যে, এ ধরনের গণসংগঠন, আর যুক্তফ্রন্ট সমার্থক– তা নয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট গড়ার কাজটিকে এর বাদে করা সম্ভব নয়। জনগণের সবচেয়ে অগ্রসর অংশটি পার্টিতে যোগ দেন। পার্টি-সংগঠনের বাইরে বাহিনী এক বিশেষ ধরনের গণসংগঠন, যা অনেক বেশি শৃংখলাবদ্ধ ও নিবেদিত। তাই, বাহিনীতেও সকল ধরনের সাধারণ জনগণ যোগ দিতে পারেন না। এছাড়া বাহিনীতে আসেন মূলত/প্রধানত তর"ণ/যুবক অংশ। বিশেষ সাহসী অংশ। সুতরাং জনগণের প্রধান অংশটি এর বাইরেই অবস্থান করেন।

সত্য যে, সশস্ত্র অঞ্চলগুলোতে গণলাইন প্রয়োগ ও গণভিত্তি অর্জনের প্রক্রিয়ায় তাদের অধিকাংশই আমাদেরকে সমর্থন করেন। কিন্তু তারা তখনো প্রায় অসংগঠিতই থাকেন। জনগণের এই বিভিন্ন অংশের নিজস্ব শ্রেণিগত বা সম্প্রদায়গত বিভিন্ন নিজস্ব দাবি/কর্মসূচি রয়েছে। বিপ্লব ও গণযুদ্ধের অধীনে তাদেরকে যদি সেসবের ভিত্তিতে সংগঠিত না করা যায় তাহলে জনগণের ব্যাপক অংশ অসংগঠিতই থেকে যাবেন। জনগণের এইসব বিভিন্ন অংশকে, বিভিন্ন শ্রেণি/সম্প্রদায়ের মিত্রদেরকে সংগঠিত করাটা

সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠনেরই কাজ।

সশস্ত্র সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণ হয় জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সে ক্ষমতা কার্যকর করতে হলে জনগণের নিজস্ব সংগঠন প্রয়োজন। না হলে পার্টি বা বাহিনীর ক্ষমতায় সেটা পর্যবসিত হবে, যার বিরাট অনুশীলন সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনে অতীতে ঘটেছে। এখনও তা ঘটছে; এমনকি কিছু পরিমাণে আমাদের পার্টিতেও। জনগণের ক্ষমতার নামে পার্টি বা বাহিনীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হলে সেটা অচিরেই নৈতিক অধপতনের দিকে পার্টি-কর্মী, কেডারদের ধাবিত করবে, যার প্রচুর দৃষ্টান্ড় আমাদের দেশে রয়েছে।

* এ ধরনের গণসংগঠন গড়ার প্রশ্নটি পার্টি গঠনের সাথেও যুক্ত। পার্টির নেতৃত্বে বাহিনী হলো একটিমাত্র সংগঠন। পার্টির নেতৃত্বে আরো অনেক সংগঠন থাকতে হবে, যাতে জনগণের বিভিন্ন অংশকে পার্টি এসব গণসংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত ও বিপ্লবে পরিচালনা করতে পারে। যখন তা না করা হয় তখন স্বভাবতই পার্টি-গঠনের কাজ খর্বিত হতে বাধ্য। আমাদের ইতিহাসে এটা ঘটেছে এবং এখনো ঘটে চলেছে।

* সশস্ত্র অঞ্চলগুলোতে পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্ট– এগুলোর গঠন একে অন্যের সাথে জড়িত। একটি অন্যটির পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে বা দুর্বল ক'রে অন্যটি ভালভাবে গঠিত হতে পারে না। আমাদের দেশে যুদ্ধ গড়া ও পার্টিগঠন– এ দুটোই যে দুর্বল হয়েছে, সফল হয়নি ভালভাবে, তার পিছনে এটি একটি গুর"ত্বপূর্ণ কারণই বটে।

* পার্টির নেতৃত্বে আশুভাবে সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ ও জর"রী গণসংগঠন হলো "কৃষক-মজুর মুক্তি ফ্রন্ট"। যাতে ভূমিহীন-গরীব কৃষক, কৃষি-মজুরসহ অন্যান্য গ্রামীণ মজুর ও দরিদ্র ছাড়াও মধ্য কৃষকরাও আসবেন। এছাড়া "নারী মুক্তি ফ্রন্ট"-এর কাজও আমাদের প্রথম থেকেই গুর"ত্ব দিয়ে শুর" করা উচিত।

এর বাইরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে "আদিবাসী মুক্তি ফ্রন্ট", এলাকাভেদে "জেলে মুক্তি ফ্রন্ট", "তাঁতি মুক্তি ফ্রন্ট", সর্বত্রই "তর"ণ মুক্তি ফ্রন্ট"– ইত্যাদি গড়ে তোলা সম্ভব ও প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতে আরো বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার মানুষের অনেক ধরনের গণসংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

* সশস্ত্র অঞ্চলগুলোতে ক্ষমতার শূন্যতার প্রাথমিক অবস্থাতেই একটি বড় সমস্যা আকারে উপস্থিত হয় জনগণের মধ্যকার বিচার-শালিসীর সমস্যাবলী। জনগণ, বিশেষত সাধারণ কৃষকসহ ব্যাপক গরীব জনগণ রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা, থানা-পুলিশ ও প্রচলিত ব্যবস্থার গ্রাম্য বিচার-শালিসী দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত ও নিপীড়িত হন। এর মধ্য দিয়ে তারা অনেকে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তাই, তারা এ থেকে আশু মুক্তি চান।

– অঞ্চলে পার্টির বিকাশের সাথে সাথে জনগণ পার্টির কাছে তাদের অভাব-অভিযোগ ব্যাপকভাবে নিয়ে আসেন। এটা পার্টি ও বিপ্লবের প্রতি জনগণের আস্থারই প্রকাশ। এটা কোন খারাপ বিষয় নয়। কিন্তু খারাপ হলো এ ধরনের বিচার-আচারের কাজে পার্টি ও বাহিনীর যুক্ত হয়ে পড়া। এর ফলে গ্রাম্য মাতবরদের শূন্য স্থানগুলো

পার্টি ও বাহিনীর হাতে চলে আসে এবং পার্টি ধীরে ধীরে বিপ্লবের মূল কাজের বদলে বিচার-আচারে জড়িয়ে পড়ে, তাদের মাঝে সংস্কারবাদী অধপতন হতে থাকে, এবং ক্রমান্বয়ে তা নৈতিক অধপতনের দিকে ধাবিত হয়। এর প্রচুর দৃষ্টান্ড় রয়েছে। সুতরাং, একদিকে পার্টি ও বাহিনীকে এই ধরনের বিচার-আচার থেকে বাইরে রাখা, অন্যদিকে জনগণের জন্য ধাপে ধাপে সুবিচারের ব্যবস্থার সৃষ্টি করা– এটা রাষ্ট্রের থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাচারীর বিপরীতে এবং গ্রাম্য দুর্নীতিবাজ শালিসী ব্যবস্থার বিপরীতে জনকল্যাণমূলক বিপ্লবী সংস্কারকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিপ্লবী কর্মসূচির অংশ। তাই, পার্টির উচিত এর একটা সঠিক মীমাংসা করা। সেজন্য সৎ ও পার্টি-সমর্থক মাতবরদের নিয়ে, এবং পরবর্তীতে জনগণের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে "বিচার কমিটি" গঠনের একটা পদ্ধতি পার্টি অনুসরণ করে, যাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এটাও এক ধরনের গণসংগঠন, যাকে পার্টির পরিচালনা করতে হবে, যতদিন না আমরা বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা হিসেবে "বিপ্লবী কমিটি" প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কারণ, সে ধরনের সংস্থাই পারবে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ও সনাতন দুর্নীতিবাজ বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ক'রে একটি বিপ্লবী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

* আমাদের এই গণসংগঠনগুলো যেহেতু সশস্ত্র অঞ্চলগুলোতে সশস্ত্র সংগ্রাম বিকাশের প্রক্রিয়াতে গড়ে উঠবে, এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ও গণক্ষমতা গড়ে উঠছে রণনৈতিক অঞ্চলগুলোকে ভিত্তি ক'রে, তাই, এ ধরনের গণসংগঠন গড়ে উঠবে মূলত নিচ থেকে। উপর থেকে বা জাতীয়ভিত্তিক নয়। অবশ্য সমস্ড় অঞ্চলেই আমরা এক নামেই এই সংগঠনগুলো গড়ে তুলবো, এবং তাদের কিছু সাধারণ কর্মসূচি ও গঠনপ্রক্রিয়াও থাকবে। তবে প্রতিটি অঞ্চলে এলাকাগুলোর বিশেষত্ব অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ কর্মসূচিও সেখানকার গণসংগঠনগুলোর থাকবে।

অঞ্চল অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ গণসংগঠন গুর"ত্ব পাবে, যেমন হাওর-চরাঞ্চলে জেলে সংগঠনের বিশেষ গুর"ত্ব থাকবে, যখন কিনা অন্যত্র তা ততটা গুর"ত্ব ধারণ করবে না। প্রতিটি সংগঠন নিজ নিজ এলাকাভিত্তিক কিছু সাংগঠনিক নীতি/পদ্ধতি গড়ে নেবে। একেবারে নিচে গ্রাম/পাড়া/ওয়ার্ড ভিত্তিক শাখা এবং কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যা কয়েকটি শাখা গঠিত হলে ইউনিয়ন/উপ-এলাকা কমিটি গড়ে তুলবে। পর্যায়ক্রমে উপজেলা/এলাকা কমিটি, জেলা/উপ-অঞ্চল কমিটি, এবং অঞ্চল কমিটি গড়ে উঠবে।

তবে সর্বদা এমন ছকেই যে সংগঠনের কাঠামোগুলো গড়ে উঠবে তা নয়। ইউনিয়ন বা উপজেলা সম্মেলন ক'রে আগে সংশ্লিষ্ট স্ড়রের কমিটি গঠন ক'রে পরে নিচে ও উপরের স্ড়রগুলোর দিকে যাওয়া যেতে পারে, পরিস্থিতি অনুযায়ী যা নির্ধারিত হবে।

* প্রথমে পার্টির সংগঠক/পরিচালক গণভিত্তি সম্পন্ন গ্রামে সচেতন ও অগ্রসর কৃষকদের বৈঠক আহ্বান ক'রে এ ধরনের সংগঠনের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য/কর্মসূচি/কর্মপদ্ধতি– এগুলো ব্যাখ্যা ক'রে সংগঠনের শাখা গঠন করতে পারেন। প্রথমে এ ধরনের সংগঠন

স্থায়ী রূপ পেতে চাইবে না। যেমন আমাদের পার্টি বা বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। ভাঙবে, গড়বে– এ প্রক্রিয়ায় এগুলো ধীরে ধীরে স্থায়ী রূপ পাবে।

উচ্চস্ড়রের কমরেড প্রথমে বিন্দু ভাঙবেন এবং নিজ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন এলাকার সংগঠকদেরকে শিখিয়ে দেবেন। কিছু পরে গণসংগঠনগুলোর নেতৃত্বরা নিজেরাই এগুলো গঠন করতে পারবেন।

* প্রথমে পার্টির নিজস্ব এলাকাগুলোতে এটা গঠিত হলেও বিকাশের প্রক্রিয়ায় ও কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের প্রক্রিয়ায় এগুলো আমাদের নিজ গ" ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী/দূরবর্তী এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়বে। এবং বিপরীতভাবে এসব সংগঠন থেকে বাহিনী/পার্টি গঠিত হবে। এভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে সমগ্র সাংগঠনিক কাজ বিকশিত হবে। পার্টি, বাহিনী ও যুক্তফ্রন্ট এগিয়ে চলবে।

* যেহেতু এই সংগঠনগুলো সরাসরি পার্টির নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত হবে এবং গণযুদ্ধকে সমর্থন-সহায়তা করবে, তাই, স্বভাবতই এগুলো সংগঠিত হবে গোপনে। তবে পার্টি ও বাহিনীর গোপনীয়তার সাথে এগুলোর গোপনীয়তার পার্থক্য রয়েছে। এগুলো ততটা কঠোর শৃংখলাবদ্ধ সংগঠন নয়, এবং অনেক বেশি গণচরিত্রসম্পন্ন। তাই, এ সংগঠনগুলো শুধু সক্রিয় শত্র" ছাড়া সবার কাছেই মূলত নিজ নামে গণভাবেই কাজ করবে।

* এই সব সংগঠন গণযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের জন্য কাজ করবে, গণক্ষমতার অংশ হিসেবে কাজ করবে, গণযুদ্ধের সমর্থন-সহায়তায় জনগণকে সংগঠিত করবে ও পরিচালনা করবে। তবে এগুলোকে জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন সমস্যা ও ইস্যুর উপর প্রকাশ্য-আধাপ্রকাশ্য গণসংগ্রাম সংগঠিত করায়ও অভ্যস্ড় হয়ে উঠতে হবে। সেসব ক্ষেত্রে নিজ নাম গোপন রেখে "কৃষক কমিটি", "নারী কমিটি", "ছাত্র কমিটি" "সংগ্রাম কমিটি", "বিদ্যুত/সার/পণ্যমূল্য... ... ...ইত্যাদি আন্দোলন কমিটি"– এ জাতীয় বিভিন্ন নাম ধারণ ক'রে আমাদের গণসংগঠনগুলোকে সমন্বিতভাবে এবং আরো ব্যাপক জনগণকে তাতে সামিল ক'রে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

* পরিশেষে বলা যায় যে, এ সংক্রাস্ড় আমাদের লাইনগত সমস্যা ও উপলব্ধির সমস্যাই এখনো প্রধান। একারণেই পুরনো অনুশীলনের ধারা থেকে আমরা এখনো বের হতে পারছি না। কিন্তু আমাদের অনুশীলনের পুনর্গঠন যদি না করা যায় তাহলে একটি নতুন ধরনের পার্টি ও বিপ্লবী সংগ্রাম, তথা সফল গণযুদ্ধ আমরা গড়তে পারবো না। তাই, সকল স্ড়রের কমরেডদেরকে এ বিষয়ে গভীর মনোযোগী ও অধ্যবসায়ী হয়ে নতুন অনুশীলনে মনোনিবেশ করতে হবে। ❑

(২)

গণযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অনুশীলনের কিছু সমস্যা সম্পর্কে

(২৫/০৮/২০০৯)

আমরা একটি সফল গণযুদ্ধ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত। এজন্য একটি বাহিনীও আমাদেরকে গড়ে তুলতে হচ্ছে।

মাওবাদী গণযুদ্ধ ও সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী গণবাহিনী গড়ার নীতিমালার সাথে আমরা সবাই তত্ত্বগতভাবে একমত হলেও বাস্ড়ব অনুশীলনে আমাদের অনেক দুর্বলতা ও বিচ্যুতি রয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের গুর"তর ত্র"টি-বিচ্যুতি হচ্ছে বললে ভুল হবে না। এসবই গণযুদ্ধ ও বাহিনী গড়ার কাজকে ক্ষতিগ্রস্ড় ও দুর্বল করে। সেজন্য এ সম্পর্কে ভাল আলোচনা প্রয়োজন, যাতে আমাদের প্রাথমিক ধরনের গেরিলা অঞ্চলগুলোতে আমরা আমাদের কাজের ত্র"টিগুলোকে কাটিয়ে তুলতে পারি এবং আমাদের কাজকে উন্নত করতে পারি।

বুর্জোয়া বাহিনী ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের সাথে আমাদের বাহিনী ও যুদ্ধের মৌলিক তফাৎটি হলো এই যে, আমাদেরগুলো হলো বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ ও রাজনীতি দ্বারা সজ্জিত ও পরিচালিত। আমাদের বাহিনী আমাদের সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত, কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য সে লড়াই করে, এবং আজকের পর্যায়ে আমাদের বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের নীতি-কৌশল দ্বারা চালিত হয়।

বুর্জোয়া বাহিনী হলো ভাড়াটিয়া বাহিনী। বিপরীতে আমাদের বাহিনী হলো নিপীড়িত জনগণের লড়াকু অংশের স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক বাহিনী। তাই, আমাদের বাহিনীতে গণতান্ত্রিক রীতি একটি অপরিহার্য বিষয়, যা ছাড়া নিপীড়িত জনগণের মধ্য থেকে বিপ্লবী বাহিনী গড়ে উঠতে, টিকে থাকতে ও বিকশিত হতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দায়িত্বশীল কমরেডদের পক্ষ থেকে নিম্নস্ড়রের গেরিলা ও কমরেডদের সাথে অনেক সময়ই আমলাতান্ত্রিক আচরণ করা হয়। চলমান কাজগুলো নিয়ে কমরেডদের সাথে গণতান্ত্রিক পরামর্শ করা হয় না। গুর"ত্বপূর্ণ কাজগুলোর নীতিনির্ধারণ ও তা বাস্ড়বায়নের সমস্যাগুলো নিয়ে ভাল আলোচনা না ক'রে প্রায়ই ব্যক্তিকেন্দ্রীকভাবে ও উপস্থিতমতো সংগঠন ও কাজ পরিচালনা করা হয়। নিম্নস্ড়রের কমরেডগণ যদিও অনেকেই অনেক কাজ সম্পর্কে সমালোচনা পোষণ করেন; কিন্তু তারা বাহিনী-কমান্ডার বা পার্টি-পরিচালকদের সামনে অনেক সময় ভয়ে এসব কথা বলতে পারেন না। তারা উচ্চস্ড়রকে সমালোচনা করতে ভয় পান। কেউ কেউ একারণে ক্ষুব্ধও থাকেন। এটা মোটেই সর্বহারা বিপ্লবী বাহিনীর বৈশিষ্ট্য নয়।

বাহিনীতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুর"ত্ব দেয়া প্রয়োজন। যা অনেক সময়ই হয় না। বাহিনী সদস্যদেরকে দিয়ে শুধু চলতি কাজগুলো করানো হয় এবং তাদের সাথে বস্তুত ভালভাবে ও নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক আলোচনার পদ্ধতি গড়ে তোলা হয় না। উচ্চস্ড়রের ও অভিজ্ঞ কমরেডদের দায়িত্ব হলো নিম্নস্ড়র ও নবীন কমরেডদেরকে অবিরত ধমকাধমকি না ক'রে তাদের স্নেহশীল অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা, তাদেরকে যত্নের সাথে বিকশিত হতে সহায়তা করা। তাদের রাজনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করা। তাদেরকে বই-পত্র সরবরাহ করা। সাপ্তাহিক ও মাসিক আলোচনা/মানোন্নয়নমূলক বৈঠক পরিচালনা করা– ইত্যাদি।

কোন একটি কাজ, তা সামরিক বা সাংগঠনিক যা-ই হোক না কেন, করার আগে বাহিনী-সদস্যদের সাথে অবশ্যই খুব ভালভাবে আলোচনা করা উচিত। এটা প্রথমত কাজটিকে সফল করার জন্য প্রয়োজন। একইসাথে কাজের পূর্বে প্রস্ত'তি-আলোচনা, এবং কাজের পর সারসংকলনমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে নিচের কমরেডগণ লাইন ও প্রয়োগগতভাবে যোগ্য হয়ে ওঠেন। বাস্ড়ব কাজগুলোকে নতুন কমরেডদের প্রশিক্ষিত করার উপায় হিসেবেও দেখতে হবে; নিছক কাজটি যেনতেনভাবে উঠে গেলেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

সামরিক কাজের আগে অনুসন্ধান, পরিকল্পনা, দায়িত্ব-বণ্টন; কাজের পর সারসংকলন– এগুলো একটি নিগেদ (নিয়মিত গেরিলা দল)/ইউনিট পরিচালনার খুবই মৌলিক পদ্ধতি। এগুলো অনেক সময়ই ভালভাবে করা হয় না। এমনকি কর্মী-গেরিলাদের সাথে কাজটি সম্পর্কে ভাল পূর্ব-আলোচনা ও ধারণাও দেয়া হয় না। এর ফলে আমাদের বাহিনী কোনভাবেই তার যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়াতে পারবে না। এমনকি নির্দিষ্ট কাজে ভয়াবহ বিপর্যয় পর্যন্ড় ঘটতে পারে।

আমরা নিশ্চয়ই পার্টি ও বাহিনীতে নিরংকুশ সমানাধিকারকে বিরোধিতা করি। কারণ, কাজের শ্রমবিভাগ রয়েছে, এবং স্ড়রগতভাবে কাজের বৈশিষ্ট্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এগুলো অনিবার্যভাবে কমরেডদের সুযোগ-সুবিধার মাঝে যে পার্থক্য করে তাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কিন্তু নীতিগতভাবে কমান্ডার/পরিচালক ও নিম্নস্ড়র/গেরিলাদের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার মাঝে বড় ব্যবধান থাকা উচিত নয়। অনিবার্য ব্যবধানগুলো পার্টির কমিটিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারণ করা উচিত এবং উচ্চস্ড়রের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ড় দ্বারা সেগুলো কার্যকর করা উচিত নয়। বিশেষত উচ্চস্ড়রের কমরেডদের দায়িত্ব হলো সাধারণ জীবন-যাপনে, সক্রিয়তা ও পরিশ্রমে, স্বার্থত্যাগ ও সাহসিকতায়, অন্যের প্রতি যত্নশীলতায় নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা। তাদের দায়িত্ব হলো নিম্নস্ড়রের গেরিলা ও কমরেডদের বৈষয়িক সমস্যাগুলোর খোঁজ-খবর নেয়া, শারীরিক সমস্যা ও চিকিৎসাদির প্রতি যত্ন নেয়া, যাদের পরিবার রয়েছে তাদের বিষয়ে দায়িত্বশীল হওয়া। এগুলো অনেক সময়ই আমাদের উচ্চস্ড়রের কমরেডগণ ভালভাবে করেন না।

* গেরিলা যুদ্ধের নীতি-কৌশলে আমাদের বাহিনীকে খুবই গুর"ত্ব দিয়ে সজ্জিত করতে হবে। নতুবা আমরা গণযুদ্ধের বর্তমান রূপ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবো

না এবং আমরা গণযুদ্ধকে বিকশিত করতে ব্যর্থ হবো। গেরিলা বাহিনীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার চলমানতা। একটি ক্ষুদ্র জায়গায় আটকে থাকলে শত্রুর আক্রমণে বাহিনীর বিপর্যয় অনিবার্য। বাহিনীকে প্রতিদিনই ৫/১০/১৫ মাইল নাইট-মার্চ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেখানে দিনে থাকলাম, সেখানেই রাতে খেলাম এবং সেখানেই ঘুমালাম– এই অভ্যাস গেরিলা বাহিনীর জন্য মৃত্যুদূত স্বরূপ। তাকে প্রতিদিন জায়গা বদল করতে হবে, প্রতিদিন অনেক দূর মার্চ করতে হবে, বিশেষত আমাদের দেশে চরম-দুর্গমতার অভাব, যাতায়াত (রাস্ড়া-ঘাট ও পরিবহন) ও যোগাযোগের (ফোন/মোবাইল) উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে এর গুরুত্ব খুবই বেশি। বাহিনীর চলমানতা আমাদের কাজকে, গণযুদ্ধকে বিস্ড়ৃত করার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজন। এর অভাবে আমাদের কাজ ক্ষুদ্র গ িতে আটকে পড়তে বাধ্য।

নাইট-মার্চের জন্য বাহিনীকে সামরিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে হবে, যা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আয়ত্ব করতে হবে ও উন্নত করতে হবে। নাইট-মার্চ ভালভাবে না শিখলে ভাল গেরিলা বাহিনী হতে পারে না। নাইট-মার্চের কালে বাহিনী-সদস্যকে তার বাহিনী-ব্যাগসহ যাবতীয় দ্রব্যাদি দ্বারা সঠিকভাবে সজ্জিত থাকতে হবে। এ বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। একটি টর্চ থাকা, পানির বোতল থাকা, একটি ছুরি থাকা, মোবাইল বহনের সঠিক ব্যবস্থা থাকা– এগুলো অনেক কিছুতেই আমাদের বাহিনী-সদস্যগণ সচেতন নন। বিশেষত এখন নতুন কৃষক সদস্যগণ, নবীন রাজনৈতিক কর্মীগণ বাহিনী-কর্মকা ে যখন যুক্ত হচ্ছেন তখন তাদেরকে নিম্নতম সামরিক প্রশিক্ষিত করার উপর প্রথমেই জোর দিতে হবে। তার পরই তাকে অস্ত্র-বহন বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। অস্ত্র চালাতে ভালভাবে না জানলে তার হাতে অস্ত্র দেবার অর্থ হলো বাহিনীকে বিপদে ফেলা এবং অস্ত্রটিও খোয়ানো।

– বাহিনীর চলমানতার মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আমাদের যুদ্ধকে বিকশিত করার অন্যতম প্রধান উপায় তাহলো আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্যকে আয়ত্ব করা। কিছু কমরেডের মাঝে এমন কিছু ধারণা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে যে, বাধ্য না হলে এবং ঘাড়ের উপর চেপে না বসলে আমরা কোন সামরিক এ্যাকশনে যাবো না। এটা খুবই খারাপভাবে আত্মরক্ষাবাদী চেতনায় আমাদের সকল স্ড়রকে কলুষিত করতে পারে।

গেরিলা যুদ্ধ আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন না হলে তা বিকশিত হতে পারে না। শত্রুর এলাকায় আগবাড়িয়ে গিয়ে তাকে আক্রমণ না করলে যুদ্ধটা প্রতিরোধাত্মক লাইনের ভুলে আটকে যাবে। শত্রুর এলাকায় তাকে স্ড়ম্ভিত ক'রে দিয়ে তার উপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে তার নির্ধারক ক্ষতি করা ব্যতীত গণযুদ্ধ বিকশিত হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে লড়াইটা হবে দ্রুত নিষ্পত্তির। ব্যাপক অনুসন্ধান ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে জেতার নিশ্চয়তা সহকারে সাহসের সাথে আক্রমণে যেতে হবে। এতে উদ্যোগ আমাদের হাতে থাকবে। এটা শত্রুকে আমাদের নিয়মবিধি বুঝতে ব্যর্থ করে দেবে। তাদের পরিকল্পনাকেও তছনছ ক'রে দেবে। নতুবা শত্রুই আমাদের নিয়মবিধি বুঝে ফেলতে সক্ষম হবে এবং সহজেই আমাদের ধ্বংস করে দেবে।

– আমাদের গণযুদ্ধের বিকাশে একটি বড় সমস্যা হলো খতম লাইনের

নেতিবাচক/দুর্বল দিকের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংস্কারবাদকে সংগ্রাম করতে গিয়ে শুধু রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমণের আশায় বসে থেকে অন্যান্য বহুবিধ ধরনের সামরিক এ্যাকশন থেকে বিরত থাকা। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমণের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র ক্যাম্প/ফাঁড়ি এ ধরনের টার্গেটকে গুরুত্ব দেয়ার ভুল চিন্ড়া আমাদের মাঝে রয়েছে। যদিও এর অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু এগুলো সহজসাধ্য নয় বলে অন্যবিধ সামরিক এ্যাকশনে মনোযোগ না দেয়াতে বাস্ড়বে সামরিক কাজে এক ধরনের স্থবিরতা নেমে আসে। অন্যদিকে ছোট ছোট বহুবিধ সামরিক এ্যাকশন ও সামরিক অভিযানের পাশাপাশি আপাত অসাধ্য শত্রুর আরো বৃহত্তর ঘাঁটিতে আক্রমণের চিন্ড়াকেও আমাদের অবশ্যই সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। যেক্ষেত্রেও আমাদের অনুশীলনে সাহসী চিন্ড়ার অভাব রয়েছে।

সেজন্য সামরিক এ্যাকশনের বহু বৈচিত্র সম্পর্কে লাইনগতভাবে স্বচ্ছ হওয়াটা জরুরী। রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রীয় বাহিনী এক নয়, যদিও বাহিনী হলো রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান। বাহিনী ছাড়াও রাষ্ট্রযন্ত্রের আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর সামরিক আক্রমণ গণযুদ্ধ বিকাশে খুব জরুরী। যেমন জরুরী শাসকশ্রেণির বিবিধ স্বার্থানুগ প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা করা। যার মাঝে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানই পড়তে পারে। অন্যদিকে প্রভাবিত এলাকায় সংস্কারবাদী ধারার খতম যথাসম্ভব পরিহারের পাশাপাশি হারানো/বিপর্যস্ড় এলাকায়, অথবা নতুনতর এলাকায় নির্ধারক খতমকে গুরুত্ব দিতে হবে।

– বাহিনীর চলমানতা, শত্রুর এলাকায় আগবাড়িয়ে গিয়ে আক্রমণাত্মক এ্যাকশন ও এ্যাকশনের বহুবিধ রূপকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করলে বিস্ড়ৃত এলাকাগুলো থেকে পর্যাপ্ত গেরিলাও বেরিয়ে আসবে। তারা অনেকে প্রথমে স্থায়ী না হলেও অস্থায়ীভাবে তাদেরকে নিগেদে নিতে হবে। এভাবে বাহিনীর বিকাশকে দ্রুততর করা যাবে।

* সবমিলিয়ে আমাদের বাহিনী ও গণযুদ্ধ-তৎপরতাকে গুরুতরভাবে পুনর্গঠন করাটা আজ জরুরী। সঠিক রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং সামরিক লাইনের উচ্চতর বিকাশকে আয়ত্ব করার উপর আমাদের খুবই জোর দিতে হবে। তাহলে আমরা বাহিনীকেও বিকশিত করতে পারবো, গণযুদ্ধকে বিস্ড়ৃত ও শক্তিশালী করতে পারবো। ❑

(৩)

পুনরায় "লাল বই" অধ্যয়নের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তুলুন

(১০ মার্চ, ২০১০)

মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা-পর্বে সারা বিশ্বের মত আমাদের দেশেও মাও সেতুঙের "লাল বই" অধ্যয়নের একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই লাল বইগুলোর মাঝে প্রধানতম ছিল মাও সেতুঙের উদ্ধৃতি, পাঁচটি প্রবন্ধ এবং গণযুদ্ধ সম্পর্কে। তবে এর বাইরেও আরো "লাল বই" ছিল, যেগুলো-ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেগুলোর মাঝে ছিল পাঁচটি দার্শনিক প্রবন্ধ এবং ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ। বাস্তবে এই লাল বই অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই লক্ষ লক্ষ তরুণ সেসময় মার্কসবাদ, তথা মাওবাদে দীক্ষিত হয়েছিল।

লাল বই অধ্যয়ন মাও-এর আরো অনেক মূল্যবান রচনা অধ্যয়নের গুরুত্বকে বাতিল করে না; মার্কস, লেনিনের রচনার অধ্যয়নকেও সীমিত করতে বলে না। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে সেরকম কিছু কিছু সমস্যা ঐসময়ে ও পরে মাওবাদী আন্দোলনের মধ্যে দেখা গেছে। বাস্তবে লাল বই মার্কসবাদের বিরাটাকারের জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশের ক্ষেত্রে একজন নবীন বিপ্লবীকে পথ দেখায়। বিশেষত তা প্রত্যক্ষ বিপ্লবী অনুশীলনের মৌলিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সমস্যাবলীতে ব্যাপকতম শ্রমিক, কৃষক ও তরুণ বিপ্লবীদেরকে সহজভাবে দিক নির্দেশনা দেয়।

দুঃখজনকভাবে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংকট ও বহুবিধ তাত্ত্বিক সমস্যার ভিড়ে পার্টির সর্বস্তরেই লাল বই অধ্যয়নের অভ্যাস গুরুতরভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর অর্থ এমন নয় যে, কমরেডগণ লাল বই-এর চেয়ে উচ্চতর ও জটিলতর মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন ও আত্মস্থকরণে এখন বেশি অগ্রগামী হয়েছেন। বাস্তবে মৌলিক মার্কসবাদ অধ্যয়নে বিশেষ ঘাটতিই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যখন কিনা তা আরো বেশি করে এখন প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞ কমরেডগণ বহু আগে লাল বই পড়েছেন, এখন আর তার অধ্যয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন না। আর নবীন কমরেডগণ লাল বই অধ্যয়নের আন্দোলনকে দেখেননি, সিনিয়র কমরেডগণ অনেকক্ষেত্রেই তাদেরকে সেভাবে গাইডও করেন না। তার মানে এমন নয় যে, লাল বই আমাদের কমরেডগণ একেবারে ভুলে গেছেন। তার শিক্ষা রয়েছে বটে, কিন্তু যেভাবে থাকা উচিত সেভাবে তা নেই।

আমাদের মত দেশে বিপ্লবী অনুশীলন, বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনা করার মাঝে মার্কসবাদী মতাদর্শগত-রাজনৈতিক শিক্ষা এবং সামরিক নীতি-কৌশলকে ব্যাপক স্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য লাল বই-এর অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক। বিশেষত যখন আমাদেরকে প্রায় নতুন করে নতুন প্রজন্মের বিপ্লবীদের নিয়ে নতুন ধরনের মাওবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হচ্ছে, তখন ব্যাপক নিচু সারির কেডার ও নেতৃত্বদেরকে শিক্ষিত করার জন্য

এর চেয়ে উপযোগী আর কিছু নেই। আর সেজন্য উঁচু সারির পুরনো কমরেডদেরও পুনরায় তা অধ্যয়নে নিতে হবে।

লাল বই অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের চেয়ে বর্তমানে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে। এই লালবইগুলো সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উন্মেষকালে। তাই, মাও সেতুঙের উদ্ধৃতিকে তার শেষ জীবনের উদ্ধৃতি সহকারে আরো সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। আবার লাল বই-এর উদ্ধৃতির বিশেষ প্রয়োজনীয় অধ্যায়গুলোকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যা এখন আমাদের বেশি প্রয়োজন। গণযুদ্ধ সংক্রান্ত উদ্ধৃতিকে আরো ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, প্রয়োজনও। সিনিয়র কমরেডগণ নিশ্চয়ই এসব ব্যাপারে গাইড করবেন।

মাও সেতুঙের পাঁচটি প্রবন্ধ খুবই গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়নের দাবি রাখে। বিশেষত প্রথম তিনটি প্রবন্ধ, যেসবের তাৎপর্য আমাদের বহু কমরেড অনেকটা বিস্মৃত হয়ে গেছেন। অথবা সেসবের অনুশীলনকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরেন না।

উঁচু ও মধ্যসারির কমরেডদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পাঁচটি দার্শনিক প্রবন্ধ ও ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ বার বার ও বহুবার অধ্যয়ন করতে হবে। গণযুদ্ধের ভাল নেতৃত্ব হতে হলে মাও-এর এই উচ্চতর সামরিক প্রবন্ধগুলোর মৌলিক জ্ঞান ধারণ করতে হবে। এবং তাকে সৃজনশীলভাবে আমাদের দেশের জন্য উপযোগীভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে দার্শনিক প্রশ্নে বিশেষত জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়ে, সঠিক জ্ঞান কীভাবে আসে সে বিষয়ে, অনুশীলনের গুরুত্বকে বোঝার জন্য দর্শনের লাল বই-টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দর্শনের প্রশ্নে লাল বই-এর সাথে মাও-এর শেষ জীবনের, অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব-পূর্ব ও বিপ্লব-কালের গুণগত নতুন অবদানকেও অবশ্য আয়ত্ত করতে হবে। তেমনিভাবে চীন-বিপ্লবকালে লিখিত সামরিক প্রবন্ধগুলোর পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়ে বিশ্ব ও দেশীয় বাস্তব পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন এবং বিপ্লবী ও অন্যান্য যুদ্ধের অনেক নতুনতর অভিজ্ঞতার সারসংকলনের ভিত্তিতে আনীত নতুন সামরিক নীতি-পদ্ধতিগুলোকেও আয়ত্ব করতে হবে। যেক্ষেত্রে পেরু ও নেপাল-গণযুদ্ধের উচ্চতর অভিজ্ঞতার খুবই মূল্য রয়েছে। কিন্তু এসব কারণে মাও-এর লাল বই-এর সামরিক ও দার্শনিক বনিয়াদী রচনাগুলোর অধ্যয়নকে দুর্বল করা যাবে না।

উদ্ধৃতি ও পাঁচটি প্রবন্ধ সকল স্তরের কেডারদের কাছেই একসেট করে থাকা উচিত। আর দার্শনিক প্রবন্ধ ও সামরিক প্রবন্ধের বই দুটো নেতৃত্বদের হাতের কাছেই রাখতে হবে, যাতে তারা মাঝে মাঝেই অন্য কাজের ফাঁকে, অন্যান্য অধ্যয়নের মধ্যে এ দুটোকে প্রায়ই জায়গায় জায়গায় অধ্যয়ন করতে পারেন। অবশ্য যারা একবারও ভাল করে এই মহামূল্যবান বই দুটোকে আদ্যপান্ত এখনও পড়ে উঠতে পারেননি, তাদের জন্য সে কাজটি সম্পন্ন করাই হলো প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এগুলো কমরেডদেরকে করতে হবে নিজেদের লাল চরিত্রকে বিকশিত করার জন্য, যার অনেক ঘাটতি নতুন আন্দোলনে রয়েছে। সেটা পুরনো কমরেডদের মাঝেও রয়ে গেছে বা নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে, আর নবীন কমরেডদের মধ্যেও তা রয়েছে। একইসাথে

এগুলো অধ্যয়ন করা প্রয়োজন মৌলিক মার্কসবাদ শেখার জন্য। বিশেষত একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবীর মতাদর্শগত অবস্থান, চিন্তার পদ্ধতি ও যুদ্ধের তত্ত্বকে বিস্তৃতভাবে শেখার জন্য।

সকল শাখা লাল বই অধ্যয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নিলে ও তাকে অব্যাহত রাখলে আমাদের অনেক মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে আসবে। ❑

(৪)

আমাদের কমরেডদের মৃত্যু এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত সংঘাত

(ফেব্রুয়ারি, ২০১২)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের ও আন্দোলনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমরেড মৃত্যুবরণ করেছেন। এরা বেশিরভাগই প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হন। কারও ক্ষেত্রে বয়সজনিত সমস্যাবলীও কিছুটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। ২০09 সালে কমরেড সুলতান ও কমরেড বশীর মারা যান। ২০১০ সালে কমরেড নুরুলদীন মৃত্যুকে এড়াতে পারলেও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। ২০১১ সালে কমরেড ওদুদ ও কমরেড আজিজ মারা যান। এরা ছাড়াও আরো কিছু কমরেড প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হন; তবে চিকিৎসায় তারা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেলেও গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে ছিলেন।

পার্টি তার সামর্থ্যের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সুচিকিৎসার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যেখানে সম্ভব পরিবার ও অন্যান্য সূত্রগুলোকেও কাজে লাগিয়েছে। উপরে উল্লিখিত সকলেই পার্টির খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে তাদের হারানোটা সবচেয়ে বড় আঘাত করেছে পার্টিকেই। এইসব কমরেডকে চিরতরে হারিয়ে বা তাদের কর্মক্ষমতাকে হারিয়ে পার্টি-নেতা ও কর্মীগণ একদিকে শোক ও বেদনায়, আবেগ ও বিষাদে নিমজ্জিত হয়েছেন। অন্যদিকে এই শূন্যতাগুলো পূরণের সুকঠিন কর্তব্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এই কঠিন সময়গুলোতেও এইসব মৃত্যু ও রোগাক্রমণের সূত্র ধরে আমাদের বন্ধুস্থানীয় কিছু মহল পার্টির সাথে দৃষ্টিভঙ্গিগত সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এমনকি এসব অবিপ্লবী অসর্বহারা মতাদর্শ কিছ কিছু পার্টির অভ্যন্তরেও প্রকাশ ঘটিয়েছে, যদিও তা সাময়িক ও স্বল্প পরিসরে। এসব প্রমাণ করে যে, মতাদর্শগত ও লাইনগত সংগ্রাম ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। বিশেষত যদি পার্টির জীবনে ব ।
বিপ্লব ও জনগণের সংগ্রামে কোন বড় নতুনত্ব আসে বা মোড় ঘোরার জায়গা আসে। তাই, আমাদের গুরুতর ক্ষতি ও সুগভীর বেদনা ও আবেগের মাঝেও আমাদেরকে মতাদর্শগত সংগ্রামে শিক্ষিত হতে হবে। সমগ্র পার্টিকেও অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলোর শিক্ষা থেকে সজ্জিত করতে হবে।

আমাদের মত একটি গোপন বিপ্লবী পার্টির সার্বক্ষণিক কমরেডগণ, বিশেষত নেতৃস্থানীয় কমরেডরা কোন সাধারণ জীবন যাপন করেন না। তাই, তাদের অসুখ-বিসুখ-চিকিৎসা, বিশেষত মৃত্যুর মত ঘটনাগুলোকেও সাধারণ ও সমাজের স্বাভাবিক

উপায়ে আমরা মোকাবেলা করতে পারি না। এটা যারা বোঝেন না বা চিন্ড্র করেন না তারা সাধারণভাবে বিপ্লবী পার্টির, আর বিশেষত আমাদের পার্টির বর্তমান অবস্থাগুলোকে অনুধাবন করেন না। এটা সোজাসুজি বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে দুর্বলতা ও বিচ্যুতির সাথে যুক্ত। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও সংশোধনবাদী ধারাগুলোর জীবনের সাথে একে মিলিয়ে দেখাটা খুবই সমস্যাসংকুল দৃষ্টিভঙ্গি। চিকিৎসা ভাল হলো না, অন্ড্রষ্টিক্রিয়া হলো না, পরিবার জানলো না, রাজনৈতিক তৎপরতা হলো না– এসব কথা-বার্তা বলাটা সহজ, কিন্তু করাটা তত সহজ নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই খুবই কঠিন। পার্টি এসব প্রশ্নেও বিপ্লবী রাজনীতি এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের মতাদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে বিবিধ লাইন-নীতির বিরাট বিকাশ ঘটিয়েছে। কার্যক্ষেত্রে সেসবের যথেষ্ট প্রয়োগও আমরা সম্প্রতি দেখতে পেয়েছি। এসবের অনেক অভিজ্ঞতা পার্টি ও আমাদের আন্দোলনের জীবনে নতুন। সেক্ষেত্রে ঝুঁকি ও সংকটের মুখে পার্টির কমরেডগণ খুব ভাল কাজ করেছেন। নিশ্চয়ই এসবকে আরো ভাল করার সুযোগ রয়েছে। তাই, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের তৎপরতাগুলোর পর তার ভাল পর্যালোচনা ও সারসংকলন অবশ্যই করতে হবে। পার্টির ভেতরকার ও বাইরের সমালোচনাগুলোকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে ও শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু সেটা এক জিনিষ, আর অশ্রেণি ও অবিপ্লবী চেতনা ও ধারা থেকে কথা বলে চলা, বা এই সুযোগেও পার্টিকে একহাত নেয়ার বদ অভ্যাস আরেক বিষয়।

চিকিৎসার বিষয়টাকে আমাদের দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে মিলিয়ে চিন্ড্র করতে হবে। অবশ্যই পার্টি ও বিপ্লবের গুর"ত্বপূর্ণ নেতৃত্বদের জীবন রক্ষার পৃথক গুর"ত্ব রয়েছে, এবং তাকে সাধারণ জনগণের স্ড়রে ফেলে আগানো উচিত নয়। কিন্তু এটাও সত্য যে, বুর্জোয়ারা বা উচ্চমধ্যবিত্তরা তাদের স্বাভাবিক জীবনে যেটুকু করতে পারে বা করে থাকে, সেটা জনগণের নেতৃত্ব হিসেবে বিপ্লবী পার্টি পারে না। আমরা সিঙ্গাপুরে গিয়ে বা দেশের এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারি না। এটা একদিকে বিপ্লবী চেতনার বিষয়, পাশাপাশি এটা গোপন বিপ্লবী পার্টির মতাদর্শিক ও কাজের ধারাকে বোঝার বিষয়। ভারতের মাওবাদীদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে, তাদের বিরাট আর্থিক ও অন্যান্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বহু কমরেড সেখানে ঘাঁটি এলাকায় সেরিব্রাল ম্যালেরিয়াতে মৃত্যুবরণ করেছেন, যার মাঝে কমরেড অনুরাধার মত গুর"ত্বপূর্ণ নারী-নেতৃত্বও রয়েছেন। এখানে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার সমস্যাকে বিশেষ বিবেচনায় রাখতেই হবে। আমাদের নেতৃত্বদেরকে আমরা গভীরভাবে ভালবাসি। কিন্তু এটা এক নির্মম সত্য যে, তাদের কারও জীবনকে বাঁচানোর জন্য বা শেষকৃত্যকে যথাযথ মর্যাদায় পরিচালনা করতে গিয়ে কোন বিপ্লবী পার্টি তার নির্ধারক ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিতে পারে না।

এর সাথে দেশের গণবিরোধী মুনাফালোভী প্রতিক্রিয়াশীল চিকিৎসা ব্যবস্থাকে গণ্য করতেই হবে। এটা বুঝতে না পারা বা মনে না রাখাটাও বিপ্লবী চেতনার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। প্রায় প্রতিদিন জাতীয় পত্রিকার পাতায় অপচিকিৎসা বা বিনা চিকিৎসায়

মৃত্যুর খবর আমরা পেয়ে থাকি। চিকিৎসা ব্যবস্থার এই জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, তা আমাদের কাউকে কখনো ছিনিয়ে নেবে না তা কী করে হতে পারে? এবং এজন্য এই ব্যবস্থাকে দোষারোপ না ক'রে আক্রান্ড় কমরেডের পাশে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে বা পার্টিকে দায়ী করার মনোভাব যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও না হয়, তাহলেও তাকে তো অন্ড়ত সমাজের পশ্চাদপদ চেতনা বলাটাই সঙ্গত হবে।

দেশের ব্যাপক জনগণ জটিল রোগে চিকিৎসা দূরের কথা, সাধারণ রোগ-ব্যাধিতেও কী ভয়াবহ ভোগান্ড়ি পোহান তা-কি আমাদের দেখতে হবে না? তার চেয়ে পার্টির কেডার ও নেতৃত্বগণ বরং তুলনামূলক ভাল সুযোগই পান। কারণ, সংগঠনের যে শক্তি– তার লোকবল, তার জ্ঞানের ও তথ্যের সুবিধা এবং তার অর্থও বটে– সবই একজন বিচ্ছিন্ন গরীব বা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ পান না। পার্টির কেডারদেরকে সবচেয়ে সাধারণ মানুষের খারাপ অবস্থাটার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। তারা ক্ষুধায় সর্বদা খাদ্য পাবেন না, তারা শীতে কাপড় পাবেন না, বর্ষা ও গরমে স্বস্ড়ি পাবেন না, সংকটে আশ্রয় পাবেন না, অসুস্থতায় চিকিৎসা পাবেন না, এমনকি চরম অসুস্থতা বা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ড়ে ঘনিষ্ঠ বা আপন কোন জনের শুশ্রূষা পাবেন না– এ সবের জন্যই একজন বিপ্লবীকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

মৃত কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, শেষ কৃত্য, স্মরণ– এসব ভালভাবে করতে পারা না পারাটা যেমন একটি বিপ্লবী পার্টির লাইন, নীতি ও আত্মগত পরিস্থিতির সাথে যুক্ত, তেমনি বাস্ড়ব পরিস্থিতির অনেক বিষয়ের সাথেও জড়িত। একজন কমরেডকে বড় আয়োজনে শেষ বিদায় জানানো আমাদের রাজনৈতিক কাজেরই অংশ বটে। সেটাই আমরা চাই। কিন্তু অনুষ্ঠানের ব্যাপকতাই তার বড়ত্বের মাপকাঠি নয়। বিপ্লবী পার্টি অবশ্যই তার একজন কর্মীকে, বিশেষত গুর"ত্বপূর্ণ নেতাকে যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ করবে। কিন্তু সেটাও কতটুকু হবে না হবে তা অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। আমরা যেসব কমরেডকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বড় আয়োজন করতে পেরেছি সেগুলোও তাদের কর্মের অতি ক্ষুদ্র স্বীকৃতি মাত্র। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেটুকুও করতে পারি না উপরে আলোচিত বহুবিধ কারণে। এ সমাজ ব্যবস্থা যতদিন রয়েছে ততদিন আমরা এইসব আনুষ্ঠানিকতা খুব কমই করতে পারবো। প্রয়াত কমরেডগণ বেঁচে থাকেন তাদের প্রিয় পার্টি ও তার কর্মতৎপরতার মাঝে। কমরেড সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর প্রথম দিকে পার্টি তাঁর স্মরণে তেমন কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বলে তিনি ছোট ছিলেন না। জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী রোজা লুক্সেমবার্গকে হত্যা করে তার লাশ খালে ফেলে রেখেছিল বিপ্লবের শত্র"রা। কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারেনি, বা তার শেষকৃত্য করা যায়নি। তাই বলে তিনি কোন সাধারণ বিপ্লবী ছিলেন না।

তাই আমাদের কমরেডদেরকে, এবং সকল নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরকে মৃত্যু, শেষকৃত্য, স্মরণ– এসব প্রশ্নেও সম্পূর্ণ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। প্রকৃত বিপ্লবী মৃত্যুর পর একটা বড় স্মরণ সভার আশা করে কাজ করেন না। তার কাজ হতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। এবং পরবর্তীকালের বিপ্লবীদের দায়িত্ব হলো বিপ্লবী রাজনীতির

স্বার্থে এই সব ত্যাগী বিপ্লবীদের স্মরণ করা, তাদের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তরে, কোন ব্যক্তি চর্চার জন্য নয়।

যারা পার্টিকে যেকোন সুযোগে বিরোধিতা করতে চায় তারা সেটা করবেই। বিপ্লবী পার্টির দায়িত্ব হলো তাকে সংগ্রাম করা আমাদের শ্রেণি লাইনে ও আমাদের বিপ্লবী রাজনীতি ও আমাদের বিপ্লবী পার্টির বিশেষ পরিস্থিতির ভিত্তিতে। একইসাথে এই সংগ্রামের পাশাপাশি যার সাথে যেখানে যতটুকু ঐক্য সম্ভব তার জন্যও কাজ করা। কারণ, পার্টির নিন্দা বা সমালোচনা শুনতে পারার সক্ষমতা অর্জনও যোগ্য বিপ্লবীদের জন্য প্রয়োজন।

গুর“তরভাবে অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী, শারীরিকভাবে বিপর্যস্ড় এবং তারই ফলশ্র“তিতে মানসিকভাবে পূর্ণ সক্ষম নন এমন কোন কমরেডের বিক্ষিপ্ত কোন কথাকে ব্যবহার ক'রে বা তেমন কোন কথাকে প্রেক্ষাপটহীনভাবে তুলে ধরে পার্টি-বিরোধিতার খারাপ দৃষ্টান্ড়ও আমরা দেখছি। মাও-এর মৃত্যুর পর সংশোধনবাদী তেং-হুয়া চক্র মাও-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রাজনীতির প্রসঙ্গ না তুলে একটি কথা বাজারে ছেড়েছিল– মাও নাকি মৃত্যুর আগে হুয়া কুয়ো ফেঙ-কে পার্টি-চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে বলে বলেছিলেন যে, "আপনি দায়িত্বে থাকলে আমি স্বস্ড়িতে থাকি"। এর মধ্য দিয়ে তারা সত্যিকারের মাওবাদীদেরকে উচ্ছেদ ও বিরোধিতা এবং নিজেদের সংশোধনবাদী ক্ষমতাকে ন্যায্য করতে চেয়েছিল। আমাদের প্রয়াত কমরেডদের রাজনৈতিক জীবনই তাদের রাজনৈতিক অবস্থান ও সেরা বক্তব্য। রাজনৈতিক জীবনে তাদেরকে ও পার্টিকে যারা পদে পদে বিরোধিতা করতে সক্রিয় ছিলেন, তাদের মুখে প্রয়াত কমরেডদের কোন কথা পার্টির বিপক্ষে ব্যবহার করতে দেখলে সেই তেং-হুয়ার সংশোধনবাদী কৌশলই আমাদের মনে পড়ে। পার্টির নেতারা পার্টিরই নেতা ছিলেন, তারা পার্টি-বিরোধী ছিলেন না। তারা বিপ্লব করেছেন পার্টির নেতৃত্বে, পার্টিকে আগলে রেখে, পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়ে– পার্টি না করে নয়। এসব সরল বিষয়কে আবার আমাদের কমরেডদের ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পার্টির সকল স্ড়রের নেতা ও কর্মীদেরকে তাই দুঃখভারাক্রান্ড় হৃদয়েও মতাদর্শগত সংগ্রামকে শিথিল করলে চলবে না। এবং আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের মহান আদর্শে আরো ভালভাবে সজ্জিত হয়ে শুধুমাত্র পার্টি, বিপ্লব ও জনগণের স্বার্থ চিন্ড়াকে মুখ্য ক'রে সকল প্রকার স্বার্থবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে– যেমনটা করেছেন কমরেড ওদুদসহ অন্য অনেক কমরেড। ❑

(৫)

মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন মহাবিতর্ক সকল প্রকৃত বিপ্লবীকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেই হবে

(জুন, ২০১২)

বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন বলতে বিগত ৫০ বছর ধরে মাওবাদী আন্দোলনকেই বোঝায়। গত শতাব্দীর ৫০-দশকে মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদে অধপতিত হয়। ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যায়। বাস্ড়বে র“শপন্থী নামে পরিচিত ক্রুশ্চভ-ব্রেজনেভের শিষ্যরা নামে কমিউনিস্ট পরিচয় দিলেও কাজে সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের বিপ্লবী আদর্শ ত্যাগ করেছিল এবং প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় নব্য পুঁজিবাদের ফেরীওয়ালায় পরিণত হয়েছিল। সে সময় থেকে মহান মাও-এর নেতৃত্বে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এগিয়ে চলে। মাও-এর মৃত্যুর পর বিশ্বের মাওবাদীরা '৮৪-সালে 'রিম' গঠন করেন। যদিও রিমের বাইরেও কিছু মাওবাদী বিপ্লবী পার্টি ও সংগঠন বিভিন্ন দেশে বিরাজ করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও রিম-ই হয়ে ওঠে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কেন্দ্র। আমাদের পার্টিও শুর“ থেকেই রিমের সদস্য হয় এবং দেশের পাশাপাশি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা রাখে। রিমের নেতৃত্বে বিশ্ব বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের দিকে এগিয়ে চলে। এ সময়ে রিম গঠন, রিমের নেতৃত্বে আন্ড়র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনের বিকাশ, পের“র গণযুদ্ধ, নেপালের গণযুদ্ধ, এবং বিশ্বব্যাপী অসংখ্য রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে এবং লাইনগত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলন এগিয়ে চলে।

কিন্তু সকল বস্তুর নিয়ম অনুসারে রিমের অভ্যন্ড়রেও দ্বন্দ্ব ছিল। বাস্ড়বে এই অভ্যন্ড়রীণ দ্বন্দ্বই সব বস্তুকে বিকশিত করে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনও তার সূচনা থেকেই এই ধরনের লাইনগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস উনবিংশ শতাব্দীতে যখন মার্কসবাদের ভিত্তি রচনা করেন, তখনও তাঁদেরকে বিবিধ অবিপ্লবী ও অসর্বহারা লাইনের বির“দ্ধে সংগ্রাম করেই তা করতে হয়েছিল। প্রথমে মার্কস ও পরে এঙ্গেলসের মৃত্যুর কিছু পরে ঐ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই মার্কসবাদী বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংস্কারবাদ ও জাতীয়তাবাদ জেঁকে বসতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুর“ থেকে মহান লেনিন মার্কসবাদের বিপ্লবী সারবস্তুকে উদ্ধার করতে কাজ শুর“ করেন এবং উপরোক্ত অসর্বহারা অবিপ্লবী ধারাগুলোর বির“দ্ধে তীব্র মতাদর্শগত

সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই মহাবিতর্কের মধ্য দিয়েই লেনিনবাদ গড়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯১৭ সালে মহান রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে প্রথমে লেনিন ও তার মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে। তাঁদের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঐক্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে ৩য় আন্তর্জাতিক। এবং বহু দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে এবং বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লব এগিয়ে চলে।

কিন্তু আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় পুঁজিবাদের পুনরুত্থান ঘটে। ফলে বিগত শতকের ৫০/৬০-এর দশকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন মহাবিতর্ক সৃষ্টি হয়। এবার কমিউনিজমের বিপ্লবী আদর্শ রক্ষা ও বিকশিত করেন মাও। গড়ে ওঠে মাওবাদ। যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নতুনতর বিকাশ। এই মহাবিতর্কে মাওবাদী মতবাদই কমিউনিজমকে রক্ষা করে। বহু দেশে মাওবাদী বিপ্লবী পার্টি ও সংগ্রাম গড়ে ওঠে। আমাদের দেশেও আমাদের পার্টি গড়ে ওঠে। বিপ্লবী সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

মাও-এর মৃত্যুর পর সমাজতান্ত্রিক চীনেও বিশ্বাসঘাতক তেং চক্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটে। ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আবার এক মহাবিতর্ক শুরু হয়। বিগত শতকের ৭০/৮০-এর দশকে এই মহাবিতর্কে আলবেনিয়ার হোক্সা বিপথে চালিত হয়ে মাওবাদকে আক্রমণ করে। কিন্তু এই মহাবিতর্কে কমিউনিজম হারিয়ে না গিয়ে বরং নব শক্তিতে বলিয়ান হয় এবং বিশ্ব জুড়ে মাওবাদী আন্দোলনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। রিম গঠিত হয়। রিমের নেতৃত্বে মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলন উচ্চতর উপলব্ধির শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিশ্ব জুড়ে বিকশিত হতে থাকে।

* কিন্তু যেমনটা বলা হয়েছে যে, রিমের মধ্যেও শুরু থেকেই অনেক দ্বন্দ্ব ছিল। কমিউনিজমের মতবাদ, তথা মালেমা'র উপলব্ধিতেই বিভিন্নতা ছিল। এই দ্বন্দ্বগুলোর কিছু বিষয় মীমাংসা হলেও অনেকগুলো বেড়ে উঠতে থাকে– বিশ্ব পরিস্থিতির বিকাশের সাথে সাথে, বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশের সাথে সাথে, সেই সাথে বিপ্লবী লাইনের বিকাশের পাশাপাশি। কমিউনিজমের বিপ্লবী ব্রতকে, বিপ্লবী ঐতিহ্যকে ধারণ করে তার বিকাশের বদলে কোন কোন অংশ আশ্রয় নিতে থাকে বুর্জোয়া মতবাদের বিবিধ রূপের কাছে। যেমন, আন্তর্জাতিকতাবাদের বদলে জাতীয়তাবাদে, বিপ্লবী রাজনীতির বদলে সংস্কারবাদে, সর্বহারা একনায়কত্বের বদলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে, বিপ্লবী আশাবাদের স্থলে হতাশাবাদে, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির বদলে ব্যক্তিতাবাদে, সুস্থ দুই লাইনের সংগ্রামের বদলে উপদলবাদ ও চক্রান্তে– ইত্যাদি। এ সবেরই কুফল আমরা দেখতে পাই পেরুতে গণযুদ্ধ, বিপ্লব ও পার্টির সামগ্রিক বিপর্যয়ে; পরে নেপালে বিপ্লবের ফলকে বুর্জোয়া সংসদীয়বাদের কাছে সমর্পণ করার মধ্যে।

এ সবকিছুকে কীভাবে দেখা হবে তা নিয়ে রিমের মধ্যে পূর্বতন দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা করতে না পেরে রিম কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বিগত ৫ বছরে বাস্তবে রিম বিবিধ ধারায় বিভক্ত হয়ে

পড়ে। যেকোন মহাবিতর্কে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবীদের দায়িত্ব তখন এসে যায় প্রকৃত বিপ্লবী ধারাটিকে এগিয়ে নেয়ার। অতীতে লেনিন, মাও ও মাওবাদী রিম যেটা করেছিলেন। এবং সেই সব মহাবিতর্কে সংশোধনবাদকে পরাস্ত করেছিলেন। সেটা করতে গিয়ে একদিকে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কমিউনিজমের আদর্শের সারবস্তুকে তারা আঁকড়ে ধরেছিলেন, আমাদের মহান অর্জনগুলোকে রক্ষা করেছিলেন। একইসাথে ক্ষয়-ক্ষতিগুলোর যে অভিজ্ঞতা, তার সারসংকলন করে আমাদের বিপ্লবের আদর্শকে উচ্চতর মাত্রায় বিকশিত করেছিলেন।

তাই, মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই মহাবিতর্কে সক্রিয় অংশ নেয়ার দায়িত্ব আমাদের পার্টির সকল স্তরকে কাঁধে তুলে নিতে হবে। লাইনগত মহাবিতর্কে নিষ্ক্রিয় থাকাটা সর্বদাই ভুল লাইনকে সেবা করে। শুধু আমাদের পার্টিই নয়, যারাই মাওবাদী আন্দোলনে জড়িত, যারাই কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী, তাদের সবাইকেই এই মহাবিতর্ককে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমরা বর্তমান এই সন্ধিক্ষণে আমাদের উপর দায়িত্ব পালন করতে পারবো।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্টি বহু আগে থেকেই এই মহাবিতর্কে জড়িয়ে রয়েছে। পেরু-পরিস্থিতিকে ঘিরে বিতর্কে আমরা অংশ নিয়েছি। একদিকে শান্তি-আলোচনার নামে বিপ্লব বর্জনের ডান লাইনকে আমরা সংগ্রাম করেছি। অন্যদিকে পেরু-পার্টির প্রতিনিধিত্ব ও গনজালো চিন্তাধারার পতাকাবাহক দাবিকারী এমপিপি'র ব্যানারে রিম-বিরোধী, লিন ও হোক্সাপন্থার অনুরূপ, পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিতাবাদী উপদলবাদী চক্রান্তকারী লাইনকেও সংগ্রাম করেছি। পরে নেপাল পরিস্থিতিতেও প্রচন্ড-ভট্টরাইয়ের সংশোধনবাদকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সংগ্রাম করে নেপালের প্রকৃত বিপ্লবীদের সহায়তা করার চেষ্টা করেছি।

এই সংগ্রামগুলোর তাৎপর্যকে সমগ্র পার্টির আরো গভীরভাবে আত্মস্থ করতে হবে। উপরোক্ত বুর্জোয়া-ক্ষুদে বুর্জোয়া লাইনগুলোর এদেশীয় ধারকদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। কিন্তু আরো যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, এই মহাবিতর্কে আরো গভীরতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিজমের আদর্শকে আরো এগিয়ে নেয়া। যে ভুলগুলোর কারণে রিমভুক্ত একাংশের উপরোক্ত অধপতন হলো, রিম বিভক্ত হলো– তার সারসংকলন করা, এবং আমাদের লাইন/মতবাদকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই কাজটা আবার নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করতে বাধ্য। তাই, সমগ্র বিতর্কগুলোকে এক সূত্রে গ্রথিত করে যে লাইনগত পর্যালোচনা-বিতর্ক-সংগ্রাম, তা কোন সহজ কাজ নয়। সেজন্য সুদীর্ঘ সময় লাগবে। গভীর দায়িত্বশীলতার সাথে বিপ্লবী কর্মী ও জনগণকে তাতে সজ্জিত করতে হবে ধাপে ধাপে। যা বাস্তব বিপ্লবী শ্রেণিসংগ্রামের সাথে, তথা আমাদের দেশে গণযুদ্ধকে রক্ষা করা ও বিকশিত করার সংগ্রামের সাথে সংযুক্তভাবে করতে হবে। তত্ত্বগত সংগ্রামকে যেমন শুধু বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রাম দিয়েই মোকাবিলা করা যাবে না, তত্ত্বগত-লাইনগত সংগ্রামের পৃথক গুরুত্বকে বুঝতে হবে। তেমনি বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে সংযুক্ত না করে শুধু তত্ত্বগত সংগ্রামের মাধ্যমেও সঠিক অবস্থানে

পৌঁছা যাবে না। বিগত দেড়শো বছরে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহাবিতর্কগুলো এবং দেশে ও বিশ্বের লাইনগত সংগ্রামগুলোর সকল ইতিহাস থেকে এ শিক্ষা প্রমাণিত।

প্রতিটি মহাবিতর্কে আমাদের লাইন ও মতবাদ এগিয়ে গেছে। বিশ্বের নতুনতর পরিস্থিতির বিপ্লবী মূল্যায়ন করতে আমাদেরকে সক্ষম করে তুলেছে। এবং বিশ্ব সর্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামকে উচ্চতর মানে উন্নীত করেছে। বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির প্রকৃত বিপ্লবী অগ্রযোদ্ধা হিসেবে বিপ্লবী কমিউনিস্টরা, তথা আজকের মাওবাদীরা সেটা করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার বিশ্ব ব্যবস্থা গভীর সংকটে রয়েছে। তারা শান্তিতে নেই। থাকতেও পারবে না। তাদের মতবাদ, রাজনীতি ও অর্থনীতি মৃতপ্রায়। একে পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ও ধ্বংস করতে পারে শুধু কমিউনিজমের বিপ্লবী মতবাদ। বিগত বিংশ শতকে বিশ্ব কমিউনিস্টরা তা করে দেখিয়েছেন। এ শতাব্দীতে তা হবে আরো উচ্চতর। নতুনতর বিজয়ের মধ্য দিয়ে তা অবশ্যই অর্জিত হবে।

কিন্তু পথটা জটিল। সেজন্য লড়াই ও সংগ্রাম করতে হবে। আদর্শ-বর্জিতদের বর্জন করে ও বিভ্রান্তদেরকে জয় করে অগ্রযোদ্ধা মাওবাদীরা অবশ্যই সেই দুর্গ দখল করবেন। ❑

(৬)

শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণি-অনুসন্ধানকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরুন !

(সেপ্টেম্বর, '১২)

আমাদের বাস্তব সাংগঠনিক কাজে শ্রেণি-লাইনের ক্ষেত্রে প্রায়ই সমস্যা দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত যারা গণযুদ্ধের অঞ্চলগুলোতে কাজ করেন তারা অনেক সময়ই সঠিকভাবে শ্রেণি বিশ্লেষণ করতে পারেন না। তারা কর্মী , জনগণ বা শত্রুতাকারীদের শ্রেণি-অনুসন্ধান করেন না; শ্রেণি অনুসন্ধানের গুরুত্ব তারা বোঝেন না। এক্ষেত্রে তাদের মানগত ঘাটতি ছাড়াও শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির বিচ্যুতিও কাজ করে। শহরাঞ্চলে যারা কাজ করেন, বিশেষত গণফ্রন্টে, তারাও অনেকে শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সর্বহারা চেতনার বদলে ক্ষুদে বুর্জোয়া চেতনা দ্বারা চালিত হন। ফলে আমাদের মূলশ্রেণী-ভিত্তিক সংগঠন ভালভাবে গড়ে উঠছে না। বিশেষ করে গণযুদ্ধের অঞ্চলে এ কারণে বিবিধ গুরুতর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সমস্যা বেড়ে উঠে।

বিগত ৫০ বছরে আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও শ্রেণি কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। জমিদারী উচ্ছেদ হওয়া, বিরাট বিরাট সামন্তবাদী ভূমি-মালিক জোতদারদের ব্যাপকভাবে রূপান্তর ঘটা, চাষের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিরাট অনুপ্রবেশ, এবং গ্রামাঞ্চলের জনগণের মাঝে বহু ধরনের চাষ-বহির্ভূত পেশার উদ্ভব ঘটেছে। ফলে সরলভাবে পূর্বের মত জমিদার ও কৃষক– এভাবে বহু সময়ই গ্রামের জনগণকে সহজে বিভক্ত করা যায় না। শ্রেণি-সম্পর্কে অনেক জটিল ও বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। এটা আমাদের কমরেডদেরকে শ্রেণি-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অসুবিধায় ফেলে। গ্রামের জনগণের একটা বড় অংশের শহুরে আয় ও কিছু কিছু অঞ্চলে বিদেশী টাকা এই জটিলতাকে আরো বাড়িয়ে ফেলেছে। এই জটিলতা বাস্তব, এবং আর্থ-সামাজিক ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনগুলোর সাথে এটা জড়িত। তাই, কমরেডদেরকে এবং বিশেষত নেতৃত্বগণকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলো এবং পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতিগুলোর উপর গভীর মনোযোগ দিতে হবে। এছাড়া সঠিকভাবে শ্রেণি বিশ্লেষণ করা যাবে না।

কিন্তু এটা ছাড়াও আমাদের কমরেডদের ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গির মতাদর্শগত বিচ্যুতিগুলোর কারণে শহর-গ্রাম সর্বত্রই আমাদের বাস্তব কাজে মূল শ্রেণিগত ভিত্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি হয়। শহরাঞ্চলে এই দৃষ্টিভঙ্গিগত বিচ্যুতিকে বোঝা তুলনামূলক সহজ। ইউনিভার্সিটি-কলেজ, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, প্রেসকাব, বইমেলা, ফেসবুক বিতর্ক, সেমিনার, তত্ত্বগত আলোচনা, জাতীয় রাজনীতির মিটিং-মিছিল– ইত্যাদির কাজ সহজেই আমাদের কমরেডদেরকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ততটা আকৃষ্ট করে না শ্রমিক অঞ্চল বা দরিদ্র এলাকাগুলোতে পড়ে থেকে শিল্প শ্রমিক, বিবিধ শ্রমজীবী, দরিদ্র পেশাজীবী, বস্তি

বাসী– এ জায়গাগুলোর কাজ। আর এটা না হলে সংগঠনের বিকাশ হবেই-বা কীভাবে? কারণ আমরা তো আর মধ্যবিত্ত-নির্ভর সংগঠন গড়ছি না। আমাদের রাজনীতি সেটা করতেও দেয় না। এখানে সর্বহারা শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে না ধরলে বাস্ড়ব সংগঠনের কাজের সমস্যাও কাটবে না।

গ্রামাঞ্চলে শ্রেণি-সংগঠন গড়ার বিষয়টা বেশ জটিল। আগেই বলা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণি-সম্পর্ক ও পেশার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। তাই সঠিকভাবে শ্রেণি অনুসন্ধান ও শ্রেণি-বিশ্লেষণের গুর"ত্ব অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এটা ঠিক যে, আর্থ-সামাজিক সুগভীর বিশ্লেষণ ও সে সম্পর্কে ভাল উপলব্ধির সাথে এটা জড়িত। কিন্তু খুবই সাধারণ দৃষ্টিতে মূল শ্রেণির জনগণকে চিনতে পারা ও আঁকড়ে ধরাটা সেরকম জটিল কোন কাজ নয়। আসলে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা ও বিচ্যুতির কারণে অনেক কমরেড মূল জনগণকে আঁকড়ে ধরেন না। বিশেষ করে গণযুদ্ধের অঞ্চলে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব তুলনামূলক বেশি হবার কারণে ব্যাপক অশ্রেণীর জনগণের মাঝেও আমাদের সমর্থন গড়ে ওঠে। এটা প্রয়োজনীয়, যা ফ্রন্টের কাজের সাথে যুক্ত। কিন্তু আমাদের সংগঠকগণ অনেকে মূল শ্রেণির মধ্যকার পার্টি-কাজের প্রাধান্যকে হারিয়ে ফেলেন এবং ক্রমে ঐসব অমূলশ্রেণীর সমর্থক-কর্মীদের মাঝেই আশ্রয় গাড়েন। এ সত্ত্বেও এই কমরেডগণ প্রচুর কষ্ট করেন সত্য। কিন্তু তাদের নির্ভর ও আশ্রয়, সখ্য ও কাজ ব্যাপকভাবে অমূল শ্রেণিতে চলে যায়। এইসব বিপুল অমূল শ্রেণির জনগণও আমাদের গুর"ত্বপূর্ণ শক্তি ও মিত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এরাই যদি আমাদের বেশি নিকট বন্ধু ও আসল আত্মীয় হয়ে যায় তাহলে আমরা মূল শ্রেণিভিত্তি হারিয়ে ফেলবো। এভাবে আমাদের কমরেডগণ কেউ কেউ ক্রমে অলস ও ভোগবাদী হয়ে ওঠেন, গ্রামের অশ্রেণী জনগণের সাথেই কার্যত একাত্ম হয়ে পড়েন, তাদেরই আসল বন্ধু হয়ে যান। আর মূল শ্রেণির কর্মীরা হয়ে পড়েন তাদের কাজের হাতিয়ার মাত্র। এভাবে সংগঠনে অধঃপতনের ভিত্তি সৃষ্টি হতে থাকে। এ সবের শুর" কিন্তু প্রায়ই অধঃপতনের মানসিকতা দিয়ে হয় না। তা শুর" হয় অশ্রেণী নির্ভরতা থেকে, যা আসে শ্রেণি-অনুসন্ধান ও শ্রেণি-বিশ্লেষণের দুর্বলতা ও বিচ্যুতি থেকে। এটা তাদের নিজেদের ক্ষুদে বুর্জোয়া চেতনাকে ক্রমে শক্তিশালী করে। বিপ্লবী রাজনীতি দুর্বল হয়ে যায়। মতাদর্শগত ত্র"টি বাড়তে থাকে। এবং শেষে যা কিনা সার্বিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক অধঃপতন ডেকে আনতে পারে।

তাই, প্রত্যেক সংগঠককে সংগঠনের কাজে শ্রেণি-অনুসন্ধান ও শ্রেণি-বিশ্লেষণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সঠিকভাবে শ্রেণি-বিশ্লেষণ করাটা খুব সহজ কাজ নয়। সেটা নেতৃত্ব ও সংগঠকগণকে অবিরত চর্চা করে আয়ত্ত করতে হবে। নিজেরা শিখতে হবে, কর্মী ও জনগণকে শেখাতে হবে। আমাদের পক্ষের এবং শত্র"তাকারী সবার ক্ষেত্রেই এটা প্রয়োগ করতে হবে। আশু কোন ইস্যুতে, বা কোন ব্যক্তিতাবাদী সম্পর্ক বা ইস্যুতে আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে– এই দিয়ে শত্র"-মিত্র ঠিক করা যাবে না। তা চূড়ান্ড়ভাবে করতে হবে শ্রেণি-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। ভূমিহীন-গরীব কৃষক, গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মজুর শ্রেণি, গ্রাম ও শহরের অন্যান্য দরিদ্র শ্রমজীবী বা পেশাজীবী জনগণ, শিল্প শ্রমিক, বস্ড়ি বাসী– এই মূল ভিত্তিটাকে সংগঠনে অর্জন করতে হবে। নইলে গ্রাম বা শহর, সশস্ত্র বা

নিরস্ত্র– যে ধরনের কাজই হোক না কেন, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অধঃপতন ঠেকানো যাবে না। সংস্কারবাদী, সমরবাদী, গোঁড়ামিবাদী, অর্থনীতিবাদী ও সংশোধনবাদী ক্ষুদে বুর্জোয়া লাইন আমাদের মধ্যে ও আশেপাশে অনবরত ঘুরতে থাকবে।

বিপ্লবী রাজনীতি ও শ্রেণি-কর্মসূচি শ্রেণি-সংগঠন গড়ার চাবিকাঠি– এটা সত্য। তেমনি সর্বহারা শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রেণি-অনুসন্ধান শ্রেণি-বিশ্লেষণের কর্মপদ্ধতি ও চেতনা মূল শ্রেণির সংগঠন গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী কর্মসূচি ও রাজনীতি প্রয়োগের মৌলিক উপায়। এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েই নেপাল পার্টির মত একটি সমৃদ্ধ বিপ্লবী পার্টির প্রধান নেতারা আজ সংশোধনবাদে অধপতিত হয়েছে। শ্রেণি-প্রশ্ন ও শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন না করলে বা অর্জন করলেও তা পরে হারিয়ে ফেললে বিপ্লবের আর কিছু থাকে না। ফলে মার্কসবাদ ও কমিউনিজমও হয়ে পড়ে কথার কথা। কারণ, মার্কসবাদ শ্রেণি-বিপ্লবেরই মতবাদ। ❑

চতুর্থ অধ্যায়

[জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন এবং সে প্রেক্ষিতে পার্টি-কর্মীসহ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির করণীয় উল্লেখ করে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবেই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এসব বিবৃতি একদিকে পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সঠিক ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। অন্যদিকে পার্টির বাইরে আমাদের রাজনীতিকে প্রচার ও জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রাখে। বিবৃতিগুলো বুর্জোয়া মিডিয়াগুলোতে পাঠানোর লক্ষ নিয়েও তৈরি করা হয়।

এ বিবৃতিগুলোর কোন কোনটি ক. আনোয়ার কবীর লিখে থাকেন। সেই সব লেখা থেকে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিবৃতি চতুর্থ অধ্যায়ে সংকলিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিগত কয়েক বছরে রাষ্ট্রীয় খুনী বাহিনী র‍্যাবের হাতে ভুয়া ক্রসফায়ারে অথবা বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে ক. মোফাখ্খার চৌধুরী, ক. রাকেশ কামাল, ক.সুলতান হাফেজ, ক.কামরুল মাস্টার, ক. মোশতাক-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী নেতা মারা গেছেন। মাওবাদী আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ও তাৎপর্য তুলে ধরে পার্টির পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হয়েছে। সেসব বিবৃতির কোন কোনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সংকলনে সীমিত জায়গার কারণে। এখন নির্বাচিত দু'একটা দেয়া হলে তা নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক হতে পারে বিধায় তা এড়ানোর জন্য সবগুলোই এখানে প্রকাশ করা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এগুলো একত্রে সংকলিত করার প্রচেষ্টা থাকবে।

– সম্পাদনা বোর্ড]

(১)

পার্বত্য "শান্তি চুক্তি" সম্পর্কে

(ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

[যুগ যুগ ধরে বাঙালি শাসকশ্রেণি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী জাতিসত্তার জনগণের উপর যে জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ চালিয়ে আসছে তা থেকে মুক্তির জন্য পাহাড়ী জনগণ সশস্ত্র সংগ্রাম ও বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। নিপীড়িত পাহাড়ী জনগণের সেই সংগ্রাম ও বাহিনী ধ্বংস করার লক্ষ্যে '৯৭ সালে হাসিনা সরকার ও ভারতীয় শাসক শ্রেণি চক্রান্ত করে বিশ্বাসঘাতক সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন সংগঠন "জনসংহতি সমিতি"র সাথে তথাকথিত শান্তি চুক্তি করে।
সেই প্রেক্ষাপটে তখন এই বক্তব্যটি প্রচার করা হয়– সম্পাদনা বোর্ড]

(১) দীর্ঘ দুই যুগ ধরে বাঙালী আমলা-মুৎসুদ্দি শাসকশ্রেণি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী জাতিসত্তার জনগণের উপর জাতিগত নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। বাস্তবে তার পূর্ব থেকেই এ নিপীড়ন চলছে যা ষাটের দশকে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুতর রূপ নেয়। এই জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিপীড়িত পাহাড়ী জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন– যা ছিল সম্পূর্ণই ন্যায্য। যদিও বুর্জোয়া নেতৃত্বের সুবিধাবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে তা ভুলপথে পরিচালিত হয়েছে।

– বাঙালী শাসকশ্রেণি পাহাড়ী জনগণের ন্যায্য আন্দোলনকে দমনের জন্য বর্বর দমন-পীড়ন চালায় তার ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনীর সাহায্যে (প্রায় পাঁচশ' মতো সেনা-ক্যাম্প পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপন করা হয়)।

– একইসাথে পাহাড়ী জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য সেখানে বন্দুকের জোরে বাঙালী পুনর্বাসন করেছে ও করছে– যেমনটা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল ক'রে চলেছে (পাহাড়ে বাঙালী জনসংখ্যার অনুপাত '৪৭ সালে ছিল ৩%, '৭১ সালে ১৫%, আর '৯৭-এ ৩৯%)।

– এতসব করেও পাহাড়ী জনগণকে তারা দমাতে পারেনি। ফলে শাসকশ্রেণির সংকট রয়ে গেছে।

উপরন্তু, এ প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের চাপে তাদের সংকট বেড়েছে। ফলে শাসকশ্রেণি এখন বেশ কিছু ছাড় দিয়ে এই "শান্তি চুক্তি" ক'রে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। এটা হচ্ছে বুর্জোয়া-সৃষ্ট সংকটের বুর্জোয়া সমাধান।

– শাসকশ্রেণি (মুজিব-জিয়া-এরশাদ-খালেদা-হাসিনা আমল নির্বিশেষে) ২৬ বছর ধরে সেনাবাহিনী দিয়ে এর সমাধান করতে চেয়েছে। তাতে তারা সফল হয়নি।

এখন, এই "শান্তি চুক্তি" ক'রে পাহাড়ী বুর্জোয়াদেরকে ক্ষমতা-স্বার্থের কিছু ভাগ

বাড়িয়ে দিয়ে তারা সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছে।

এতে–

• সংকটের প্রকৃত কোন সমাধান হবে না। কারণ, জাতীয় নিপীড়ক শাসকশ্রেণির একটি সরকার নিপীড়নের অবসান করবে না। করতেও পারে না। আর জাতীয় নিপীড়নের সম্পূর্ণ অবসান ব্যতীত সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

• এটা বিভিন্ন নতুন সংকটের জন্ম দেবে।

(২) পাহাড়ী জনগণের উপর দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় নিপীড়নের এতে অবসান হবে না।

(ক) পাহাড়ী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, তথা বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়নি।

– অর্থাৎ জাতিগত সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

– ফলে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র পাহাড়ী জাতিসত্তাগুলোর ঐক্য রয়ে যাচ্ছে জোরপূর্বক ঐক্য, স্বেচ্ছামূলক ঐক্য নয়। এটাই জাতীয় নিপীড়নের মূল ভিত্তি।

খ) পাহাড়ী জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণকে "উপজাতি" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা হচ্ছে–

– জাতিগত অসমতা বজায় রাখা ও পাহাড়ী জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানো।

– শাসকশ্রেণি মুজিব আমলে পাহাড়ী জনগণকে জোর ক'রে বাঙালী বলেছিল। পরে ২১ বছর তাদেরকে "বাংলাদেশী জাতি" বলা হয়েছে অন্যায়ভাবে। এখন "উপজাতি" হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে একই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে।

(গ) সংবিধান ও বাংলাদেশী রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা লংঘন হয়েছে কি হয়নি– এ নিয়ে শাসকশ্রেণির অভ্যন্তরে ব্যাপক বিতর্ক চললেও এটা পরিষ্কার যে, সমগ্র শাসকশ্রেণি সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার কথা বলছে।

– বাস্তবে বাংলাদেশী রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বলপূর্বক স্থাপিত এবং এর সংবিধান জাতীয় নিপীড়ন/বৈষম্য সৃষ্টিকারী। সুতরাং এ সংবিধান ও বলপূর্বক স্থাপিত রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে রক্ষা করার অর্থই হচ্ছে জাতিগত নিপীড়ন/বৈষম্যকে বজায় রাখা। "শান্তি চুক্তি"তে এটাই করা হয়েছে।

(ঘ) বন্দুকের জোরে বিগত ২৬ বছরে পুনর্বাসিত বাঙালীদের প্রত্যাহারের বিধান-তো নেই-ই, বরং তাদের অবস্থানকে ন্যায্য করা হয়েছে। জমির মালিক হলেই তাদেরকে "স্থায়ী বাসিন্দা" বলা হয়েছে। প্রশাসনে এক-তৃতীয়াংশ তাদের জন্য স্থায়ী বরাদ্দ করা হয়েছে।

এটা জাতিগত নিপীড়ন ও বৈরিতার একটি মূল খুঁটি হিসেবে কাজ ক'রে যাবে।

(ঙ) নিপীড়ক সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার-তো হয়ইনি, বরং যেকোন অজুহাতে তাদের পুনঃ মোতায়েনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

(চ) নিপীড়ক সেনাবাহিনী দুই যুগব্যাপী পাহাড়ীদের উপর যে হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন-জ্বালাও-পোড়াও-উচ্ছেদ-লুটপাট চালিয়েছে তার কোন বিচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

(ছ) পাহাড়ী জনগণকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।

– যে চরিত্রেরই হোক না কেন এতদিন পাহাড়ী জনগণের একটা নিজস্ব বাহিনী ছিল। এখন তা-ও থাকবে না।

– "বাহিনী না থাকলে জনগণের কিছুই নেই"। বাহিনী ভেঙে দেয়াটা পাহাড়ী জনগণের পরাজয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এভাবে শাসকশ্রেণি জাতিগত নিপীড়নের পথে মূল বাধা অপসারণের চেষ্টা করেছে।

(জ) একইসাথে এই জাতীয় নিপীড়ক রাষ্ট্রের আওতার বাইরে যে কোন অস্ত্র-ধারণকে পাহাড়ীদের জন্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এভাবে পাহাড়ী জনগণের হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়েছে।

(ঝ) নিপীড়ক বাঙালী শাসকশ্রেণি পাহাড়ী জনগণকে বিভক্ত করার জন্য পার্বত্য অঞ্চলকে ৩টি জেলায় বিভক্ত করেছিল। এটা বহাল রাখা হয়েছে– যা পাহাড়ী জাতি-জনগণের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থ-বিরোধী।

(ঞ) "ভাগ কর, শাসন কর"– এই পলিসি অনুযায়ী পাহাড়ী জনগণের মধ্যে যারা অধিকতর সংখ্যালঘু– তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে; প্রশাসনে কারও কারও কোন ক্ষমতাই রাখা হয়নি। এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো এখন দ্বি-মুখী (বাঙালী ও চাকমা) জাতীয় নিপীড়নের মুখে পড়বেন।

(ট) পাহাড়ী শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র জনগণের স্বার্থে সত্যিকারভাবে কোন ব্যবস্থা এ চুক্তিতে নেই।

– যাও-বা দু'/একটা পুনর্বাসনধর্মী কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোও পাহাড়ী দালাল/উঠতি বুর্জোয়া ও বাঙালী নিপীড়কদের লুটপাটে কমই বাস্তবায়িত হবে– কারণ ক্ষমতাটা এই ধনী শ্রেণিটাই পাচ্ছে, শ্রমিক-কৃষক বা দরিদ্র জনগণ নয়।

(ঠ) ভূমি সংক্রান্ত যে আমলা-কমিশন গঠন করা হয়েছে– তা কিছু পাহাড়ী-বাঙালী ধনী শ্রেণিভুক্তদের সমস্যার সমাধান ছাড়া পাহাড়ী-বাঙালী খোদ কৃষকের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না– কারণ, নীতিগতভাবে সকল কৃষি জমি খোদ কৃষকদের হাতে অর্পণ করা হয়নি।

◈ আরো বিভিন্নভাবেই জাতীয় বৈষম্য/নিপীড়ন/বৈরিতা অব্যাহত থাকবে। ফলে পাহাড়ী জনগণের প্রতিরোধ/সংগ্রামও হবে অনিবার্য। কারণ, যেখানেই নিপীড়ন, সেখানেই বিদ্রোহ– এটা এক বিশ্বজনীন নিয়ম।

(৩) বাস্তবে এই চুক্তিতে লাভবান পক্ষের একটি হলো পাহাড়ী দালাল/উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি– যারা আপোষ/আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিল ক'রে নিতে চাচ্ছে।

– এদের এই সুবিধাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের কারণেই বিগত দুই যুগে ব্যাপক পাহাড়ী জনগণের সমর্থন/ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্ত্বেও কোন প্রকৃত গণযুদ্ধ তারা গড়ে তুলতে পারেনি।

– তারা পাহাড়ী জনগণকে তোপের মুখে ফেলে সর্বদা প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের কোলে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেছে– যেমনি করেছিল '৭১-এ এদেশের

বাঙালী দালাল-বুর্জোয়া আওয়ামী লীগ ও সেনা-অফিসারদের (যেমন, জিয়া) নেতৃত্বে।

– তারাই পাহাড়ী জনগণের অসীম ত্যাগ ও বীরোচিত সংগ্রামের ফলকে পুঁজি করে দরকষাকষি করেছে, এবং নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থের বিনিময়ে নিপীড়ক বাঙালী বুর্জোয়াদের সাথে আপোষ ক'রে পাহাড়ী জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

এভাবে তারা পাহাড়ী জাতিসত্তার সাথে জাতীয় বেঈমানের ভূমিকা পালন করেছে।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা বড় পক্ষ হচ্ছে এখন পুনর্বাসিত বাঙালীরা।

– এদের অধিকাংশই হচ্ছেন দরিদ্র– যাদেরকে শাসকশ্রেণি বিগত ২৬ বছর নিজেদের স্বার্থে দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করেছে।

– শাসকশ্রেণি ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নির্মম শোষণ-নিপীড়নে এরা সমতলে নিজ বাসভূমিতে সর্বস্বান্ড় হয়েছেন। এই শাসকশ্রেণিই আবার তাদেরকে পাহাড়ী জনগণের বির"দ্ধে ব্যবহারের জন্য পাহড়ে নিয়ে এসেছে; পাহাড়ীদেরকে উচ্ছেদ ক'রে/উচ্ছেদ করার জন্য তাদেরকে পাহাড়ে বসিয়েছে।

– এখন সরকার নিজেদের সংকট সমাধানের জন্য এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনরায় জাতিগত বৈরিতা ও অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিচ্ছে। তাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান করছে না (অর্থাৎ, সমতলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনছে না ও পুনর্বাসিত করছে না)।

– বাস্ড়বে এই চুক্তিতে তাদেরকে পাহাড়ে রেখে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানো হয়েছে। তাই তাদের অনিশ্চয়তা-উদ্ভূত ক্ষোভও ন্যায্য– যদিও তা এখন বাঙালী উগ্র জাতীয়তাবাদ দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এতে তাদেরকে আরো কলুষিত করা হচ্ছে।

– শাসকশ্রেণি পাহাড়ে এদেরকে ব্যবহার করবে। তাই তারা এদের আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম নয়। অন্যদিকে তাদের দাবি মানাও সম্ভব নয়। এভাবে নতুন সংকট শাসকশ্রেণির জন্য জটিল অবস্থা সৃষ্টি করবে।

(৫) শাসকশ্রেণি এই চুক্তির সূত্রে নিজেরাই বড় ধরনে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিএনপি'র নেতৃত্বে এর বিরাট এক অংশ আন্দোলনের মাঠে নেমে পড়েছে।

– পাহাড়ে বিগত দুই যুগে সেনা-আমলারা যে ব্যাপক ক্ষমতা-লুটপাট চালিয়েছে তা এখন খর্ব হবে। এতে সেনা-আমলাদের একটি অংশ অসন্তুষ্ট থাকবে।

– পাহাড়ে বসতি স্থাপনকারী ও লুটপাটকারী বাঙালী ধনীদের একচেটিয়া স্বার্থ এখন কিছু খর্ব হবে। এতে তাদের বড় অংশই ক্ষুব্ধ হবে।

– পুনর্বাসিত বাঙালী জনগণকেও এরা ব্যবহার করছে ও করতে পারবে– তাদের অনিশ্চয়তার জন্য ও জাতিগত বৈরিতাকে কাজে লাগিয়ে।

– বাঙালী শাসকশ্রেণির যে অংশ কট্টর ভারতবিরোধী তারাও একে বিরোধিতা করবে। জনগণের মধ্যে ন্যায্য ভারতবিরোধী চেতনাকে এরা ব্যবহার করবে।

– এভাবে শাসকশ্রেণি ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হবে। বরং এটা তাদের নতুন সংকট তৈরি করবে। সংকট বাড়াবে।

– শাসকশ্রেণির চুক্তিবিরোধী অংশটি বিএনপি-র নেতৃত্বে বাঙালী জনগণকে

উগ্রজাতীয়তাবাদী বিষ দ্বারা কলুষিত করছে। সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে। নিজেদের বাঙালী বুর্জোয়া স্বার্থকে "জাতীয় স্বার্থ" বলে চালাচ্ছে।

বিপরীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার ও চুক্তিপন্থী বুর্জোয়ারা সংস্কারের আড়ালে নিজেদের ২৬ বছরের অপকর্ম, বর্তমানেও জাতীয় নিপীড়নকারী চরিত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের চাপে নতিস্বীকার– প্রভৃতিকে লুকানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা এই সংস্কারকেই জাতিগত সমতার নীতি বলে চালিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উদারনৈতিকতা দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ড় করতে চাচ্ছে।

এভাবে বুর্জোয়া দলগুলো জনগণকে অভিন্ন শাসকশ্রেণির অভিন্ন জাতীয় নিপীড়নকারী ভিন্ন ভিন্ন পলিসির পিছনে বিভক্ত করছে।

– বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও পত্রিকাওয়ালারা এক্ষেত্রে জঘন্য ভূমিকা পালন করছে– উপরোক্তভাবে বাঙালী নিপীড়ক জাতীয়তাবাদী দুই পলিসির কোন না কোন পক্ষকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্য। তারা এভাবে শাসকশ্রেণির অভ্যন্ড়রস্থ পর্যালোচনা/মূল্যায়নে জনগণকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছে।

একইসাথে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একাংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে শাসকশ্রেণির ঐক্যের জন্য– যা তারা প্রতিনিয়তই ক'রে থাকে, কিন্তু ব্যর্থ হয়, কারণ শাসকশ্রেণির অভ্যন্ড়রস্থ এই দ্বন্দ্ব/সংকট অমীমাংসেয়।

(৬) তথাকথিত বাম-রা মেনন, সিপিবি, জাসদ প্রভৃতির নেতৃত্বে নির্লজ্জভাবে শাসকশ্রেণির সরকারি পলিসিকে মদদ দিয়ে চলেছে।

এভাবে তারা "কিছু অগ্রগতি"কে সমর্থন করার নামে সর্বহারা শ্রেণি-রাজনীতি বর্জন ও বুর্জোয়া রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। যা সর্বদাই তারা ক'রে থাকে (যেমন, এরশাদ-পতন, খালেদা-সরকার বিরোধী আন্দোলন– প্রভৃতি সময়েও করেছে)।

(৭) এই চুক্তির পিছনে সাম্রাজ্যবাদী চাপ স্পষ্ট।

– শাসকশ্রেণি থেকেই তথ্য বেরিয়ে এসেছে যে, দীর্ঘদিন ধরেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপর "আপোষে"র জন্য চাপ সৃষ্টি ক'রে এসেছে। এই চাপের কারণেও এরশাদ ও খালেদা সরকার আমলেই তারা আপোষের চেষ্টা চালাচ্ছিল।

– সাম্রাজ্যবাদীরা এখন এ চুক্তিকে সমর্থন করছে। কারণ, তারা চায় শোষণ-লুটপাটের "শান্ড়িপূর্ণ" ক্ষেত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ, তেল-গ্যাস প্রভৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের লোভ গোপন নয়। যুদ্ধাবস্থা এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলের সামরিক-রাজনৈতিক গুর"ত্বও সাম্রাজ্যবাদের কাছে অপরিসীম। সবমিলিয়ে তারা এখন "শান্ড়িপূর্ণ" আবহাওয়ায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ চালাতে চায়। এজন্য তারা বিএনপি-র উপরও চাপ সৃষ্টি করছে। ঠিক এ কারণেই বিএনপি চরম আন্দোলনে যেতে পারছে না।

(৮) এ চুক্তির পিছনে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকশ্রেণিরও বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে।

– চুক্তি হয়েছে ভারতের অনুমোদনে। পাহাড়ী বুর্জোয়া নেতা সন্তু লারমা ভারত থেকে এসেই চুক্তি করেছে। ভারতেই তার আস্ড়না।

– আওয়ামী সরকার এক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের স্বার্থও রক্ষা করেছে। পাহাড়ী দালাল বুর্জোয়া নেতৃত্ব যাদের প্রধান অংশ দীর্ঘকাল যাবত ভারতের আশ্রয়-মদদে ভারতের দালালে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে পুনর্বাসন করা ও ক্ষমতার অংশীপ্রদানের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে।

এছাড়া ভারতের উত্তর-পূর্বে জাতিগত বিদ্রোহের পেছনে এতদিনকার বাংলাদেশী মদদও প্রত্যাহার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

(৯) উপরোক্ত বিশ্লেষণগুলো থেকেই দেখা যায় যে, এই তথাকথিত "শান্ড়ি" চুক্তি শান্ড়ি আনতে ব্যর্থ হবে, নতুন অশান্ড়ির জন্ম দেবে। সর্বোপরি, পাহাড়ী ও বাঙালী মূল জনগণের সমস্যার কোন সমাধান এটা দেবে না।

(ক) ইতিমধ্যেই পাহাড়ী জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকটি সংগঠন একে "আপোষ চুক্তি", সন্তু লারমাকে "জাতীয় বেঈমান" বলে চিহ্নিত করেছে। একে প্রত্যাখ্যান করেছে। নতুন ক'রে বাহিনী সংগঠনের সংবাদও শোনা যাচ্ছে।

– জঙ্গী পাহাড়ীরা সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন– যাতে সশস্ত্র সংগ্রামও থাকতে পারে/থাকবে।

– শান্ড়িবাহিনীর একটা অংশ অস্ত্র সমর্পণ করলেও অনিশ্চয়তার কারণে সকলে তা করবে না।

– ভারতও একটা সশস্ত্র অংশ হাতে রাখতে পারে।

– জঙ্গী পাহাড়ীরা ভারতের শাসকশ্রেণির বদলে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্ব জঙ্গীরাও বাংলাদেশী মদদ-বঞ্চিত হয়ে পাহাড়ী জঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে পারে। এমন হলে পাহাড়ী সশস্ত্র সংগ্রাম পুনরায় বেগবান হবে।

– এছাড়া শ'-পাঁচেক সেনা-ক্যাম্প তুলে নেয়া হলে সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের জন্য সামরিক অনুকূল পরিস্থিতিও সৃষ্টি হবে যা নতুন/অবশিষ্ট জঙ্গীরা ব্যবহার করতে পারবে।

(খ) অন্যদিকে পুনর্বাসিত বাঙালী জনগোষ্ঠী নিজেদের অনিশ্চয়তার কারণে আন্দোলনমুখী হবেন।

– এতদিন বাঙালী সেনাবাহিনী এদেরকে রক্ষা করেছে। কিন্তু এখন সেনা-ক্যাম্প প্রত্যাহার, পাহাড়ী বুর্জোয়াদের বর্ধিত ক্ষমতা– প্রভৃতির প্রেক্ষিতে এই বাঙালী জনগোষ্ঠী আত্মরক্ষার্থে ও উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের ইন্ধনে নিজেদের বাহিনী গঠনের দিকেও এগোতে পারে– যা জাতিগত বৈরিতাকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

(গ) এই চুক্তির সূত্রে শাসকশ্রেণির বিভক্তি (বিএনপি'র নেতৃত্বে সরকার বিরোধী আন্দোলন) নতুন মাত্রা পাবে। তাদের কামড়াকামড়ি বাড়বে– যতই না সাম্রাজ্যবাদী প্রভু আর বুদ্ধিজীবী পরামর্শকরা নসিহত করুক।

এটা শুধু পাহাড়ে নয়, দেশব্যাপী নতুন অশান্ড়ি ডেকে আনছে ও আনবে।

(১০) এ চুক্তির সূত্রে শাসকশ্রেণির এই কামড়াকামড়ি জনগণ থেকে তাদেরকে আরো বিচ্ছিন্ন করবে।

বিএনপি তার উগ্র নিপীড়ক জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক চরিত্র নগ্ন করবে। আওয়ামী লীগ তার শান্ড়ির নামে প্রহসন ও ব্যর্থতাকে আরো প্রকাশ করবে।

– পাহাড়ীদের সশস্ত্র সংগ্রাম আপাতত কিছু দুর্বল হলেও পরে সেটা অধিকতর জঙ্গীরূপে আবির্ভূত হতে পারে। সর্বোপরি জঙ্গী সংগ্রামীদের নিকট বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা-ব্যর্থতা তুলে ধরা, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ড়কে উন্মোচন করা এবং বিপ্লবী আদর্শ, কর্মসূচি ও সামরিক রণনীতি-রণকৌশল তুলে ধরার সুযোগ বাড়বে।

– এ চুক্তির ফলে পাহাড়ীদের মাঝে যে দালাল বুর্জোয়া শ্রেণিটি গড়ে উঠেছে/উঠছে তারা আপোষ/দালালীর মাধ্যমে বিকশিত হবে। ফলে পাহাড়ীদের মাঝে শ্রেণি সংগ্রাম বৃদ্ধি পাবে।

– পাহাড়ী-বাঙালী ধনীদের শ্রেণি-স্বার্থের অভিন্নতা বৃদ্ধি পাবে।

এদের বিপরীতে পাহাড়ী-বাঙালী মূল জনগণের ঐক্য বৃদ্ধিরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এগুলো সর্বহারার শ্রেণি-রাজানীতিতে পার্বত্য জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করার সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

(১১) এ অবস্থায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান–

◈ নিপীড়িত পাহাড়ী জনগণ–

– জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের (বিচ্ছিন্নতার অধিকার ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন) সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন। তথাকথিত শান্ড়ি চুক্তি ও জাতীয় বেঈমানদের মুখোশ উন্মোচন করুন/বর্জন করুন।

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্র/চক্রান্ড়কে বিরোধিতা করুন। আত্মনির্ভরশীল ভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলুন।

– জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামকে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে যুক্ত করুন। বিপ্লবের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, বাঙালী-পাহাড়ী দালাল বুর্জোয়া শ্রেণি ও সামন্ড়বাদীদের এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলুন।

– নিপীড়ক বাঙালী শাসকশ্রেণির দ্বারা নিপীড়িত বাঙালী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সংগ্রামের সাথে নিজেদের সংগ্রামকে যুক্ত করুন। নিপীড়িত পাহাড়ী-বাঙালী ঐক্য গড়ে তুলুন।

– প্রকৃত শত্রুকে চিহ্নিত ক'রে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করুন। শাসকশ্রেণির চক্রান্ড়ের হাতিয়ার পুনর্বাসিত বাঙালী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে ঐক্য গড়ে তুলুন।

– মাওবাদের আদর্শে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে একটা বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণের উপর নির্ভর ক'রে প্রকৃত গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন।

– প্রকৃত জাতীয় মুক্তি ও নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবের জন্য শ্রমিক শ্রেণির একমাত্র বিপ্লবী পার্টি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গড়ে তুলুন।

• পুনর্বাসিত সাধারণ বাঙালী জনগণ–

শাসকশ্রেণির হাতিয়ারে পরিণত হবেন না।

– আপনাদের দুর্গতি ও অনিশ্চয়তার জন্য দায়ী পাহাড়ীরা নন, দায়ী শাসক বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণি।

– বাঙালী বড় ধনী ও তাদের পাহাড়ী দালালদের বির"দ্ধে সাধারণ পাহাড়ী জনগণের সাথে ঐক্য গড়ে তুলুন।

– আওয়ামী লীগ ও বিএনপি– একই বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির দুই পক্ষ। উভয়ই আপনাদের শত্র"। এদের কারও পক্ষ অবলম্বন করবেন না।

– পার্বত্য এলাকা পাহাড়ী জনগণের।

– সমতলে আপনাদের পুনর্বাসনের জন্য দাবি তুলুন।

– সমতলে জমি/রেশন/কাজ/ন্যায্য মজুরীর জন্য দাবি তুলুন।

– বাঙালী-পাহাড়ী কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ জনগণের মুক্তির জন্য পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন।

• বাঙালী শ্রমিক-কৃষক জনগণ–

– পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে শাসক বিএনপি/আওয়ামী লীগ-এর কামড়াকামড়িতে কোন পক্ষ নেবেন না।

– তারা উভয়ই বাঙালী ও পাহাড়ী জনগণের শত্র"। তারা উভয়ই দেশ বিক্রেতা ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল।

– বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির উগ্র জাতীয়তাবাদী স্লোগানে ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভুলবেন না।

– পাহাড়ী জনগণ বাঙালী নন; পার্বত্য অঞ্চল বাঙালীদের নয়। পাহাড়ী জনগণের জাতীয় অধিকারের পক্ষে দাঁড়ান।

– পাহাড়ে সেনা-দমন চালিয়ে বা চুক্তি করে শোষণ-নিপীড়ন চালানোতে আপনাদের কোন লাভ নেই। লাভ হচ্ছে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির ও তাদের বিদেশী প্রভুদের।

– বাঙালী আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি আপনাদের শত্র"। পাহাড়ী নিপীড়িত জনগণ আপনাদের বন্ধু। জাতিগত ভিত্তিতে নয়, শোষণ-নির্যাতনের মাপকাঠিতে শত্র" ও বন্ধু চিহ্নিত কর"ন।

– পাহাড়ী-বাঙালী নিপীড়িত জনগণের ঐক্য গড়ে তুলুন। অভিন্ন নিপীড়ক শাসক বুর্জোয়া শ্রেণিকে ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদের জন্য পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন। ❑

(২)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আত্মঘাতী হামলা সম্পর্কে

(১৫/০৯/২০০১)

[২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ারসহ একাধিক জায়গায় যে সশস্ত্র আক্রমণ চালানো হয়েছিল সে প্রেক্ষিতে পার্টি নিচের বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিল– সম্পাদনা বোর্ড।]

১। গত ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার দিকে (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি আত্মঘাতী সামরিক হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ৪টি যাত্রীবাহী বিমান ও একটি গাড়িবোমা ব্যবহার করা হয়। ফলে মার্কিন সামরিক সদর দপ্তর– "পেন্টাগনে"র ব্যাপক ক্ষতি হয়, এবং "বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র" নামের বিশাল ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পেন্টাগনের কয়েকশ' ব্যক্তি নিহত হয়। এছাড়া বিমানগুলোর যাত্রীসহ বাণিজ্য ভবনে কয়েক হাজার বেসামরিক লোকও এতে নিহত হন।

এই বিশ্ব কাঁপানো ঘটনার জন্য মার্কিন সরকার মুসলিম মৌলবাদী নেতা লাদেন ও আফগানিস্ড়ানের তালেবান সরকারকে দায়ী করছে। মার্কিন সরকার এর প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে, তার উপর আক্রমণকে সন্ত্রাসী ও মানবতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান চালাচ্ছে, প্রতিশোধের নামে আফগানিস্ড়ান বা অন্য কোন দেশের জনগণের বির"দ্ধে একটা সামগ্রিক যুদ্ধ-অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, এবং বিশ্বব্যাপী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দালাল শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের দ্বারা সম্ভাব্য আগ্রাসী হামলার পক্ষে প্রস্তুত করছে। তারা দেখাতে চাচ্ছে, তাদের উপর আক্রমণে সাহসী যে কারও বির"দ্ধে হিংস্র প্রতিশোধ চালাতে সক্ষম এক ভয়ংকর দানব তারা– যাকে পৃথিবীর সকল মানুষের ভয় ও সমীহ করে চলতে হবে।

২। যারাই এ হামলা চালাক না কেন হামলার লক্ষ্যবস্তু থেকে এটা স্পষ্ট যে, নিছক সাধারণ জনগণকে হত্যা করাটা এ আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। বরং মার্কিন শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কেন্দ্রগুলোই ছিল এর মূল লক্ষ্য। পেন্টাগনের মার্কিন সামরিক সদর দপ্তর, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মার্কিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র– এ সবই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা, শক্তি ও অহমের গুর"ত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

উপরন্তু এটাও প্রমাণিত যে, আক্রমণগুলো করেছে বেশ কিছু আত্মঘাতী দল। শত্র"র প্রতি তীব্র রাজনৈতিক ঘৃণা ব্যতীত বিশ্বের ১ নম্বর শক্তিধর ও হিংস্রতম সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রে আক্রমণের জন্য এমন আত্মঘাতী স্কোয়াড গঠন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, এই আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং তা মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ন্যায্য ক্ষোভ ও ঘৃণা থেকে সৃষ্ট। যদিও এ হামলায় প্রচুর অসামরিক জনগণও নিহত হয়েছেন, কিন্তু এমন দুঃখজনক অবস্থা সৃষ্টির আসল কারণ নিহিত রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই যুগ যুগব্যাপী কৃত বিশ্বজনগণ বিরোধী ও মানবতা বিরোধী অপরাধের মাঝে। একইসাথে হামলাকারীদের ত্রুটিপূর্ণ মতাদর্শ ও রাজনীতি তাদেরকে এতে প্রবৃত্ত করেছে।

৩। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সরাবিশ্বের কোটি কোটি জনগণ দ্বারা ঘৃণিত। এবং এ ঘৃণা তারা অর্জন করেছে সারা বিশ্বে ও নিজ দেশে শত শত কোটি জনগণের উপর মানব ইতিহাসের নির্মমতম শোষণ ও বর্বরতম নিপীড়ন চালানোর কারণে। সন্ত্রাস বিরোধিতার নামে যারা এত গলাবাজি করে তাদের কয়েকশ' বছরের (ও সাম্প্রতিককালের) ইতিহাস হলো সারা বিশ্বের মুক্তিকামী জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে অবর্ণনীয় অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলা চালানোরই ইতিহাস। দূর অতীতের কথা বাদ দিয়ে শুধু সাম্প্রতিককালের কয়েকটি তথ্যই এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। মাত্র এক দশক আগে ইরাকে এক হিংস্র আগ্রাসন চালিয়ে এই দানবীয় অপশক্তি মাত্র দুই সপ্তাহে হত্যা করেছিল দুই লক্ষ সাধারণ জনগণকে। সেই একতরফা আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় সেদেশে ৫ লক্ষ পঙ্গু ও অসুস্থ শিশু জন্ম নিয়েছে যার জন্য মার্কিন হানাদাররাই দায়ী। এই সাম্রাজ্যবাদ ষাট-সত্তর দশকে ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়ায় পঞ্চাশ লক্ষ জনগণকে হত্যা করে। এরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপানের পরাজয়ের পরও সেখানে আনবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে তিন লক্ষ অসামরিক জনসাধারণকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল এবং দুটো শহরকে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এরা '৬৫-সালে ইন্দোনেশিয়ায়, '৭১-সালে পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) ও '৭৩-সালে চিলিতে নরঘাতক শাসকদেরকে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে লক্ষ লক্ষ জনগণকে হত্যা করিয়েছিল। এইসব অপরাধ তারা এখনো পৃথিবীর দেশে দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করে চলেছে। ফিলিস্তিন হলো যার এক দগদগে উদাহরণ। এমনকি আফগানিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদীদেরও সৃষ্টি হয়েছিল মার্কিনী মদদেই– যারা আজ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটির মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিশ্বজনগণের রক্তে রঞ্জিত এবং তার অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ পৃথিবী জুড়ে লুণ্ঠন ও ডাকাতির সম্পদে।

সুতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখে সন্ত্রাসবিরোধী বুলি হলো পৃথিবীর জঘন্যতম প্রতারণা। এদের বিরুদ্ধে যেকোন আক্রমণের অধিকার পৃথিবীর (আমেরিকাসহ) প্রত্যেকটি নিপীড়িত জনগণেরই রয়েছে।

৪। এই ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তথা সাম্রাজ্যবাদীরা বাহ্যত যত শক্তিশালীই দেখাক না কেন, তারা হলো, মাও-এর ভাষায় "কাগুজে বাঘ"। লেনিনের বিশ্লেষণ মতো বলা চলে যে, এরা হলো কাদার দু'পায়ের উপর দাঁড়ানো এক বিশালকায় দৈত্য। এদের শক্তিমত্তা, প্রযুক্তি, অর্থ-বিত্তই এদের ধ্বংসের উপাদান সৃষ্টি করে চলেছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তার নিজ দেশেই বিশাল আঘাতে সামরিক ও আর্থিকভাবে বিরাট ক্ষতিগ্রস্থ করা ও ভীত-সন্ত্রস্ত করা সম্ভব। আমেরিকার নিপীড়িত জনগণের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে এবং সঠিক মতবাদ, কর্মসূচি ও

নীতি-কৌশলে পরিচালিত হলে মার্কিন শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অমিত সামরিক ও আর্থিক শক্তিকে উচ্ছেদের আক্রমণও করা-যে সম্ভব তা এ ঘটনা ইঙ্গিত করে।

৫। কিন্তু এটাও সত্য যে, এরা প্রকৃত বাঘও বটে। এরা সারা বিশ্বে শোষণ-লুণ্ঠন করে বিপুল বিত্ত ও অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। নিজ দেশে ও সারা বিশ্বে তারা শক্তিশালী শ্রেণি, প্রতিষ্ঠান, প্রচার-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি– প্রভৃতি গড়ে তুলেছে। সুতরাং, একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ, সামগ্রিক বিপ্লবী কর্মসূচি ও সঠিক রণনীতি-রণকৌশল ব্যতীত ব্যাপক নিপীড়িত জনগণের সমর্থন অর্জন করা সম্ভব নয়, তাদের সমর্থনকে সক্রিয়তায় পরিণত করা সম্ভব নয় এবং এই আসল বাঘকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

তাই নিছক হামলাই কোন সমাধান নয়। বরং সঠিক কর্মসূচিতে, সঠিক লক্ষ্যে, সঠিকভাবে আক্রমণ প্রয়োজন যাতে মানবজাতির এই দুশমনদেরকে উচ্ছেদ করে নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

এমন একটি মতবাদই হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। এটা শেখায় যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর সেদেশের জনগণ এক নয়; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেদেশের জনগণের উপরও নিপীড়ন চালায়; এই শত্রুকে উচ্ছেদের বিপ্লবী সংগ্রাম সেদেশে চালাতে হবে মূলত সেদেশের নিপীড়িত জনগণকেই; জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নিপীড়িত জনগণের ঐক্য ও মিত্রতা এই সংগ্রামে এক অপরিহার্য নীতি; নিছক কিছু বিচ্ছিন্ন হামলা নয় বরং এই শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করে নিপীড়িত জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাই বিপ্লবী যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য– প্রভৃতি।

সুতরাং ধর্মীয় মৌলবাদ– যা ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করে, অথবা ভিন্ন ধর্ম-জাতির নিপীড়িত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে না, এমনকি শত্রু জ্ঞান করে, সর্বোপরি বিজ্ঞানসম্মত শোষণহীন সমাজ নির্মাণের কমিউনিস্ট কর্মসূচিকে ও বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ দ্বান্দিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে শত্রু মনে করে– তা সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদে প্রকৃত কোন অবদান রাখতে সক্ষম নয়। বিক্ষোভ-ঘৃণার এজাতীয় প্রকাশ ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে সাময়িক কিছু ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়– কিন্তু এতে বিশ্বজনগণের মুক্তির সংগ্রামে কোন অগ্রগতি ঘটবে না।

৬। এই হামলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসী অহম ও শক্তিমত্তার প্রচারে এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এ কারণেই সে এমন পাগলা কুত্তার মতো হিংস্রভাবে প্রতিশোধের কথা বলছে। আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের যেকোন প্রান্তেই তারা এই বর্বর হামলা চালাতে পারে। তারা এই আগ্রাসনের পথ হিসেবে পাকিস্তানের ভূমি ও আকাশপথ ব্যবহারের জন্য পাকিস্তানী শাসকদের উপর হুকুম জারি করেছে। এভাবে এই উগ্র জাতিদম্ভী সাম্রাজ্যবাদ নিজ দেশের স্বাধীনতার বুলি আউড়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লংঘনের নগ্ন আস্ফালন করছে। এর মধ্য দিয়ে তারা বিশ্বজুড়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অধীনে বিশ্বজনগণকে ভীত-সন্ত্রস্থ নতজানু করতে চাচ্ছে। উপরন্তু আফগানিস্তানে (ও পাকিস্তানে) নগ্ন আগ্রাসন করে দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান মাওবাদী বিপ্লবী সংগ্রাম, যাকিনা তার প্রকৃত শত্রু, তার বিরুদ্ধে চক্রান্তকে শক্তিশালী করা ও এ অঞ্চলে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার পথে সে এগিয়ে আসছে।

৭। ইতিমধ্যেই তাদের এই জাতিদম্ভী রাজনীতির ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ও প্রবাসী জনগণের উপর নিপীড়ন নেমে এসেছে। কট্টর জাতিদম্ভী বর্ণবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলো উসকে উঠেছে, তারা এই জনগণের উপর হামলা চালাচ্ছে। বিশেষত আরব ও দক্ষিণ-এশীয় (বাংলাদেশসহ) জনগণ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এইসব প্রবাসীদের ভিসা, চাকরী, ব্যবসা, বাসস্থান– প্রভৃতির উপর হুমকি বেড়ে চলেছে। সরকারী পা"রা বাহ্যত একে বিরোধিতার ভাব দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের জাতিদম্ভ ও সন্ত্রাসী মদমত্ততাই এই পরিস্থিতির মূল কারণ।

৮। বিশ্বব্যাপী এই ১ নম্বর সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বৃটিশসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বড় দাদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে– নিজেদের বিশ্ব-প্রভুত্ব রক্ষা ও দুর্বল জাতি ও নিপীড়িত জনগণের বির"দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধকর্মে। দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠী নগ্নভাবে তাদের আঞ্চলিক কর্তৃত্বের স্বার্থে আফগান-পাকিস্ড়ানের বির"দ্ধে মার্কিন আগ্রাসন ও সন্ত্রাসী হুমকির প্রতি তাদের উচ্ছ্বসিত সমর্থন দেয়া শুর" করেছে। পাকিস্ড়ানের গণবিরোধী সামরিক শাসকচক্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র মার্কিনী হুমকির মুখে নতজানু হয়ে তার দালালীর পরীক্ষা দিতে শুর" করেছে। এদের সাথে তাল মিলিয়েছে আমাদের দেশের গণশত্র" শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধি– তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিএনপি, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি– তথাকথিত সন্ত্রাস-বিরোধিতার নামে মার্কিন আগ্রাসী যুদ্ধ-তৎপরতায় মদদ দিচ্ছে।

৯। এ অবস্থায় আমাদের দেশের ও বিশ্বের সমস্ড় নিপীড়িত জনগণের দায়িত্ব হলো যেকোন সাম্রাজ্যবাদী হামলা, অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসনের বির"দ্ধে জনমত, প্রতিরোধ ও সংগ্রাম গড়ে তোলা, তাকে স্পষ্টভাবে নিন্দা ও বিরোধিতা করা। এ কাজে সহায়তাকারী সকল তৎপরতাকে নিন্দা করা। এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদের পালের গোদা মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর বির"দ্ধে সংগ্রাম ও আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করা, সকল জনগণের ঐক্য, বিশেষত আমেরিকার সাধারণ জনগণের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা। যে কোন দেশে সরাসরি মার্কিন আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে সেদেশের সকল জনগণের দায়িত্ব হবে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনা করা, গ্রামভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ চালানো এবং ভিয়েতনামের মত গণযুদ্ধের সাগরে এই হিংস্র হায়েনাদের ডুবিয়ে মারা। এই দীর্ঘস্থায়ী, জটিল ও কঠিন সংগ্রাম চালানোর জন্য জনগণের প্রয়োজন একমাত্র বিপ্লবী মতাদর্শ মাওবাদের উপর নির্ভর করা– যা কিনা এক সামগ্রিক বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত এক নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার পথ দেখাতে পারে। ❑

(৩)

২১ আগষ্ট বোমা হামলা সম্পর্কে

(২২/০৮/২০০৪)

বিগত কয়েক বছর ধরেই দেশের বিভিন্ন শহরে জনসভা বা জনবহুল জায়গায় বোমা হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে যাতে প্রধানত সাধারণ জনগণ ও সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীরা নিহত হচ্ছেন। সর্বশেষ গত ২১/৮ তারিখে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে জনসভায় যে বোমা হামলা ঘটে তাতেও বিরাট সংখ্যক সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণই নিহত হয়েছেন, যদিও ২/১ জন আওয়ামী শীর্ষ নেতাও এতে আহত হয়েছেন।* সম্প্রতি বোমা হামলা ছাড়াও আরো কিছু গুর"ত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হত্যা বা হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা হয়।

এসব হামলার দায়দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি। বাস্ড়বে কোন সরকারের আমলেই এগুলোর তদন্ড়ও কোন সুরাহা হয়নি। প্রায় প্রতিটি বোমা হামলার পরপরই আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা সরকারকে বা বিএনপিকে দায়ী করেছে। বিপরীতে বিএনপি দায়ী করেছে আওয়ামী লীগকে।

অবশ্য আওয়ামী লীগ ও তাদের ঘনিষ্ঠ 'বাম' ও অন্যান্য দলগুলো এসব হামলার জন্য ইসলামী মৌলবাদীদের দায়ী করেছে। তবে আওয়ামী লীগ এই কথিত মৌলবাদী-দেরকে বিএনপি/সরকারের মদদপুষ্ট বা তাদের দ্বারা পরিচালিত বলেই প্রচার করেছে।

এসব হামলার প্রকৃতি থেকে ধারণা করা যায় যে, যদিও কিছু কিছু হামলা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে কিছু পরিকল্পিত তৎপরতাই চলছে।

* বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং পাশাপাশি আমাদের দেশের বাস্ড়বতায় এদেশে সশস্ত্র মৌলবাদী সংগঠন গড়ে ওঠা ও তাদের তৎপরতা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটা এখনো পর্যন্ড় উন্মোচন করা হয়নি। অন্যদিকে শাসকশ্রেণির বিভিন্ন পার্টি ও গ্র"প এজন্য একে অপরকে দায়ী করে নিজ নিজ গোষ্ঠীগত ফায়দা লুটায় নিয়োজিত, যতনা তারা প্রকৃত অপরাধী সনাক্ত করতে বা ধরতে ইচ্ছুক। সুতরাং এক বা একাধিক সশস্ত্র মৌলবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে এ জাতীয় হামলার কোন কোনটা পরিচালিত হলেও এটা ধারণা করা যায় যে, শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রের (এবং সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিনের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের) কোন না কোন পক্ষের প্রশ্রয়/মদদ/পরিকল্পনাতেই এগুলো ঘটছে। শাসকশ্রেণির অভ্যন্ড়রীণ কামড়াকামড়ি এতই তীব্র এবং এদের প্রধান গোষ্ঠীগুলো এতটাই ফ্যাসিস্ট যে, এদের গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে এরা যে কারও সাহায্য নিতে পারে এবং যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে। কট্টর

* আওয়ামী কেন্দ্রীয় নেতাদের একজন আইভী রহমান আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন– সম্পাদনা বোর্ড।

আওয়ামী/ভারতবিরোধী কোন গোষ্ঠী দ্বারা আওয়ামীপন্থীদের উপর হামলা হতে পারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও/বা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের হাত থাকার সম্ভাবনাও এতে ব্যাপক; কারণ তাদের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আধিপত্যের লক্ষ্যে তারা যে কোন চক্রান্তই করতে পারে। সচেতন বা অসচেতনভাবে মৌলবাদী বা অন্য কোন গোষ্ঠী এই সব শক্তির হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও এই সব গোষ্ঠীর নিজস্ব আশু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও রয়েছে বা থাকতে পারে।

এই সব তৎপরতার মধ্য দিয়ে কী কী উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে তার থেকেই বোঝা যাবে কেন উপরোক্ত শত্রুদের কোন না কোন গোষ্ঠী এগুলোতে জড়িত থাকতে পারে।

এ জাতীয় তৎপরতার দ্বারা বিবিধ গোষ্ঠীর বিভিন্ন আশু স্বার্থ হাসিল হতে পারে বটে, কিন্তু এর ফলস্বরূপ সর্বদাই নিচের মৌলিক ফলগুলো আসছে যা শাসকশ্রেণির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে।

১। জনগণকে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে,

২। রাষ্ট্রের ফ্যাসিকরণ এগিয়ে যাচ্ছে,

৩। সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা ও সামরিকসহ সামগ্রিক অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপকে জোরদার করা হচ্ছে।

এগুলোর আসল উদ্দেশ্য হলো জনগণের আন্দোলন/বিপ্লবী সংগ্রাম/গণযুদ্ধকে দমন করায় রাষ্ট্রকে আরো যোগ্য করে তোলা। নতুনতর ফ্যাসিস্ট বাহিনী (যেমন– র‍্যাব) তৈরি ও তাদের অবাধ তৎপরতা (যেমন– ভুয়া সংঘর্ষের নামে হেফাজতে হত্যা)/ফ্যাসিস্ট আইন/জরুরী অবস্থা/সামরিক শাসন/মার্কিন ঘাঁটি– ইত্যাদির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা– যা শাসকশ্রেণি/রাষ্ট্র/সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি, বিশেষত নেপাল-গণযুদ্ধের দেশব্যাপী ক্ষমতা দখলের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া, ভারতের বিপ্লবের ভাল অগ্রগতি, 'কমপোসা' গঠন ও পাশাপাশি এদেশের বুর্জোয়া রাজনীতির তীব্র কামড়াকামড়ি, চূড়ান্ত গণবিচ্ছিন্নতা ও ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এগুলো তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।

* এদেশীয় শাসকশ্রেণির বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো– আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত প্রভৃতি– চূড়ান্ত মাত্রায় গণবিরোধী, গণবিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রাসী। সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদও দেশ ও জনগণের চতুর শত্রু। এদের দ্বারা চালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতিও গণবিরোধী ও প্রগতিবিরোধী। আমরা এ সবকিছুকেই উচ্ছেদের কর্মসূচি হাজির করি। কিন্তু সেটা করা সম্ভব একটা সামগ্রিক বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণকে সমাবেশিত করে এবং তাদের উপর নির্ভর করে গণযুদ্ধ পরিচালনা করে। জনগণ ও সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী হত্যাকারী কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে নয়।

গণযুদ্ধ ও জনগণের পক্ষের বিপ্লবী রাজনীতি ও সংগ্রাম কোন গোপন বিষয় নয়। শুধুমাত্র গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিই নিজ পরিচয় গোপন রেখে এ জাতীয় হামলা চালাতে পারে– যার মাঝে উপরোক্ত বুর্জোয়া দলগুলো, তাদের শ্রেণি ও রাষ্ট্র

এবং তাদের প্রভুরাই (সাম্রাজ্যবাদ/সম্প্রসারণবাদ) অগ্রগণ্য। এদের প্রতিক্রিয়াশীল কামড়াকামড়ি ও জনগণের উপর চালিত বর্বরতার চর্চা এতদিন সাধারণ কর্মী ও জনগণকেই ক্ষতি করেছে। এখন এগুলো এই গণ্ডি ছাড়িয়ে তাদের নিজেদের কাতারেও রক্ত ঝরাচ্ছে। এটা তাদের অনুসৃত রাজনীতিরই ফল মাত্র।

আমরা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই, শত্রুর কামড়াকামড়িতে পক্ষ না নিয়ে এই সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা ও তার প্রতীভূদের উচ্ছেদের সংগ্রামে সম্পূর্ণ পৃথক বিপ্লবী রাজনীতিতে সংগঠিত হোন। জনগণকে অবশ্যই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে এবং বিপ্লবী সংগ্রাম তথা গণযুদ্ধের পথে এগোতে হবে। যাতে শাসকশ্রেণি, রাষ্ট্র ও প্রতিক্রিয়াশীলদের একতরফা ও বর্বর অস্ত্রধারণকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। এবং নিজেদেরকে এই ব্যবস্থার বর্বরতা, সন্ত্রাস ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত করা যায়। ❑

(৪)

দেশব্যাপী বোমা হামলা সম্পর্কে

(২০/০৮/০৫)

[২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশের প্রায় সবগুলো জেলা-সদরে একযোগে বোমা বিস্ফোরণ করা হয়, যার দায়িত্ব পরে জেএমবি নামক ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন স্বীকার করে। এ সময়ে ক্ষমতাসীন ছিল বিএনপি। আর বিরোধী দলে ছিল আওয়ামী লীগ। এই হামলার কিছু পরে এই সংগঠনের শীর্ষ নেতারা গ্রেফতার হয় ও ২০০৭ সালে ক্ষমতাসীন সেনা-সুশীল সরকারের আমলে তাদেরকে ফাঁসি দেয়া হয়। এই বোমা হামলার পর পর নিচের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছিল– সম্পাদনা বোর্ড।]

১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার দিন থেকেই শাসকশ্রেণির সরকারি দলগুলো আওয়ামী লীগকে দায়ী করে, আর আওয়ামী নেত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪-দল দায়ী করে সরকার ও সরকারি দলগুলোকে। এরা একে অন্যকে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের দায়ে অভিযুক্ত করে। আওয়ামী লীগ এজন্য সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল আহ্বান করেছে।

* এই পরস্পর দায়ী করার ঘটনা থেকে দুটো বিষয় বেরিয়ে আসে। প্রথমত, শাসকশ্রেণির এই প্রধান দলগুলো ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র অদ্যাবধি এখনো পর্যন্ত এ জাতীয় বোমা হামলাগুলোর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে তেমন একটা আগ্রহী নয়। তারা বরং এসবকে ব্যবহার করে নিজেদের কোটারী স্বার্থ হাসিলেই বেশি সক্রিয়। দ্বিতীয়ত, তারা এই বোমা-ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাদের বৈদেশিক প্রভুদেরকে কীভাবে সন্তুষ্ট করবে সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সশস্ত্র ধর্মীয় মৌলবাদী তৎপরতার পিছনে সরকারি মদদের অভিযোগ তুলে আওয়ামী লীগ নিজেরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধিক প্রিয় হতে সচেষ্ট, পাশাপাশি ভারতীয় শাসকশ্রেণি কর্তৃক বাংলাদেশবিরোধী সম্প্রসারণবাদী তৎপরতায় শক্তি যোগাতে মনোযোগী। এভাবে তারা ভারত ও মার্কিনের আশীর্বাদে নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়াকে নিশ্চিত করতে সক্রিয়। অন্যদিকে বিএনপি-জোট রাষ্ট্রের আরো ফ্যাসিকরণের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের আরো অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তাদের আশীর্বাদকে ধরে রেখে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে চায়।

* বোমা হামলার সাথে প্রাপ্ত লিফলেট ও গ্রেফতারকৃতদের পরিচিতি থেকে দৃশ্যত ধারণা করা যায় যে, জামাআতুল মুজাহেদীন নামের ইসলামী মৌলবাদী সংগঠনটি এ হামলা সংঘটিত করেছে। কিন্তু হামলার পর এ সংগঠন তার দায়িত্ব স্বীকার করে এখনো পর্যন্ত কোন বক্তব্য দেয়নি। অন্যদিকে ঘটনার পর এই সংগঠনটির নামে এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পত্রিকা অফিসে যে ই-মেইল পাঠানো হয়েছে তার কোন প্রতিবাদ এ

পর্যন্ত উক্ত সংগঠন থেকে করা হয়নি। বোমা হামলাগুলো খুবই সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও এর টার্গেটগুলো ধর্মীয় মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে হামলার রাজনৈতিক চরিত্রকে পরিষ্কার করেনি, এবং পরে হামলাকারীদের পক্ষ থেকে তা ব্যাখ্যাও করা হয়নি। তারা সাম্রাজ্যবাদী বা ভারতীয় কোন স্বার্থ কেন্দ্রে হামলা করেনি। অন্যদিকে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে কেন এই তৎপরতা তারও কোন ব্যাখ্যা মেলেনি। এ সব তথ্য থেকে হামলাকারীদের, অন্তত পক্ষে তাদের শীর্ষ পরিকল্পনাকারীদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। এ চরিত্র ধর্মীয় মৌলবাদী এবং শাসকশ্রেণি ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী/সম্প্রসারণবাদী প্রভুদের বিবিধ গোষ্ঠীর চরিত্রের সাথে মেলে।

* আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে এখন জঙ্গী ইসলামী মৌলবাদী শক্তির বিকাশ অস্বাভাবিক নয়। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ যাবতকালের এ জাতীয় বোমা হামলাগুলোর কোন না কোনটার সাথে কোন না কোন ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠী অংশত বা পুরোপুরি জড়িত। কিন্তু এ পর্যন্তকার ঘটনাপ্রবাহে প্রমাণিত হয়েছে যে, শাসকশ্রেণি– তার রাজনৈতিক পার্টিগুলো ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ/প্রশ্রয়/নেতৃত্বেই এ জাতীয় তৎপরতাগুলো বিকশিত হচ্ছে। শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সুতীব্র অমীমাংসেয় কামড়াকামড়ি রয়েছে, তাদের বিভিন্ন বৈদেশিক প্রভুদের মধ্যকার স্বার্থের যে গুরুতর দ্বন্দ্ব রয়েছে, এবং এমনসব দ্বন্দ্ব যেভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, তাতে এসব দ্বন্দ্বমান গোষ্ঠীগুলোর মাঝে অবস্থান করে ও তাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্রয় ও মদদেই এই জঙ্গী গোষ্ঠীগুলো বিকশিত হচ্ছে।

যেক্ষেত্রে সাধারণ মাওবাদী বিপ্লবী মাত্রই গ্রেফতারের পর তথাকথিত ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করা হচ্ছে এবং বিগত মাত্র এক বছরে প্রায় ৫০০ ক্রসফায়ার হত্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে, সেখানে এতসব বিভৎস সন্ত্রাসী বোমা হামলার পরও, এবং মৌলবাদী উত্থানের জিগির তোলা হলেও একজন মৌলবাদীও ক্রসফায়ারে পড়েনি। বরং এদের বন্দীদের প্রায় সকলেই বার বার ছাড়া পেয়ে গেছে। আওয়ামী বা বিএনপি– কোন সরকারের আমলেই রহস্যজনক সন্ত্রাসী বোমা হামলার কোন কূল-কিনারা হয়নি, এবং এ সবের কারণে কারও কোন শাস্তি অদ্যাবধি হয়নি। বরং মাওবাদী আন্দোলন দমনে বাংলাভাইসহ ধর্মীয় মৌলবাদীদেরকে রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি– আওয়ামী/বিএনপি নির্বিশেষে ব্যবহার করেছে ও করে চলেছে।

চলমান সমাজব্যবস্থার মধ্যেই ধর্মীয় মৌলবাদ উদ্ভবের মৌলিক শর্তগুলো বিদ্যমান– যাকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ শাসকশ্রেণির সকল পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্র সযত্নে টিকিয়ে রেখেছে। এরা কেউই ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। বরং প্রত্যেকেই নিজেদের প্রতারণামূলক রাজনীতিতে ধর্মকে খুবই নগ্নভাবে ব্যবহার/অপব্যবহার করেছে ও করছে।

বাস্তবে এই শাসকশ্রেণির প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই ৮০-র দশকে বিশ্বজুড়ে এই

জঙ্গী ধর্মীয় মৌলবাদী আন্দোলনকে পরিকল্পিতভাবে জন্ম দিয়েছিল। তারা এটা করেছিল আশুভাবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদকে ঘায়েলের জন্য; আর চূড়ান্তভাবে জনগণের বিপ্লবী, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও চেতনাকে দমন ও বিপথগামী করার জন্য।

যদিও আজকের বিশ্বে ধর্মীয় মৌলবাদের একাংশের সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সাধারণভাবে ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বজুড়ে তাদের দালালদের অসংখ্য ধরনের সম্পর্ক বিরাজমান।

তাই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না।

* ধর্মীয় মৌলবাদ নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ ও গণবিরোধী রাজনীতিকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটা ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করে এবং জঙ্গী মৌলবাদ জনগণের শত্রুর বদলে প্রায়ই জনগণকেই তাদের আক্রমণের টার্গেট করে। এভাবে এটা জনগণের প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বলই শুধু করে না, তাকে বিপথগামীই শুধু করে না, বরং জনগণের বিপক্ষে শত্রুর কোন না কোন অংশের সাথে গাঁটছড়াও বাধে। এরা নারী-প্রশ্নে গুরুতর প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যযুগীয় কর্মসূচি দ্বারা চালিত হয়। সর্বোপরি তারা সামন্তীয় ভাবাদর্শের আবরণে চলমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রেখে তার মধ্যেই নিজেদের একটা পরিবর্তিত স্থান করতে চায়। এসব কারণে তারা প্রকৃত প্রগতিশীল সংগ্রাম তথা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনকে বর্বরভাবে দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের পক্ষ নেয়। ইরান, আফগানিস্তানসহ এদেশেও বাংলাভাই ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং ধর্মীয় মৌলবাদকে মতাদর্শ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এককাট্টা সংগ্রাম করা ছাড়া কোন প্রগতিশীল আন্দোলনই এগিয়ে যেতে পারে না।

* কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় দালাল শাসকশ্রেণি– তাদের রাজনৈতিক পার্টি (যেমন, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত, জাতীয় পার্টি, বিকল্প ধারা, ড. কামাল প্রভৃতি), বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, বড় সামরিক ও বেসামরিক আমলা, বুর্জোয়া পত্রিকাওয়ালা ও বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি– ধর্মীয় মৌলবাদের অজুহাতে এদেশে সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী অনুপ্রবেশকেই বাড়িয়ে তুলছে। নিরাপত্তার নামে তারা রাষ্ট্রকে আরো ফ্যাসিকৃত করে তুলছে। তারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে জনগণের উপর হামলা বাড়িয়ে তুলছে। আন্তর্জাতিক তদন্তের নামে তারা নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ও গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের দালালীর দ্বারা তারা সাধারণ ধর্মপ্রাণ জনগণকে মৌলবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা সাম্রাজ্যবাদের তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'-র নামে বিশ্ব জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ, আগ্রাসন, নিপীড়নকে সমর্থন করছে ও তার অংশী হচ্ছে। আর এ সমস্ত কাজকে জায়েজ করার জন্য তারা

কথিত মৌলবাদী তৎপরতাকে ব্যবহার করছে সুচতুরভাবে। একারণেই তারা এ ধরনের কাজকে একটা সীমার মধ্যে গোপন মদদও দিচ্ছে।

সুতরাং ধর্মীয় মৌলবাদী গণবিরোধী সন্ত্রাসকে সংগ্রাম করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশে তাদের দালাল শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর ও মূল সমস্যাকে সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা। নইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন অগ্রগতি-তো হবেই না, বরং তা আরো বাধাগ্রস্থ হবে এবং মৌলবাদও শক্তিশালী হবে।

* মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ বিশ্ব জনগণের বিরুদ্ধে এক নয়া বর্বর আক্রমণাভিযানে লিপ্ত– যাকে তারা নাম দিয়েছে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'। বাস্তবে এই যুদ্ধের মাধ্যমে সে আবারো প্রমাণ করেছে যে, সে-ই বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী। সারা বিশ্বে তার একক আধিপত্য কায়েমের জন্য মানবজাতির এই ঘৃণ্য শত্রুটি যেকোন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালাচ্ছে, যেকোন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, যেকোন অজুহাত তৈরি করছে। এবং এসবের মাধ্যমেই সে বিশ্বের দেশে দেশে বর্বর আক্রমণ, আগ্রাসন, হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ চালাচ্ছে। আর এই অপকর্মে হাত মিলিয়েছে সারা বিশ্বে তাদের দালালরা। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে এ কাজে তার প্রধান সহযোগী হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। আমাদের দেশের বড় ধনী শাসকশ্রেণিটি ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটি সাম্রাজ্যবাদের এ কর্মসূচির ঘৃণ্য দালালী করছে।

বাস্তবে বিশ্বজনগণের বিরুদ্ধে (বর্তমানে প্রধানত মুসলিম জনঅধ্যুষিত দেশের বিরুদ্ধে) মার্কিনের এই বর্বর আক্রমণই বহু মুসলিম জনগণকে ধর্মীয় মৌলবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মৌলবাদের ভিত্তি এ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা চালিত তৃতীয় বিশ্বের বিদ্যমান সমাজের মধ্যেই রয়ে গেছে। ধর্মীয় মৌলবাদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে, এবং এদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগুলোর ঐতিহাসিক ও চলমান সম্পর্কের কারণে এইসব মৌলবাদী তৎপরতা অনেক ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদের প্রকল্প হাসিলের জন্য সহায়ক শর্ত যোগান দেয়। এমনকি এসবের কোন কোনটা সাম্রাজ্যবাদের ও তার দালালদের দ্বারা গোপনে পরিকল্পিত, নিদেনপক্ষে তাদের দ্বারা অনুমোদিত।

আমাদের মত একটি মুসলিম জনঅধ্যুষিত দেশে বহুবিধ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে নিজ আক্রমণ-আগ্রাসন-অনুপ্রবেশকে বাড়ানো, তাকে দ্রুততর করা ও নিশ্চিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ (ও দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে তার প্রধান খুঁটি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ) সরাসরি ও তার দালালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে যেকোন ধরনের ষড়যন্ত্র চালাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের চলমান ষড়যন্ত্রমূলক ও গণবিরোধী সন্ত্রাসী রাজনীতি ও তৎপরতাকে ঐসব বিদেশী শত্রুর আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মোটেই ঠিক হবে না।

* পরবর্তীতে নেপাল পার্টির কেন্দ্রে প্রচন্ড-ভট্টরাই-এর নেতৃত্বে সংশোধনবাদের উদ্ভব হলে সেই পার্টি অধপতিত হয় এবং নেপাল বিপ্লবের এক অমিত সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যায়– স. বোর্ড।

* দক্ষিণ এশিয়ার চলমান পরিস্থিতির অতি গুর"ত্বপূর্ণ দিক হলো মাওবাদী নেতৃত্বে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের এক নতুন উত্থান। বিশেষত নেপালে এ আন্দোলন দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের দিকে দ্র"ত এগিয়ে চলেছে। সেখানে বিশ্ব জনগণের শত্র" সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার সকল ক্ষুদ্র দেশ, জাতি ও জনগণের সাধারণ শত্র" ভারতীয় সম্প্রসারণবাদসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শ্রেণিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজ দ্র"ত এগিয়ে চলেছে।* ভারতেও এমন আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিকাশমান। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসন ষড়যন্ত্রকে ব্যাপক মাত্রায় বাড়িয়ে তোলার প্রকল্প নিয়েছে। বাংলাদেশে যেকোন রহস্যজনক গণবিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতা, অথবা বুর্জোয়া কামড়াকামড়ির সুতীব্র প্রকাশগুলো (যেমন, সামরিক শাসন জারি, জর"রী অবস্থা ঘোষণা বা ট্রাম্পকার্ড জাতীয় কর্মসূচি ইত্যাদি) এই সামগ্রিক ষড়যন্ত্র-চক্রান্ড়ের সাথে এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

* এমতাবস্থায়, দেশের পরিস্থিতি আগামীতে আরো জটিল হয়ে উঠবে– এটাই স্বাভাবিক। এটা দক্ষিণ এশিয়া সহ সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতির সাথে জড়িত। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, তাদের দালাল শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রগুলোর ফ্যাসিবাদী শাসন ও পরদেশী আগ্রাসন, অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদী নামে বা অন্য নামে বা বেনামে গণবিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতা। এ দু'য়ের মাঝে বিশ্ব ও এদেশের জনগণ ঘনায়মান অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবেন, যেমন কিনা ফিলিস্ড়িন বা ইরাকে, অথবা কাশ্মীর বা আফগানিস্ড়ানে হচ্ছে? নাকি তারা এগোবেন সম্পূর্ণ নতুন এক প্রগতিশীল ভবিষ্যতের দিকে? এটা অবশ্যই আজ জনগণকে বেছে নিতে হবে। আজ বা কাল সিদ্ধান্ড় নিতে পরিস্থিতি সকলকে বাধ্য করবে। নেপাল-ভারতের নিপীড়িত জনগণ মাওবাদের আদর্শে গণযুদ্ধকে শক্তিশালী করে একদিকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কবর খুঁড়ে চলেছেন। অন্যদিকে জনগণকে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ বা ধর্মীয় মৌলবাদের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করে এক সত্যিকারের প্রগতিশীল মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্মসূচির পথে এগিয়ে চলেছেন। এ দেশেও মাওবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলো কেটে উঠছে। এ আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে একটি সফল গণযুদ্ধ গড়ে তুলেই জনগণকে মুক্তির পথে এগোতে হবে। আমরা দেশবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী দালাল শাসকশ্রেণির সকল বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতা বর্জন করে মাওবাদী আদর্শে এক নতুন বিপ্লবী সমাজ নির্মাণের উজ্জ্বল পথে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ❑

(৫)

জর"রী অবস্থা ও পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি

(১০ ফেব্র"য়ারি, ২০০৭)

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকশ্রেণির মধ্যকার সুতীব্র কামড়াকামড়ি থেকে উদ্ভূত সংকট মোচনের জন্য বিগত ১১ জানুয়ারি জর"রী অবস্থা জারি করা হয়। যদিও নতুন (২য়) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শপথ অনুষ্ঠান বি.এন.পি. বর্জন করেছিল, কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর চাপে শাসকশ্রেণির প্রায় সকল পক্ষই বাহ্যত একে মেনে নিয়েছিল। তবে সম্প্রতি দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের নামে প্রধানত বিএনপি-পন্থী (এবং দৃশ্যত আংশিকভাবে আওয়ামীপন্থী) শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার ও বিচারের মুখোমুখি করার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি নতুন দিকে মোড় নেয়া শুর" করেছে।

* জর"রী অবস্থা জারির অব্যবহিত পূর্বে ৭ জানুয়ারির বিবৃতিতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে, শাসকশ্রেণির অন্ড়র্কলহ-উদ্ভূত অমীমাংসেয় সংকট, ও অন্যদিকে দেশ ও জনগণের বির"দ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালালদের নতুনতর ষড়যন্ত্র-চক্রান্ড়ের ফল হিসেবে জর"রী অবস্থা বা সামরিক শাসন জারির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্ড়বে শাসকশ্রেণির মাঝে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা ও পরিকল্পনা সে সময়েই আরো অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। জর"রী অবস্থা জারি, ১ম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পতন ও ২য় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতাগ্রহণ– এ সবই ছিল বাস্ড়বে একটি ছদ্মবেশী ক্যুদেতা– যার সংঘটনে প্রধানতম ভূমিকা পালন করেছে সাম্রাজ্যবাদীরা (তথাকথিত দাতাগোষ্ঠী ও কূটনীতিক নামের কর্তাব্যক্তিরা) ও সামরিক বাহিনী। তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে বড় ব্যবসায়ী, তথাকথিত সুশীল সমাজ নামের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বড় এক অংশ। বুর্জোয়া ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর একাংশ (ড. কামাল, কর্নেল ওলি, আসম রব, এরশাদ প্রভৃতি) ক্ষমতার হালুয়া-র"টির ভাগের আশায়, আর বিএনপি-বিরোধী গোষ্ঠীস্বার্থ থেকে আওয়ামী লীগও এ উদ্যোগকে সমর্থন দেয়। বুর্জোয়া দলগুলোর বড় দুই জোটের কামড়াকামড়ি, দুর্নীতি, গণবিরোধী কর্মসূচি থেকে জনগণের বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভকে এরা কাজে লাগায়।

◈ <u>প্রথম পদক্ষেপ ঃ জনগণের উপর আক্রমণ</u>

জর"রী অবস্থা ঘোষণা করে আইনগতভাবেই এরা জনগণের চলমান যেটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল তাকে সর্বপ্রথম হরণ করে। প্রথমদিকে সংবাদ-মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে বাধানিষেধ থাকবে না বলা হলেও শিগগিরই নির্দিষ্ট শাস্ড়ির বিধান করে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গণতন্ত্রের গলাবাজিওয়ালা সকল বুর্জোয়া পক্ষ এ সব কিছুকেই

টু-শব্দটি না করে সাময়িক ব্যবস্থার অজুহাতে মেনে নেয়। শুধুমাত্র সংবাদ-মাধ্যমগুলোর একটা ছোট অংশ নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে কিছু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেও বিধিনিষেধের কোন পরিবর্তন ঘটাতে তারা পারেনি।

রাজনীতিক তৎপরতা ও ধর্মঘট-আন্দোলনের অধিকাররোধে তারা সর্বপ্রথম তৎপর হয় শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে। তারপরই তারা 'অবৈধ উচ্ছেদ'-এর নামে ঢাকাসহ সারাদেশে নগর ও শহরগুলোতে হকার, বস্তি, ছোট দোকানপাট ধ্বংস করার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গরিব-নিম্নবিত্ত জনগণের জীবন-জীবিকার উপর হিংস্র আক্রমণ চালায়। যে সরকার নিজেই কিনা এক অবৈধ সরকার, যার আইনগত ও সাংবিধানিক বৈধতাটুকু পর্যন্ত নেই, সে-ই কিনা স্রেফ বন্দুক ও জেল-জুলুমের জোরে এবং বড় ধনী, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী-সুশীল সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে 'অবৈধ' স্থাপনা উচ্ছেদের নামে এই গণবিরোধী অভিযান এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। তারা 'অবৈধ' রিক্সা উচ্ছেদের নামে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শ্রমজীবী জনগণকেই শুধু সন্ত্রস্ত করে তুলছে তা নয়, তারা 'অবৈধ' বেবী/টেম্পো/বাস যাচাই-এর নামে পরিবহন সেক্টরের সাধারণ শ্রমিক ও ক্ষুদে মালিকদেরকেই শুধু অনিশ্চয়তা ও জরিমানার কবলে ফেলছে তা নয়, এভাবে তারা ব্যাপক সাধারণ মধ্যবিত্ত জনগণের জীবনেও সংকট সৃষ্টি করেছে।

তারা টিভি-লাইসেন্স চেকিং-এর নামে নগরবাসী সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করার পর জনরোষের ভয়ে নিজেদের সংশ্লিষ্টতাকে গোপন করার জন্য মিথ্যা প্রেসনোট দেয় ও সাময়িকভাবে তা স্থগিত করে বটে, কিন্তু যেকোন সময় এই সন্ত্রাসী তৎপরতা আবার তারা শুরু করতে পারে।

তারা প্রথম দিন থেকেই সন্ত্রাসী গ্রেফতারের নামে গণগ্রেফতার চালিয়ে আরেক সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। জরুরী অবস্থার একমাসের মধ্যে কমপক্ষে ৩০/৪০ হাজার লোককে তারা গ্রেফতার করে এক নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে।

তারা পূর্বতন সরকারের সূচিত তথাকথিত ক্রসফায়ারের নামে বিনাবিচারে হত্যাকাণ্ড একইভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। বরং এর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সেনা-হেফাজতে 'হার্ট-এ্যাটাক' বা অন্য কোন উপায়ে বর্বর শারীরিক নির্যাতনে হত্যার নতুন উপসর্গ। মাওবাদী বা বাম প্রগতিশীল শক্তিকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মাধ্যমে ধ্বংস করার জন্য তারা গ্রামাঞ্চলে তাদের গণবিরোধী অভিযান ও আক্রমণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

জনগণের বিরুদ্ধে এ সরকারের এইসব আক্রমণ আগামীতে আরো নতুন নতুন রূপে আবির্ভূত হবে, যদিনা জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে এসবকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন।

◈ সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন

এরা ক্ষমতায় এসে দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে আরেকটি যে প্রধান পদক্ষেপ নিয়েছে তাহলো সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচিগুলোকে দ্রুত কার্যকর করা। উপরে আলোচিত জনগণের উপর আক্রমণগুলোও তারই অংশ। সাম্রাজ্যবাদের দালাল ড. ইউনুসসহ সুশীল ও বড় ব্যবসায়ী সমাজ এখন আর রাখঢাক না করে খোলামেলাভাবে বলছে যে,

তাদের রাজনৈতিক সরকারগুলো জনমতের চাপে যা যা করতে পারে না সেসব কর্মসূচি কার্যকর করার এটাই নাকি একটা সুযোগ। বাস্তবে তারা সেভাবেই কাজ করছে, এমনকি সাংবিধানিকভাবে এ জাতীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের না থাকা সত্ত্বেও।

ইতিমধ্যে তারা তিনটি প্রধান ব্যাংক বিরাষ্ট্রীকরণের আদেশ জারি করেছে, যা ছিল বড় ধনী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দীর্ঘ দিনের দাবি। তারা বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে– যা কিনা বিগত বিএনপি সরকার সামনে নির্বাচন থাকায় জনমতের ভয়ে অন্তত তখনি কার্যকর করতে সাহস পায়নি। শিগগির তারা জ্বালানী তেলের দামও বাড়াবে বলে পায়তারা করছে, যার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও সাম্রাজ্যবাদীরা বহুদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা ভারত থেকে বিদ্যুত আমদানীর চিন্তাও করছে, যার মধ্য দিয়ে দেশ ভয়ংকরভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তারা টাটার বিনিয়োগ, এশিয়া এনার্জি ও নাইকো, চট্টগ্রাম বন্দর প্রভৃতি প্রশ্নে জনগণের আন্দোলনের চাপে স্থগিত কর্মসূচিগুলোকে পুনরায় চালু করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এ জাতীয় প্রকাশ্য তৎপরতা ছাড়াও গোপনে-যে তাদের বহু কর্মসূচি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর রাজনৈতিক তৎপরতায় জনগণের অধিকার হরণ করার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন হস্তক্ষেপ, খবরদারি, বিচরণ ও কার্যকলাপ এখন প্রকাশ্য রূপ ধারণ করেছে। যাতে প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতা করে চলেছে এনজিও নামের বহুবিধ সংস্থা ও সুশীল সমাজ।

◈ সংবিধান, বৈধতা ও তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দেউলিয়াত্ব

এদেশের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের তীব্রতাকে এড়িয়ে তাদের রাজনৈতিক দলীয় শাসনের কথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চালিয়ে নেবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের এক খচ্চর ব্যবস্থা তাদের সংবিধানে সংযুক্ত করেছিল। এভাবে তারা ৫ বছর পরপর একটা অনির্বাচিত সরকারকে সর্বোচ্চ ৩ মাসের জন্য ক্ষমতাসীন রাখার বিধান করেছিল। যদিও এটা বুর্জোয়া অর্থেও কোন গণতান্ত্রিক রীতি নয়, কিন্তু এরা একেই গণতন্ত্রের বিজয় বলে চালিয়েছিল।

কিন্তু সেই ব্যবস্থাটিকেও তারা ইতিমধ্যেই সংকটে ফেলে দিয়েছে।

বিএনপি সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দেবার পর ৩ মাস পার হয়ে যাবার সাথে সাথেই তাদের সংবিধানমতও এ সরকার তার বৈধতা হারিয়েছে। তারা গায়ের জোরে তাদেরই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে। তারা একই কায়দায় ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকেও বাতিল করেছে ও তার কিছু ফলাফলকে বাতিল করেছে। সুতরাং এটা বোধগম্য যে, তাদের কাছে অন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন, প্রেসিডেন্ট, স্পীকার, প্রধান বিচারপতির পদ– এসবও নিরাপদ নয়। অর্থাৎ তারা ইতিমধ্যেই তাদেরই সংবিধানকে অকার্যকর করে ফেলেছে, মুখে তারা

যাই বলুক না কেন, এবং দালাল আইনজীবী ও সুশীলরা যে ব্যাখ্যাই প্রচার কর"ক না কেন। সোজা কথায়, গায়ের জোরে একটা অসাংবিধানিক সরকার এখন দেশ চালাচ্ছে। এ কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত সামরিক শাসন জারির পক্ষে খোলামেলা কথা বলা হচ্ছে, এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান নিজে খোলাখুলিভাবে চলমান রাজনীতিক প্রশ্নাবলীতে প্রকাশ্যভাবে মত প্রকাশ করছে।

* জর"রী অবস্থা কতদিন চলবে, এবং এই সরকার কবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে– এ দুটো মৌলিক প্রশ্নে ১ মাস পার হবার পর এখনো পর্যন্ড় এ সরকার কোন স্পষ্ট বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত রয়েছে।

৪ মাসের বেশি জর"রী অবস্থা বজায় রাখা সাংবিধানিক নীতির দিক থেকে সম্ভব না হলেও সে প্রশ্নটিকে ধোয়াশে রাখা ও সংসদ না থাকার খোঁড়া যুক্তি এনে জর"রী অবস্থাকে সুদীর্ঘদিন চালিয়ে যাবার চক্রান্ড় এরা চালাচ্ছে।

"সংস্কার প্রক্রিয়া সেরে তারপর নির্বাচন", "কাজগুলো সারতে কতদিন লাগবে এখনই বলা যায় না"– এ জাতীয় কথামালার ধূম্রজালে তারা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতার সম্ভাবনারও ইঙ্গিত দিচ্ছে। তথাকথিত সুশীল সমাজ (সংবাদ-মাধ্যমগুলোর একটা বড় অংশসহ) ও ব্যবসায়ীদের একটা অংশ জোর গলায় বলছে, সময় বেশি লাগলে লাগুক, দুর্নীতি দমন না করে বা সংস্কার সম্পন্ন না করে নির্বাচন নয়। এমনকি কেউ কেউ প্রকাশ্যে 'সামরিক শাসনও ভাল'– এ জাতীয় মন্ড়ব্য প্রকাশ্যেই করে চলেছে।

জনমত, বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ ও প্রভাব এবং আন্ড়র্জাতিক পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন কারণে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন জারিকে তারা এখনো এড়াচ্ছে বটে, কিন্তু তার খড়্গ তারা ঝুলিয়ে রেখেছে। এবং তাদের সংকট মোচনের শেষ পদক্ষেপ হিসেবে সেটাও তারা এখন শান দিচ্ছে।

এ সবই প্রমাণ করে যে, এ সরকার হলো এক ছদ্মবেশী অসাংবিধানিক অবৈধ সরকার। অথচ এরা এখনো মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছে, এবং বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির প্রায় সবাই একে মেনে চলেছে। এভাবে এদেশে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির তথাকথিত গণতন্ত্রের দেউলিয়াত্ব প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

এরা একদিকে দেশ ও জনগণবিরোধী, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও বড় ধনী শাসকশ্রেণির সাধারণ কর্মসূচিগুলো বাস্ড়বায়ন করছে, অন্যদিকে জনগণের আন্দোলন-সংগঠন-সংগ্রাম-অধিকারকে গলা টিপে রেখেছে। এটা হলো এক অবৈধ স্বৈরতান্ত্রিক সরকার যার ক্ষমতায় থাকার ও তথাকথিত সংস্কার চালাবার নীতিগত ও নৈতিক-তো বটেই, আইনগত কোন বৈধতাও নেই।

◈ দুর্নীতি বিরোধী অভিযান

সম্প্রতি এ অভিযানে সরকারি ভাষায় কিছু 'রুই-কাতলা' ধরা পড়েছে যার অধিকাংশই বিএনপি ঘরানার। অন্যতম প্রধান বুর্জোয়া দল ও সর্বশেষ সরকারি দল হিসেবে বিএনপি'র নেতা-হোতাদের দুর্নীতি অনেক সাম্প্রতিক, জ্বলজ্বলে ও আধুনিক–

এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কারও পক্ষেই এটা বোঝা সম্ভব যে, শুধু বিএনপি নেতারাই দুর্নীতিবাজ নয়। বাস্ড়বে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাত, এলডিপিসহ সকল বুর্জোয়া পার্টির নেতারাই দুর্নীতিবাজ। কিন্তু, আরো যা বড় সত্য তাহলো, শুধু বুর্জোয়া রাজনীতিকরাই দুর্নীতিবাজ তা নয়, বরং বড় সামরিক ও বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ– এরাও দুর্নীতিবাজ। দুর্নীতির মাধ্যমেই শাসকশ্রেণির এই সকল পক্ষ বিগত ৩৬ বছরে কোটি কোটি টাকার পাহাড় গড়েছে। বর্তমান ক্ষমতাসীনরা এই দুর্নীতিবাজ শাসকশ্রেণিরই একটা অংশ। তাই, শাসকশ্রেণির এক স্বৈরতান্ত্রিক অবৈধ সরকারের এই দুর্নীতিবিরোধী অভিযান একটা স্ট্যান্ট মাত্র।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরা দুর্নীতিবাজদের একজন এরশাদকে এ সরকার ক্ষমতা নেবার সাথে সাথে দুর্নীতির এক সাজা থেকে খালাস দেয়া হয়েছে। উপদেষ্টা মইনুল হোসেন সম্প্রতি বলেছে, শুধু রাজনীতিকদের ধরা হবে, আমলা ও ব্যবসায়ীদের নয়।

এসব থেকে বোঝা সম্ভব যে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য ভিন্ন। এদেশের ইতিহাসে (পাকিস্ড়ান আমলসহ) সকল স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা নিজেদেরকে অরাজনৈতিক প্রতিপন্ন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের স্লোগান তুলেছে। বৈদেশিক অভিজ্ঞতাও সেটাই বলে। তাই, এটা পরিষ্কার যে, দুর্নীতিবিরোধী চলমান অভিযানের উদ্দেশ্য রাজনীতিক, দুর্নীতি নির্মূল নয়। জনগণের মঙ্গল তো নয়ই।

এটা এরা চালাচ্ছে, প্রথমত, নিজেদের অবৈধ ক্ষমতাকে আড়াল করার চেষ্টায় জনমতকে বিভ্রান্ড় করার জন্য; দ্বিতীয়ত, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর (যাদের আড়ালে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক বাহিনী) কোন রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য, যা হতে পারে আগামী নির্বাচনে কোনক্রমেই যেন বিএনপি ক্ষমতায় যেতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা; তৃতীয়ত, ও সম্ভবত প্রধানত, বিরাজনীতিকরণ করার জন্য, যার মাধ্যমে নিজেদের অনির্বাচিত অগণতান্ত্রিক অবৈধ ক্ষমতাকে ন্যায্য করা যায়, তাকে দীর্ঘায়িত করা যায়, এবং প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পথ সুগম করা যায়।

* উপরোক্ত পরিস্থিতিতে আগামীতে কী ঘটতে পারে তার প্রধান প্রশ্ন দুটো হলো– ১) আদৌ এ সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে কিনা; ২) যদি করে তাহলে সেটা কতদিন পর, এবং শাসকশ্রেণির কোন গোষ্ঠীকে তারা ক্ষমতায় আনতে চায়।

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জনগণের কাতারে থেকে এখনি নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কারণ, বর্তমান ক্ষমতাসীনদের ভেতরে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোতে শাসকশ্রেণির আগামী পথচিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্ড়াবনা থাকাটাই স্বাভাবিক, এবং এখানে শাসকশ্রেণির সকল পক্ষেরই কম-বেশি অংশগ্রহণ রয়েছে। তবে সর্বশেষ দুর্নীতি-অভিযানের নামে প্রধানত বিএনপি-ব্লকের উপর হামলা থেকে আওয়ামী লীগের একাংশ হয়তো মনে করছে, বা তারা হয়তো-বা অবগত যে, এটা তাদের ক্ষমতার পথ প্রশস্ড় করবে, যেমনটা এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময় তারা আশা করেছিল। শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বিবৃতিতে দুর্নীতি-অভিযানে র"ই-কাতলা ধরাকে সমর্থনদান তাকে প্রকাশ করে।

কিন্তু ঘটনাবলী এমন সরলভাবে বিকশিত না-ও হতে পারে। ইতিমধ্যেই জলিলসহ

একাধিক আওয়ামী নেতার বিবৃতি/বক্তব্য থেকে তাদের সংশয়ও ফুটে উঠেছে। আগামীতে শাসকশ্রেণির অভ্যন্ড়রে দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের বিভিন্ন ভাঙচুর ঘটবে। প্রথম থেকেই এলডিপি'র একাংশ, এরশাদ, ড. কামাল প্রভৃতির পক্ষ থেকে গায়ে পড়া সমর্থন, এবং শেখ হাসিনার বিবৃতিতে শুধু ৫/১০ বছর নয়, বিগত ২৫ বছরের (অর্থাৎ এরশাদের আমলসহ) দুর্নীতিকে ধরার আহ্বান থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, 'মহাজোট' অবিকৃত অবস্থাতে নাও থাকতে পারে। এই সরকারও এখনো পর্যন্ড় এমনকি আওয়ামী লীগের উপর কিছুটা হলেও ধরপাকড় করলেও জাতীয় পার্টি, এলডিপি, জামাত– এসবের বির"দ্ধে এখনো-যে কোন আঘাত করেনি সেটা গুর"ত্বপূর্ণ। এ সব কিছু তৃতীয় কোন রাজনৈতিক শক্তি জড়ো করার প্রচেষ্টাকে প্রতিপন্ন করতে পারে।

* বিএনপি অবশ্যই শাসকশ্রেণির একটা বড় শরিক। সুতরাং তার শীর্ষ স্ড়রে বড় ধরনের আক্রমণ শাসকশ্রেণির মধ্যে গুর"তর চাঞ্চল্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে বাধ্য। এর সাথে যদি আংশিকভাবেও আওয়ামী লীগের উপর আক্রমণ চলে তাহলে নিচ-স্ড়রে সরকারের বিরাজনীতিকরণের চক্রান্ড়ের বির"দ্ধে আওয়ামী-বিএনপি'র রাজনীতিক ব্লকের ঐক্য-সমঝোতার ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারে যা এ সরকারের জন্য মধুর হবে না। ইতিমধ্যেই হুদা-বিএনপি গ্র"প ও নাসিম-আলমগীর-সালমানদেরকে গ্রেফতারের পর আদালতে এ দু'পক্ষের আইনজীবীদের যৌথ ভূমিকা অন্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে।

সুতরাং শাসকশ্রেণির নিজের গায়ে বড় আঘাত করতে এ সরকার বাধ্য হচ্ছে তার সংকট মোচনের জন্য, অন্যদিকে এটা তার জন্য নতুন সংকটের জন্ম দিচ্ছে।

সর্বোপরি, জনগণের উপর এ সরকারের হিংস্র আক্রমণ ও দেশবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচিগুলোর উলঙ্গ উদ্বাহু বাস্ড়বায়ন দ্র"তই জনগণকে অসমর্থন, ক্ষোভ ও আন্দোলনে ঠেলে দেবে। সংকট বৃদ্ধি পেলে বিএনপি'র মত আক্রান্ড় শাসকশ্রেণির অংশগুলো জনগণের ক্ষোভকেও কাজে লাগাতে চাইবে।

সুতরাং সর্বশেষ বিকাশ জনগণের জন্য দ্র"ত অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

* এমতাবস্থায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর দায়িত্ব হলো জনগণের উপর আক্রমণ, গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর পূর্ণহরণ ও সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচিগুলোর বাস্ড়বায়ন– এসবের বির"দ্ধে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

হকার-বস্ড়ি-দোকানপাট-ব্যবসা উচ্ছেদ ও ভেঙ্গে দেয়া, গণগ্রেফতার, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, তেলের দাম বৃদ্ধির চক্রান্ড়, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির চক্রান্ড়, ব্যাংক-চট্টগ্রাম বন্দর-টাটা-নাইকো-এশিয়া এনার্জি প্রভৃতির চক্রান্ড়, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে বিরাজনীতিকরণ চক্রান্ড়, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ক্রসফায়ারের নামে বিনাবিচারে হত্যা বন্ধ, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্ড়ক্ষেপ বন্ধ, দেশীয় রাজনীতিতে ও নীতি নির্ধারণে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্ড়ক্ষেপ ও খবরদারি বন্ধ, এবং অবিলম্বে জর"রী অবস্থা তুলে নেয়া ইত্যাদি ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে তোলার বাস্ড়ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

– এদেশের শাসকশ্রেণি ইতিমধ্যেই তাদের নিজেদের সংবিধানকে বহুবার

কাটাচেরা করে, এবং সর্বশেষে এখন নিজেরাই তা পরিপূর্ণভাবে লংঘন করে তার কার্যকারিতা সম্পুর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং একটি নতুন "প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান" প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তোলার পরিস্থিতিও এখন জাতীয় রাজনীতিতে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তিকে আজ পচে যাওয়া চলমান সংবিধানের অধীনে নির্বাচনের বদলে এ আওয়াজ জোরালোভাবে তুলতে হবে এবং তেমন একটি সংবিধানের মূল নীতিগুলোকেও ধাপে ধাপে জাতির সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। এভাবে জাতীয় রাজনীতিতে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিকল্প তুলে ধরতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে উপরোক্ত কর্মসূচিগুলোর ভিত্তিতে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

শাসকশ্রেণি-জোটের বাইরে অন্যান্য বাম শক্তির সাথেও যুগপৎ আন্দোলন গড়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

এমনকি শাসকশ্রেণির মধ্যে ভাঙন আরো বেড়ে গেলে গণতান্ত্রিক ইস্যুর ভিত্তিতে (নির্বাচন-দাবির বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তিতে নয়) শাসকশ্রেণির ভাঙনকে ব্যবহার করায় মনোযোগী হতে হবে।

* দেশের চলমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের তৎপরতা ও তাদের দালাল শাসকশ্রেণির নতুন ধরনের কার্যক্রম (যার অংশ হলো ২য় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে অবৈধ ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন) সাম্রাজ্যবাদের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' কর্মসূচির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দক্ষিণ এশিয়ায় মাওবাদী আন্দোলনের নব-বিস্ড়র ও বিশেষত নেপালে মাওবাদী বিপ্লবের সম্ভাব্যতা, এবং দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও বিশ্বায়ন কর্মসূচির বির"দ্ধে ক্রমবর্ধমান জনবিক্ষোভ ও আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীদেরকে আমাদের দেশে তাদের বিষাক্ত নখর আরো গভীরে বিধিয়ে দেবার চক্রান্ড়ে চালিত করছে। এই চক্রান্ড়ে শুধু-যে আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামাত-এলডিপিই সহায়তা করছে তা নয়, এখন বরং আরো বর্ধিতভাবে তথাকথিত সুশীল সমাজ, এনজিও, ব্যবসায়ী, প্রচার মাফিয়া, আমলা, সামরিক কর্তাব্যক্তিরা তাতে সামিল হয়েছে। তারা এদেশে জনগণের প্রতিরোধ, আন্দোলন ও বিদ্রোহের সম্ভাবনাগুলোকে সমূলে ধ্বংস করতে চায়; অন্যদিকে কোন না কোনভাবে তাদের ব্যবস্থাটিকে সংস্কার করে সহনীয় করে তুলতে চায় যাতে এই টোটকা বড়ি খাইয়েই এ দেশের জনগণকে আরো বহুদিন চালিয়ে নেয়া যায়।

কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল শ্রেণিগুলোর মাঝে যে বিভ্রান্ড়ি এরা জাগাতে পারছে তা কেটে যেতে কিছু সময় লাগবে বটে, তবে মূলশ্রেণির জনগণ ইতিমধ্যেই আক্রান্ড়। তারা প্রতিরোধ করবেন তাদের জীবন-জীবিকার আশু প্রয়োজন থেকেই। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীরাও দীর্ঘদিন এ প্রতারণাকে মেনে নেবেন না।

আমরা জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি–

ভোটবাজ বুর্জোয়া রাজনীতির তপ্ত কড়াই থেকে আপনারা এখন স্বৈরতন্ত্রের জ্বলন্ড়

চুলায় পড়েছেন। একে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসুন।

আর সমাজের আমূল রূপান্ড়রের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী বহিঃশত্র ও তাদের দালাল বড় ধনী শ্রেণির সকল গোষ্ঠীর সকল রূপের শাসন-শোষণ উচ্ছেদ করে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তসহ সাধারণ জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টির নেতৃত্বে গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন।

(৬)

চলতি রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু বিষয় সম্পর্কে

(৩১ মার্চ, ২০০৭)

[২০০৭ সালের অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন জামাতুল মুজাহেদীন অব বাংলাদেশ (জেএমবি)-র ৬ শীর্ষ নেতাকে ফাঁসি দেয়া। এছাড়া তৎকালীন ছদ্মবেশী সেনা-সরকারের পরিকল্পনায় সিভিল প্রশাসনে সেনা-অফিসারদের ঢুকে পড়া প্রভৃতি গুর ত্বপূর্ণ বিষয়ে এ বিবৃতিতে বক্তব্য তুলে ধরা হয়– সম্পাদনা বোর্ড]

১। মৌলবাদী নেতাদের ফাঁসি কার্যকর ঃ

২৯ মার্চ দিবাগত রাতে আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইসহ ৬ জেএমবি নেতার ফাঁসি কার্যকর করেছে রাষ্ট্র।

জেএমবি একটি ধর্মীয় মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট সংগঠন, যা দেশব্যাপী গণবিরোধী সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে জনগণের ঘৃণা অর্জন করেছিল। তারা প্রথম বড় আকারে আত্মপ্রকাশ করে উত্তরাঞ্চলে মাওবাদীদের উপর নৃশংস সশস্ত্র আক্রমণ ও উচ্ছেদ-অভিযানের মাধ্যমে। তখন রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির বড় এক অংশ তাদেরকে মদদ ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু যখন রাষ্ট্রের সাথে অন্য দ্বন্দ্বের কারণে তারা রাষ্ট্রের উপরই সশস্ত্র হামলা করে, এবং শাসকশ্রেণির নির্বাচনী রাজনীতিতে ফ্যাক্টর হয়ে উঠায় এ নিয়ে শাসকশ্রেণির অভ্যন্ড়রীণ দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে, মাত্র তখনই রাষ্ট্র তাদের বির দ্ধে পদক্ষেপ নেয়।

কিন্তু এটা ইতিমধ্যে সবার কাছেই পষ্কিার হয়ে গেছে যে, রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির বৃহৎ এক অংশের মদদ ও প্রশ্রয়েই এরা এতটা শক্তি অর্জন করেছিল। শুধু তাই নয়, এদের সাথে অন্ড়ত মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কও যথেষ্টই প্রকাশিত হয়েছে, যেসব রাষ্ট্র আবার এদেশের ক্ষমতাসীন সকল গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের মুর ব্বী রূপে কাজ করে। এদেশে এদের উত্থান বিশ্বব্যাপী ইসলামী ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গী দল আল কায়দা, তালেবান ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত থাকার সম্ভাবনাও যথেষ্ট, যারা কিনা আন্ড়র্জাতিকভাবে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয়েই একদা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান বিশ্ব বাস্ড়বতায় এদের একাংশের সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বে এরা বলির পাঁঠা হচ্ছে। এদের ফাঁসি কার্যকর করার অর্থ এটা নয় যে এই রাষ্ট্র ও তাদের বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা ধর্মীয় মৌলবাদের চরম কোন বিরোধী পক্ষ। এ ফাঁসির পিছনে তাদের বহুবিধ কৌশল ও বাধ্যবাধকতাও কাজ করেছে।

অনির্বাচিত ও তথাকথিত অন্ড়র্বর্তীকালীন এ সরকার দ্র ততার সাথে এ ফাঁসি

কার্যকর করার পিছনে বেশ কিছু উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে। প্রথমত তাদের অসাংবিধানিক ও প্রকাশ্য স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার কার্যকারিতা ও দক্ষতা প্রমাণ ক'রে সাম্রাজ্যবাদী মুরব্বীদের সমর্থন ধরে রাখা। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে কার্যকর করা কঠিন এমন কিছু কর্মসূচি দ্রুত বাস্ড়বায়ন করে সমগ্র শাসকশ্রেণি ও তাদের রাষ্ট্রকে সংকট থেকে রক্ষা করা। (সুতরাং তারা মুজিব হত্যার আসামীদের সমস্যাকেও এখন সমাধানের দিকে এগোতে পারে যা কিনা তাদের জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী সংকট রূপে বিরাজ করছে)। তৃতীয়ত রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি কার্যকর করার এক নতুন ফ্যাসিস্ট ধারা চালু করা যা এদেশে প্রায় নতুন (এক কর্ণেল তাহেরের ফাঁসি ছাড়া এমনটা সাম্প্রতিক ইতিহাসে হয়নি)। এর মাধ্যমে তারা প্রকৃত বিপ্লবী শক্তিকে ভবিষ্যতে আইনী প্রক্রিয়াতেও হত্যা করার পথ উন্মুক্ত করছে। যা এখন তারা করছে ক্রসফায়ারের মিথ্যা গল্প চালিয়ে এবং যা ক্রমবর্ধিত বিরোধিতার মুখে পড়ছে। চতুর্থত এই অসাংবিধানিক সরকার তার নিজের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার শক্তি প্রদর্শন করতে চাচ্ছে যাতে জনমতকে বিভ্রান্ড় করা যায় এবং পাশাপাশি জনসংগ্রামকে দমন করা যায়। অন্যদিকে শাসকশ্রেণির বিরোধী অংশগুলোকেও ভয় দেখানো যায়। পঞ্চমত এই মৌলবাদীদের সাথে জড়িত ছিল এবং এখনো রয়েছে শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের এধরনের বেশি ক্ষমতাশালী দেশী-বিদেশী পক্ষগুলোকে রক্ষা করা, এবং মৌলবাদী উত্থানের এই পর্বের পিছনের ইতিহাসকে মুছে ফেলা।

এই পদক্ষেপ এদেশে মৌলবাদী উৎপাতকে চূড়ান্ড়ভাবে উচ্ছেদ করতে পারবে না, যদিনা বিপ্লবী শক্তি ও জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিকশিত করা যায়। কারণ এই ব্যবস্থা (দেশীয় ও আন্ড়র্জাতিক উভয়বিধ) প্রতিনিয়ত এদেরকে সৃষ্টি করছে ও রক্ষাও করছে। বিশেষত মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের তথাকথিত "সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ"-র মাধ্যমে বিশ্ব জনগণের উপর আক্রমণ মৌলবাদের শক্তিশালী হয়ে ওঠার এক অন্যতম পরোক্ষ কারণ। সকল বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তির দায়িত্ব হলো ধর্মীয় মৌলবাদ সৃষ্টির মৌলিক কারণের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা এবং তার সমাধানের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার উপর কোনরকম ভরসা ও নির্ভর না ক'রে এবং তাদের প্রতারণায় বিভ্রান্ড় না হয়ে এ ব্যবস্থার সমূল ও সার্বিক উচ্ছেদে ভূমিকা রাখা।

২। সেনাপ্রধানের রাজনীতি ঃ

সম্প্রতি সেনাপ্রধান ও বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা অফিসাররা সরাসরি প্রশাসন ও রাজনীতিতে ঢুকে পড়ছে, যা এখন আর গোপন নয়। এই সরকার সেনাবাহিনী ও সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে এক ছদ্মবেশী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়েছে তা এখন প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছে। কিন্তু দিন দিন সেনাবাহিনী যেভাবে ক্ষমতার বিভিন্ন ফ্রন্টে আরো বেশি বেশি করে প্রকাশ্য ভূমিকা রাখা শুরু করেছে, তা সরাসরি সামরিক শাসনের আশংকাকে বাড়িয়ে তুলছে। তবে এখনো এটা স্পষ্ট নয় যে, প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন, নাকি ক্ষমতার উৎসগুলোর স্বার্থে বড় ধরনের সংস্কার করে তারপর নির্বাচন দেয়া ও

রাজনীতিক সরকার গঠন– কোনটা তাদের লক্ষ্য। এটা এখনো তাদের মাঝেও অনির্ধারিত থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু ক্ষমতার সকল পক্ষ নিজ নিজ খেলা খেলে চলেছে, যার মাঝে সেনাপ্রধানের সাম্প্রতিক কিছু উক্তি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। তার বক্তব্যের প্রথম অংশ হলো রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের প্রতি বিষোদ্গার। দ্বিতীয় অংশ হলো তথাকথিত জাতীয় নেতাদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়।

প্রথমত এখনো এ সরকার দাবি করে যে, তারা সাংবিধানিক সরকার ও গণতন্ত্রের জন্য কাজ করছে। এ অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারী রাজনীতি করতে পারে না, যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এক মৌলিক নীতি। (যা অবশ্য ভাওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়, কারণ, বড় সামরিক ও বেসামরিক আমলারা সকল রাষ্ট্রে সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে যা কিনা বুর্জোয়া গণতন্ত্র গোপন রাখে, যেমন তারা গোপন রাখে সার্বজনীন গণতন্ত্রের বুলির আড়ালে বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্বকে)। কিন্তু সেনা প্রধানসহ সেনাবাহিনীর অনেকেই সেটা এখন করেছে ও করছে যা তাদেরই সংবিধানের গুরুতর লংঘন। সেনাপ্রধান আসলে তাদের নিজ শ্রেণির রাজনীতিকদের ও সমগ্র ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও গণবিরোধিতার সূত্র ধরে সমগ্র রাজনীতিকেই আক্রমণ করেছে; বাস্ড়বে জনগণের রাজনীতিকে আক্রমণ করেছে। এটা বর্তমান শাসকদের বিরাজনীতিকরণ কর্মসূচির স্পষ্ট নিদর্শন। এটা করেছিল জেনারেল এরশাদ, সাত্তার সরকারের থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেবার আগে। কিছুদিন আগে ড.ইউনুস একই কথা বলেছিল, যা তখন অনেক বুর্জোয়া পার্টি ও বুদ্ধিজীবীরাও বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এখন তারা মুখে তালা এঁটে রেখেছে। এমনকি কেউ কেউ তাকে নির্লজ্জ সমর্থনও করছে।

বাস্ড়বে বিগত ৩৬ বছরে শাসকশ্রেণির রাজনীতিকরা কিছুই করতে পারেনি এটা সঠিক নয়। তারা নিজেরা ও তাদের শ্রেণির অন্য সকল পক্ষ শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে। শুধু ভাগ্য বদলায়নি জনগণের। এজন্য সমগ্র শাসকশ্রেণিই দায়ী, যার প্রধান একটি অংশ হলো সামরিক আমলারা। প্রকৃত সত্য হলো এই যে, বুর্জোয়া রাজনীতিকরা দেশের ও জনগণের সর্বনাশ করলেও বিগত ৩৬ বছরে তাদের সাথে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখেছে সামরিক আমলাতন্ত্র, জনগণ যাকে সোজা ভাষায় সেনাবাহিনী বলে থাকেন। তারা এরশাদের মত চরম দুর্নীতিবাজ জেনারেলের নেতৃত্বে ৯ বছর দেশে প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্র চালিয়েছে। জিয়ার নেতৃত্বে তারা ৫ বছর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন চালিয়েছে। তারা মুজিব ও জিয়াসহ তাদেরই দুইজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেছে ও বহু রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। তারা কর্ণেল তাহেরকে বিচারের প্রহসন করে হত্যা করেছে। তারা আমাদের মত ছোট এক দেশে বিনা প্রয়োজনে এক বিরাট সেনাবাহিনী পুষে প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের এক বিরাট অংশ আত্মসাৎ করেছে ও করে চলেছে। তারা অসংখ্য জনগণকে বিনা বিচারে হত্যা করেছে। তারা জনগণের উপর অবর্ণনীয় শারীরিক অত্যাচার করেছে। বিএনপি আমলে এই সেনাবাহিনীই "অপারেশন ক্লিনহার্ট"-এর মাধ্যমে ৫০ জনের বেশি মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করে হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যু বলে চালিয়েছে। র‍্যাবের মাধ্যমে ও নেতৃত্বে তথাকথিত

ক্রসফায়ারের গল্প সাজিয়ে বিগত ২ বছরে যে এক হাজারের বেশি মানুষকে বিনাবিচারে হত্যা করা হয়েছে সেটাও হয়েছে সেনাবাহিনীরই নেতৃত্বে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে তারাই। সুতরাং বিতর্কটা এটা নয় যে, শুধু বুর্জোয়া রাজনীতিকরা ভাল নয়, আর বুর্জোয়া সেনাঅফিসার বা সেনাবাহিনী খুব ভাল। বরং সামরিক স্বৈরতন্ত্রই হলো অনেক বেশি ফ্যাসিস্ট, এবং তারা ও বুর্জোয়া রাজ-নীতিকরা যৌথভাবেই দেশের ও জনগণের দুর্গতির জন্য দায়ী।

দ্বিতীয়ত সেনাপ্রধান জাতীয় নেতাদের মর্যাদা দেবার যে কথা বলেছে সেটা এক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, তার কথামত বিগত ৩৬ বছরে যে রাজনীতিবিদরা দেশের সর্বনাশ করেছে তাদেরই নেতা হলো মুজিব, জিয়াসহ তার উল্লেখিত তথাকথিত জাতীয় নেতাগণ। সুতরাং এই রাজনীতিকদেরই মর্যাদা দেবার দাবি স্ববিরোধী। এটা তারা এখন বলছে আওয়ামী, বিএনপিসহ বুর্জোয়া রাজনীতিক দলগুলোকে কোণঠাসা করা, কিন্তু পাশাপাশি তাদের আদর্শিক নেতাদের প্রতি একটা মেকি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সেই সমর্থনকে পক্ষে টানার দুরভিসন্ধি থেকে।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির দায়িত্ব হবে এর উন্মোচন করা। একইসাথে বুর্জোয়া রাজনীতিক দল ও নেতাদের চরিত্রকে উন্মোচন করা, যারা নিজেদের রক্ষার জন্য একদিকে বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরকে, বিশেষত তাদের সেনাবাহিনীকে তেলমর্দন করছে; অন্যদিকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের দরবারে দেনদরবার করে নিজেদের রাজনীতিক ক্ষমতা পুনস্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৩। ঘরোয়া রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ ও বিরাজনীতিকরণের বর্ধিত পদক্ষেপ ঃ

শেখ হাসিনা মে মাসের মধ্যে জরুরী অবস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার সাংবিধানিক বিধান তুলে ধরে জুনের মধ্যে নির্বাচন দাবি করার পরপরই বিএনপি জুলাই-এর ১১ তারিখের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলে। এভাবে বুর্জোয়া পার্টিগুলো খোলস থেকে বের হবার চেষ্টা করার সাথে সাথে সরকার পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঘরোয়া রাজনীতি নিষিদ্ধ করে। শুধু তাই নয়, তারা তারেক রহমানকে গ্রেফতার করে। শেখ হাসিনা বিদেশ সফরে চলে যায়, যাকে সরকারের চাপে স্থায়ী বা সাময়িক দেশছাড়া করার পদক্ষেপ বলেও ব্যাপকভাবে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি খালেদা জিয়াকেও দেশছাড়া করার প্রক্রিয়া চলছে বলে বাজারে গুজব চলছে। এসবই নিছক গুজব নয়। এগুলোর সাথে সরকারের বিরাজনীতিকরণ কর্মসূচির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু এগুলো আবার শাসকশ্রেণির নতুন সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুর্জোয়া রাজনীতিক দল ও তাদের লেজুড় তথাকথিত বামদের গুরুতর সুবিধাবাদ সত্ত্বেও তারা ও তাদের প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীরা মুখ খুলতে শুরু করেছে। অন্যদিকে শাসকদের উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি কমনওয়েলথের মহাসচিব ম্যাককিননের অবিলম্বে জরুরী অবস্থা তুলে নেবার

দাবি ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরামর্শ শাসকদের প্রতি একটা গুরুতর চাপ। ই. ইউ. এবং মার্কিন, এবং অন্যদিকে সরাসরি মার্কিন ও ভারতের মাধ্যমে মার্কিনের লবিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সরকারের কাজকে প্রভাবিত করছে।

ইতিমধ্যেই সরকার যতটা হৈ-হল্লা করে তার দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচি শুরু করেছিল তা থেকে অনেকটাই পিছু হটেছে। বস্তি হকার, ছোট দোকানদার-ব্যবসায়ীসহ সাধারণ জনগণকে উচ্ছেদ সম্পন্ন করার পর তারা এখন বড় ধনীদের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কর্মসূচি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অব্যাহত গতি সাধারণ জনগণতো বটেই, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও মোহমুক্ত করা শুরু করেছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তাদের চাপ বজায় রয়েছে যার সবকিছুই দ্রুতই তাদের পক্ষে মেনে নেয়াও কঠিন হয়ে উঠছে। তারা বিএনপি, আওয়ামী লীগ সহ সব ফ্রন্টে আঘাত করে নিজেদের শ্রেণিতে একা হয়ে যাবার ঝুঁকি সৃষ্টি করে চলেছে। সবমিলিয়ে এ পরিস্থিতি খুব বেশিদিন অব্যাহত রাখা এদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

বিপ্লবী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির করণীয় হবে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করা, পরিস্থিতি উপযোগী কৌশল গ্রহণে দক্ষ হওয়া, পরিস্থিতির সুপ্ত অনুকূলতাগুলোকে বের করে নিয়ে আসা ও কাজে লাগানো, নিজেদের মাঝে ঐক্যকে বৃদ্ধি করা, মধ্যবর্তী শক্তিগুলোর সাথে যুগপৎ আন্দোলনের কৌশলকে বিকশিত করা, জরুরী অবস্থা তুলে নেবার দাবিকে জোরালো করে তোলা, শ্রেণি এবং জনগণের শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলোকে জাগরিত করে তোলা ও তাকে তীব্র করা, এবং সম্ভবমত প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলোর নীতিসম্মত ব্যবহার করা। ❑

(৭)

বর্তমান পরিস্থিতির উপর কিছু প্রয়োজনীয় পয়েন্ট

(১৫ জুন, ২০০৭)

[মইনুদ্দিন-ফখর-দ্দিনের নেতৃত্বে সেনা-সুশীল স্বৈরতন্ত্র ক্ষমতা দখল করে নিলে যে সমস্ড় রাজনৈতিক পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে সেসবের উপর এই বক্তব্যটি প্রচার করা হয়েছিল– সম্পাদনা বোর্ড]

১। তথাকথিত সংস্কার সম্পর্কে

সমগ্র শাসকশ্রেণি ও তাদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা জর-রী অবস্থা জারির পর 'সংস্কার' নামে দেশে এক হুলুস্থুল কা- করে ফেলার ভাব দেখাচ্ছে।

অবশ্য তাদের রাজনৈতিক কিছু মহল, যারা শাসকশ্রেণির অভ্যন্ড়রীণ দ্বন্দ্বে এখন বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তারা এই সংস্কার সম্বন্ধে তাদের সুপ্ত বিরোধিতাকে 'সংস্কারটা কী' বলে নরম সুরে প্রশ্ন উত্থাপন করছে। তবুও এটা বলা চলে যে, তারাসহ মূলত সমগ্র শাসকশ্রেণি এই 'সংস্কার'-এর কর্মসূচিকে মেনে নিয়েছে। খুশি হয়ে বা স্বইচ্ছায়, অথবা তা না হলে বাধ্য হয়ে।

আসলেই এই সংস্কারটা কী, এই উদ্যোগটার পেছনে কারা রয়েছে এবং কেন, এই সংস্কার দ্বারা কার স্বার্থ হাসিল হচ্ছে এবং বিশেষত শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ জনগণের, অর্থাৎ ব্যাপক সংখ্যাগুর- মানুষের কোন উপকার এতে হবে কিনা– ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত পরিস্থিতিটা উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

** বিগত ১১ জানুয়ারি জর-রী অবস্থা জারি ও ২য় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনটা-যে ছিল একটি ছদ্মবেশী সামরিক ক্যুদেতা, সেটা বেশ আগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন আর তাতে কেউ তেমন একটা সন্দেহ প্রকাশ করছে না, এবং সংশ্লিষ্টরাও খুব একটা রাখঢাক করছে না। এর পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক প্রভুদের হাত, এমনকি পরিকল্পনা ছিল– সেটাও তারা নিজেরাই বলে দিচ্ছে। সামরিক বাহিনী কেন প্রত্যক্ষভাবে সামনে এলো না সেটাও তাদের প্রভুদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল।

– প্রধানত এ কারণেই তাদেরই সংবিধানকে সুস্পষ্টভাবে লংঘন করে ৩ মাসের বেশি একটি অনির্বাচিত সরকার সংবিধানের কথা বলেই তারা চালিয়ে যেতে পারছে। এই গণবিচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ২ বছর এই ক্ষমতা চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিচ্ছে। ৪ মাসের বেশি জর-রী অবস্থার সাংবিধানিক বিধান না থাকা সত্ত্বেও অনির্দিষ্টকালের জন্য তা চালাতে পারছে। এমনকি ক্ষমতাসীন

কারও কারও পক্ষ থেকে জর-রী অবস্থার মধ্যেই নির্বাচন হবে এমন ধরনের কথা বলা হচ্ছে। এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থূল টালবাহানা করা হচ্ছে।

এ কারণেই আওয়ামী, বিএনপি'র মত শক্তিশালী রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও তারা ক্ষীণ কণ্ঠে এর বিরোধিতা ছাড়া আর কিছু প্রতিবাদ করতে পারছে না। 'সংস্কার'-এর নামে তাদের শীর্ষ স্ড়রের ও মাঠ স্ড়রের নেতাদের পাইকারী গ্রেফতার ও তাদের বির-দ্ধে যা ইচ্ছা তাই মামলা দেয়া সত্ত্বেও সেগুলো তাদের হজম করতে হচ্ছে। তাদের প্রধান দুই নেতা খালেদা ও হাসিনাকে বাদ দিয়ে তাদের পার্টি দুটোকে মাথা কেটে মেরে ফেলা বা অন্ড়ত পঙ্গু করে দেবার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ্যে বলা সত্ত্বেও সংস্কার কর্মসূচিকে তারা নিজেরাই চালাবার অঙ্গিকার করছে। এবং ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো দ্বারা উপর থেকে চাপানো একটা 'তৃতীয় শক্তি' কৃত্রিমভাবে তৈরি করে তাকে ক্ষমতাসীন করার সুস্পষ্ট আলামত সত্ত্বেও প্রচলিত বুর্জোয়া রাজনীতি তার বির-দ্ধে তেমন কিছুই করতে পারছে না ও করছে না।

– বুর্জোয়া রাজনীতিকরা যেটুকু করছে তাহলো অভিন্ন বিদেশী প্রভুদের কাছে দেনদরবার করা। সামরিক বাহিনীকে তোষামোদ করা। এবং তারা যখন তাদেরকে সুযোগ দেবে, যদি দেয়, তার জন্য অপেক্ষা করা। তারা বিনাকারণে 'ধৈর্য ধরা'র কথা বলছে না (খালেদা)। যদিও কেউ কেউ মাঝে মাঝে 'ধৈর্য ভেঙে যাবার' আস্ফালনও করছে (হাসিনা)।

– এই অবস্থাটা এখন সুস্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে, এই বুর্জোয়া রাজনীতি জনগণ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন। এবং তাদের ক্রিমিনাল নেতৃত্বসারি (শীর্ষ, মাঝারী ও নি স্ড়রেও অনেকটা) জনগণকে নিয়ে বর্তমান প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্রের বির-দ্ধে আন্দোলন করতে কতটা অসমর্থ।

** এখন যারা ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছে, অর্থাৎ সামরিক বাহিনী, সুশীল সমাজ নামের বুর্জোয়া–সাম্রাজ্যবাদী দালাল বুদ্ধিজীবীরা ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা– তারাই 'সংস্কার' কর্মসূচিটা পেশ করেছে, তাদের শিখ-ী বর্তমান তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে। এজন্যই তারা তথাকথিত দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের নামে প্রতিপক্ষ বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তির বির-দ্ধে একটা দমন অভিযান চালাচ্ছে। এর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো, যাদেরকে পক্ষে আনা যাবে না তাদেরকে দাবিয়ে রাখা, একটা অংশকে ভয় দেখিয়ে বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা, এবং বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ ও সুযোগসন্ধানী অংশটাকে কিনে নেয়া।

সমগ্র দমন অভিযানটা তারা চালাচ্ছে তথাকথিত যৌথবাহিনী দ্বারা, যা হলো কার্যত সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে রাষ্ট্রীয় সকল বাহিনীর অভিযান, মূলত সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত অভিযান। এখানে মনে রাখতে হবে যে, র‍্যাব-ও বাস্ড়বে সামরিক বাহিনীরই বর্ধিতাংশ, যা গঠন করা হয়েছিল বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর অংশীদারত্বকে নিশ্চিত করার জন্য, এবং সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি অনুপ্রবেশের লক্ষ্যে।

নির্বাচন কমিশন, দুদক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও বিভিন্ন গুর-ত্বপূর্ণ পদে প্রাক্তন সামরিক অফিসাররা নিয়োজিত হয়েছে।

এসব ছাড়াও সবকিছুর উপর খবরদারির জন্য পৃথক দুর্নীতি দমন ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে, যা সরাসরি সামরিক বাহিনী চালাচ্ছে। প্রতিটি জেলায় একজন মেজরের নেতৃত্বে এর শাখা গড়ার প্রকল্পটা হলো জেলা পর্যায় পর্যন্ড় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে সামরিক বাহিনীর হাতে নিয়ে নেয়া।

আর সাম্রাজ্যবাদীরা একেবারে নেংটো হয়ে এখানে সংস্কার ও রাজনীতির রূপরেখা বলে বলে দিচ্ছে।

এসবের মাধ্যমে ও জোরেই তারা 'সংস্কার'টা চাপিয়ে দিচ্ছে। সামরিক বাহিনী ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব শক্তির এই অবৈধ, দেশবিরোধী ও গণবিরোধী চাপ না থাকলে এই সরকারের পক্ষে দু'দিনও টেকা সম্ভব ছিল না, এবং তথাকথিত সংস্কারের বড় বড় বুলি আওড়ানোও সম্ভব হতো না। এখন রাজনীতিকদের মধ্যকার সুযোগসন্ধানী, যারা জোরেশোরে সংস্কারের কথা বলছে, তারা এই শক্তির মদদে সাহসী হয়েই তা বলছে। কিছু অংশ গা বাঁচানোর জন্যও এখন তা বলে চলেছে। এটা মোটেই আর অস্পষ্ট নয় যে, বুর্জোয়া পার্টিগুলোরও যারাই সংবিধান, জর"রী অবস্থা, নির্বাচন ইত্যাদি মূল বিষয়াবলীতে এ সরকারের দুর্বল জায়গাগুলোতে বিরোধিতা করছে, তাদের উপরই নেমে আসছে 'সংস্কার'-এর খড়্গ। আর যারা যথেষ্ট দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্ত হিসেবে নাম কামিয়েও এই নতুন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে মদদ দিচ্ছে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। এমনকি কেউ কেউ ভাল তবিয়তে 'সংস্কার'-এর পক্ষে সক্রিয় রয়েছে।

** 'সংস্কার'–এর কিছু বাহ্যিক দিক, যা বেশি বেশি প্রচার পাচ্ছে ও প্রচার করা হচ্ছে, সেগুলো হলো নিম্নরূপ –

– তথাকথিত দুর্নীতি বিরোধী অভিযান, যা মূলত পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতিক ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু ব্যবসায়ী বা আমলার বির"দ্ধে।

– এই দুর্নীতির হাত ধরে বুর্জোয়া রাজনীতিতে সৃষ্ট দুর্বৃত্তায়নকে নির্মূল করার নামে বিদ্যমান প্রধান বুর্জোয়া পার্টিগুলোকে অকর্মণ্য ও অপ্রয়োজনীয় করার প্রচেষ্টা।

– এজন্য পার্টিগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে পরিবারতন্ত্রকে অপসারণ করার নামে 'মাইনাস টু ফর্মূলা'য় খালেদা-হাসিনার অপসারণ প্রক্রিয়া চালানো। এবং এভাবে প্রধানতম বুর্জোয়া দলদুটোকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অবস্থান থেকে সরানো। পাশাপাশি তথাকথিত 'সংস্কারপন্থী'দের দ্বারা এ পার্টিগুলোর বা তার অংশের ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সেগুলোকে নিজেদের দালালে পরিণত করা।

– এই সবকিছুর মাধ্যমে এবং নতুন কিছু রাজনীতিক কথাবার্তা বলে (যেমন, সেনাপ্রধানের 'বাংলাদেশী ব্র্যান্ড গণতন্ত্র', কথিত 'জাতীয় নেতা'দের মর্যাদাদান, পরিবারতন্ত্র বিরোধী জেহাদ, চাঁদাবাজিমুক্ত পার্টি– ইত্যাদি) একটি নতুন রাজনীতিক প্লাটফর্ম বা ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা, যাকে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ করে নিতে চায়, এবং তাদের চলমান কর্মসূচিগুলোকে পরেও অব্যাহত রাখতে চায়।

– এজন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কারের নামে নিত্য-নতুন বিধি জারি করা, যাতে উপরোক্ত লক্ষ্যগুলো তারা হাসিল করতে পারে।

– সর্বোপরি, ব্যাপক সাধারণ জনগণ যেন কোন রকম প্রতিবাদ ও আন্দোলন করতে না পারেন সেজন্য জর"রী অবস্থার খাড়া প্রধানত তাদেরই মাথার উপর ঝুলিয়ে রেখে জনগণের বিভিন্ন অংশ বিশেষত শ্রমিক শ্রেণি ও প্রতিবাদী ছাত্র-তর"ণ সমাজের রাজনীতিক অধিকারকে স্থায়ীভাবে কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র চালানো। এজন্য তাদেরই শ্রেণির বুর্জোয়া পার্টিগুলোর দ্বারা সৃষ্ট গণবিরোধী নৈরাজ্যের দৃষ্টান্ড়গুলোকে তারা জনমত গঠনে সুচতুরভাবে কাজে লাগাচ্ছে, যা এই শাসকশ্রেণি বহু পূর্ব থেকেই প্রচার করে চলেছে।

– সহজেই এটা দৃষ্টিগ্রাহ্য যে, এই সংস্কারে বিদ্যমান গণবিরোধী রাষ্ট্রের প্রধানতম খুঁটি গণবিরোধী, ফ্যাসিস্ট, সাম্রাজ্যবাদের ভাড়া খাটা, বিশাল বাজেট খেকো, দেশ ও জনগণের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও তাদের ঘাড়ে চাপা দৈত্যসম সেনাবাহিনীর সংস্কারের কোন কথা নেই। রাষ্ট্রের গণবিরোধী আমলাতন্ত্রের, যা কিনা বৃটিশ সৃষ্ট, তার সংস্কারের কোন কথা নেই। রাজনীতিতে একেবারে উলঙ্গভাবে হস্ড়ক্ষেপকারী সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকাকে বাতিল করার কোন সংস্কারের কথা নেই। সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ., এডিবি – প্রভৃতির প্রেসক্রিপশনে চলা দেশ ও গণবিরোধী অর্থনীতির সংস্কারের কথা নেই। বুর্জোয়া পার্টিগুলো যে বড় ধনীদের দ্বারা শ্রমিক ও জনগণের তীব্র শোষণের ব্যবস্থাকে বহাল করে দেশের সাধারণ জনগণের জীবনে নাভিশ্বাস এনেছিল তার সংস্কারের কোন কথা নেই। কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের কোন কথা নেই। এরকমভাবে সংস্কৃতি, শিক্ষা, জাতীয় প্রশ্ন, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নসহ মৌলিক কোন বিষয়েই সংস্কারের কোন কথা তারা বলছে না। আসলে তারা জনগণের স্বার্থে কোন রকম সংস্কারকেই হাতে নেয়নি।

** এটা সত্য যে, দুই প্রধান রাজনীতিক দলের মধ্যকার তীব্র কামড়াকামড়ির মাধ্যমে প্রকাশিত শাসকশ্রেণির চরম অন্ড়র্দ্বন্দ্ব তাদের ব্যবস্থাকে বহুদিন ধরেই গুর"তর সংকটে ফেলে দিয়েছিল, যা খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে গত জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। সুতরাং শাসকশ্রেণির পক্ষ থেকে ভিন্ন পদক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। এমন এক প্রেক্ষাপটেই ১১ জানুয়ারির ঘটনা ঘটে।

কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, এই পদক্ষেপ সমগ্র শাসকশ্রেণিকে একইভাবে সেবা করবে। বিশেষত এই পদক্ষেপের সাথে জড়িত হয়ে যায় শাসকশ্রেণির অন্য অংশগুলোর (যেমন, সামরিক বাহিনী, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বী অংশ, তথাকথিত সৎ রাজনীতিকদের ক্ষমতাপ্রত্যাশী অংশ ইত্যাদির) একচেটিয়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পদক্ষেপ। এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সেজন্য তারা যাকিছু প্রতারণা, মিথ্যা, টালবাহানা করা প্রয়োজন তা করছে। তাদের ঘোষিত 'দুর্নীতি বিরোধী' জেহাদ-যে একপেশে ও রাজনীতিক উদ্দেশ্য সম্বলিত সেটা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাস্ড়বে আমাদের দেশে শাসকশ্রেণির এই অভ্যন্ড়রীণ কামড়াকামড়ি হলো বিদ্যমান ব্যবস্থার একটা অনিবার্য বাস্ড়বতা, যা তাদের কোন গোষ্ঠীর পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়, এবং তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়াও সম্ভব নয়। এটা হাসিনা বা খালেদার ব্যক্তি অহমিকার কোন বিষয় নয়, অথবা দুই প্রধান রাজনীতিক দলের ক্ষমতা কুক্ষিগত

করার দুর্বৃত্তসুলভ মনোভাবের কোন বিষয় নয়। যদিও অন্য সব বিষয়ের মত এখানেও নেতৃত্বের বা দলের বা গোষ্ঠীর নিজস্ব দোষ-গুণ, যোগ্যতা-অযোগ্যতা কিছুটা ভূমিকা রেখে থাকে।

** সংস্কার কর্মসূচির প্রধানতম উদ্দেশ্য তাহলে এটা নয়, এবং হতেও পারে না যে, তারা তাদের দ্বারা বেশি করে ঘোষিত ও প্রচারিত কর্মসূচিগুলো (যেমন, দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি প্রশাসন ও ব্যবসা, নিরপেক্ষ নির্বাচন, ভাল গণতন্ত্র, দেশ ও জনগণের স্বার্থ ইত্যাদি) বাস্ড়বায়ন করতে চায়। আরো বেশি সত্য হলো এ কথাটি যে, সেগুলো তাদের পক্ষে কার্যকর করাই সম্ভব নয়, যদিও সাময়িকভাবে কিছু চমক দেখানো সম্ভব, এবং বিরোধী পক্ষকে কুপোকাত করার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ তাদের বির"দ্ধে তারা নিতেই পারে। আমাদের দেশে পাকিস্ড়ান আমলে এবং পরে বহুবার জনগণ শাসকদের পক্ষ থেকে 'দুর্নীতি বিরোধী অভিযান'-এর ভ"ামি কথা শুনেছেন ও দেখেছেন। এরা সারমর্মে একই শাসকশ্রেণি। বিশেষত সামরিক শাসকরা ক্ষমতা গ্রহণের আগে বা পরে এ ধরনের স্লোগান তুলে থাকে। সেটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশেও ঘটে থাকে। সুতরাং এ ধরনের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান বা সংস্কার-এর স্লোগানে বিভ্রান্ড় হবার কোনই অবকাশ নেই। যারা আজ ক্ষমতাসীন তারা কোন দূর গ্রহ থেকে আবির্ভূত হয়নি। তারা এই দুই রাজনীতিক দল, তাদের নেত্রী, তার পূর্বে সামরিক শাসক ও দুর্নীতিবাজ সকল আমলের হাত ধরেই আজ এখানে এসেছে। এরা এই ব্যবস্থারই ফসল, তারই সুবিধাভোগী, তারই রক্ষক।

** সংস্কার কর্মসূচির প্রধানতম এজেন্ডা হলো সাম্রাজ্যবাদের কর্মসূচিগুলোকে দ্র"ততার সঙ্গে কার্যকর করা।

বিষয়টা এমন নয় যে, বিগত ১৫ বছরের রাজনীতিক দলীয় শাসনে সরকারগুলো সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ডা অনুযায়ী চলেনি। বরং তারা খুব বিশ্বস্ড়তার সাথেই সেটা করেছে। আজ তাদের যেসব দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে (যা কিনা তাদের প্রকৃত দুর্নীতির খুবই ক্ষুদ্র ও কম গুর"ত্বপূর্ণ অংশ) এবং আরো গুর"ত্বপূর্ণ যেগুলো বলা হচ্ছে না, সেগুলোও সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচির হাত ধরেই এসেছে, এবং তারই অংশ ছিল। ৯০-স া ে ল রাজনীতিক দলীয়-শাসনের কর্মসূচিটাও সাম্রাজ্যবাদের কর্মসূচিরই অংশ ছিল। সেটা এখনো-যে তারা হাতে রেখেছে তা বোঝা যায়, যখন তারা এই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে হাসিনাকে দেশে আনে, বা ঘরোয়া রাজনীতি দ্র"ত দেয়া ও নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার জন্য চাপ বজায় রাখে তখন।

কিন্তু রাজনীতিক শাসনামলে খুব কম করে হলেও জনগণ কিছুটা গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করেন। অন্যদিকে চরম গণবিরোধী হলেও এই বুর্জোয়া রাজনীতিক-দেরকে কিছুটা হলেও জনগণের মুখাপেক্ষী হতে হয়। ফলে তারা চাইলেও দেশ ও গণবিরোধী সব সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচি তৎক্ষণাৎ, সাম্রাজ্যবাদী চাহিদা মতই কার্যকর করতে পারে না।

তাই, সাম্রাজ্যবাদীরা এই প্রকাশ্য স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে স্বাগত জানায়, যাদের জনগণের কাছে কোন রকম জবাবদিহিতাই নেই, এমনকি তাদের শ্রেণির অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছেও। তাদের জবাবদিহিতা শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে, ও সামরিক বাহিনীর কাছে, যা বিগত কয়মাসে খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়ে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এমন একটি সরকারের মাধ্যমেই দ্র"ততার সাথে তাদের কর্মসূচিগুলো বাস্ড়বায়নের পদক্ষেপ নেয়।

পাশাপাশি তারা বিভিন্ন কারণে সামরিক শাসনকে ঠেকিয়ে রাখছে। এবং সংস্কার শেষে নির্বাচন ও রাজনীতিক সরকার প্রতিষ্ঠার মূলা ঝুলিয়ে রাখছে ও তার জন্য নসিহতও করছে। এটা এই সরকারের উপর তাদের চাপ সৃষ্টির একটা কৌশলও বটে, যাতে তারা আরো ভাল করে তাদের কর্মসূচিগুলোকে আদায় করে নিতে পারে।

এর অর্থ এমন নয় যে, সামরিক শাসনটা তাদের এজেন্ডায় নেই। সেটাও তাদের রয়েছে, প্রায় সর্বদাই থাকে, এবং যে কোনভাবে বা কারণে সেটা এসে গেলে তারা তাকেও মদদ দেবে, এমনকি তারা নিজেরাই তার পরিকল্পনা করে দিতে পারে। পাশাপাশি সামরিক শাসন এলেও এখনকার মতই 'গণতন্ত্রে উত্তরণ'-এর কসরৎ তারা দেখিয়ে যাবে।

** দুর্নীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনা, বুর্জোয়া দল ও বুর্জোয়া রাজনীতি এবং তাদের নির্বাচনী ব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কার করা– ইত্যাদিও সাম্রাজ্যবাদ ও শাসকশ্রেণিরই এজেন্ডা। তাদের ব্যবস্থাকে চালিয়ে নিতে হলে এ ছাড়া তাদের উপায়ও নেই, যাকিনা তারা তাদের এতদিনকার রাজনৈতিক দল ও শাসনের দ্বারা মীমাংসা করতে পারেনি। বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই, সে লক্ষ্যে তারা কিছু কাজ করতে চায়, এবং তা করছেও বটে। কিন্তু পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে যে, এগুলো তাদের গৌণ বিষয়। কারণ, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, পরিবারতন্ত্র, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি যা কিছুর কথা বলা হচ্ছে, এবং যেসবের জন্য শুধু দুই নেত্রী বা তাদের রাজনীতি ও পার্টি দুটোকে দায়ী করা হচ্ছে, সেগুলো সারবস্তুগতভাবে এই ব্যবস্থারই অংশ, এবং এই ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস না করে সেসবকে নির্মূল করার কোন প্রশ্নই আসে না।

** তাই দেখা যাবে যে, এই তথাকথিত সংস্কার জনগণের স্বার্থানুসারী কোন বিষয়তো নয়ই, বরং তা মূলগতভাবে আরো বেশি করে দেশ ও জনগণবিরোধী। ইতিমধ্যে সাধারণ জনগণতো বটেই, ব্যাপক মধ্যবিত্তের কাছেও এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আদপে এটা কোন সংস্কারই নয়। ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই-যে এইসব তথাকথিত সংস্কার চালানো হচ্ছে, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আরো উঠবে।

তাই, এর রাজনৈতিক চরিত্র ও উদ্দেশ্যের উন্মোচন, এবং পাশাপাশি সমগ্র শাসকশ্রেণি ও ব্যবস্থার চরিত্র উন্মোচনই হতে পারে এখনকার প্রকৃত গণমুখী রাজনীতি।

২। শাসকশ্রেণির সংকট

বর্তমান ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় এসেছিল যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে তার মাঝে একটা

হিসেবেও তারা চিহ্নিত হয়ে চলেছে। এভাবে জনগণের মোহমুক্তি, তীব্র হতাশা, চাপা ও অসহায় ক্ষোভ, অন্যদিকে নিজ শ্রেণির মাঝে বিরোধী পক্ষের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেবার পরিস্থিতি একটা অভ্যুত্থানমূলক অবস্থার দিকে দেশকে নিয়ে চলেছে। সেটা গণঅভ্যুত্থান ও প্রতিক্রিয়াশীল ক্যুদেতা উভয়টির জন্যই পরিস্থিতি পরিপক্ক করে তুলছে।

** এই সংকট থেকে তাদের কোন রেহাই নেই। হয় তাদের বড় বড় বাগাড়ম্বরকে অসমাপ্ত রেখে যেনতেনভাবে রাজনৈতিক শাসনে ফিরে যেতে হবে, এবং তা করতে গিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অপউদ্দেশ্যকে আরো প্রকাশিত করতে হবে। প্রতিপক্ষ গুলোর সাথে আপোষও করতে হবে। নতুবা সংকট মোচনের শেষ উপায় হিসেবে সেনাশাসনকে ডেকে আনতে হবে। সেনা শাসন হলে কিছুদিনের জন্য শাসকশ্রেণির স্থিতিশীলতা এলেও দ্রুতই বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকটে তারা জড়িয়ে পড়বে।

তাই, দেখা যাচ্ছে যে, এই শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্র কোন ক্রমেই তাদের গভীর সংকট থেকে মুক্তি পাবে না। যদিও প্রকাশ্য এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসন তার ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল করেছে জনগণকে, বিশেষত দরিদ্র জনগণকে, এবং প্রকৃত বিপ্লবী শক্তিকে। এবং সেকারণে বিপ্লবী শক্তির জন্য বাস্তব কিছু প্রতিকুলতাও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতি এই কোটারী স্বার্থের বিচ্ছিন্নতাকেও দ্রুততর করছে। তারা শুধু জনগণ থেকেই বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তা নয়। তারা গাছের ডালে বসে ডাল কাটার পথ গ্রহণ করে নিজ শ্রেণিতেও বেশি বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে একটা অভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে চললেও নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে কোন রাজনৈতিক শক্তি এখনই এমন কোন অভ্যুত্থানকে সচেতনভাবে গড়তে সক্ষম নয়। একদিকে প্রকৃত বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তি এখনো যথেষ্ট দুর্বল ও বিভক্ত। অন্যদিকে প্রচলিত বুর্জোয়া রাজনীতি ব্যাপকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়লেও জনগণ থেকে তাদের গুরুতর বিচ্ছিন্নতা ও তাদের নগ্ন গণবিরোধিতা এমন পর্যায়ে উপনীত যে তাদের পক্ষে কোন গণআন্দোলন দ্বারা এর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তবে পরিস্থিতিটা এমন যে, যে কোন সময় যে কোন জ্বলন্ত ইস্যুতে স্থানীয়ভাবে জনগণ অভ্যুত্থানে ফেটে পড়তে পারেন। যাতে বুর্জোয়া রাজনীতিও মদদ দিতে বাধ্য হতে পারে। এবং ব্যবস্থার সংকট মোচনের উপায় হিসেবে, বা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যে কোন ধরনে বা নামে নতুন কোন প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যুত্থানও ঘটতে পারে।

এই সমগ্র পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এখনি বিপ্লবী নেতৃত্বে কোন বিকল্প গড়ে তোলা যদিও সম্ভব নয়, কিন্তু তার লক্ষ্যে শক্তিশালী, সচেতন ও দক্ষ কর্মতৎপরতা চালাতে হবে প্রকৃত বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে। আর এ পরিস্থিতিকে আরো পরিপক্ক করা ও তার সুযোগ গ্রহণ করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তিকে রাজনৈতিক মঞ্চে বড় ভূমিকা পালনের উপযুক্ত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। ❑

আশু লক্ষ্যতো অবশ্যই ছিল শাসকশ্রেণির অচলাবস্থা মোচনের মাধ্যমে তাদের সংকটের অবসান করা। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের নেয়া পদক্ষেপসমূহ তাদের নতুনতর সংকটকে জন্ম দিচ্ছে যা অনিবার্য, এবং সেটা উপরে দেখানোও হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জনগণকে কিছুটা বিভ্রান্ত করতে পারলেও ক্রমেই পরিস্থিতি বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য অনুকূল হয়ে উঠছে।

এরা দুই প্রধান বুর্জোয়া দলের সুতীব্র কামড়াকামড়ি ও অনমনীয়তা, এবং একচেটিয়া দুর্নীতি ও ক্ষমতার কারণে সৃষ্ট বিদ্যমান ব্যবস্থার অচলাবস্থা ও সংকট মোচনের কর্মসূচি নেয়ায় নিজ শ্রেণির মধ্যে প্রধান অংশের সমর্থন পেয়েছিল। উপরন্তু, তাদের একচেটিয়া দুর্নীতি ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলায় এবং তাদের একটা অংশের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নেয়ায় অন্তত মধ্যবিত্তেরও একটা আশু সমর্থন তারা পেয়েছিল সন্দেহ নেই। জনগণ বুর্জোয়া দলগুলোর কামড়াকামড়ি ও চরম গণবিরোধী তৎপরতায় এতটাই অতিষ্ঠ ছিলেন যে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে কোন কথা ও কাজ প্রাথমিক সমর্থন পায়।

কিন্তু জনগণের মোহ ভাঙতেও খুব একটা সময় লাগছে না। এটা জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশ এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার স্থায়ী সংকটের প্রকাশ। এ সরকার প্রথম থেকেই গ্রাম-শহরের গরীব মানুষের রুটি-রুজির বিরুদ্ধে আঘাত করে তাদের থেকে তো বটেই, সৎ বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তসহ সুশীল সমাজের একাংশের মাঝেও বিরোধিতা সৃষ্টি করেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, তার বল্গাহীন ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুতের ভয়াবহ সংকট, তদুপরি গ্যাস-বিদ্যুত-জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি রোধের বদলে তা আরো বাড়ানোর অব্যাহত ষড়যন্ত্র, শিল্প খাতে শ্রমিকবিরোধী নগ্ন পদক্ষেপ, তাদের গণবিরোধিতা এবং সাম্রাজ্যবাদের দালালী চরিত্র জনগণের হতাশাকে এমন মাত্রায়বিকশিত করেছে যে, জনগণের সমস্ত সমর্থন এখন উবে গিয়ে তার স্থলে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এ সরকারের কোটারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দিন দিন প্রকাশ হয়ে পড়ায়, দিন দিন তাদের মিথ্যা ও প্রতারণার সম্মুখীন হওয়ায়, অব্যাহতভাবে মানবাধিকার লংঘন করে চলায়, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কাছে তাদের পুরোপুরি সমর্পিত হতে দেখায়, দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিরোধী কর্মসূচিগুলো দ্রুততার সাথে কার্যকর করায় ব্যাপক দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত জনগণের কাছেও তাদের চরিত্র দ্রুত উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে এরা সংস্কারের নামে নিজেদেরই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেভাবে আক্রমণ করছে, যেভাবে নিজ শ্রেণির একটা প্রভাবশালী অংশকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে বা দিতে বাধ্য হচ্ছে, আবার যেভাবে নির্বাচন, 'গণতন্ত্র' ও রাজনৈতিক দলীয় শাসন ফিরিয়ে আনার কথা বলছে, তাতে তাদের সংকট দ্রুত বেড়ে চলেছে। তাদের এ সংকট প্রকাশ পায় বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ ঘোষণার পর দ্রুতই আবার তা থেকে পিছু হটার মধ্য দিয়ে, তাকে নরম করে দেয়ার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি নিজ শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্বকে ইচ্ছামুক্তভাবে তীব্রতর করার মধ্য দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচিগুলো মেনে চলাটা যেখানে তাদের প্রাণভোমরা, সেখানে তার জন্যই আবার দ্রুত গণবিরোধী ও দেশবিরোধী

(৮)

নির্বাচনের ফলাফলের উপর বিবৃতি

(সংক্ষেপিত)

(১ জানুয়ারি, ২০০৯)

[মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন চক্র পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের মদদে ক্ষমতাসীন হলেও পরে তাদেরই পরিকল্পনাধীনে নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সে নির্বাচনে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ এই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও তাদের বৈদেশিক প্রভুদের সরাসরি পরিকল্পনায় বিজয়ী হয়। ২০০৮ সালের শেষে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের উপর এই বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছিল– সম্পাদনা বোর্ড।]

শাসক বড় ধনী শ্রেণির ক্ষমতা ভাগাভাগির হিস্যা নির্ধারণ করার জন্য অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক সংসদ নির্বাচনে সব মহলের অনুমিতভাবেই আওয়ামী লীগ/মহাজোট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করছে।

আসন সংখ্যার দিক থেকে আওয়ামী জোটের তুলনায় বিএনপি-জোটের পার্থক্য অনেক বড় দেখালেও ভোট সংখ্যার দিক থেকে তাদের পার্থক্য খুব অস্বাভাবিক জায়গায় যায়নি। ভোটের সময়ে আওয়ামী-বিএনপি পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত জনগণ মোটামুটিভাবে একইধারায় বিভক্ত থাকেন। যে কারণে, এবারও বিএনপি-জোটে ভোট দেখানো হয়েছে প্রায় ৩৭%। আর আওয়ামী পক্ষে পড়েছে ৫৫%। এটা খুব বিশাল কোন পার্থক্য নয়।

এই দুই পক্ষের কে ক্ষমতায় যাবে সেটা ভোটে নির্ধারিত হয় মোটাদাগে ১০%–১৫% নিরপেক্ষ ভোটারের একটা বড় অংশের পক্ষ বদলের কারণে। ২০০১-সালে যারা বিএনপি'র দিকে সমর্থন দিয়েছিল, সেই ধরনের গ্রুপটি এবার প্রধানত আওয়ামী জোটের দিকে ঘুরে গেছে।

সুতরাং শাসক শ্রেণির প্রধান বিভক্তিটা বজায় রয়েছে। সেই সাথে জনগণও ভোটের রাজনীতিতে সেভাবেই বিভক্ত রয়েছেন।

** বিএনপি'র পরাজয় নির্ধারিত ছিল প্রধান দুটো কারণে–

প্রথম কারণ হলো– শাসকশ্রেণির প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে সর্বসাম্প্রতিক দলীয় সরকার চালানোর কারণে শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিকতা, গণবিরোধিতা, দেশদ্রোহিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস, চরমতম শোষণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিচার বহির্ভূত হত্যা এবং বিপ্লবী ও আন্দোলন পরিচালনাকারী জনগণের উপর ফ্যাসিস্ট দমন প্রভৃতির জন্য জনগণের ন্যায্য অনাস্থা/ক্ষোভের প্রধান টার্গেট ছিল তারা। ভোটে তার প্রকাশ ঘটেছে।

যেহেতু বিপ্লবী রাজনীতিতে ব্যাপক জনগণ সজ্জিত নন, তাই, সমগ্র ব্যবস্থা উচ্ছেদের পথে না যেয়ে তারা আশু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নেতিবাচক ভোট দেন।

* দ্বিতীয় কারণটি হলো শাসকশ্রেণির নিজেদের মধ্যকার পছন্দের বিষয়।

উপরে আলোচিত কারণে, এবং অন্য আরো কিছু কারণে শাসকশ্রেণির প্রধানতম শক্তিগুলো– যেমন, সেনা-আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, এনজিও-গ্রুপ, সুশীল সমাজ, মিডিয়া এবং তাদের বৈদেশিক প্রভু, বিশেষত মার্কিন, ইইউ ও ভারত– এরা প্রধানভাবে বিএনপি-কে পুনরায় ক্ষমতাসীন করতে চায়নি। তাদের এই পরিকল্পনাকে নিশ্চিত করার জন্য বিগত ২ বছর ধরে সেনা-সুশীল প্রকাশ্য স্বৈরতান্ত্রিক সরকারটি বিএনপি-কে কোণঠাসা করার ব্যবস্থা করে। এর ফলে বিএনপি ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

** বিএনপি'র পরাজয়ের অন্য কিছু মৌলিক কারণ রয়েছে। সেটা হলো বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক (দক্ষিণ-এশীয়) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দালালীর প্রতিযোগিতায় আওয়ামী লীগের থেকে পিছিয়ে পড়া। এবং দেশে ক্ষমতাসীনদের বিরাগভাজন থাকা। এগুলো হলো–

ক) ভারত-মার্কিনের পরিকল্পিত এশীয় হাইওয়েকে কার্যত ভারতের জন্য ট্রানজিট বানানোর ষড়যন্ত্রকে বিএনপি বিরোধিতা করে। বিপরীতে আওয়ামী লীগ ভারতের পরিপূর্ণ মনোরঞ্জন করে একে তার ইশতেহারে প্রকাশ্যে সমর্থন দেয়।

খ) ভারত-মার্কিনের পরিকল্পিত সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতার নামে দক্ষিণ-এশীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মসূচিকে বিএনপি বিরোধিতা করে। বিপরীতে আওয়ামী লীগ এই সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ ও প্রকাশ্য সম্মতি দান করে।

গ) যদিও খুব নরম সুরে, কিন্তু বিএনপি মার্কিনের নেতৃত্বে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধকে কিছু সমালোচনা করে, যাকিনা মধ্যপ্রাচ্যে তার বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ ও চীনের সাথে তার বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভারতবিরোধী কিছু পলিসি থেকে সে আনতে চেয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ পরিপূর্ণভাবে মার্কিন ও ভারতের সুরে কথা বলে।

এইসব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণ বিএনপি'র পরাজয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

ঘ) বিগত দুই বছরের ছদ্মবেশী সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সংবিধান বিরোধী অবৈধ ক্ষমতা ও তার দেশ ও গণবিরোধী সকল কার্যক্রমকে আওয়ামী লীগ বৈধতা দানের আগাম ঘোষণা করে। বিএনপি সেক্ষেত্রে কিছু রিজার্ভেশন নিয়ে কথা বলে। ফলে ক্ষমতাসীনদের সমর্থন আওয়ামী লীগই ভোগ করে।

** বিএনপি'র পরাজয়ে তার আমলের আরো যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার ভূমিকা রয়েছে সেগুলো হলো–

– ইসলামী জঙ্গীবাদী তৎপরতার বিকাশে, বিশেষত বাংলা ভাই কর্মকাণ্ডে তাদের মদদ বা প্রশ্রয়কে আওয়ামী লীগ কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে।

– যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নকে আওয়ামী লীগ ব্যবহার করতে পেরেছে।

– এবং মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিকভাবে তার শক্তিশালী অবস্থানকে বিএনপি'র বিরুদ্ধে এবার কাজে লাগাতে পেরেছে। প্রথমোক্ত দুটো ক্ষেত্রেও এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

** নির্বাচন কমিশন, সরকার, সেনাবাহিনী, সুশীল সমাজ প্রভৃতি এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু বলে যে বুলি কপচাচ্ছে সেটা প্রতিটি নির্বাচনের পরই, বিশেষত '৯০-এর পর থেকে শাসকশ্রেণি ও তাদের প্রভুরা করেছে।

কিন্তু সত্য কথা হলো এই যে, এটা জনগণের জন্য, প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য কোন অবাধ নির্বাচন নয়।

– বাস্তবে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ জনগণ ভোটটা দেন শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সাজানো দাবার ছকে। এক্ষেত্রে জনগণ খেলোয়াড় নন, নিছক দর্শকমাত্র, যাদের কাজ হলো ভোট নামক হাততালি দেয়া বা না দেয়া। মূল খেলোয়াড় হলো বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির বিভিন্ন পক্ষ। শুধু রাজনৈতিক দলই নয়, শাসকশ্রেণির অন্য সকল প্রধান গোষ্ঠী, যেমন, নির্বাচন কমিশন, দুদক, বিচার ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, বৈদেশিক প্রভু, এনজিও পাল্টা, সুশীল সমাজ, মিডিয়া গডফাদার, ব্যবসায়ী সমিতি– এরাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।

সুতরাং, জনস্বার্থ বা গণক্ষমতা– কোন অর্থেই এই নির্বাচন কোন কাজের নয়।

– তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের দেশে বুর্জোয়া অর্থেও নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

এটা বাস্তব তথ্য যে, বিগত দুই বছরে বিএনপি-কে পরাজিত করার ব্যবস্থা শাসকশ্রেণির ক্ষমতাসীনদের মধ্যে আগেই ঘটানো হয়েছে। সুতরাং এটা বহু কথিত কোন লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড ছিল না।

– ৮৭%-এর বেশি ভোট পড়া, এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসনে ৯০%-এর বেশি ভোট পড়ার ঘটনা (তা-ও সিইসি'র কথামতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুপুর ২টার মধ্যে) প্রমাণ করে যে, অন্তত ১০% থেকে ১৫% ভোট ভোটারবিহীনভাবে পড়েছে।

– যাদেরকে দুই বছর ধরে দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের প্রায় সবারই নির্বাচনে যোগ দেয়া, এবং তাদের বহুজনের বিজয়ী হওয়া প্রমাণ করে যে, এই নির্বাচন তাদের প্রচারমতেই সুষ্ঠু হতে পারে না ও পারেনি।

* তৃতীয় শক্তির 'সুশীল', 'সৎ' নেতাদের সার্বিক পরাজয় প্রমাণ করেছে যে, বিগত ৩৭ বছর ধরে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের যে প্রধানতম দুটো পার্টি গড়ে তুলেছে তাদের গন্ডির বাইরে তারা নিজেরাই যেতে পারেনি। বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের সংস্কারের স্লোগান মাঠে মারা গেছে।

– ঠিক একই কারণে কিছু বামপন্থী যারা কৌশলের নামে নির্বাচনে অংশ নিয়ে শোচনীয় ফল দেখিয়েছে তাদের এ কৌশল গুরুতর ভুল বলে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে।

– মেনন ও ইনুদের মত তথাকথিত বাম-রা নৌকা প্রতীকে ভোট করে নির্বাচিত

হয়ে নিজেদেরকে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরস্থ বিরোধী দল বলে প্রমাণ করেছে। এদেরকে জনরাজনীতি ও বামপন্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করার আর কোন বিকল্প নেই।

– 'না'-ভোট শোচনীয় পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সুশীলরা পরাজিত হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু রাঙামাটি, যার আলোচনায় বুর্জোয়া মিডিয়া উৎসাহ দেখায়নি।

= সবমিলিয়ে এই ভোট কোন বিশেষ কিছু হয়নি। ৯০-এর পর বাকি সব নির্বাচনের মতই একটা নির্বাচন এটা। দু'বছরে শাসকশ্রেণি নিজেদেরকে কিছুই বদলাতে পারেনি, যার এত প্রচার তারা করে থাকে।

** আওয়ামী লীগ তার মার্কিন প্রভুদের অনুসরণে স্লোগান তুলেছিল 'দিন বদল' বা 'পরিবর্তন'-এর।

কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ জনগণের পক্ষে এই "দিন বদল" স্লোগানের কোন অর্থই নেই।

আওয়ামী লীগ আগে যা ছিল এখনও তাই রয়েছে। এই আওয়ামী লীগ ২০০১-সালের নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দলীয় সন্ত্রাস, স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, শোষণ-লুটপাটের কারণে। তারা এখনো সেটাই। তাদের কাছ থেকে জনস্বার্থের কোন মৌলিক পরিবর্তন আশা করা বোকার স্বর্গে বাস করার সামিল। যারা আশা করছেন অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হবে।

ইতিমধ্যেই বিএনপি'র দখলে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখলের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রকৃত 'দিন বদল'/'পরিবর্তন' শুরু হয়ে গেছে।

– দুর্নীতিবিরোধী বড় বড় কথা বললেও দুদকের মামলায় আওয়ামী গোষ্ঠীর নেতারা নিজেরাও অনেকে আসামী। ১ নম্বর দুর্নীতিবাজ এরশাদ শেখ হাসিনার বড় ভাই হয়েছে। এমনকি বিএনপি আমলের দুর্নীতির যে অভিযোগ তুলে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ কিছু জনমত গঠন করেছে তারও কোন সার্বিক বিচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব না। দু'একটা লোক দেখানো পদক্ষেপ ও বিএনপি-কে কোণঠাসা করার চেষ্টায় কিছু আইনী প্রক্রিয়া চললেও সেই দুর্নীতির বিচার, অর্থ উদ্ধার, তার রিপোর্ট প্রকাশ এগুলোর কিছুই তারা করতে পারবে না। কারণ, মৌলিক শ্রেণি-ঐক্যের কারণে সেটা তারা করতে সক্ষম নয়।

ইতিমধ্যেই তাদেরই কথিত প্রধান দুর্নীতিবাজ পরিবারের কর্তা খালেদা জিয়ার সহযোগিতা শেখ হাসিনা চেয়েছে। এভাবে তারা নিজেদের শ্রেণি-ভ্রাতৃত্ব প্রমাণ করেছে ইতিমধ্যেই।

– যে দ্রব্যমূল্যের কথা এত বেশি আওয়ামী লীগ বলেছে সেক্ষেত্রেও কিছু আশু ও সাময়িক সমাধান ছাড়া তারা কিছুই করতে পারবে না, কারণ বিএনপি-র সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর ও বড় ধনী শ্রেণির অর্থনীতির সাথে আওয়ামী লীগের কোন পার্থক্যই নেই।

– আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে স্লোগান দিয়ে কিছুটা মধ্যবিত্ত জনমত পেয়েছে সেটাও তারা করতে পারবে না। কারণ, '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের গডফাদাররা বহু আগেই শাসকশ্রেণিতে আত্মীকরণ হয়ে গেছে। যেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগেরও ভূমিকা ছিল। কিছু লোক দেখানো পদক্ষেপ ও প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা রাখার জন্য তারা কিছু

আইনী প্রক্রিয়া নিলেও প্রকৃত কোন সামগ্রিক শাস্তির ব্যবস্থা তারা করতে পারবে না।

– মৌলবাদবিরোধী স্লোগান তুললেও তারা নিজেরা ইশতেহারে ধর্মকে ব্যবহার করেছে মৌলবাদীদের মতই। এতে মৌলবাদ বরং টিকে থাকবে, গজিয়ে উঠবে। এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আধখেচড়া যে পদক্ষেপ তারা নেবে (যদি নেয়) তাতে বরং এই শক্তিগুলো আরো বেশি করে মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

** বিএনপি ভোট-জালিয়াতির অভিযোগ আনলেও প্রভুদের নির্দেশে ও নিজ শ্রেণির সাময়িক স্থিতিশীলতার জন্য সংসদে যোগ দেবে বলেই ধারণা করা যায়।

কিন্তু এটা শাসকশ্রেণির মধ্যকার কামড়াকামড়িকে সমাধান করতে পারবে না। সুজনের সুশীল পরামর্শ যতই মধ্যবিত্তরা সমর্থন করুন না কেন, এই কামড়াকামড়ি অনিবার্য।

সেনা-সুশীলদের চক্রান্ত অব্যাহত থাকবে। কারণ, আওয়ামী ও বিএনপি'র বিকল্প তৈরি করার প্রয়োজন শাসকশ্রেণির জন্য শেষ হয়নি, যা পূরণের লক্ষ্যে তারা কাজ করেছে। এর সাথে সেনা আমলাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা ও তাতে মার্কিনের হাত নতুনতর ষড়যন্ত্রকে এগিয়ে নিতে বাধ্য।

শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্নীতিবাজ ছিল ও থাকবে। কোন সেনা-সুশীল পদক্ষেপ এর চরিত্র বদলাতে পারবে না। কারণ, তারা নিজেরা এরই অংশ।

শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের জন্য কোন প্রকৃত গণতন্ত্র আনতে পারবে না। কারণ, তারা জনগণের শত্রু।

তারা পরিচালিত হয়েছে ও হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের স্বার্থ রক্ষা করে।

শাসকশ্রেণির সকল গোষ্ঠী সমভাবে দেশদ্রোহী, গণবিরোধী, অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, লুটেরা, এবং শোষক। বিগত ৩৮ বছরে এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। বার বার প্রমাণিত হয়েছে এই ব্যবস্থার নির্বাচন জনগণের ক্ষমতা দূরের কথা, কোন মৌলিক স্বার্থ হাসিল করতে সক্ষম নয়। সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ছাড়া এবং জনগণের প্রকৃত ক্ষমতা ও গণতন্ত্র, এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া শ্রমিক-কৃষক-দরিদ্র সাধারণ মানুষের কোন বিকল্প নেই। সেজন্য বিপ্লবী সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই।

আমরা, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, জনগণকে সে পথেই আহ্বান জানাই। আহ্বান জানাই, প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভ্রান্তিপূর্ণ নির্বাচনী মোহ থেকে মুক্ত হোন। এই সমগ্র বুর্জোয়া শাসকশ্রেণিকে ও তাদের বৈদেশিক প্রভুদের উচ্ছেদ করে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার যে 'রূপান্তর', প্রকৃত যে 'পরিবর্তন', সেজন্য সংগঠিত হোন, সচেতন হোন, লড়াই-এর মাঠে নেমে আসুন, গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন। ❑

(৯)

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত"

বিডিআর-বিদ্রোহ সম্পর্কে/১

(২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

[সেনা-কর্তৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী আধা-সামরিক বাহিনী "বাংলাদেশ রাইফেলস"-এ (বিডিআর– বর্তমানে বিজিবি) সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে সাধারণ সৈনিকেরা এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহ সংঘটিত করেন ২০০৯ সালের ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি। মূলত সেনা স্বৈরাচার বিরোধী এই বিদ্রোহ শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রকে গুরুতর সংকটে ফেলে দেয়। বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে দুটো বিবৃতি পার্টির পক্ষ থেকে পর পর প্রকাশ করা হয়। সেগুলো এখানে প্রকাশ করা হলো– সম্পাদনা বোর্ড]

*** শ্রেণি শোষণ-নিপীড়ন ও সেনা-স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এটা ন্যায়সঙ্গত বিডিআর বিদ্রোহ।**

*** বিপ্লবী রাজনীতিক নেতৃত্বের অভাবে এই বিদ্রোহ বিশৃংখল সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।**

*** দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত এতে থাকতে পারে, এবং এ অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য তারা সক্রিয়।**

◈ শোষণ-নিপীড়নমূলক ও গণবিরোধী বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় শাসক বড় ধনী শ্রেণির সম্পদ ও ক্ষমতাকে পাহারা দেবার জন্য তারা আনসার থেকে শুরু ক'রে সেনাবাহিনী পর্যন্ত বহুবিধ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে।

– কিন্তু এই বাহিনীগুলোর ব্যাপক সাধারণ সদস্যগণ হলেন প্রধানত কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী ও সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সে কারণে এই বাহিনীগুলোর অভ্যন্তরেও শ্রেণি পার্থক্য ও শোষণ-নিপীড়ন খুবই ভয়াবহ। এমনকি বিভিন্ন বাহিনীর মাঝে মর্যাদা ও ক্ষমতাগত ব্যাপক পার্থক্যও এই শ্রেণিবৈষম্যেরই একটা অংশ। এর ফলে এই প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীগুলোর সাধারণ সদস্যদের মাঝে তাদের অফিসারদের বিরুদ্ধে রয়েছে ব্যাপক ক্ষোভ ও ঘৃণা। একইসাথে বিভিন্ন বাহিনীর মাঝে রয়েছে গুরুতর দ্বন্দ্ব, উচ্চতর বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে নিম্নতর বাহিনীগুলোর ন্যায্য ক্ষোভ। বিডিআর-এর প্রধান উচ্চপদগুলো সবই সেনা অফিসারদের দখলে থাকার কারণে এই আন্তর্বাহিনী দ্বন্দ্ব আরো প্রকট রূপ নিয়েছে। এসবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারির বিডিআর বিদ্রোহে।

◈ বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের জবানীতে সেনা অফিসারদের বিগত দুই বছরের

শত শত কোটি টাকার দুর্নীতির খবর প্রকাশ পেয়েছে। যা সেনা আমলাদের সামগ্রিক দুর্নীতির একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

◈ এই বিদ্রোহকে দমনের নামে সেনাবাহিনীর ব্যাপক যুদ্ধকালীন শক্তি মোতায়েন তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রেরই প্রকাশ। তারা বিডিআর-দের নিরস্ত্র করার পর বা তার আগেই ব্যাপক সামরিক অভিযান চালিয়ে গণহত্যার প্রস্তুতি নেয়।

– প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে, নাকি তার নির্দেশের বাইরে এটা ঘটানো হয়েছে সেটাও অস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমার সুস্পষ্ট ঘোষণার পরও রাজধানীর প্রকাশ্য জায়গায় সেনা ক্যাম্প স্থাপন ক'রে প্রাণ ভয়ে পলাতক বিডিআর সদস্যদেরকে সেখানে বন্দী করা হচ্ছে। এ কাজে বেসামরিক লেবাসে সেনাবাহিনীর বর্ধিত অংশ ফ্যাসিস্ট 'র‍্যাব' সেনাবাহিনীর হয়ে ভূমিকা রাখছে।

◈ এক্ষেত্রে আওয়ামী সরকারের মের"দ"হীনতা ও সেনাবাহিনীর নগ্ন তোষণ নীতিও প্রকাশিত হয়।

– বিডিআর-দের পক্ষ থেকে বারংবার যুদ্ধাভিযানে সজ্জিত সেনা প্রত্যাহারের ন্যায্য দাবি জানানো সত্ত্বেও সরকার ও প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্যও সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করেনি।

– প্রধানমন্ত্রী ও বহু মন্ত্রী, এমপি বিডিআর জোয়ানদের কোন কিছু করা হবে না বলে ওয়াদা দিয়ে তাদেরকে নিরস্ত্র করার পর এখন কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বলা শু"র" করেছে যে আইন নিজের গতিতে চলবে, হত্যার বিচার হতে হবে– ইত্যাদি। এভাবে তারা নগ্ন প্রতারণার পথেও যাচ্ছে।

◈ বিদ্রোহ কীভাবে সৃষ্টি হলো তার কোন তদ"ভিত্তিক রিপোর্ট পেশ না করে সেনা অফিসারদের নিহত বা নিগৃহীত হবার একপাক্ষিক কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে নগ্নভাবে বিডিআর জোয়ানদের বিপক্ষে সেনাবাহিনীর বর্বর গণহত্যা ও নিপীড়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে ও হচ্ছে।

– অথচ বহু সংখ্যক বিডিআর জোয়ান হতাহত হওয়া, পিলখানা ও দেশব্যাপী হাজার হাজার বিডিআর জোয়ান ও তাদের পরিবারের উৎকণ্ঠা, দুর্ভোগ, শোককে প্রায় আমলই দেয়া হচ্ছে না।

– একইভাবে বেসামরিক সাধারণ জনগণের হতাহত হওয়ার ক্ষতিকেও এখন কমই প্রচার করা হচ্ছে। তাদের জন্য কোন ক্ষতিপূরণের ঘোষণাও সরকার দেয়নি।

◈ পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মহল সক্রিয়।

– বিগত দুই বছর ধরে কার্যত সেনাশাসন চালিয়ে নির্বাচনের পর ব্যারাকে ফিরতে বাধ্য হলেও এই সুযোগে পুনরায় সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানো হয়েছে।

– আরো জটিল অবস্থা সৃষ্টি হলে তার অজুহাতে সামরিক শাসন জারি করার ষড়যন্ত্র তাদের হাতে ছিল না বা নেই তা বলা যাবে না।

– প্রাক্তন সামরিক স্বৈরাচারী এরশাদ ২৫ তারিখেই মাঠে নেমে বিডিআর-দের বির"দ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর নসিহত করেছে, যা ব্যাপক ও গভীর ষড়যন্ত্র-চক্রা"ড় চলমান বলে প্রকাশ করে।

– ভারতের ষড়যন্ত্র এতে রয়েছে কিনা সে প্রশ্ন ইতিমধ্যেই শাসকশ্রেণির পার্টি বিএনপি'র পক্ষ থেকে পরোক্ষভাবে তোলা হয়েছে। বিএনপি'ও তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির কাজে একে ব্যবহার করবে না তা বলা যাবে না।

◈ এই পরিস্থিতি উদ্ভবের চলমান কারণ সেনা স্বৈরাচার, তাদের বিপুল দুর্নীতি, এবং তাদের দ্বারা চালিত শোষণ ও নিপীড়ন।

– এর মৌলিক কারণ নিহিত সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের মাঝে। শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের গণবিরোধী চরিত্রের মাঝে।

– এ অবস্থার মৌলিক রূপা"ড় না হওয়া পর্য"ড় এ ধরনের বা এর চেয়ে আরো বড় বড় বিদ্রোহ উদ্ভূত ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

– বিপ্লবী রাজনীতির নেতৃত্ব ছাড়া এ সকল বিদ্রোহ বিশৃংখল ও নৈরাজ্যিক তৎপরতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না।

– প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী শাসক বড় ধনী শ্রেণিকে তার হাজারো অপরাধ ও অপকর্মের জন্য এ ধরনের চরম মূল্য মাঝে মাঝে দিতে হবেই। এর জন্য তারাই দায়ী।

◈ আমরা অপরাধী ও ফ্যাসিস্ট সেনা-অফিসারদের জন্য কোন শোক জানাতে পারি না। আমরা সহমর্মিতা জানাই হতাহত সাধারণ বিডিআর-জোয়ান, সাধারণ জনগণ ও তাদের পরিবার বর্গের ক্ষয়ক্ষতি, শোক ও উৎকণ্ঠার প্রতি। একইসাথে নিরপরাধ সেনা-অফিসারদের হতাহত হওয়া এবং বহুসংখ্যক নারী-শিশুর নিগৃহীত হওয়া ও বেদনার প্রতিও সহানুভূতি জানাই।

◈ আমরা সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও জনগণের প্রতি জোরালো দাবি উঠাতে বলি–

– বিদ্রোহ দমন ও শা"ড়ির নামে বর্বর হত্যা ও নিপীড়ন অভিযানের ষড়যন্ত্র বন্ধ কর!

– অবিলম্বে সেনা প্রত্যাহার কর!

– পলাতক বিডিআর গ্রেফতারের নামে হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ কর!

– সাধারণ ক্ষমাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর কর!

– সকল বিডিআর জোয়ানকে পূর্ব চাকরিতে বহাল কর!

– বিডিআর-দের ন্যায্য দাবি মেনে নাও! ❑

(১০)

বিডিআর-বিদ্রোহ সম্পর্কে বিবৃতি/২

(৩ মার্চ, ২০০৯)

বিদ্রোহী বিডিআর যে ব্যাপক হত্যা ঘটিয়েছে সেটা শাসক শ্রেণির অপকর্ম ও অপরাধেরই প্রতিক্রিয়া। এটা তাদের নিজেদের শিক্ষারই প্রকাশ।

বিডিআর সদর দপ্তরে বিদ্রোহের প্রথম প্রহরেই ব্যাপক সেনা অফিসারদের হত্যা করা হয় বলে ধারণা করা হয়। বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবেই এই বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য হয়েছে, যাতে শাসকশ্রেণির কোন দেশী বা বিদেশী মহলের ষড়যন্ত্রও থাকতে পারে। বিডিআর প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণির শিক্ষায় শিক্ষিত তাদেরই এক ভাড়াটিয়া বাহিনী। সীমান্ড় প্রহরা ছাড়াও জনগণের বিদ্রোহ দমনে তাদেরকে শাসক শ্রেণি ব্যবহার ক'রে থাকে। সে ক্ষেত্রে পাইকারী হত্যা ও অত্যাচার একটি প্রচলিত পদ্ধতি।

বিগত দুই বছরে সেনা পরিচালিত র‍্যাব বাহিনীর দ্বারা হাজারের উপর বন্দীকে নির্মমভাবে হত্যা তার একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ মাত্র। বাংলাদেশের ইতিহাসে সেনাবাহিনী জনগণের উপর তো বটেই, এমনকি নিজ বাহিনী ও শ্রেণির অভ্যন্ড়রে এ ধরনের অসংখ্য হত্যা ও বর্বরতা করেছে। তাদের নিজ শ্রেণির প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানকে হত্যা ছাড়াও '৭৫-সাল থেকে '৮১-সালের মধ্যে কয়েক হাজার সেনা সদস্যকে তারা নিজেরাই হত্যা করেছিল। এরশাদের নেতৃত্বে তারাই এদেশে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করে অসংখ্য হত্যা, নির্যাতন ও দুর্নীতি করেছিল। বিএনপি আমলে ক্লিনহার্ট অপারেশন করে ৫০ জনের মত মানুষ অত্যাচার করে হত্যা করেছিল। বিগত দুই বছরে ছদ্মবেশী সেনাশাসন কায়েম করেও তারা হত্যা, অত্যাচার ও দুর্নীতির মাধ্যমে বহু শত্র" সৃষ্টি করেছে। বিডিআর দ্বারা সংঘটিত হত্যা এসবের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

বিডিআর কর্তৃক হত্যার একপেশে প্রচার ও মানবিক আবেগ সৃষ্টি দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ড় করা এবং নিজেদের সংকট ও ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এটা সত্য যে নিহত অফিসারদের বড় একটা অংশ ছিলেন নিরপরাধ, নিহত হবার মত দায়ী নন, এবং তাদের হত্যা ও তাদের পরিবারবর্গের শোক ও সংকটের প্রতি সহানুভূতি দাবি সঠিক। কিন্তু এটাও সত্য যে অফিসারদের একটা বড় অংশ নিঃসন্দেহেই ছিল ফ্যাসিস্ট, অত্যাচারী ও দুর্নীতিবাজ। সশস্ত্র বিদ্রোহ হলো একটা যুদ্ধ, যাতে মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা, তাতে মানবিক সমস্যা ঘটবেই। নিহত বিডিআর সদস্যদেরও পরিবার রয়েছে, তাদেরও শোক, সংকট রয়েছে যা এই শাসক শ্রেণি ভুলিয়ে দিতে চাইছে। একইসাথে নিহত ও আহত জনসাধারণের বিষয়টাকেও তারা প্রায় সম্পূর্ণ আড়ালে নিয়ে গেছে।

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী সরকার
ব্যাপক সাধারণ বিডিআর-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো

২৬ ফেব্র"য়ারি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের আশ্বাসে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করার পরপরই আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্রোহী বিডিআর-দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা এখন বলছে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার অর্থ নাকি এটা নয় যে, যারা বিদ্রোহ করেছে, হত্যা করেছে তাদের বিচার হবে না। এটা খোদ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যরা আরো নগ্নভাবে সব দায়দায়িত্ব বিডিআর-দের উপর চাপাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিডিআর-দের নিজের ছেলে বলে সম্বোধন করে মায়ের মত তাদেরকে আশ্বস্ড় করার পর এখন বলছে সেগুলো নাকি ছিল নিছক কৌশল। এটা তারা করছে সেনাবাহিনীকে তোষণ নীতির দ্বারা সেটা স্পষ্ট। এমনকি সেনাবাহিনীর চাপেও তারা এটা করছে।

এলিট সেনাবাহিনীর পক্ষে, আর সাধারণ বিডিআর জোয়ানদের বিপক্ষে
সমগ্র বড় ধনী শাসকশ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে

কারণ, বিডিআর তাদের নিজেদের বাহিনী হলেও যখন বিডিআর-সেনাবাহিনী যুদ্ধ বেধেছে তখন তারা তাদের প্রধান বাহিনী সেনাদের পক্ষ নিয়েছে। বিডিআর-কে তারা পরে আবার পুনর্গঠন করতে পারবে বলে ভাবছে। তদুপরি বিডিআর বিদ্রোহে শাসক শ্রেণি ও তার এলিট বাহিনীর বির"দ্ধে ন্যায্য দাবি থাকায়, এবং তাদের এই এলিট বাহিনীর অফিসারদের উপর বিশাল ধরনের আক্রমণ হওয়ায় তারা এখন হিংস্রভাবে বিডিআর-এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে।

সবাই বলছে ষড়যন্ত্র, কিন্তু কী সেই ষড়যন্ত্র? ষড়যন্ত্রটা কে করছে?

২৫ তারিখ থেকেই ভারতের মিডিয়াগুলো প্রচার করেছে যে, জামাত এই ষড়যন্ত্র করেছে। বিএনপি ঘরানার লোকেরা বলতে চাচ্ছে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ড় নিরাপত্তা ধ্বংসের জন্য এটা করেছে। ২৮ তারিখে শেখ হাসিনা বলেছে, নিশ্চিতভাবেই এতে কারও ষড়যন্ত্র রয়েছে। এরশাদ বলেছে দেশের সামরিক শক্তিকে ধ্বংসের জন্য এটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এদের অনেকেই বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্রের কথা বলছে। সেনাবাহিনীও এখন সে কথাই বলছে। কিন্তু কী সে ষড়যন্ত্র তা কেউ নির্দিষ্ট করে বলছে না এবং তার বির"দ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

বিডিআর বিদ্রোহের অন্ড়র্নিহিত ন্যায্য কারণকে ধামাচাপা দেবার জন্য শাসকশ্রেণি ষড়যন্ত্রের দিকে মানুষের দৃষ্টি বিপথগামী করতে চাচ্ছে এটা পরিষ্কার। আবার বাস্ড়বে ষড়যন্ত্র তাদেরই বিভিন্ন অংশ, এবং তাদের বৈদেশিক প্রভুরা একে অন্যের বির"দ্ধে করে চলেছে সেটাও পরিষ্কার।

শাসকশ্রেণির সকলেই জাতির ঐক্যের কথা বলছে, আর নিজেরা একে অন্যের বির‍ুদ্ধে চক্রান্ড় চালাচ্ছে

শাসকশ্রেণির মধ্যকার চরম অন্র্ড়দ্বন্দ্ব এই বিদ্রোহে ভূমিকা রেখেছে, এবং তার সুযোগ নেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেনাবাহিনী দুই বছরের নিরংকুশ ক্ষমতা পুনর‍ুদ্ধারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে একাধিক গ্র‍ুপের কোন্দলেও এই বিদ্রোহ ব্যবহৃত হতে পারে, বা এখন হবে। বিএনপি হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। জামাত তাদের বির‍ুদ্ধে আওয়ামী গোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চক্রান্ড়ে লিপ্ত। আওয়ামী লীগ একদিকে বিএনপি-জামাতকে কোণঠাসা করা ও অন্যদিকে সেনাবাহিনীকে পুনরায় নিরংকুশ ক্ষমতা না দেবার চেষ্টায় চক্রান্ড়রত। সংসদে শেখ হাসিনা প্রায় সরাসরি এই বিদ্রোহ ও সেনা হত্যায় বিএনপি'র হাত থাকার কথা বলেছে। বিএনপি বলেছে হাসিনা ও আওয়ামী সরকার ক্ষমা ঘোষণা করে সেনা হত্যার পথ করে দিয়েছে।

আবার প্রত্যেকে তাদের ক্ষমতার উৎস সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত।

সাম্রাজ্যবাদী ও বৈদেশিক অপশক্তিরা সামরিক ঢুকে পড়ার আরেকটা মওকা পেয়েছে, এবং শাসকশ্রেণি তাকে ডেকে আনছে

ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছে যে, আমেরিকার এফবিআই এবং বৃটেন ও অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্ড়ের জন্য ডাকা হবে। ভারত শান্ড়িরক্ষী পাঠাবার প্রস্ড়াব দিয়েছে। রাশিয়া তদন্ড়ের প্রস্ড়াব দিয়েছে। এভাবে বৈদেশিক শক্তিগুলো দেশের অভ্যন্ড়রীণ বিষয়ে হস্ড়ক্ষেপের জন্য একে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রীয় গোপনীয় ও স্পর্শকাতর সেক্টরে শাসকশ্রেণি এভাবে বৈদেশিক শক্তিকে ঢুকতে দিচ্ছে এবং শাসক শ্রেণির সকল অংশ তাকে নীরবে সমর্থন করছে।

গুজব ছড়ানোর বির‍ুদ্ধে হুঁশিয়ারি, কিন্তু গুজবগুলো কী?

সেনাপ্রধান, প্রধানমন্ত্রীসহ অনেকেই এটা বলছে। মিডিয়াগুলোকে নসিহত করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য তারাই গোপন করছে। সেনা প্রধান ১২টি পয়েন্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ২৮ তারিখে কথা বলেছে। কী সেই পয়েন্ট? ৫০০ সেনা অফিসারের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সভায় কী আলোচনা হয়েছে? বিদ্রোহের মাত্র একদিন আগে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধান বিডিআর দপ্তরে গেলেও কীভাবে পরদিনই এ ঘটনা ঘটলো? কেন খালেদা জিয়া দুইদিন বাসা থেকে উধাও ছিলো? এ রকম অসংখ্য বিষয়কে জনগণের কাছ থেকে গোপন করছে কে?

নিখোঁজ সেনা অফিসার সংখ্যা ৭২ থেকে নেমে এলো ৭-এ, তারপর ৬-এ

এটা খুব আশ্চর্যজনক যে শাসকশ্রেণির সবচেয়ে সুশৃংখল সংগঠন সেনাবাহিনীর নিখোঁজ অফিসারদের সংখ্যার বিষয়ে এ জাতীয় অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সাথে নির্মম অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে

হাজার হাজার সদস্য বিডিআর-গেটে এসে জমা হলেও তাদেরকে দিনের পর দিন সেখানে অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। তারা চরম আতংক ও অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। পোশাক-বিহীন বিডিআরদেরকে অন্যত্র জমা করা হচ্ছে যা আরও আতংকজনক। নিহত বিডিআর-দের লাশ তাদের আত্মীয়বর্গকে দেয়া হয়েছে কিনা তার কোন ঘোষণা নেই। সদর দপ্তরে যাদেরকে ঢুকানো হচ্ছে তাদের কোন খবর বা সংযোগ পরিবার পাচ্ছে না। এভাবে বিচার বিহীন পাইকারী শান্ড়ি ইতিমধ্যেই শুর‍ু হয়ে গেছে।

অথচ তারাই বলছে বিদ্রোহী অল্প সংখ্যক। এমনকি নতুন বিডিআর ডিজি বলেছে এটা নাকি কোন বিদ্রোহই নয়, নিছক হত্যাকা‍ণ্ড।

শাসকশ্রেণি জনগণের উপর ফ্যাসিবাদ চাপিয়ে দেবার জন্য বিদ্রোহের ঘটনাকে এখন ব্যবহার করছে

অপারেশন রেবেল হান্টিং নামে দেশব্যাপী যে বিডিআর ধরার অভিযান সেনাবাহিনী শুর‍ু করেছে তার ফলে পুনরায় অঘোষিত সামরিক শাসন জারির মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা জনগণের আন্দোলন সংগ্রামের উপর একটা হুমকি হয়ে তারা জারি রাখবে।

শাসকশ্রেণির সংকট ভীষণরকম ঘনীভূত হয়ে উঠেছে

আওয়ামী সরকার গঠিত প্রথম তদন্ড় কমিশন ভেঙে দেয়া হয়েছে। নতুন তদন্ড় কমিটিগুলো সেনা-নিয়ন্ত্রিত বলেই ধারণা করা যায়। বিডিআর-কে বিলুপ্ত করার কথা উঠেছে তাদের মধ্য থেকেই। এরশাদ সংসদে বলেছে এই বিদ্রোহী প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। একটি বৈরী হয়ে পড়া বাহিনীর সদস্যদের সাথে অমানবিক নির্মম আচরণ দ্বারা বৈরিতা আরো বাড়িয়ে তুলে সেনাবাহিনী তাকে পরিচালনা করা বা তার পরিচালনা থেকে সরে যাওয়া উভয় ক্ষেত্রে ভীত ও সংকটগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

সেনাবাহিনী মাঠে নামানোর মাধ্যমে দুই বছরের সেনা স্বৈরাচারের বির‍ুদ্ধে উত্থিত অভিযোগগুলোকে ধামাচাপা দেয়া ও জন-আন্দোলন দমনের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর অন্র্ড়দ্বন্দ্ব চাপা দেবার প্রচেষ্টা ক্রিয়াশীল থাকার সম্ভাবনাও প্রকাশিত হচ্ছে।

জনগণের নিজস্ব আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে

প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে উন্মোচনের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক-জনগণের নিজস্ব আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। এটাই শাসকশ্রেণির প্রচার ও তৎপরতার বলয় থেকে জনগণের বের হবার উপায়। ❑

(১১)

শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায় সম্পর্কে

(২৪/১১/২০০৯)

['৭৫ সালের আগস্টে স্বৈরাচারি আওয়ামী-বাকশালী নেতা শেখ মুজিব এক সেনা-অভ্যুত্থানে নিহত হয়। দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর পর হাসিনা-সরকারের আমলে রাষ্ট্র উক্ত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ১২ জনকে ফাঁসির রায় দেয়। একে কেন্দ্র করে তৎকালীন পরিস্থিতিতে নিচের বিবৃতিটি প্রচার করা হয়– সম্পাদনা বোর্ড।]

গত ১৯ নভেম্বর শেখ মুজিব হত্যা মামলার চূড়ান্ড় রায় ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ে মোট ১২ জনের ফাঁসির দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। সরকার বলছে এক/দেড় মাসের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। উল্লেখ্য, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ১২ জনের মধ্যে ৫ জন বর্তমানে জেলে আটক রয়েছে, যাদের মাঝে ১৯৭৫-সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নেতৃত্বাধীন তৎকালীন একদলীয় বাকশাল সরকার বিরোধী সামরিক অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান সামরিক নেতৃত্ব কর্নেল ফারুকও রয়েছে। বাকিদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে; অন্যরা বিদেশে পলাতক রয়েছে। পলাতকদের মধ্যে রয়েছে কর্নেল রশীদ, মেজর ডালিম প্রমুখ।

১৯৭৫-সালে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড ছিল শাসকশ্রেণির মধ্যকার চরম দ্বন্দ্বের ফসল হিসেবে সংঘটিত একটি রাজনৈতিক-সামরিক অভ্যুত্থানমূলক ঘটনার অংশ। এটা কোন ব্যক্তিগত খুনখারাপীর ঘটনা ছিল না। বরং ছিল একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ, যাকিনা এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যদিও এটা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বাধীন, কিন্তু এটা সফল হবার কারণ ছিল এই যে– গুটিকয় ব্যতিক্রম ছাড়া সেসময় শাসকশ্রেণির নিরংকুশ সংখ্যাগুরু অংশ একে সমর্থন করেছিল। একইসাথে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তৎকালীন সরকারের চরম গণবিরোধী ও দেশবিরোধী শাসনের যাতাকলে পিষ্ট জনগণ মুক্তি পাবার আশায় এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছিলেন এবং ব্যাপক জনগণও স্বস্ড়ির নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মুজিব হত্যা তথা ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের এই ঐতিহাসিক সত্যকে সম্পূর্ণরূপে চেপে যাওয়া হয়েছে, একে কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহ বা সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান হিসেবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং একে নিছক একটি খুনের ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটা ইতিহাসের চরমতম বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। এই মৌলিক মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করে রায় ঘোষণা প্রমাণ করে যে, শাসক গোষ্ঠী সত্যকে গোপন ক'রে, ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে একদিকে ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত

হিংসা চরিতার্থ করছে এবং অন্যদিকে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি জনগণকে গেলাতে চাইছে।

এটা সত্য যে, প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বে পরিচালিত হবার কারণে মুজিবের বাকশাল সরকার বিরোধী এই অভ্যুত্থান প্রক্রিয়ায় মুজিব পরিবারের নিরপরাধ নারী-শিশুরাও নিহত হয়েছিল, যা কোন বিপ্লবী অভ্যুত্থানে এড়ানো সম্ভব হতো। এবং এটা কাম্য নয়। কিন্তু এটাও সত্য যে, মুজিব সরকার ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের শোষণ-লুণ্ঠন-অত্যাচার-নিপীড়নে ব্যাপক জনগণ এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন যে, তাদের কাছে মুজিবের স্বৈরতান্ত্রিক বাকশাল সরকারের উচ্ছেদটিই তখন বড় বিষয় ছিল।

❖❖ ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানটি এমন এক পরিস্থিতিতে হয়েছিল যখন মৌলিক একটি পরিবর্তনের জন্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। মুজিব সরকারের আমলে নব্য শাসকশ্রেণি ও আওয়ামী নেতা-পাণ্ডাদের সীমাহীন শোষণ-লুণ্ঠন, ভারতের নির্লজ্জ দালালী, রক্ষীবাহিনীর ফ্যাসিবাদী হত্যা-নির্যাতন, দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি বিশেষত '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, এবং শেষত সকল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভণ্ডামির খোলস ফেলে একদলীয় বাকশাল কায়েম– অন্ড়ত এই ৫টি কারণে '৭১-সালে ব্যাপক জনগণ যে আশা-আকাংখা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগের মহিমায় পূর্ণ সংগ্রাম করেছিলেন, তা পরিপূর্ণভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে মুক্তির জন্য '৭৩-সাল থেকেই ব্যাপকতম জনগণ মাওবাদী, বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির নেতৃত্বে বিশালাকারের সশস্ত্র ও গণসংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। একে বর্বরতম পন্থায় মুজিব সরকার দমন করেছিল। হাজার হাজার বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে তারা বিনাবিচারে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল। এ অবস্থায় ব্যাপকতম জনগণ যেকোন উপায়ে মুজিব সরকারের পতন কামনা করছিলেন।

এ সময়টাতে মুজিব সরকার বিশ্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দুই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি মার্কিন ও সোভিয়েতের দ্বন্দ্বে সোভিয়েত ব্লকে অবস্থান নিয়েছিল, ভারতের ইন্দিরা সরকারের লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে। ফলে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন উপায়ে এদেশে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র প্রথম থেকেই করে চলেছিল, যার সাথে আওয়ামী লীগের একটা বড় অংশও যুক্ত ছিল। আওয়ামী নেতা মোশতাক যার অন্যতম প্রধান নেতা ছিল।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করবার জন্য মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করে। একনায়ক মুজিব নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট বানিয়ে নেয়। এবং এভাবে জনগণের ক্ষীণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ড় হরণ করে নেয়। ফলে শাসক শ্রেণির মধ্যেও শান্ড়িপূর্ণ উপায়ে যেকোন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

এ অবস্থায় মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে ওঠে। যারই প্রকাশ ঘটে ১৫ আগস্ট।

সুতরাং ১৫ আগস্টের হত্যাকা"কে এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ব্যক্তিগত খুনখারাপী হিসেবে দেখানো এবং অভ্যুত্থানকারীদেরকে সামাজিক খুনী বলে চিত্রিত করা সত্যের অপলাপ শুধু নয়, এটা এক জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীলতা।

– একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদে, সম্ভবত নেতৃত্বে ও পরিকল্পনায়, এই অভ্যুত্থানটি হয়েছিল। ১৫ আগষ্ট, '৭৫-এ হত্যাকা"ের পর ১৬ আগষ্টেই ঢাকার তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টার ওয়াশিংটনে জানিয়েছিল, "মুজিবের সময়ের তুলনায় মোশতাকের জমানায় বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক আন্ড়রিক হবে।"– (সমকাল, ২০/১১/০৯)। এমনকি শেখ হাসিনা নিজে পর্যন্ড় সরাসরিভাবে বহুবার এই অভ্যুত্থানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত থাকার কথা বলেছে, যা ৮০-দশকের জাতীয় পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যাবে। কিন্তু ৮০-দশকের পর সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের পতনের পর শাসক বড় বুর্জোয়া শ্রেণিকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আওয়ামী লীগ যখন থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে গেল, তার পর থেকে হাসিনা ও আওয়ামী লীগ খুনী হিসেবে মার্কিনের নাম বলতে ভুলে গেছে।

– বাস্ড়বে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের বেনিফিসিয়ারী শুধু ফার"ক-রশীদ-জিয়া ব্যক্তিগতভাবেই হয়নি, এর সুবিধাভোগী ছিল গোটা শাসকশ্রেণি। '৭১-এর পর লুটেরা বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি যে পথে নিজেদের এগিয়ে নিয়েছিল, '৭৫-এ এসে তার পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ১৫-আগস্ট তাদের সামনে সে সুযোগ সৃষ্টি করে। এমনকি খোদ আওয়ামী লীগও এর বেনিফিসিয়ারী, কারণ, এটা না ঘটলে বহুদলীয় বুর্জোয়া রাজনীতি ও আওয়ামী লীগের পুনর্জীবন সম্ভব ছিল না; বাকশালের মাধ্যমে আর সব পার্টির মত আওয়ামী লীগকেও বিলুপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আজ ৩৪ বছর পর পরিবর্তিত বিশ্ব ও দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শাসকশ্রেণি, রাষ্ট্র, সরকার ও আওয়ামী লীগ নিজেদের 'লজ্জা', 'পাপ', 'কলংক' মোচনের জন্য প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে বলীর পাঁঠা বানিয়েছে ফার"ক, রশীদ, ডালিমদেরকে। ফার"ক-রশীদ-ডালিমদের ট্র্যাজেডী হলো, তারা ১৫ আগস্টের পর ক্ষমতাকে নিজেদের হাতে বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। বহু বিভিন্ন ঘটনার প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা চলে যায় অন্যদের হাতে, এবং শেষ পর্যন্ড় বহু বছরের পথ পরিক্রমায় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ মুজিবের কন্যাকে সামনে রেখে হত্যাকারী মার্কিনের মদদেই পুনরায় ক্ষমতাসীন। ফার"ক-রশীদদের একাংশ 'ইনডেমনিটি' এবং মার্কিনের উপর অতিরিক্ত আস্থা রেখেছিল; ক্ষমতার পরিবর্তনগুলো এবং মার্কিনের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্কের রূপান্ড়রগুলোকে তারা অধ্যয়ন করতে ব্যর্থ হয়।

◈ এই রায়ের সূত্র ধরে শাসকশ্রেণি, বিশেষত তার বর্তমানের প্রধান প্রতিভূ আওয়ামী গোষ্ঠী তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি, ইতিহাস বিকৃতি, নির্লজ্জ মিথ্য প্রচার এবং ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপগুলোকে তীব্র করে তুলেছে।

– তারা নিজেদের শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক পদক্ষেপকে জাতির কলংক মোচন বলে চালাচ্ছে। কিন্তু এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে, শেখ মুজিবকে সমগ্র জাতির পিতা দূরের কথা, নিজেদের শ্রেণিরই পিতা তারা এখনো বানাতে পারেনি। মুজিব সরকার ও আওয়ামী লীগের স্বৈরশাসন, গণবিরোধিতা, শোষণ-লুটপাট ও ভারতের দালালী কোন দূর অতীতের বিষয় নয় যে ইতিহাস থেকে তা মুছে ফেলা সম্ভব।

– তারা বলছে, এতে নাকি খুনের রাজনীতি বন্ধ হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে।

কিন্তু এ কথা এক জ্বলজ্যান্ড় সত্য যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই খুনের রাজনীতি শুর" করেছিল শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ। তারা বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে দমন করতে তথাকথিত "লাল ঘোড়া দাবড়ায়"। তারা মাত্র সাড়ে তিন বছরে প্রায় ৩০ হাজার মাওবাদী, বামপন্থী ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে বিনাবিচারে অকথ্য অত্যাচার করে খুন করেছিল। 'নকশাল' দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিল শেখ মুজিব নিজে। কমরেড সিরাজ সিকদারকে খুন করার পর প্রতিক্রিয়াশীল বিকৃত উল্লাসের উন্মাদনায় সংসদে সে বলেছিল– কোথায় আজ সিরাজ সিকদার? তার সরকার জেল থেকে বের করে এনে আরেকজন মাওবাদী নেতা কমরেড মনির"জ্জামান তারা-কে হত্যা করেছিল। বিপ্লবী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তি বাদ দিলেও জাসদ, মেনন, দিলীপ বড়ুয়া– যারা আজ হাসিনার সহযোগী– তাদের তৎকালীন বক্তব্যও এর প্রমাণ দেবে।

– তারা এখন বলছে সব খুনের নাকি বিচার করবে। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় শেখ হাসিনা বলেছে, "শুধু আমার পিতার হত্যাকা"ই নয়, সব হত্যাকা"ের বিচার করা হবে।"(প্রাগুক্ত)। একদিকে ক্রসফায়ারের নামে নিজেদের আইনকেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অব্যাহতভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে উল্লিখিত প্রতিশ্র"তি দেয়া জনগণের সাথে তামাশা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। যদিও তারা শাসকশ্রেণির মধ্যকার অন্ড়র্দ্বন্দ্বে নিহত আওয়ামী ঘরানার নেতাদের হত্যার বিচারের কথা নাম ধরে বলছে, কিন্তু তারা একবারও বলছে না সিরাজ সিকদার, তারাসহ মুজিব আমলে ৩০ হাজার বামপন্থী নেতা-কর্মী হত্যার বিচারের কথা। তারা বলছে না তাদের সরকারের অতি প্রিয় র‍্যাব কর্তৃক মাওবাদী নেতা মোফাখ্খার চৌধুরী, কামর"ল মাস্টার, ডা. টুটুল হত্যার বিচারের কথা। তারা একবারও সামরিক বাহিনীর বিচার প্রহসনে নিহত কর্ণেল তাহের হত্যার পুনর্বিচারের কথা বলছে না। এমনকি তারা এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নিহত নূর হোসেন, তাজুল, ডা. মিলন, ট্রাক দিয়ে খুন করা সেলিম-দেলোয়ারের হত্যার বিচারের কথাও বলছে না। যদিও কোন কোন আওয়ামী নেতা এইসব হত্যার কোন কোনটির কথা মুখে বলছে, কিন্তু অচিরেই প্রমাণ হবে যে, এগুলো স্রেফ লোক দেখানো, প্রহসনমাত্র।

– আওয়ামী লীগ এই রায়কে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি-কে কোণঠাসা করার কাজেও ব্যবহার করছে। তারা দেখাতে চায় যে, তারা নিজেরা ধোয়া তুলশী পাতা, আইনের শাসন মানা লোক। বিএনপি-ই শুধু হত্যাকারীদের প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ইতিহাস

সাক্ষ্য দেয় যে, মুজিব হত্যাকারীদের ইনডেমনিটিই এদেশে একমাত্র নয়, প্রথমও নয়। বরং দেশের প্রথম ইনডেমনিটি দিয়েছিল মুজিব সরকার রক্ষীবাহিনীকে, তাদের সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন-খুন থেকে রেহাই দেবার জন্য '৭৪-সালে।

◆◆ এই রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণি নিজেদের সংকট মোচন করতে তো পারবেই না, বরং আরো নতুনতর সংকটে জড়িয়ে পড়বে। বহুদিন ধরে শাসকশ্রেণির উচ্চ পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্য খুনোখুনী কিছুটা কম মাত্রায় ছিল। কিন্তু এই রায় তাকে নতুনভাবে জিইয়ে তুলবে। আওয়ামী লীগ-তো বটেই, শেখ হাসিনা ও শেখ পরিবার নতুনতর মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়বে, সেটা আরো বাড়বে, যার কথা ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইতিমধ্যেই বলে চলেছে। মজার বিষয় হলো এই যে, এই ঝুঁকির মধ্যে রেখে কে কাকে খুন করবে সেটা খুবই অনিশ্চিত। 'র' বা 'সিআইএ'-র পক্ষে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে যে কাউকে বলির পাঁঠা করা সম্ভব। তদুপরি এর সাথে সামরিক বাহিনীর ভেতরকার অসন্তোষ, '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিরোধ, মৌলবাদীদের সশস্ত্র তৎপরতা– ইত্যাদি অনেক উপাদান যুক্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনা সৃষ্টির দিকে দেশকে চালিত করতে পারে।

◆◆ এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কোন কোন ক্ষেত্রে বামপন্থী শক্তির মাঝে গুরুতর বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা গেছে। এটা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বলয়ে বসবাস করা, প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের কুপ্রভাব, শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক চরিত্র ও ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্তিজাত ও বুর্জোয়া প্রচারণার লেজুড়বৃত্তিজাত, এবং সমাজতন্ত্রের নামে অবিপ্লবী সংস্কারবাদী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ফলশ্রুতি। এই বিভ্রান্তি শ্রমিক-কৃষকের মাঝে কম, নেই বললে চলে। যদিও বুর্জোয়া ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত/উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের স্বল্পদৃষ্টির ভাবনাকে সমগ্র জাতির ভাবনা বলে মনে করে এবং সে ভাবেই তাকে চালাতে চায়। এই প্রতিক্রিয়াশীল রায় জনগণের কোন বিষয় নয়। এটা শাসক শ্রেণির নিজেদের অপকর্ম ও ব্যর্থতাগুলোর কিছু অংশের বোঝা থেকে মুক্তির কূটচালজাত অপচেষ্টা মাত্র। বাংলাদেশে হত্যা ও লুটপাটের রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতের দালালীর রাজনীতি যারা শুরু করেছিল তাদের নেতা স্বৈরশাসক শেখ মুজিবের হত্যাকে বা তার হত্যাকারীদের বিচার হওয়া না হওয়ার সাথে নিপীড়িত জনগণের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। এতে জনগণের এতটুকু দায় নেই। এটা কেবলই শাসকশ্রেণি, তাদের রাষ্ট্র ও তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিষয়। নিপীড়িত ও মুক্তিকামী জনগণকে নিজেদের মুক্তির জন্য শাসকশ্রেণি ও তাদের গণবিরোধী বুর্জোয়া রাজনীতিকে বর্জন করতে হবে। বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে। বুর্জোয়া গুরু ও পিতা কন্যাদের মতাদর্শগত বোঝা ঝেড়ে ফেলতে হবে। তাদেরকে উৎখাত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ❑

(১২)

ভারতের মুক্তিকামী জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম ও বিপ্লবী ক্ষমতাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সরকার পরিচালিত গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট "অপারেশন গ্রিন হান্ট"-কে নিন্দা করুন, প্রতিবাদে সোচ্চার হোন!

(৩০ জানুয়ারি, ২০১০)

[ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)'র নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য পরিচালিত নিপীড়িত জনগণের গণযুদ্ধ ও বিপ্লবী সংগ্রাম দমনে নির্মম গণহত্যাকারী অভিযান চালায় ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র। অপারেশন "গ্রিন হান্ট" নামের এই কুখ্যাত অভিযানের নিন্দা ও প্রতিবাদে নিচের বিবৃতিটি রচনা ও প্রচার করা হয়। বিবৃতিটি অন্য একজন কমরেডের লেখা হলেও এতে ক. আনোয়ার কবীর ব্যাপক সম্পাদনা করেছিলেন। রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় এটি এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।
– সম্পাদনা বোর্ড]

গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে ভারতের ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, বিহার ও পশ্চিম বাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশে সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে "অপারেশন গ্রিন হান্ট" নামে এক বর্বর দমন অভিযান শুরু করেছে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ভারতের কংগ্রেস সরকার। যাতে হাত মিলিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ও ভুয়া বামপন্থী সিপিএ-মসহ বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির পার্টিগুলো। এই দমনাভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে সিপিআই (মাওবাদী)'র নেতৃত্বে পরিচালিত গণযুদ্ধ, তথা নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে ধ্বংস করা এবং ব্যাপক বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করা।

এজন্য ভারত সরকার এক লক্ষেরও বেশি সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী, যেমন– সিআরপিএফ, কোবরা, সি-৬০, গ্রে হাউন্ড, আইটিবিএফ, নক্সাল বিরোধী স্ট্রাইকিং ফোর্স এবং বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার এই অঞ্চলে নিয়োজিত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযানের জন্য ৭,৩০০ কোটি রুপী বরাদ্দ দিয়েছে। এ ছাড়াও ভারতীয় বাহিনীর হেলিকপ্টার এবং আমেরিকার স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে মাওবাদী সামরিক বাহিনী পিএলজিএ (PLGA)'র অবস্থান শনাক্ত করার জন্য।

এই অপারেশন 'গ্রিন হান্ট'-এর পূর্বে ২০০৫ সাল থেকেই মাওবাদীদের উৎখাতের জন্য বিজেপি পরিচালিত ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সমর্থনে ভারতীয় রাষ্ট্র তথাকথিত "সালওয়া জুদুম" অভিযান চালায়। উক্ত "সালওয়া জুদুম" অভিযানে সরকার সমর্থিত কুখ্যাত "গণ মিলিশিয়া" নামীয় বেসামরিক গুন্ডা

বাহিনী ২০০৫ থেকে ২০০৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ড় ১,০০০-এর অধিক আদিবাসী জনগণকে হত্যা করেছে। এই গুন্ডা বাহিনী ৬০ বছরের বৃদ্ধার স্ড়ন কেটে নিতে এবং ২ বছরের শিশুর জিহ্বা কেটে নিতে দ্বিধা করেনি। এরা অসংখ্য আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ করেছে। এমনকি ধর্ষণের পর অনেককে পুড়িয়ে মেরেছে। একমাত্র দান্ড়েওয়ারা জেলাতেই ৩ লক্ষ আদিবাসীকে গৃহহীন করেছে এবং প্রায় ৭০০ গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। এসব সত্ত্বেও "সালওয়া জুদুম" অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্র মাওবাদী পরিচালিত গণযুদ্ধ ও বিপ্লবী সংগ্রামকে উচ্ছেদ করতে-তো পারেইনি, বরং মাওবাদী বাহিনী ও মুক্ত এলাকার আরো অনেক বিস্ড়ার ঘটেছে।

এ অবস্থায় বড় বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর স্বার্থরক্ষাকারী ভারতীয় রাষ্ট্র, সরকার ও বুর্জোয়া পার্টিগুলো আতংকিত হয়ে পড়ে। তারা নিপীড়িত জনগণের আরো উত্থান ও বিপ্লবী মুক্ত এলাকার আরো বিস্ড়ার, তথা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরায় শক্তি অর্জনের আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। তারা জনগণের বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে আরো বড়, আরো নির্মম ও আরো দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে।

এরই অংশ হিসেবে তারা এখন সমগ্র ভারতব্যাপী "গ্রিন হান্ট" নামীয় অভিযান শুর্ করেছে। প্রথমে মাওবাদীদের উচ্ছেদের জন্য ১ বছরের সময় নির্ধারণ করলেও এখন "গ্রিন হান্ট"-এর সময় নির্ধারণ করেছে ৫ বছর। আর এজন্য ঝাড়খন্ডের বিলাশপুরে সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড সদর দফতর নির্মাণ করা হচ্ছে। যার জন্য ৯টি গ্রামের আদিবাসী অধিবাসীদের বিতাড়িত করা হয়েছে। এবং ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজনন্দন গাঁও-এ সামরিক বিমান ঘাঁটি তৈরি করা হচ্ছে। যার জন্য ৭টি গ্রামের আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আদিবাসী অধ্যুষিত ঘন জঙ্গল ও পাহাড় এলাকা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য খনিজ সম্পদের ভান্ডার। ভারতের আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে এই খনিজ সম্পদ লুটপাটের জন্য বহু বহু চুক্তি করেছে। কিন্তু এই লুটপাটের বির্দ্ধে মাওবাদীরা আদিবাসী জনগণকে সংগঠিত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। আর তাই সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি সম্মিলিতভাবে এখন মাওবাদীদের উচ্ছেদের জন্য "অপারেশন গ্রিন হান্ট" অভিযান শুর্ করেছে।

* এই ফ্যাসিস্ট গণহত্যাকারী ভারত সরকারের সাথে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি তিনটি চুক্তি ও কিছু সমঝোতা স্বাক্ষর করে উল্লাস প্রকাশ করছে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। এই চুক্তি ও সমঝোতার লক্ষ্য হচ্ছে জঙ্গী ও তথাকথিত চরমপন্থী দমনের নামে বাংলাদেশকে ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর নিজ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ, সংগ্রামী আদিবাসী ও বিপ্লবী জনগণের বির্দ্ধে চালিত প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের অংশীদার করা। এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন দমনে ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদী হস্ড়ক্ষেপকে ডেকে আনা। যার প্রকাশ ঘটেছে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হওয়ার পূর্বেই উলফার নেতা অরবিন্দ রাজখোয়াসহ অন্যান্য শীর্ষ স্বাধীনতাকামী নেতাদের গ্রেফতার করে ভারতে হস্ড়ান্ড়রের মাধ্যমে।

* কিন্তু মনমোহন-চিদাম্বরম চক্রের দ্বারা মাওবাদী গণযুদ্ধ ও আদিবাসী উচ্ছেদের এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহ মেনে নেননি। তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। ভারতের বাইরে ইউরোপ-আমেরিকার বহু বহু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ভারত সরকারের নিকট "অপারেশন গ্রিন হান্ট" বন্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরা ভারত সরকার পরিচালিত "অপারেশন গ্রিন হান্ট"-এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কর্পোরেশন ও ভারতীয় আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদীদের স্বার্থে আদিবাসী জনগণসহ ভারতব্যাপী গণহত্যা, মধ্যযুগীয় নিপীড়ন, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও, বাস্তুচ্যুতির তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং জনগণকে এই ফ্যাসিস্ট দমনাভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা ভারতের মাওবাদী পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণযুদ্ধের সাথে সংহতি ঘোষণা করছি এবং বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণকে এই সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। একইসাথে বাংলাদেশের সকল বাম প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক এবং মানবতাবাদী সংগঠন, শক্তি ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই– ভারত সরকার পরিচালিত "অপারেশন গ্রিন হান্ট" নামীয় মানবতাবিরোধী, ফ্যাসিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল অভিযানের বিরোধিতা কর্ন। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। ❑

(১৩)

ইসলামের নবীর উপর সিনেমা প্রসঙ্গ

(সেপ্টেম্বর, শেষ সপ্তাহ, ২০১২)

[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মের নবী মোহম্মদকে ঘিরে একটি ভিডিও-চলচিত্র নির্মাণ কেন্দ্রীক মুসলিম বিশ্বে তখন যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সে প্রেক্ষিতেই এ বিবৃতি – সম্পাদনা বোর্ড]

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের নবী মোহম্মদের জীবনকাহিনী-ভিত্তিক একটি ভিডিও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে সারা বিশ্বজুড়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতর বিরাট বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এবং সারা বিশ্বেই এর বির"দ্ধে ইসলামী প্রতিবাদ চলছে। অন্যদিকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে ইসলাম ধর্ম ও নবী মোহম্মদের উপর আক্রমণাত্মক আরও সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া কর্মকা" লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা এখনি প্রথম ঘটছে তা নয়। ইতিপূর্বেও এরকম হয়েছে।

পশ্চিমা দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসগুলোর উপর এমন আক্রমণ ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকে তুলে ধরার জন্য করা হয়নি। বরং এগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে খ্রীস্টান ধর্মীয় মৌলবাদী অবস্থান থেকে, যা কিনা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা রক্ষা করে, প্রশ্রয় দেয় এবং মদদ দেয়। বর্তমানের ভিডিও-টি দেখা ও তার উপর সত্যনিষ্ঠ আলোচনা করার সুযোগ নেই। কারণ, ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর চাপে আমাদের দেশসহ বহু দেশেই সিনেমাটি নিষিদ্ধ। তবে যা কিছু খবরাখবর এ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে ধারণা করা যায় যে, এটি নবী মোহম্মদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক, বিশেষত তার জীবনে নারীদের ভূমিকাকে নিন্দনীয়ভাবে তুলে ধরেছে। এ খবরও প্রকাশ হয়েছে যে, যারা এ ছবিটি নির্মাণ করেছে তারা কট্টর ইহুদীবাদী মদদপ্রাপ্ত এবং খ্রীস্টান মৌলবাদী ধারার লোক। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, ছবিটি ধর্ম বা ধর্মীয় নেতৃত্বদের জীবনীর আলোচনা কোন প্রগতিশীল বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে করেনি।

◈◈ বিগত দশকে, বিশেষত ২০০১ সালে টুইন টাওয়ার-এর ঘটনার সূত্র ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ব জনগণের বির"দ্ধে "সন্ত্রাসের বির"দ্ধে যুদ্ধ" নামে যে বর্বর ও ফ্যাসিস্ট আক্রমণ অভিযান শুর" করে তা কেন্দ্রীভূত হয় মুসলিম জনগণ অধ্যুষিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। তারা ইসলামী মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের বির"দ্ধে যুদ্ধের নামে সারা পৃথিবীর জনগণের বির"দ্ধে এই আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। ইসলামী মৌলবাদ যদিও

ইতিপূর্বে মার্কিনের প্রশ্রয় ও আশ্রয়েই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; কিন্তু বিগত দশকে তাদের একাংশ বহুবিধ কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বির"দ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালাচ্ছে। তবে এটা একইসাথে উভয় পক্ষের জনগণের উপরও মধ্যযুগীয় ফ্যাসিস্ট আক্রমণ করছে। এ অবস্থায় একদিকে বিশ্ব জনগণের বির"দ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ইসলামী মৌলবাদ শক্তিশালী হবার ও নৈতিক সমর্থন পাবার শর্ত সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে মৌলবাদীদের গণবিরোধী তৎপরতা ও মধ্যযুগীয় ফ্যাসিস্ট কর্মসূচি সাম্রাজ্যবাদীদের সুযোগ করে দিচ্ছে তাদের "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ"-কে শক্তিশালী করার। এই বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই চলমান ভিডিও-বিতর্ক ও তার প্রতিক্রিয়াকে দেখতে হবে। এবং এই বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে ভিডিও নির্মাণটিকে সংযুক্তভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে।

◈◈ ভিডিও-নির্মাণকারীরা সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে বিশ্ব জনগণ, বিশেষত মুসলিম জনগণের বির"দ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বঘোষিত এ "ক্রুসেড"-কে সহায়তা করেছে, বা তারই অংশ হয়ে পড়েছে। যদিও তা হয়েছে সাংস্কৃতিক পরিম"লে। এমনও হতে পারে যে, তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবেই এটা করেছে। যা কিনা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তেরই অংশ।

একইসাথে আমেরিকার আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সাথেও এটা সম্পর্কিত হতে পারে। যেখানে কিনা খ্রীস্টান মৌলবাদীরা ওবামাকে হারানো ও কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল প্রার্থী রমনিকে জেতানোর জন্য খ্রীস্টান মৌলবাদকে উসকে দিতে চায়।

যেভাবেই হোক না কেন, এই ছবি সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সেবা করেছে।

◈◈ অন্যদিকে এর সুযোগ নিয়েছে সারা বিশ্বের ইসলামী মৌলবাদী শক্তি। অন্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও এই মৌলবাদীরা ধর্মীয় জিগির তুলে মাঠে নেমেছে। ব্যাপক ধর্মবিশ্বাসী জনগণকেও এটা প্রভাবিত করছে এবং তারা অধিকতর বেশি করে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার খপ্পরে পড়ছেন এবং তাদের হাতিয়ার হয়ে পড়ছেন।

প্রথমত সকল ধর্মের মৌলবাদী মতাদর্শ ও কর্মসূচিই মধ্যযুগীয় ফ্যাসিস্ট। তা ইসলামী মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য পশ্চিমা দেশের খ্রীস্টান ও ভারতের হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদীদের ক্ষেত্রেও। একারণেই তারা ধর্মের বা ধর্মীয় নেতাদের জীবনের উপর কোন বাস্ড়ব ইতিহাসভিত্তিক বা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকেই অনুমোদন করে না। শুধু তাই নয়, ইসলামী মৌলবাদীরা প্রায় ক্ষেত্রেই এমন কাজের জন্য মানুষকে মৃত্যুদ"ের ফতোয়া দেয়, হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। অথচ বিগত এক দশকে কখনও তারা লক্ষ লক্ষ জনগণ (ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ) হত্যার জন্য সাম্রাজ্যবাদী কোন নেতা বা সমরনায়কের মৃত্যুদ" ঘোষণা করেনি।

সুতরাং ইতিহাসের সত্য ও ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বিতর্কের অধিকারের জন্য আমাদের অবশ্যই সকল রূপের ধর্মীয় মৌলবাদের বির"দ্ধে নীতিগত সংগ্রাম চালাতে হবে। এটা এক দীর্ঘস্থায়ী কঠিন, কষ্টকর ও তিক্ত সংগ্রামই বটে।

◆◆ বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার মুখে মার্কিন সরকারি নেতারা ছবিটির নিন্দা করেছে। এক্ষেত্রে পুনরায় আমেরিকার চলমান ভোট-রাজনীতি ভূমিকা রেখেছে।

প্রভুদের অনুসরণে আমাদের দেশের হাসিনা সরকারও ছবিটির নিন্দা করেছে ও তা নিষিদ্ধ করেছে। ফলে এদেশের মানুষের পক্ষে ছবিটির উপর বাস্ড়ব কোন আলোচনা-বিতর্ক করাও আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। এটা তারাও করেছে ভোট-রাজনীতির স্বার্থে। জনগণের ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রতারণার সাথে ব্যবহার করার জন্য। একইসাথে তারা তাদের চেয়ে অধিক ধর্মপ্রাণ ধর্মীয় দলগুলোর প্রতিবাদকে আচ্ছামত পিটুনি দিয়েছে। এ দিয়ে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে অধিকতর প্রিয় হবার বার্তা পাঠিয়েছে। পরপরই জাতিসংঘে শেখ হাসিনার ভাষণেও সাম্রাজ্যবাদকে এভাবে খুশি করার প্রকাশ ঘটেছে। এটাও ভোট-রাজনীতিতে ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি শেখ হাসিনার দলের পিছিয়ে পড়াকে কাটানোর একটি প্রচেষ্টা। একইসাথে সরকার-যে অন্য যেকোন দলের যেকোন আন্দোলন তৎপরতাকে একটুও সহ্য করতে ইচ্ছুক নয়, এবং তারা ফ্যাসিবাদের পথেই হাঁটছে, এটা তারই প্রমাণ বহন করে।

◆◆ আমাদের পার্টি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সাম্রাজ্যবাদের খ্রীস্টান মৌলবাদী অপতৎপরতার ক্রমাগত বৃদ্ধিকে নিন্দা জানায়; ইসলামী মৌলবাদীদের স্বৈরতান্ত্রিক কর্মসূচি ও মতবাদকে বিরোধিতা করে এবং হাসিনা সরকারের সাম্রাজ্যবাদের দালালী ও ধর্ম নিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা ও ফ্যাসিবাদী তৎপরতাকে উন্মোচনের আহ্বান জানাচ্ছে। ❑

(১৪)

এই মৃত্যুপুরী ভেঙ্গে ফেলুন

(প্রথম সপ্তাহ, ডিসেম্বর, ২০১২)

[দেশে গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে দুর্ঘটনার নামে শ্রমিক হত্যা সাধারণ ঘটনা। এরই ধারাবাহিকতায় গাজীপুরে "তাজরীন গার্মেন্টসে" এক ভয়াবহ অগ্নিকাে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। মালিক গোষ্ঠী তথা শাসকশ্রেণি, রাষ্ট্র ও এই ব্যবস্থার অধীনে গার্মেন্টসকে মৃত্যুপুরী আখ্যা দিয়ে শ্রমিক জনসাধারণের করণীয় তুলে ধরা হয়েছে এই লেখাটিতে– সম্পাদনা বোর্ড]

২৪ ও ২৫ নভেম্বর রাতে আশুলিয়ার তাজরীন গার্মেন্টসের ভয়াবহ হত্যালীলা সর্ববৃহৎ হলেও প্রথম নয়। ১৯৯০ সাল থেকে গার্মেন্টসে আগুনে পুড়ে ও অন্যান্য কারণে সর্বমোট কতজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে তার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনো পাওয়া যাবে না। এটা ৭ শতের বেশি বই কম নয়। এমনকি তাজরীনে কতজনের মৃত্যু ঘটেছে সেটাও নিশ্চিত নয়। সরকার বলছে ১১১, পত্রিকাগুলো একেকটি একেক কথা বলছে, তবে বেশিরভাগ তথ্য বলছে ১২৪, শ্রমিকরা বলছেন আরো বেশি। এই-যে খোদ ঢাকা শহরে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এই মৃত্যু, তার সংখ্যাটি পর্যন্ড় ঠিক নেই। মৃতদের তালিকা/নাম, ঠিকানা সম্পূর্ণভাবে কোথাও প্রকাশ হয়নি। এতেই বোঝা যায় এই সমাজ ব্যবস্থায়, এই কারখানা পরিস্থিতিতে, এই মালিকদের কাছে এবং তাদের সরকার ও বুর্জোয়া ক্ষমতাসীন পার্টিগুলোর কাছে শ্রমিকের প্রাণের দাম কতটুকু।

আগুনে পুড়ে ভয়াবহ এই মর্মান্ড়িক মৃত্যুর পর পরই বড়লোকদের ক্ষমতার সংসদে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার মত করেই বলেছে যে, এটা নাকি নাশকতা, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র, এমনকি জামাত-যুদ্ধাপরাধীর কাজ। আর তারপর থেকেই মালিক পক্ষ প্রচার করে চলেছে এই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। সরকার ও হাসিনা যা শিখিয়ে দিলো, মালিকরা সেটাই এখন বলছে।

অথচ, নাশকতা হোক আর দুর্ঘটনা হোক, আগুন লাগার পর কেন শ্রমিকরা বের তে পারলেন না, কেন তাদেরকে পুড়ে মরতে হলো, এই আসল প্রশ্নটাকে তারা যতটা পারছে ধামাচাপা দিচ্ছে। আগেও সর্বদাই তারা এটা করেছে। এমন একটি শিল্প-সেক্টরে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা দুই যুগ ধরে নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে কীভাবে– এত এত সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা আর রং-বেরঙের বাহিনী থাকা সত্ত্বেও– তারও কোন উত্তর নেই। আগুন লাগলেই ষড়যন্ত্র, তাদের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি; যাতে এবার প্রথম ইন্ধন দিল প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ। কিন্তু শ্রমিক যে প্রাণ দিল তার কোন গুর ত্ব নেই,

তাদের প্রাণের দাম নেই, এইসব হত্যার কোন বিচার নেই, যারা বেঁচে রইলেন আহত হয়ে তাদের কী হবে তার কোন কথা নেই, আর যারা চাকরী হারিয়ে পথে বসেছেন তাদেরই-বা চলবে কী করে সেটাও দেখা হচ্ছে না। অথবা সবই বলা হচ্ছে, কিন্তু সবাই জানে সেগুলো প্রায় সবই লোক দেখানো, দু'দিন পর সবই তারা মাটিচাপা দিয়ে ফেলবে। শ্রমিকেরা আন্দোলন করে যতটুকু আদায় করতে পারবেন সেটুকুই শুধু ভরসা।

এখন তাজরীনের মধ্য-পর্যায়ের ৩ জন কর্মচারীকে গ্রেফতার করে বলা হচ্ছে এরাই নাকি এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু কে কবে শুনেছে যে, বাংলাদেশের মত একটি চরম শ্রমিক-নির্যাতনকারী স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় মালিক ও রাষ্ট্রের নির্দেশ ছাড়া মধ্য পর্যায়ের কিছু কর্মচারী নিজেদের ইচ্ছায় গার্মেন্টসে এসব নিয়ম করতে পারে? মালিক দোষী নয়, কারণ, তার কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে; অফিসাররা, যারা বেশি-রভাগ মালিকেরই আত্মীয়-স্বজন, তারাও দায়ী নয়; দায়ী হচ্ছে মাঝারী দু'-একজন কর্মচারী, আর খোদ শ্রমিকরা নিজেরাই। ওরা কেন হুড়াহুড়ি করে বের হতে গেল? এমনকি এই নিু পর্যায়ের ৩ জনের গ্রেফতারটাও মালিকদেরকে বাঁচানো আর শ্রমিকদেরকে ঠাা করার বদমাইশী ছাড়া আর কিছু বলে মনে করা যায় না।

মালিক আর সরকার মিলে এখন খুঁজে দেখছে গার্মেন্টসগুলোতে বহির্গমন সিঁড়ি রয়েছে কিনা। সিঁড়ি দিয়ে কী হবে যদি সেই সিঁড়ির গেট বন্ধ রাখার নির্দেশ থাকে? এই মালিকেরা শ্রমিকদেরকে সব চোর ভাবে। তাই সিঁড়ির গেট আটকা না রেখে মালিকদের উপায় কী? শ্রমিকের জীবনের চেয়ে তাদের সম্পদের মূল্য কি অনেক বেশি নয়?

মালিক-সরকার আন্দোলনের মুখে ও শ্রমিক-অভ্যুত্থানের ভয়ে নিহত-আহতদের কিছু টাকা ধরিয়ে দেবার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু খবরই বলছে যারা মৃত্যুর সাথে লড়ছে এখনো তাদের অনেকের চিকিৎসাটাই ভালভাবে হচ্ছে না। তারা অনেকেই চিকিৎসা করতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। একটি চিকিৎসক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানও সেখানে যায়নি তাৎক্ষণিক আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা দেবার জন্য, যেগুলো কিনা আওয়ামী-বিএনপি'র একচেটিয়া। অথচ এস্েম্বার সময়ে তাদের চিকিৎসা-সেবার বন্যা বয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন ডিএনএ টেস্ট করার জন্য অপেক্ষা করছেন, সেটা ভালভাবে হচ্ছে না। সর্বোপরি যারা মারা গেছেন তারা তো গেছেনই, কিন্তু যারা বেঁচে রয়েছেন, তাদেরকে পাওনা টাকা বা স্বীকৃত শ্রম আইনে প্রাপ্য ৪ মাসের বেতনটাও দেয়া হচ্ছে না, গড়িমসি চলছে, গার্মেন্ট খুলবে কিনা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না, কয়েক হাজার শ্রমিক এখন কোথায় যাবেন কী করবেন সে ব্যাপারে কিছু করা হচ্ছে না।

শুধু যা করা হয়েছে তাহলো, শ্রমিকরা যেন কোন রকম আন্দোলনে যেতে না পারেন সেজন্য পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী দিয়ে ঘটনার সাথে সাথে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। প্রতিদিন সেখানে শ্রমিকদের মিছিলে লাঠিপেটা করা হচ্ছে। সহকর্মী ভাই-বন্ধুদের স্মরণে তাদেরকে শোক প্রকাশ করতেও দেবে না এই মালিকের সরকার ও রাষ্ট্র। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া, যারা ঐ বড় ধনীদেরই নেতা; সংসদ, যার অর্ধেকের বেশি সদস্য নির্মম শোষক গার্মেন্টস মালিক, তাজরীনের মালিকের

মতই; তারা তাদের বুর্জোয়া ভোটের রাজনীতি আর কূটক্যাচাল করে চলেছে টিভিতে মাঠে ঘাটে; কিন্তু তারা এই শোক ও শঙ্কা বিধ্বস্ড় শ্রমিক এলাকাটির ধারে কাছে ভিড়েনি ঘটনার ৭ দিনের মাথাতেও। শ্রমমন্ত্রী যায়নি, শিল্পমন্ত্রী যায়নি, মালিক যায়নি, মালিকদের সংগঠনগুলো যায়নি। সরকার একটি লোক দেখানো শোক দিবস ঘোষণা করে একদিন গার্মেন্টসগুলো বন্ধ রেখেছে যাতে শ্রমিক-বিদ্রোহ না ঘটে। ভাবুন সকলে, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র ১০ জন সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ কর্মী-নেতা যদি এভাবে মরতো, তাহলে রাষ্ট্র থেকে কী করা হতো! এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন ছাত্র যদি একত্রে আগুনে পুড়ে মারা যেতেন, তাহলে কি তাদের লাশ সুদূর কোন কবরস্থানে নিয়ে ছাত্রসমাজের নাগালের বাইরে পুঁতে রাখা যেতো? কেন আশুলিয়ার শিল্প এলাকায় একটি শহীদ মিনার স্থাপন করে সেখানে নিহতদেরকে সসম্মানে, সযত্নে, সহকর্মী ও আত্মীয়দের ভালবাসায়াত করে কবর দেয়া হলো না? কেন গার্মেন্টসগুলো ছুটি দেয়ার কথা বলে শ্রমিকদেরকে আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা প্রকাশ থেকে দূরে রাখা হলো? এই এলাকায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-জনতার শোকসভা থেকে তাদেরকে সরিয়ে রাখা হলো? তাদের হাজার হাজার কালো পতাকা মিছিল থেকে বিরত রাখা হলো?

শ্রমিক শ্রেণিকে– শুধু গার্মেন্টের শ্রমিকই নয়, সর্বত্র সব ধরনের শ্রমিক ও শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষকে এসবই আজ গভীরভাবে চিন্ড়া করতে হবে। নিশ্চয়ই তারা আজকের জর–রী দাবিগুলোকে বলিষ্ঠভাবে আনবেন, নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ভাই-বোনদের স্মরণে যতটা সম্ভব ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন। কিন্তু তাদেরকে ভাবতে হবে– যাদেরকে তারা ভোট দিয়েছেন নৌকা, ধানের শীষ বা লাঙ্গলে– তারা কারা? তাদের সংসদে কী হয়? মালিকরা কাদেরকে টাকা দেয়? কেন দেয়? তাজরীন গার্মেন্টসের মালিক টাকা দিয়ে হাতে রাখে আওয়ামী নেতা মির্জা আজমকে, আর পাড়ার যত মাস্ড়ান গ্যাংগুলোকে টাকা দিয়ে পালে শ্রমিক সংগ্রাম, শ্রমিক বিদ্রোহ দমনের জন্য। অন্যদিকে বুর্জোয়া নেতারা তাদের পুলিশ-র‍্যাব-সেনাবাহিনীর মাধ্যমে মালিকদের এই বর্বর শোষণ আর হত্যার মৃত্যুপুরীকে রক্ষা করে চলে। এটাই হলো এই সমাজ ব্যবস্থা। এটা শ্রমিকের নয়, কৃষকের নয়, দরিদ্র মানুষের নয়। এ সমাজ হলো তাদের জন্য বৃহৎ এক মৃত্যুপুরী মাত্র।

এর উপরে আবার রয়েছে বড় ধনীদের বিদেশী প্রভুরা। যাদেরকে বায়ার নামে শ্রমিক ভাই-বোনেরা চেনেন, তারা এই দেশীয় মালিক এবং তাদের পার্টি ও সরকারের চেয়ে বহুগুণ বেশি মুনাফা করছে দেশের এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের রক্ত চুষে। এখন যখন ঐসব দেশেও জনগণ দাবি তুলছেন বাংলাদেশের এই সব মৃত্যুপুরীর রক্তমাখা কাপড় তারা পরবেন না, তখন এইসব বিদেশী বড় ধনী (যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী বলা হয়) ও তাদের এদেশীয় স্যাঙাতরা শিল্প ধ্বংসের হুল্লোড় তুলেছে। এটা কি তারা শ্রমিকের স্বার্থে করছে? স্পষ্টতই না। তাদের এত বড় মুনাফার যন্ত্রগুলো অতি মুনাফার লোভে এখন হুমকিতে পড়ার কারণেই তারা এটা বলছে। শ্রমিকের স্বার্থের জন্য তারা কখনো কিছু করেনি ও করে না।

শ্রমিকের স্বার্থ কীসে রক্ষিত হতে পারে? এই সব কারখানায় তারা কাজ করেন, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেলে তারা বিপদে পড়বেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের নিজেদেরকেই

প্রশ্ন করতে হবে, কেন তারা গ্রাম থেকে শহরে আসতে বাধ্য হলেন? তাদের বাপ-দাদার জমি-জমা কেন হাতছাড়া হলো? কেন গ্রামে তাদের জন্য কোন কাজ নেই? কেন বিদেশী শোষকরা গার্মেন্টের কাপড় না কিনলে তারা বেকার হয়ে যাবেন, আর সে কারণে এই বিদেশী শোষকদের তোষামুদী করতে হবে? কথিত এই স্বাধীন দেশে কেন তাদের স্বদেশীয় কোন কাজের ব্যবস্থা থাকবে না?

আসলে এসবই হয়েছে এইসব বড় বড় শহুরে ধনী শ্রেণি, তাদের বিদেশী প্রভু ও তাদের এই রাষ্ট্রের শোষণ-নির্যাতনের ফলে। তারা এই সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে গার্মেন্টেসের আদলে এক বৃহৎ মৃত্যুপুরী রূপে। সেই বৃহৎ মৃত্যুপুরীতে প্রতিনিয়ত গ্রাম-শহরের গরীব মানুষ, সর্বহারা মানুষ তিলে তিলে মরে চলেছেন; যাদের কোন ভবিষ্যত নেই; যাদের সারা দিনমান এইসব কঠোর কাজ করা ছাড়া আহার, বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই; যাদের অসুখে ভাল চিকিৎসার নিশ্চয়তা নেই; সন্ড়ানদের পুষ্টি চিকিৎসা খেলাধুলা ও লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা নেই; যাদের ভাল কোন দাম্পত্য জীবনও নেই। এই জীবনকে তারা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, আর দিনে-রাতে শ্রম করে চলেছেন। অথচ তাদের নিরাপদে শ্রমের সুযোগটুকু পর্যন্ড় নেই। বস্ড়িতে তাদেরকে পুড়ে মরতে হবে, বহদ্দার ব্রীজে বা পাহাড়ে তাদেরকে মাটিচাপা-ব্রীজচাপা পড়ে মরতে হবে, এমনকি কাজের গার্মেন্টসে পর্যন্ড় নির্মমভাবে মরতে হবে।

আসুন, শ্রমিক ভাই-বোনেরা, সমাজের রূঢ় এই বাস্ড়বতার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখি। এবং তার মাধ্যমে এই সত্য বুঝে নেই যে, এই সমাজ, রাজনীতি, সংসদ, সরকার, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, নেতা-নেত্রী, বড় বড় পার্টি, ভোট, অর্থনীতি– এগুলো কোনটাই আপনাদের নয়। এই রাষ্ট্র আপনাদের নয়। এই দেশ আপনাদের নয়। এগুলো ক্ষমতাসীন বড় বড় ধনীদের ও তাদের বিদেশী প্রভুদের। এইসব নেতা-নেত্রী হলো একদঙ্গল শোষক, নির্যাতক ও প্রতারক। তারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম– এসবের কথা বলে আপনাদেরকে বিভ্রান্ড় করে রেখেছে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতাটা তাদেরই হাতে। সকল সম্পদ তাদেরই হাতে। তারপরও তারা দেশ ও জনগণের শত শত, হাজার হাজার কোটি টাকা শুষে নিচ্ছে, লুটপাট করছে, দুর্নীতি করছে। অন্যদিকে আপনাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নেই, তাই আপনারা কিছুই করতে পারেন না– আপনাদের বর্বরভাবে পুড়িয়ে মারার পরও। প্রশ্ন কর"ন, নিজেদের কাছে, এই আইন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, আদালত, ভোট, সংসদ– বিগত ৪০ বছরে একজন বড় ধনীকেও কি এইসব হত্যার জন্য শাস্ড়ি দিয়েছে? কেন দেয়নি? কারণ, আমরা শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র মানুষরা ঐসব ধনীদের সৃষ্ট এক মৃত্যুপুরীতে বাস করছি। যেমন তাজরীনের শ্রমিকেরা মৃত্যুপুরীতে কাজ করতে গিয়ে পুড়ে মরেছেন, তেমনিভাবে।

তাই মুক্তির জন্য একে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। শ্রমিক, এবং তার সাথে সকল গরীব ও সাধারণ মানুষকে তাদের নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলে তারা নিজেদের স্বার্থ উপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কায়েম করতে পারবেন। সেই সমাজ হলো শ্রমিক-কৃষক-গরীব মানুষের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। যেখানে কারখানাগুলো

আর একক ব্যক্তি-মালিকের থাকবে না। সেগুলো হবে শ্রমিক-জনগণের সাধারণ সম্পত্তি। ফলে সেখানে উৎপাদনের পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রমিকের জীবন হবে উন্নত, মর্যাদাময়, ক্ষমতাবান। গুটিকয় বুর্জোয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের রক্ত চুষে কোটি কোটি টাকার পাহাড় গড়তে পারবে না। আর বুর্জোয়া পার্টি আর তার রাষ্ট্র শ্রমিকদের প্রতারণার পর প্রতারণা করে তাদের চাকরি খেয়ে, পিটিয়ে, জেলে পুরে, হত্যা করে দমন করতে পারবে না।

সেরকম একটি সমাজের জন্য শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব পার্টি থাকতে হবে। সর্বহারা পার্টি হলো সেরকমই একটি পার্টি। শ্রমিক শ্রেণিকে শিখতে হবে কীভাবে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রে যেতে হয়। সেজন্য প্রথম ধাপ হলো এইসব বড় বড় বুর্জোয়া ও তাদের বিদেশী প্রভুদেরকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা এবং তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। শ্রমিক শ্রেণিকে এই বিপ্লবী রাজনীতি শিখতে হবে, তার জন্য লড়াইয়ের কৌশলগুলো শিখতে হবে। বুর্জোয়া পার্টি ও তাদের নেতা-নেত্রীদের শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, তাদেরকে পরিপূর্ণ উচ্ছেদের জন্য কাজ করতে হবে এবং তাদের মধ্যকার জঘন্যসব অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্ড়ি দিতে হবে। আর চলমান আন্দোলনে বুর্জোয়া প্রভাবের বাইরে থেকে শ্রমিকের ন্যায্য দাবিকে আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করে নিতে হবে। সর্বস্বান্ড় নির্যাতিত শোকস্ড়ব্ধ দিশেহারা শ্রমিকের কাছে এই হলো আমাদের আহ্বান। ❑

(১৫)

শাহবাগ-আন্দোলন সম্পর্কে

(১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)

[আওয়ামী লীগ সরকার তথা রাষ্ট্র কর্তৃক '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রহসনমূলক বিচারে একটি রায়ের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র ও মধ্যবিত্তদের একটি প্রতিবাদী আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। ঘটনার আকস্মিকতায় সাময়িকভাবে বিব্রত হাসিনা সরকার পরবর্তীতে এই প্রতিবাদকারীদের নেতৃত্বদের মূল অংশকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে কব্জা করতে সক্ষম হয়। নিচের বিবৃতিটিতে তৎকালীন এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নসহ বক্তব্য তুলে ধরা হয়– সম্পাদনা বোর্ড]

ব্লগার ও ইন্টারনেট এ্যাকটিভিস্টদের উদ্যোগে মানবতাবিরোধী অপরাধে কাদের মোল্লার বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ গত ৫ তারিখ বিকেলে শাহবাগ চত্বরে অবস্থান নেয় তা দ্রুত বৃহৎ জনসমাবেশে পরিণত হয়। এর প্রাথমিক মূল কারণ হলো– বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পর দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে শাসক শ্রেণির বিভিন্ন ঘরানার সকল সরকার ও দল (মুজিব ও হাসিনার আওয়ামী লীগ, জিয়া ও খালেদার বিএনপি ও এরশাদের জাতীয় পার্টি) '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে পাশ কাটিয়ে গেছে। মূলত তাদেরকে বিনাবিচারে পার পেতে দিয়েছে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে জনমনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা ছিল। যা ফেটে পড়ে যখন আওয়ামী সরকারের নেতৃত্বে ট্রাইব্যুনালে কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে অনেক হম্বি-তম্বির পর তার বিরুদ্ধে এক লঘু রায় দেয়া হয়। যার অর্থ হলো ভবিষ্যতে কোন না কোন অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থায় তার মুক্তি নিশ্চিত করা। এটা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, অন্য আরো সব বড় যুদ্ধাপরাধী নেতাদেরকেও এভাবে পার করিয়ে দেয়া হবে। ফলে যখন কোন একটি সূত্র ধরে প্রতিবাদ ও আন্দোলন উঠলো, মধ্যবিত্ত মানুষ তাতে স্বতস্ফূর্ত সমর্থন জোগালো।

এটা হলো সূচনাকালে এই আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ইতিবাচক দিক।

জনগণ দেখেছেন যে, ক্ষমতার চার বছর পার হয়ে গেলেও আওয়ামী সরকার এ পর্যন্ত মাত্র ১০/১২ জন জামাত-বিএনপি নেতাকে বিচারের সামনে এনেছে, প্রকৃত বড় নেতাদের বিচারকে যথাসম্ভব পিছিয়ে রেখে জনৈক বাচ্চু রাজাকারের বিচার প্রথমে করেছে, যে কিনা প্রশাসন ও ক্ষমতার সহায়তায় গৃহবন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে গেছে, এবং সম্প্রতি কাদের মোল্লাকে চরম শাস্তিদানে বিরত থেকেছে। তারা আরো দেখেছেন যে, প্রথম থেকেই গঠিত ট্রাইব্যুনালের অযোগ্যতা বার বার প্রকাশ হচ্ছে। একবার যখন প্রমাণিত হয় যে, এর প্রধান বিচারক পাকিস্তান-আমলে জামাতের ছাত্র-সংগঠনের নেতা

ছিলেন, তখন অনেক গড়িমসি করে পরে তাকে অপসারণ করা হয়। দ্বিতীয়বার স্কাইপ কেলেঙ্কারি নামে খ্যাত ঘটনার সূত্র ধরে আরেকজন প্রধান বিচারক পদত্যাগে বাধ্য হন। এটাও সচেতন জনগণ জানেন যে, আওয়ামী লীগ রাজাকার বিরোধী বড় বড় কথা বললেও তাদের পার্টি, এমনকি সরকারেও রাজাকার রয়ে গেছে; প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাজাকার পরিবারের আত্মীয়তা পর্যন্ত রয়েছে। সর্বশেষ জামাত-শিবিরের মরিয়া আন্দোলনের সময় প্রশাসনের কঠোর আক্রমণাত্মক ভূমিকা থেকে হঠাৎ করে এক পর্যায়ে পুলিশের নরম আচরণ, পুলিশ-শিবির ফুল শুভেচ্ছা, এবং রায়ের পূর্বক্ষণে কারাগারে কাদের মোল্লার সাথে প্রশাসনের আপোষ-বৈঠকের প্রচার– ইত্যাদি ঘটনাও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনোযোগের সাথেই লক্ষ্য করেছেন (খোদ কাদের সিদ্দিকী এই আঁতাতকারীদের বিচার চেয়েছেন, সংসদে জাসদ নেতা মইনুদ্দিন বাদল আপোষ-মীমাংসাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন)। একদিকে আওয়ামীপন্থীদের হম্বি-তম্বি, অন্যদিকে এইসব ঘটনা জনগণের মাঝে যে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তারই কেন্দ্রীভূত প্রকাশ ঘটেছে শাহবাগে।

তাই, প্রথম পর্যায়ে শাহবাগের জমায়েত থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই স্লোগানউঠেছিল– "আপোষের ট্রাইব্যুনাল ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও!" আওয়ামী নেতা হানিফকে এ জমায়েত থেকে বোতল ছুঁড়ে মারা হয় এবং "আপোষ-আঁতাতের নেতা" বলে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। সাজেদা-মতিয়াসহ আওয়ামী সিনিয়র নেতারা সেখানে বক্তৃতা করতে গেলে তাদেরকে বারণ করা হয়।

এগুলো ছিল ইতিবাচক রাজনৈতিক অবস্থান।

◈ কিন্তু প্রাথমিক জনসমাবেশ ও জনসমর্থনের কিছু পরই এই ইতিবাচক চেতনাকে বিপথগামী করা ও নিজ ভোটবাজির স্বার্থে কাজে লাগানোর উদ্দেশে সরকারি মহল সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাতে তারা সফলও হয়। এভাবে সরকারি প্রত্যক্ষ মদদ, এমনকি তাদের দ্বারা এ আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দখল করে ফেলাটাও এ সমাবেশ অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলার ও বেড়ে ওঠার একটা মৌলিক কারণ। বস্তুত খোদ এ আন্দোলনের রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণেই এটা হতে পেরেছে।

– প্রথম থেকেই এ রাজনৈতিক দুর্বলতা ও গুরুতর বিচ্যুতি এ আন্দোলনে ক্রিয়াশীল ছিল। একে নির্দলীয় বলে গর্ব করা হতে থাকে ও "অরাজনৈতিক" আন্দোলন বলে প্রথম থেকেই প্রচার করা হয়। অথচ এমন একটি পুরোপুরি রাজনৈতিক ইস্যুর আন্দোলন যে সঠিক রাজনৈতিক দিশা ব্যতীত সঠিকভাবে এগোতে পারে না সেটা রাজনীতি-বিজ্ঞানের মানুষ মাত্রই স্বীকার করবেন। বাস্তবে রাজনীতি-বিহীনতার কথা বলা হলো বুঝে বা না বুঝে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে চলে যাওয়া। শাহবাগ আন্দোলনও এর শিকার হয়েছে।

– এ আন্দোলন সূচনায় কিছুটা নির্দলীয় ছিল– এটা সত্য। যদিও তখনও মধ্যবিত্ত বামরা (সিপিবি, বাসদ, বামমোর্চা– ইত্যাদি) এর মাঝে সক্রিয় ছিল। এ আন্দোলন নির্দলীয় রূপ নেয় তরুণদের চলমান বুর্জোয়া রাজনীতি ও বড় বুর্জোয়া পার্টিগুলোর উপর অনাস্থা থেকে। এটা বর্তমান সমাজের একটি সাধারণ পরিস্থিতি এবং এর একটি

ইতিবাচক দিক রয়েছে। কিন্তু এই বুর্জোয়া অপরাজনীতিকে-যে ভিন্ন গণরাজনীতি দ্বারাই শুধু সংগ্রাম ও অপসারণ করা যায়, সেই সচেতনতা আজকে দুঃজনকভাবে জনগণের মাঝে খুবই দুর্বল। বিশেষত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তর"ণরা এই গুর"তর রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতির সমস্যার আরো বড় শিকার। এটা এমনই ভয়াবহ যে, তারা নিজেরা এতে গর্ব বোধ করেন, এবং বহু বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সচেতনভাবে একে মহিমান্বিত করে। এই গুর"তর রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে "তৃতীয় শক্তি" বা "সুশীল" নামে খ্যাত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। যারা তৃতীয় শক্তির নামে মাত্র কিছুদিন আগেও মইনুদ্দিন-ফখর"দ্দিনের ছদ্ম সামরিক শাসনকে ডেকে এনেছিল ও সমর্থন করেছিল। আমরা যাদেরকে সংশোধনবাদী বা সংস্কারবাদী বলি সেই অধপতিত বাম বা "ভদ্র-হরতালে"র কুশীলব বামরাও এই 'অরাজনৈতিক' চরিত্রকে বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে থাকে। এরই সুযোগ নেয় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল। শাহবাগ-আন্দোলনেও এটাই ঘটেছে, ঘটছে ও ঘটবে।

◈ শাহবাগ-আন্দোলনের দুই দিনের মাথাতেই এ আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আওয়ামী প্রতিক্রিয়াশীল ও ছাত্র-সন্ত্রাসীরা ব্যাপকভাবে কব্জা করে নিয়েছে। আওয়ামী রাজনীতিক কৌশলের একটি বড় দিক হলো জনপ্রিয় আন্দোলনগুলোতে গায়ের জোরে ঢুকে পড়া, মঞ্চ দখল করা, তারপর আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলোকে শুকিয়ে মারা এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে তার উপর চাপিয়ে দেয়া। শাহবাগেও তারা সেটাই করেছে ও করছে। কেউ দাবি করতে পারে না যে, ব্যাপক নির্দলীয় মধবিত্ত ও শিক্ষিত তর"ণদের গণতান্ত্রিক আকাংখা সত্ত্বেও এর রাজনীতিকে আওয়ামী ছাত্র-সন্ত্রাসীরা, এবং পিছন থেকে বা প্রচার ও সহায়তা দিয়ে বুর্জোয়া সুশীলদের এ্যাকাংশ কর্তৃত্ব করছে না। স্লোগান উঠছে "জয় বাংলা", "জয় বঙ্গবন্ধু", "বাঙালি, বাঙালি"– যা কিনা আওয়ামী স্লোগান হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত। স্লোগান উঠছে– "জবাই করো", "সকাল বিকাল না"ড় করো", "চামড়া তুলে নেবো আমরা"। এইসব ফ্যাসিস্ট প্রবণতা আওয়ামী, বিএনপি'র মতো বুর্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিক পার্টিগুলোই এদেশের রাজনীতিতে প্রথম ঢুকিয়েছে। এখানে তাদের সমালোচনাকারী যে-কোন পক্ষকে জামাত-শিবির বলে চিহ্নিত ও আক্রমণ করা হচ্ছে। প্রগতিশীল সংগঠনের লিফলেট প্রচারের দায়ে কর্মীদের জামাত-শিবির বলে মারপিট করা হয়েছে। টকশো-তে সমালোচনাকারী প্রগতিশীল বা গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের চামড়া তুলে নেবার হুমকি দেয়া হয়েছে। আওয়ামী বিরোধী, কিন্তু জামাত নয়, এমন বুর্জোয়া পত্রিকা ও মিডিয়ার বির"দ্ধে আক্রমণ উসকে দেয়া হচ্ছে। শাহবাগের সমালোচনার কারণে বিএনপি-সমর্থক "আমার দেশ" পত্রিকার সম্পাদককে খতম করার হুমকি পর্যন্ড় দেয়া হয়েছে। এগুলো সবই আওয়ামী ফ্যাসিস্ট রাজনীতির কর্মসূচি। আন্দোলনের ঘাড়ে চেপে এগুলো আওয়ামী লীগের ভোটবাজ রাজ-নীতি ও ফ্যাসিস্ট রাজনীতির সেবা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

সরকার একদিকে যুদ্ধাপরাধী বিচারের ক্রেডিট নিতে চাচ্ছে, অন্যদিকে যখন ট্রাইব্যুনালের রায়ের বির"দ্ধে জনমত জেগে উঠেছে তখন বলছে এটা-তো ট্রাইব্যুনাল

করেছে, আমরা করিনি, আমরা কঠোর বিচারের পক্ষে– ইত্যাদি। তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই ধরনের বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রের দায়ে ট্রাইব্যুনালের বির"দ্ধে তারা কেন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না? অথবা তারা যদি এটাই বিশ্বাস করে যে, আইন নিজের গতিতে চলছে, তাহলে আবার এই রায়ের বির"দ্ধে তারা হম্বি-তম্বি করছে কেন? এগুলো সবই-যে আওয়ামী রাজনীতির প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ড় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

বাস্ড়বে এ আন্দোলনের বর্শামুখ হওয়ার কথা সরকার, আওয়ামী লীগ ও ট্রাইব্যুনাল। কারণ, তারাই জামাতের সাথে যোগসাজশে কাদের মোল্লার লঘু শাস্ড়ি দিয়েছে, এবং বড় বড় বচন সত্ত্বেও এবারও বিচারটিকে প্রহসনে পরিণত করেছে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের গুর"তর রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং আওয়ামী ছাত্র-সন্ত্রাসী এবং আওয়ামী ও সুশীল বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রে একে আওয়ামী লীগের ভোট-রাজনীতির পক্ষের এক আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছে। প্রবীণ বুর্জোয়া সাংবাদিক এবিএম মুসা সূচনাতেই সঠিকভাবেই বলেছেন যে, "ফাঁসি চাই" শাহবাগের স্লোগান না হয়ে হওয়া উচিত ছিল "ফাঁসি কেন হলো না?" এবং "যারা ফাঁসি দিলো না তাদের ফাঁসি চাই।"

◈ যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নিজেরা যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার সূচনা করেছিল এবং সবচেয়ে বড় অপরাধী বন্দী পাক-বাহিনীকে ক্ষমা করে মুক্ত করে দিয়েছিল, যে আওয়ামী লীগ '৭১-এর রাজনৈতিক অপরাধের দায় থেকে জামাতসহ সকল রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকেও যুদ্ধের দেশীয় অপরাধীদের বিচার করেনি, যে আওয়ামী লীগ জামাতসহ এইসব অপরাধীদের সাথে যুক্ত-রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এরশাদ ও পরে বিএনপি'র বির"দ্ধে আন্দোলন করেছে এবং জামাতকে তাদের 'গণতান্ত্রিক' রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছে– তাদের পার্টিগত যে মঞ্চ, সেই মঞ্চে 'নির্দলীয়' ব্লগার ও 'বাম' নেতা-কর্মীরা যতই উঠুক, তারা-যে রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এই আন্দোলনকে তুলে দিয়েছে– বুঝে বা না বুঝে, সেটা বুঝতে কষ্ট হবার নয়।

– শুধু তাই নয়, যে অপরাধে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীরা অপরাধী, সেই একই ধরনের অপরাধে আওয়ামী লীগ ও তার সরকারও কি অপরাধী নয়? সমস্ড় বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি ও তাদের এই রাষ্ট্রই-কি একই অপরাধে অপরাধী নয়? এই আন্দোলনের আগ পর্যন্ড় ও পত্রিকার পাতা ভরে থাকতো আওয়ামী নেতা-কর্মীদের ও সরকারি সন্ত্রাস, দুর্নীতি, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় পুলিশ-র‍্যাবের গুম-ক্রসফায়ার, শ্রমিক নির্যাতন-শোষণ, কৃষক উচ্ছেদ, নারী নিপীড়ন, জাতিগত অত্যাচার– ইত্যাদি হাজারো খবরে। এই বুর্জোয়া পার্টিটির ছাত্র ও যুব গু"াদের অপরাধ জামাত-শিবিরের থেকে কোন অংশেই কি কম? (বিশ্বজিৎ হত্যা)। এদের ধর্ষণের উল্লাস '৭১-এর রাজাকারদের চেয়ে কি কোন অংশে কম বর্বর? (জাবি'র সেঞ্চুরী ধর্ষক)। ভারত ও মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদীদের দালালীর

ক্ষেত্রে এরা কি '৭১-এর পাক-দালালদের চেয়ে কম দেশদ্রোহী? মোটেই নয়। কিন্তু আজ শাহবাগের মঞ্চে এই সব ছাত্র-সন্ত্রাসীরাই চড়ে বসেছে, খাওয়াচ্ছে, লোক আনছে, ভাষণ দিচ্ছে, তাদের নেতাদের উঠাচ্ছে। আর যখন এর আংশিকমাত্র প্রতিবাদ করেছে একটি আন্দোলক মেয়ে (লাকী আক্তার), তখন সাথে সাথে মঞ্চের উপরেই তার মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়ে তাকে আহত করা হয়েছে। এবং তার পর এ ব্যাপারে মিথ্যা বিবৃতি দেয়া হয়েছে– আর সব ক্ষেত্রে এই বুর্জোয়া পার্টিগুলো যা করে থাকে।

◈ শাহবাগ-আন্দোলন নিন্তম দুটো শর্তে গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক আন্দোলন হিসেবে তার চরিত্র ধরে রাখতে পারতো। এক– যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবির পাশাপাশি যারা বিগত ৪১ বছর ধরে এদের বিচার করেনি, ক্ষমা করেছে, পুনর্বাসিত করেছে, সেই বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির সরকার, দল (বিশেষত আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাত), নেতা, ছাত্র-তর"ণ সন্ত্রাসী ও তাদের ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রর সাথে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টেনে তাদেরকে এই সমাবেশে নিষিদ্ধ করা। এবং এই "বাঙালি" গণশত্র"দের বৈদেশিক প্রভু, দুনিয়ার এক নম্বর সন্ত্রাসী ও '৭১-এ পাক-বাহিনীর গণহত্যা-বর্বরতার প্রধান মুর"ব্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দা করা। এভাবে সুস্পষ্টভাবে এই আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল দালাল বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বির"দ্ধে গণরাজনীতির ভিত্তিতে স্থাপিত বলে ঘোষণা করা। দুই– সারা দেশের ৮০% যে জনগণ– কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ– তাদের ন্যায্য দাবি, আন্দোলন ও কর্মসূচিগুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা। সেসবের জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে আন্দোলনে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।

এ দুটোর কোনটাই এরা করেনি, করছে না, করবে না বলে সজোরে ঘোষণাও করছে। আর 'অরাজনৈতিক' আন্দোলনের বাতাস দেয়া সুশীলরা এই রাজনৈতিক আহাম্মকি ও মহা-ভ্রান্তিকে মহিমান্বিত করছে। এর ফলেই এ আন্দোলনে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র মানুষের মূলত কোন অংশগ্রহণ নেই। মূল জনগণের রাজনীতি ও সংগঠনকে ভিত্তি না করে ফেসবুককে ভিত্তি করলে সেটা হতেও পারে না। ফলে এটা ৮০% জনগণের আশা-আকাংখা থেকে সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন। তাদের প্রাণের স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের আবেগ থেকে বহু দূরে। অথচ বলা হচ্ছে, সারা জাতির হৃদয় নাকি শাহবাগে। এটা তর"ণ মধ্যবিত্তদেরকে ফুলিয়ে আকাশে তোলা, তাদের মাথা বিগড়ে দেয়া, দেশের প্রকৃত সমস্যা ও প্রকৃত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে উদাসীন করে রাখা এবং এই সুযোগে নিজেদের বুর্জোয়া রাজনীতির বিষ দ্বারা তাদের কলুষিত করে নিজেদের ষড়যন্ত্র হাসিল করা ছাড়া আর কিছু নয়। একইসাথে সাম্রাজ্যবাদী আইটি বাণিজ্যকে উসকে দেয়া ও তার মাধ্যমে বাস্ড়বেই মধ্যবিত্ত-বুর্জোয়া তর"ণদের বর্তমান ব্যাপক রাজনৈতিক-আদর্শিক অধপতনকে ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক স্বার্থে পুঁজি করার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

বাস্ড়বে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়ে ওঠার উপরোক্ত দুটো নিন্তম শর্তের অভাবের কারণেই শাহবাগ-আন্দোলন এত প্রচারিত ও ব্যাপকতা পেয়েছে। কারণ, এটা যুদ্ধাপরাধীদেরও অতি অল্পসংখ্যক ছাড়া, এবং এখন জামাত ছাড়া আর কাউকেই,

জনগণের মৌলিক কোন শত্র"কেই আঘাত করছে না। সুতরাং জামাত ব্যতীত বাকি সকল গণশত্র"দের পক্ষে বন্ধু সেজে এখানে আসতে আর বাধা থাকলো না। সূচনাতে তাদের কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও অচিরেই তা আওয়ামী লীগের ভোটের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ দ্বারা বিএনপি-কে কোণঠাসা করার কৌশলের হাতিয়ার হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে।

◈ এদেশের ইতিহাসে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন পুলিশ ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা ছাড়া, তাদের দ্বারা আক্রমণ ও হত্যার মুখে পড়া ছাড়া হতে পারেনি। অথচ এই আন্দোলনে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ছাড়াও সহায়তা করছে খোদ এই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র। এমনকি পুলিশও মোমবাতি জ্বালাচ্ছে! এ এক অদ্ভুদ ঘটনা! এটা কোন মহত্ব নয়, আন্দোলনের ব্যাপকতা নয়, গর্বের বিষয় নয়; বরং লজ্জার বিষয়। যে পুলিশ ১৫০ জন সহকর্মীর আগুনে অঙ্গার হবার পর স্বাভাবিক ক্রুদ্ধতায় বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার গার্মেন্টস শ্রমিকের কান্না-জড়িত বিদ্রোহী সমাবেশকে এক মুহূর্তও সহ্য করে না, যে প্রধানমন্ত্রী এমন সম্ভাব্য বিক্ষোভকে দমনের জন্য এক রাতের মধ্যেই সেখানে র‍্যাব ও বিবিধ রাষ্ট্রীয় বাহিনী পাঠায়, সেই ফ্যাসিস্ট পুলিশ ও স্বৈরাচারী সরকার এখন শাহবাগকে সমর্থন দিচ্ছে! সেই প্রধানমন্ত্রী বলেছে, শাহবাগের প্রতিটি কথা তার পছন্দ! এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে! শুধু এটাই দেখাতে পারে যে, এই আন্দোলন তার পথ হারিয়ে ফেলেছে।

কল্পনা কর"ন, যদি প্রথম দিন থেকেই রাজধানীর ব্যস্ড় রাস্ড়া দখল করে ঢাকা শহরব্যাপী যানজট সৃষ্টির যুক্তি দিয়ে, স্বাভাবিক জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ড় করার কারণ দেখিয়ে, ট্রাইব্যুনালের বির"দ্ধে সোচ্চার হওয়ার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করে, অথবা অন্য যেকোন অপযুক্তিতে করিৎকর্মা আওয়ামী পুলিশ কমিশনার বেনজীর যদি তার পেটোয়া বাহিনী, জলকামান আর সাম্প্রতিক ফ্যাসিস্ট অস্ত্র মরিচ-গুড়া ও স্ট্রিং লাঠি নিয়ে এই সমাবেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে এই রাস্ড়ার সমাবেশ ও আন্দোলন কয় ঘণ্টা টিকতো? কতটুকু ব্যাপকতা লাভ করতো? নিঃসন্দেহেই এর উদ্যোক্তারা তখন যার যার কম্পিউটারে ফেসবুক আর ব্লগের জগতেই ফিরে যেতেন। এবং কোন জাগরণই এটা ঘটাতে পারতো না।

সন্দেহাতীতভাবে এই জাগরণ একটা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনপুষ্ট আয়োজন ও মেলায় পরিণত হয়েছে। এবং এটা হতে বাধ্য এই আন্দোলনের গুর"তর রাজনৈতিক দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতির কারণে। যেমনটা '৭১-সালে মধ্যবিত্তের ও ব্যাপক জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ত্যাগ ও সংগ্রাম পরিণত হয়েছিল আওয়ামী প্রতিক্রিয়াশীল চেতনা, ষড়যন্ত্র, প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধিতা ও ভারতের কাছে দেশবিক্রির হাতিয়ারে।

◈ এটা সত্য যে, ব্যাপক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও তর"ণ এ আন্দোলনে আলোড়িত হয়েছেন। '৭১-এর বর্বর যুদ্ধাপরাধীদের বির"দ্ধে তাদের ঘৃণা, তাদের আবেগ ও আকাংখা খুবই ন্যায্য। কিন্তু বার বার প্রমাণিত যে, সঠিক রাজনীতি ব্যতীত, বিশেষত দেশের সংখ্যাগুর" কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা ব্যতীত কোন

ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান হতে পারে না। যদিও-বা হয়, তাহলে তা ক্ষণিক আলোর ঝলক দিয়ে তার আয়ু ফুরিয়ে ফেলে। শাহবাগ-আন্দোলনের অগ্রণী দেশপ্রেমী আন্তরিক নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব হলো ফেসবুক আর ডিজিটালের প্রশংসায় না মেতে, তাকেই ভিত্তি না করে, কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়াকে ভিত্তি করা। তাদের হাজারো সমস্যার সাথে সরাসরি নিজেদেরকে যুক্ত করা। ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রে বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত চত্বরে বুর্জোয়া মিডিয়ার প্রচারে, এমনকি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া পার্টিগুলোর হাতিয়ারে পরিণত না হয়ে, অন্তত ঢাকা মহানগরীর চতুর্দিকে গড়ে ওঠা বিপুল বস্তি-শহরে গিয়ে সেখানকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের জীবনকে নিয়ে অভ্যুত্থান রচনার অতি কষ্টকর ও দীর্ঘস্থায়ী পথকে গ্রহণ করা। আর পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধী বিচার নিয়ে ৪১ বছরের ষড়যন্ত্র ও বর্তমান প্রহসন, তথা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে অধ্যয়ন করা, আওয়ামী ও শাসক শ্রেণির প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় বিশ্বাসঘাতক চেতনা থেকে নিজেদের মুক্ত করা।

◈ আওয়ামী লীগ পুনরায় মধ্যবিত্ত ও তরুণদের বিক্ষোভের সাথে প্রতারণায় ও ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। যতক্ষণ শাহবাগের মঞ্চ তারা দখল করতে পারেনি, ততক্ষণ তাদের বাচাল নেত্রী একটি কথাও এ সম্পর্কে বলেনি। ৮ তারিখ থেকে মঞ্চ তাদের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণে আসার পর ১০ তারিখে এসে তারা সংসদে এর পক্ষ নিয়েছে, যখন আর এ আন্দোলন তাদের জন্য কোন ঝুঁকি নয় এটা তারা নিশ্চিত হয়েছে। একে তারা দেশের জনগণের হাজারো সমস্যা, নিজেদের অপরিসীম দুর্নীতি ও লুটপাট, তাদের সন্ত্রাসী কেডার ও তাদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রযন্ত্রের বর্বরতাগুলো, তাদের প্রভু ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগসাজশে অসংখ্য দেশদ্রোহী কার্যকলাপ এবং সেসবের বিরুদ্ধে জনমানুষের তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষকে সাময়িক ধামাচাপা দেবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছে। একইসাথে তারা বিএনপি'র বিরুদ্ধে তাদের ভোটের রাজনীতিতে একে কাজে লাগাতে তৎপর রয়েছে।

◈ কিন্তু এ আন্দোলন বিএনপি-তো বটেই, আওয়ামী লীগ সহ শাসক শ্রেণির সকল পক্ষকেই বেকায়দাতেও ফেলেছে– এটাও সত্য।

বিএনপি যে প্রতারণামূলক বিবৃতি দিয়েছে সেটা তাদের গুরুতর সংকটকেই প্রকাশ করছে। তারা এই আন্দোলনকে সমর্থনের কথা বলে যুদ্ধাপরাধী বিচার তারাও চায় বলে যে সব আশ্বাস দিয়েছে তা-যে এক মুনাফেকী প্রতারণা, এবং তা-যে তাদেরকে আরো বেকায়দায় ফেলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিএনপি'র এই সংকট আওয়ামী লীগ নিজ ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইলেও তারা নিজেরাও একের পর এক নতুনতর ফাঁদে আটকা পড়ছে– যেমন, জামাত নিষিদ্ধ করা, জামাতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাজেয়াপ্ত করা, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা– এ জাতীয় দাবি শাহবাগ থেকে ওঠার প্রেক্ষিতে। শাহবাগ যে ৬ দফা পেশ করেছে তার বহু কিছুই আওয়ামী লীগের পক্ষেও কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব। জামাত-প্রভাবিত সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে গেলে তাদের নিজ শ্রেণির অভ্যন্তরীণ

দ্বন্দ্ব খুবই বৃদ্ধি পাবে। জামাতকে নিষিদ্ধ করার দাবির বিপক্ষে আওয়ামী লীগ কিছুদিন আগেও কৌশলী অবস্থান নিয়েছে এই বলে যে, এজন্য জাতীয় ঐকমত্য লাগবে। যেখানে তত্ত্বাবধায়ক বাতিল হলো বিএনপি'র বিরোধিতা শুধু নয়, কার্যত জাতীয় ঐকমত্যের বিপক্ষে, সেখানে এই প্রশ্নে তাদের যুক্তি স্পষ্টতই তাদের শয়তানি কৌশল ও অনিহারই প্রকাশ। যদিও তার ভোট-ব্যাংকের চাপে তারা আইনের সুযোগ সৃষ্টি করছে। কিন্তু তা কার্যকর করলে আওয়ামী ও শাসকশ্রেণির সংকট আরো অনেক গভীরতর হবে। মাত্র কিছুদিন আগে খোদ সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম তারাই রেখে দিয়েছে। যা চালু করেছিল তাদের প্রধান মিত্র স্বৈরাচারী গণধিকৃত এরশাদ। আপাতত আন্দোলনকে নিজেদের কর্তৃত্বে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শাহবাগের সব বক্তব্যেই একমত প্রকাশ করলেও অচিরেই এসব প্রশ্নে আওয়ামী লীগের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা জনগণের সামনে প্রমাণ হয়ে যাবে। সুশীল ও ব্লগারদের সাথে এবং মিত্র বামদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব বেড়ে উঠবে এবং এসবই আওয়ামী রাজনীতির সংকটকে বাড়াবে।

এখন পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়েছে যে, সমস্তপ্রধান যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি না দিলে পুনরায় এমন আন্দোলন তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে– এই আশংকা তাদের সৃষ্টি হয়েছে। এটা শুধু জামাত-বিএনপি সমঝোতাকেই নয়, জামাত-আওয়ামী আপোষকেও কঠিন করে তুলবে। অন্যদিকে বুর্জোয়াদের বহুকথিত আইনের শাসনকে এটা গুরুতর প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। এখন আর কোন ট্রাইব্যুনালের পক্ষে ফাঁসি ছাড়া অন্য কোন রায় দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। বাস্তবে ট্রাইব্যুনালী বিচারের কোন গুরুত্ব এখন আর থাকছে না। একদিকে মধ্যবিত্ত তরুণ ও শিক্ষিত সমাজ, অন্যদিকে সরকার, সংসদ, আওয়ামী লীগ, এবং জামাত-তো বটেই– সকল পক্ষই এই ট্রাইব্যুনালের প্রতি কার্যত অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। এটা এই বিচারের প্রহসন নিয়ে বহির্বিশ্বে আওয়ামী লীগকে আরো বেকায়দায় ফেলবে।

অন্যদিকে এই আন্দোলন জামাতকে মরিয়া করে তুলতে বাধ্য। তারা অস্তিত্বের জন্য সহিংস সংগ্রামে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে। এটা আরো তীব্র হলে তা এই ব্যবস্থা ও শাসকশ্রেণির সকল পক্ষের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে যাবে। জামাত জেএমবি নয়। তারা শাসক শ্রেণির অংশ এবং তাদের বৈদেশিক সূত্র খুবই শক্তিশালী, যে অভিন্ন বৈদেশিক শক্তিগুলোর সাথে আওয়ামী লীগসহ শাসক শ্রেণির অন্য সকল পক্ষও জড়িত। জামাত নিষিদ্ধ করা যাও-বা শাসকশ্রেণি ও তার বিভিন্ন পক্ষ কৌশল হিসেবে বিবেচনায় নিতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ বা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এই শাসক শ্রেণির পক্ষে একটি অসম্ভব কাজ। তাই, তারা তরুণদের দাবির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য। চলমান বুর্জোয়া রাজনীতির সংকট এতে আরো বাড়বে।

এই সমূহ সংকট থেকে শাসক শ্রেণির উদ্ধারের শেষ পথ হলো তথাকথিত তৃতীয় শক্তির ক্ষমতা গ্রহণ। সে লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে না, তা বলা যাবে না। এই আন্দোলনের পূর্বেই আওয়ামী লীগের চরম গণবিচ্ছিন্নতার মুখে ও বিএনপি-জোটের সাথে প্রায় অমীমাংসেয় দ্বন্দ্বের কারণে এর সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন মহলই কথা শুরু করেছিল।

বর্তমানে এটা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় শক্তি (সেনা, সুশীল ইত্যাদি) এই আন্দোলন-সৃষ্ট পরিস্থিতিকে নিশ্চিতভাবেই ব্যবহার করছে ও করবে। শাহবাগ আন্দোলনে ও তার সমর্থনে এই সুশীলদের একাংশের একটা বড় ভূমিকা কাজ করছে, যা নিঃসন্দেহেই আওয়ামী লীগের পক্ষ হয়ে তারা করছে না। তারা নিজেরাই একটি পক্ষ। জামাতের ব্যাপক সহিংস হয়ে ওঠা, গুপ্ত হত্যা, বা আন্দোলনকে মদদদান ও একে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো– এসব কিছুতেই উপরোক্তদের ভূমিকা থাকছে ও থাকবে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনরাও নিজেদের শেষ রক্ষার জন্য পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জর"রি অবস্থার দিকে অথবা অধিকতর স্বৈরাচারী শাসনের দিকে যেতে পারে, যা শাসক শ্রেণির অন্য পক্ষগুলো কোনভাবেই মেনে নেবে না।

এই ষড়যন্ত্র ও সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে অবশ্যই জনগণের সকল মহলের সতর্কতা প্রয়োজন। আন্দোলনে সঠিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠাই এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলার একমাত্র উপায়। নতুবা যে কেউ এইসব অপশক্তির এপক্ষের বা ওপক্ষের স্বার্থ ও পরিকল্পনা হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে– তার ন্যায্য আবেগ এখানে কোন ফল দেবে না।

◈ শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র, সাধারণ মানুষ ও প্রগতিশীল-বিপ্লবী তর"ণ ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হলো– শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও তর"ণদের ইতিবাচক আবেগ ও সক্রিয়তার পক্ষে থেকে ও তাদের ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থেকে তার বির"দ্ধে অব্যাহত গঠনমূলক সংগ্রাম করা। তাদেরকে বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষে অব্যাহতভাবে প্রভাবিত করা। সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদী বামদের বুর্জোয়া-লেজুড়বৃত্তি এবং '৭১-এর চেতনার নামে আওয়ামী প্রতিক্রিয়াশীল চেতনার লেজুড়বৃত্তির উন্মোচন করা। এবং শাসক শ্রেণির সংকটকে বিপ্লবী রাজনীতির স্বার্থে কাজে লাগানো। নিজেদের শ্রেণির নিজস্ব আন্দোলন গড়ে তোলা ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই শুধু তা সম্ভব। এবং সে সবের ভিত্তিতে তর"ণদের এ দুর্বল সচেতন, কিন্তু ইতিবাচক আন্দোলনকে টেনে আনা সম্ভব।

যুদ্ধাপরাধীসহ সকল প্রকাশিত ও ছদ্মবেশী জাতীয় বেইমান ও গণশত্র"দের থেকে মুক্তি পেতে এবং দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা ও জনগণের প্রকৃত ক্ষমতা পেতে অনেক দীর্ঘ কষ্টকর ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি সঠিক রাজনীতি থাকতে হবে, যা প্রকৃতই নিপীড়িত জনগণকে সেবা করে। তাকে নেতৃত্ব দেবার রাজনৈতিক পার্টি থাকতে হবে। প্রকৃত মুক্তির কোন শর্টকাট পথ নেই। আমরা সেই পথেই তর"ণ সমাজকে আহ্বান করি। সেই আলোকোজ্জ্বল পথকেই সমগ্র জনগণের সামনে তুলে ধরি। ❑

(১৬)

বর্তমান পরিস্থিতির উপর কয়েকটি পয়েন্ট

(১৩ জানুয়ারি, ২০১৪। কিছুটা সংশোধিত ঃ ২৪ জানুয়ারি, ২০১৪)

[গত ৫ জানুয়ারি,'১৪, এক প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্য দিয়ে হাসিনার আওয়ামী সরকার তাদের কুক্ষিগত ক্ষমতাকে অব্যাহত রেখেছে। প্রধান বুর্জোয়া বিরোধী দল বিএনপি ও তার জোট এবং সংসদীয় বামপন্থী সিপিবি, বাসদসহ প্রায় সকল বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত পার্টিই এই নির্বাচন বর্জন করেছিল। নির্বাচনের আগে বিএনপি ও তার নেতৃত্বাধীন জোট ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য। শেষদিকে এই আন্দোলন ব্যাপক সহিংস রূপ নিলেও মূলত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের মদদে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় টিকে যায়। এই নির্বাচন ও পরবর্তী পরিস্থিতির উপর এই বক্তব্যটি লেখা– সম্পাদনা বোর্ড।]

১। ৫ জানুয়ারির তামাশার 'নির্বাচন' সকলের সামনে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির দ্বারা চালিত পঙ্গু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাওতাবাজিকে একেবারে উলঙ্গ করে প্রকাশ করে দিয়েছে।

এমনকি আওয়ামী গলাবাজ নেতা, তাদের দলবাজ বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ও বৃহৎ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ দালাল অংশটিও কিছুটা লজ্জার সঙ্গে নির্বাচনের 'দুর্বলতা'গুলো গ্রহণ করে নিচ্ছে। তবে তারা ও তাদের প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ নির্লজ্জের মত সংবিধানের দোহাই পাড়ছে। এভাবে বুর্জোয়া সংবিধানটির ভিত্তিতে তথাকথিত আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার স্লোগান সবই মুখ থুবড়ে পড়েছে। যে সংবিধানের দোহাই পেড়ে হাসিনার সরকার বিগত দু'মাস ধরে গণতন্ত্রের আজব খেলা দেখিয়েছে সেই সংবিধানকে তারা প্রতি পদে পদে লংঘন করেছে ও করে চলেছে নিজেদের কুক্ষিগত ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থে।

পুরোপুরিভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, গণতন্ত্র নামের শাসকশ্রেণির এই ব্যবস্থা আসলে জনগণের কোন গণতান্ত্রিক শাসন নয়, তাদের কোন ক্ষমতা নয়। এই সংবিধান জনগণের-তো নয়ই, তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেও সেবা করে না। এটা পশ্চিমা ধরনের উদারনৈতিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রও নয়। এটা হলো কার্যত এক সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র, যা এখন শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও ভারতের বদৌলতে কার্যত ভিন্নরূপের বাকশালী একদলীয় শাসনে পরিণত হয়েছে। তাদের একাজে সাহায্য করছে ইনু, মেননদের মত চরমভাবে অধপতিত তথাকথিত বামরা।

প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশের বুর্জোয়া ব্যবস্থাটি ব্যাপকভাবে চালায় নিজেদের দালাল শ্রেণিটিকে সামনে রেখে বৈদেশিক প্রভুরা– সাম্রাজ্যবাদীরা ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা। এই শাসক শ্রেণি, বিশেষত হাসিনা সরকার ও আওয়ামী লীগের মুখে

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এসব শুধু জনগণকে ভাওতা দেয়া ও নিজেদের লুটপাটের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপ ও প্রত্যক্ষ মদদ ছাড়া এবার শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের '৭১-এর চেতনা আসলে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষত ভারতের দালালী। এদের স্বাধীনতা হলো জাতীয় পরাধীনতা। এদের গণতন্ত্র হলো বাকশালী ফ্যাসিবাদ।

জাতীয় পার্টি ও এরশাদকে নিয়ে যে তামাশা, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা ও ভয়ংকর ফ্যাসিস্ট তৎপরতা এ সরকার করেছে, এবং এই পতিত বদমাইশ "বিশ্ব বেহায়া" স্বৈরশাসকটি নীতি, নৈতিকতা ও গণতন্ত্রের যে 'মহিমা' প্রদর্শন করেছে তা এদেশের ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি। বিশ্ব রাজনীতিতেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল। প্রমাণ হয়েছে যে, আন্দোলনের নামে ও তা দমনের নামে শাসকশ্রেণির বুর্জোয়া পার্টিগুলোর প্রধান দুটো পক্ষই এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র কতটা গণবিরোধী কার্যকলাপে মেতে উঠতে পারে, কতটা ফ্যাসিস্ট কায়দায় জনগণকে হত্যা করতে পারে, জনগণকে কতটা নির্মমতায় জিম্মী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, কতটা প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারে নিয়োজিত হতে পারে।

একই শাসকশ্রেণির নিজেদের মধ্যকার গোষ্ঠীগত মারামারি যারা এতটা বর্বরতায় ও প্রতারণায় পরিচালনা করতে পারে, তারা জনগণকে, বিশেষত জনগণের প্রকৃত কোন আন্দোলন ও ক্ষমতাকে কীভাবে মোকাবিলা করে ও করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

২। নির্বাচনের পরপরই বর্বর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা চিরাচরিত নিয়মে এদের সকল পক্ষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যা পত্রপত্রিকার রিপোর্ট ও খোদ হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। যদিও আওয়ামী লীগ, তাদের বুদ্ধিজীবী ও সার্কাস পার্টিতে অধপতিত গণজাগরণ মঞ্চ নামের ডিজিটাল সংগঠনটি এজন্য জামাত/মৌলবাদীদেরকে দায়ী করে চলেছে, কিন্তু এটা-যে নির্বাচনী প্রহসনের পরপরই তাকে মিডিয়া ও দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের থেকে আড়াল করার এক মোক্ষম সুযোগ আওয়ামী সরকারকে এনে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই সাম্প্রদায়িক হামলার প্রধানতম বেনিফিসিয়ারী আর কেউ নয়, আওয়ামী লীগ। এর সাথে এমন একটি নির্বাচনের পর যেকোন সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে রক্ষার জন্য এমনকি ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের পরিবেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজে দায়বদ্ধ প্রগতিশীল শক্তি যতদিন আওয়ামী লীগ ও ভারতের হিন্দু-কার্ডের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদের মুক্ত না করবেন ততদিন তারা এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন না। আওয়ামী লীগ ও ভারত দেশকে যেদিকে পরিচালিত করছে তাতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আক্রমণ আগামীতে ক্রমে আরো বাড়বে বই কমবে না। যত তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হবার ঝুঁকিতে পড়বে তত তারা বেশি বেশি হিন্দু-কার্ড-এর প্রতিক্রিয়াশীল খেলা খেলবে।

৩। এবারের নির্বাচনের আগেই আমরা মূল্যায়ন করেছিলাম যে, ক্ষমতার প্রকৃত কেন্দ্রগুলোর (সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ ও সামরিক আমলাতন্ত্র) দ্বারা বাধ্য না হলে হাসিনা সরকার কোন ক্রমেই বিরোধী বিএনপি'র দাবি অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দেবে না। নির্বাচনের পর নতুন সরকারের মন্ত্রী, আওয়ামী নেতাদের অনেকে ৫ বছর ক্ষমতায় থাকার খায়েশ খোলাখুলিই ব্যক্ত করছে। শুধু তাই নয়, বিএনপি-জোট আন্দোলনে ভাটা দেয়ার সাথে সাথে তাদের স্থানীয় নেতা-কেডারদের গুম, ক্রসফায়ার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাতক্ষীরায় বিরোধী দমনে যৌথ বাহিনী নামে ভারতীয় সেনার অংশগ্রহণের সংবাদ প্রকাশ এবং মিডিয়ার উপর নতুনতর দমনাভিযান ও হুমকি আগামী সময়গুলোতে এ সরকারের ভূমিকা কী হতে পারে তা ভালভাবেই জানান দিচ্ছে।

হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও সরকার নির্বাচনের আগে সংলাপের কথা বলে যে প্রতারণা করেছে, এখনো তাই করছে। "জামাত ছাড়ো" স্লোগান হলো সেই প্রতারণারই একটা কৌশলমাত্র। এখনো তারা বাধ্য না হলে ৫ বছর শেষ না করে নির্বাচন দেবে না। কুক্ষিগত ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য এমনকি নিজ শ্রেণির অভ্যন্তরেও কোন সমঝোতা তারা চায় না, কারণ তা তাদের ও তাদের প্রভু ভারতের শাসকশ্রেণির স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে। বিগত নির্বাচনে ২০২১ ভিশনকে এবার তারা-যে ২০৪১-এ পরিবর্তন করেছে সেটা বিনা কারণে নয়। এটা যত না আওয়ামী লীগের কর্মসূচি, তার চেয়ে বেশি করে তা হলো ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কর্মসূচি। ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্যকে কঠোর করার জন্য এক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী চীন– উভয়ের সাথেই দরকষাকষিতে লিপ্ত। একাজে তারা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মত নির্লজ্জ দেশদ্রোহী দালাল ও উগ্র ক্ষমতালোভী ফ্যাসিস্ট চাপরাশি পেয়েছে, যা তাদেরকে এবার সফল করেছে। এটা তারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতেই চাইবে।

৪। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার বন্ধু পশ্চিমা বিশ্ব আওয়ামী লীগ-ভারতের এই কর্তৃত্বকে পছন্দ করেনি। তবে একইসাথে এটা তাদের মৌলিক স্বার্থের পরিপন্থীও হয়নি। ফলে তারা আপাতত এটা মেনে নিয়েছে ও নেবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ এশিয়ার মাতব্বরি পুরোপুরি ভারতের হাতে ছেড়ে দিতে চায় না এটা যেমন ঠিক, তেমনি তারা ভারতের মাধ্যমেও এ অঞ্চলে তাদের স্বার্থ চালিয়ে যেতে চায় একেও দেখতে হবে। বিশেষত বিশ্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার সাথে মার্কিনের ক্রমবর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উদীয়মান চীনা পুঁজিবাদকে প্রতিরোধ বা বাগে আনায় ভারতকে হাতে রাখা তাদের প্রয়োজন, যার প্রচেষ্টা তারা সর্বদাই করে চলেছে। এক্ষেত্রে তাদের হাতে দুটো কার্ডই রয়েছে। দ্বিতীয়টা যতক্ষণ তাদের মৌলিক স্বার্থকে লংঘন করবে না, ততদিন তাদের দিক থেকে চরম ব্যবস্থায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। মার্কিনের এই দ্বৈত পলিসির ফাঁদে পড়ে বিএনপি জোট এবারকার মত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে।

তবে আওয়ামী নির্বাচনের চরম গণবিচ্ছিন্নতা, তাদের চরম গণবিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে বিএনপি জোটকে ক্ষমতায় আনার পলিসিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আপাতত থাকবে।

সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শাসকশ্রেণির অভ্যন্ড়রীণ এই মরিয়া দ্বন্দ্বকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতেই বেশি আগ্রহী থেকেছে ও থাকবে। শাসকশ্রেণির দুই প্রধান পক্ষের কেউই তার মৌলিক স্বার্থের বিরোধী-তো নয়ই, বরং তার রক্ষাকারী। সুতরাং দুটোর যেকোনটাকেই তাদের মেনে নিতে আপত্তি নেই। তবে বেশি বা কম পছন্দের বিষয় রয়েছে– যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। বিএনপি-জোটের তীব্র আন্দোলনের মুখে বেসামাল আওয়ামী সরকারকে দিয়ে তারা টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে, যা দীর্ঘ ১২ বছর ধরে ঝুলন্ড় ছিল। আগামীতেও তারা এজাতীয় আরো স্বার্থ হাসিলের ধান্ধায় থাকবে। অন্যদিকে বিএনপি থেকেও তারা তাদের আরো সুবিধা আগে থেকেই আদায় করে রাখবে, যা কিনা আওয়ামী সরকার আমলে তাদের জন্য প্রতিকূল হতে পারে বলে তারা গণ্য করবে।

– রাশিয়া প্রত্যাশিতভাবেই গণবিচ্ছিন্ন সরকার ও প্রহসনের নির্বাচন সত্ত্বেও তাকে তড়িঘড়ি সমর্থন দিয়েছে। মার্কিনের সাথে তার দ্বন্দ্ব ও হাসিনা সরকারের মাধ্যমে অস্ত্র বাণিজ্য, পরমাণু শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে রাশিয়ার স্বার্থগত বন্ধন তাকে আওয়ামী সরকারের বন্ধুতে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে আওয়ামী-প্রভু ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রভাবও রয়েছে।

– অপরদিকে চীন দ্বৈত নীতি নিয়েছে তার বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য, ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদেশে তার বাণিজ্যিক অবস্থানকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য, পাশাপাশি মার্কিনের বিপরীতে ভারতের সাথে সখ্যতার পলিসির দ্বারা চালিত হয়ে। তবে আন্ড়র্জাতিকভাবে মার্কিনের সাথে চীনের দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে পর্যায়েই থাক না কেন, দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ভারতের সাথে চীনের বৈরিতা অমীমাংসেয়। তাই, চীন শেষ পর্যন্ড় বিএনপি-কেই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাবতে বাধ্য। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে পাকিস্ড়ানের সাথে চীনের সম্পর্কও কাজ করছে ও করবে। অনুকূল যেকোন অবস্থায় চীন বিএনপি-কে মদদ দিয়েছে ও দেবে।

৫। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিএনপি 'আন্দোলনের নতুন কৌশল' হিসেবে হরতাল-অবরোধ 'স্থগিত' করার যে সিদ্ধান্ড় নিয়েছে এ ছাড়া তাদের কোন গত্যন্ড়র নেই। বিএনপি কোন বিপ্লবী দল নয় যে, তারা সরকার উচ্ছেদের জন্য অব্যাহতভাবে সহিংস আন্দোলন করে যেতে পারে, মুখে তারা যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন। একইসাথে তাদের সহিংস আন্দোলন যে গণবিরোধী কর্মকা"ের সৃষ্টি করেছে সেটাও তাদের ভোটের রাজনীতির জন্য উপযোগী নয়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নসিহতকে কাজে লাগিয়ে নিজ দলকে গুছিয়ে নেবার সুযোগ সে চাইবে। সুতরাং এবারকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যে উন্মোচন ঘটেছে তাকে ব্যবহার করে এবং সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে চাপের দ্বারা তারা পরবর্তী সুবিধাগুলো বের করতে চাইছে ও চাইবে।

– পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ বাধ্য না হলে নতুন কোন নির্বাচনে যাবে না। বিশেষত তার জন্য প্রতিকূল ফল হতে পারে এমন কোন সমঝোতায় যাবে না। বরং তারা পূর্বের মতই সংলাপের নামে প্রতারণা চালিয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে তাদের মৌলিক কৌশল।

তবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ, শাসকশ্রেণির একটা বড় অংশের চাপ বিশেষত সুশীল সমাজ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও মহলের চাপ, অভ্যন্ড়রীণ গণবিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্ট গণবিক্ষোভ ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে তারা আপোষে যেতে বাধ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্ধারক হতে পারে উপরোক্ত কারিকাগুলোর ফলশ্র"তিতে সৃষ্ট 'তৃতীয় শক্তি'র প্রয়োজনীয়তার যে জনপ্রিয়তা, তার মুখে সেনা-আমলাদের আস্থা হারানো। যদিও নির্বাচন পূর্বকালে সেটা কাজ করেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে সেটা সম্ভব হতে পারে। কারণ, সামরিক আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী দীর্ঘদিনের জন্য ভারতের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া কঠিন। এদের অস্ত্রব্যবসা অনেক বেশি চীন ও মার্কিনী গোষ্ঠীর সাথে। যদিও অস্ত্র ব্যবসায় রাশিয়াকে হাসিনা সরকার সুযোগ দিচ্ছে, তথাপি জাতিসংঘ বাহিনী ও বিবিধ মাধ্যমে এই সেনাবাহিনীর উপর মার্কিন প্রভাব অনেক বেশি স্থায়ী। সহসা তাকে উল্টে দেয়া সম্ভব নয়। সে চেষ্টা আওয়ামী সরকারের বর্ধিত বিপদের কারণ হতে পারে।

এর সাথে যুক্ত হতে পারে আওয়ামী লীগ ও হাসিনা কর্তৃক বহুচর্চিত সংবিধানের দোহাই, অথচ তাদের দ্বারাই তার উপর্যুপরি লংঘন থেকে সৃষ্ট আইনী সমস্যা।

তবে এসব পরিণতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই সময় নিতে পারে।

৬। উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারলেও আগামী পরিস্থিতিগুলো আওয়ামী লীগের জন্য মোটেই সুখকর হবে না। রাজনৈতিকভাবে শাসকশ্রেণির অন্যান্য পার্টি ও তাদের চিরায়ত বন্ধু অধিকাংশ তথাকথিত বাম পার্টিগুলোর থেকে বিচ্ছিন্নতা, সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশের পক্ষ থেকে সমঝোতা ও নতুন নির্বাচনের দাবি ছাড়াও যুদ্ধাপরাধী বিচার ও জামাতবিরোধী কার্ড তার নিজের জন্যই বুমেরাং হতে পারে।

– যুদ্ধাপরাধী বিচার ও জামাত নিষিদ্ধের চাপ বিএনপি'র ঘাড়ে চাপানোর কৌশলটি এবার আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার ঘাড়েই চাপবে। এটা আপাতত বিএনপি'র জন্য রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হবে। যুদ্ধাপরাধী বিচার কার্যকর করা এ সরকার ও আওয়ামী লীগের জন্য একটি স্থায়ী বিপদের সৃষ্টি করছে ও করবে।

জামাত কোন জঙ্গী মৌলবাদী পার্টি নয়, যা প্রায়শই আওয়ামীপন্থী বুর্জোয়া ও তথাকথিত বামরা বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টি ও মতলববাজীর কারণে প্রচার করে। জামাত হলো ধর্মকে ব্যবহারকারী একটি বুর্জোয়া দল। যাকিনা আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ প্রত্যেকেই কম/বেশি করে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের বিগত কয়েক দশকের ভূমিকা এটাই প্রমাণ করে। জামাত-কার্ড ব্যবহার করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র শাসকশ্রেণির জন্য নতুন সংকট ডেকে এনেছে। যুদ্ধাপরাধী বিচার ও জামাতের নিষিদ্ধকরণ জামাতের একটি অংশকে জঙ্গী তৎপরতায় ঠেলে দিতে পারে, যা দেশের রাজনীতিতে এক নতুন নেতিবাচক মাত্রা যুক্ত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। শুধু জামাতই নয়, এটা প্রকৃত মৌলবাদী শক্তিগুলোকেও দ্র"ত সেদিকে ঠেলে দেবে। এটা শুধু প্রগতিশীল আন্দোলন ও দেশের আগামী রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্যই সমস্যা হিসেবে আসবে তা নয়, শাসকশ্রেণিকেও এটা এক দীর্ঘস্থায়ী অনতিক্রম্য সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করবে।

এ সমস্যা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দ্রুত বিএনপি-কে ক্ষমতায় আনার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও শাসকশ্রেণি নতুন নির্বাচনের দিকে যেতে আওয়ামী লীগকে বাধ্য করতে পারে।

– তবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ (ও আওয়ামী লীগ) নিজেদের গণবিচ্ছিন্নতা ও ক্ষমতা হারানোকে ঠেকানোর জন্য আসলে সীমিত জঙ্গী মৌলবাদী উত্থানটাই চায় কিনা তা এক গুরুতর সন্দেহের বিষয়। তারা দেশে ও এ অঞ্চলে তা চাইতে পারে, কারণ তা তাদের রাজনীতিকে বৈধতা দেবে এবং বিএনপি-কে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে বলে তারা মনে করতে পারে। তা সত্ত্বেও গোটা শাসক শ্রেণি এখনি সেটা চাইবে না, এবং ভারত-আওয়ামী লীগের কৌশল ব্যর্থ হতে পারে। আর যদি সেটাই কার্যকর হয় তবে দেশ ও জনগণকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত এবং মৌলবাদ ও জঙ্গীবিরোধী সংগ্রামের নামে বিশ্বজনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিশ্ব ও আঞ্চলিক পরিকল্পনায় দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে দীর্ঘদিনের জন্য চরম দুর্গতিতে পড়তে হবে। যা এখন পাকিস্তানে চলছে। সকল প্রগতিশীল পার্টি ও জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং ধর্মীয় জঙ্গীবাদের বিপদ সম্পর্কে ভাল প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ-ভারতের মৌলবাদ ধুয়ার মুখোশ উন্মোচন করার দায়িত্ব সিরিয়াসলী গ্রহণ করতে হবে।

৭। নব্যরূপের বাকশালী শাসন ও ভারতের আক্রমণাত্মক কর্তৃত্ব সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ-তো বটেই, তার সাথে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধি উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরসহ ক্ষুদ্র পেটিবুর্জোয়া দলগুলোকেও অধিকারবঞ্চিত করছে ও করবে। শাসক শ্রেণির মধ্যেও এটা ঘোরতর বৈরিতা আরো বাড়িয়ে তুলবে। আর জনগণের জন্য এটা নগ্ন ফ্যাসিবাদী শাসনের বিপদ সৃষ্টি করছে ও করবে।

এ অবস্থায় এর বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনের বর্শামুখ কেন্দ্রীভূত করার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। কৌশলগতভাবে একে সঠিকভাবে মীমাংসা করা উচিত হবে। এটা জনআন্দোলন এগিয়ে নেবার নতুন সুযোগও সৃষ্টি করছে ও করবে, যা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

৮। বিএনপি জোটের বিগত মরিয়া আন্দোলন ও ব্যাপক সহিংস তৎপরতা সত্ত্বেও, তাদের মূল দাবি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন না করার প্রতি নিরংকুশ জনগণের সমর্থন সত্ত্বেও, আওয়ামী সরকারের ব্যাপক গণবিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও, বিশেষত তার দ্বারা একটি প্রচলিত নির্বাচন না করে একটি প্রহসন দ্বারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করা সত্ত্বেও এবং এই ফ্যাসিবাদের প্রতি ভারতের নির্লজ্জ মদদের প্রতি কোন গণসমর্থন না থাকা সত্ত্বেও আরো ৫ বছরের জন্য আওয়ামী সরকার টিকে যাবার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ ও সামরিক আমলাতন্ত্রের, অর্থাৎ দেশ ও জনগণের এই প্রধান শত্রুদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চরম মাত্রায় বিকাশের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্মিলিত সম্মতি ব্যতীত শাসক শ্রেণির কোন অংশের পক্ষেও আন্দোলনের দ্বারা সরকার বদল করা সম্ভব নয়। বিএনপি জোট রাজনৈতিকভাবে ও নৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার অবৈধতা পুরোপুরি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেও তারা সরকারকে সরাতে পারেনি।

এটা সত্য যে, লজ্জাহীন দালাল মিডিয়া, বিচার ব্যবস্থা, ব্যবসায়ী ও এনজিও-দের বিরাট অংশ আওয়ামী ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে তাদের কায়েমী স্বার্থেই বিরাট ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু এটাও সত্য যে, এ সত্ত্বেও নির্বাচনী সরকার ব্যবস্থার বিতর্কে আওয়ামী লীগের সমর্থন নেই বললেই চলে। এ অবস্থাতেও শাসক শ্রেণি নিজেদের মধ্যেই সরকার বদলে সক্ষম হয়নি রাস্তার আন্দোলনের মাধ্যমে।

এটা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, এদেশে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিপ্লব-তো দূরের কথা, আওয়ামী ধরনের কোন ফ্যাসিস্ট সরকারকে শাসকশ্রেণির অন্য অংশের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়। এদেশে এখন প্রতিটি জনগণ-সম্পৃক্ত আন্দোলন সশস্ত্রতায় রূপ নেয় খুব দ্রুতই। বিএনপি জামাত যে সহিংস আন্দোলন কিছুদিন করেছে সেটা আন্দোলনের রূপ হিসেবে আসতে বাধ্য ছিল। কারণ, চরম স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকার তার ক্ষমতার নিন্তম ঝুঁকি নেয়নি এবং কোন গণতান্ত্রিক অহিংস তৎপরতাকেও অনুমতি দেয়নি। ফলে বিএনপি-জামাতের পক্ষে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হলে পরবর্তী ধাপে সহিংসতায় যাওয়া ব্যতীত কোন পথই আর খোলা ছিল না। আওয়ামী অধীনে নির্বাচনে যাওয়াটা বিএনপি রাজনীতির জন্য একটি পরাজয় হতে বাধ্য ছিল, কারণ, আওয়ামী লীগ (ও ভারত) সে ধরনের কোন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কোনক্রমেই বিএনপি'র জয়লাভকে (যা প্রত্যাশিত ছিল) মেনে নিতো না। এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, জনগণ যদি ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম করেন, তবে কিছুটা ঝুঁকি হওয়া মাত্র তাকে এই রাষ্ট্র, সরকার ও শাসকশ্রেণি নিন্তম কোন গণতান্ত্রিক সুযোগ দিতে পারে না। সেটা অসম্ভব। তাই জনগণের ক্ষমতাদখলের সংগ্রাম সহিংস পথ গ্রহণ না করে একটুও এগোতে পারে না।

সমস্যাটা আন্দোলনের সহিংস রূপে নয়, বরং বিএনপি-জামাতের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে। যে কারণে তাদের সহিংস আন্দোলন জনগণের সমর্থন হারাতে শুরু করেছিল। উপরন্তু তাদের সহিংস আন্দোলনও একটা মাত্রা ছাড়াতে পারে না, কারণ, তারা এই শাসকশ্রেণিরই অংশ। তারা সেটা বুঝেনা তা নয়। একারণেই তারা এখন পিছিয়ে এসেছে। যদিও আন্দোলনের এমন রূপ সাময়িকভাবে গ্রহণ করা ছাড়া আজকের বাংলাদেশে শাসকশ্রেণির কারও পক্ষেও ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। ১৯৯৬ ও ২০০৬ সালে আওয়ামী জোটও একই কাজ করেছিল। বিএনপি সেই শিক্ষাই কাজে লাগিয়েছে। বাস্তবে এটা শুরু হয়েছিল এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনের সময়েই, যখন সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো হাইজ্যাক করে নিয়েছিল।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সঙ্গত কারণেই বিএনপি-কে সেদিকেই ঠেলে দিতে চেয়েছে। কারণ, তারা জানে যে, এ পথে সরকার পতন হয় না। ১৯৯৬ সালেও হয়নি। বিএনপি'র দাবিও অযৌক্তিক নয় যে, আন্দোলনে গণবিরোধী সহিংসতাগুলোর একাংশ রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো ও খোদ আওয়ামী শক্তির দ্বারাই সংঘটিত ছিল।

– এ থেকে জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতার আন্দোলনের রূপ নিয়ে আবারো শিক্ষার রয়েছে। জনগণের ক্ষমতা দখল শুধু সহিংস পথেই হতে পারে। আর সেটা মাওবাদী গণযুদ্ধের পথ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিংস আন্দোলন জনগণের উপর নিপীড়ন করে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং ফ্যাসিবাদী হয়ে পড়ে। বিপরীতে বিপ্লবী কর্মসূচির অধীনে জনগণের সহিংস সংগ্রাম জনগণের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং ক্রমবর্ধিতভাবে গণসমর্থনে ধন্য হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য যারা বোঝে না তারা বিপ্লব ও কমিউনিস্ট আদর্শের কিছুই বোঝে না।

– ব্যাপকভাবে গণবিচ্ছিন্ন সশস্ত্রতা সত্ত্বেও বিএনপি-জামাত জোটের সহিংস আন্দোলনের জোয়ার সময়টাতে আওয়ামী সরকার কার্যত দেশের বহু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। এটা প্রমাণ করে যে, জনসমর্থনপুস্ট ও তাদের অংশগ্রহণের দ্বার-উন্মুক্তকারী কোন সশস্ত্র আন্দোলনে প্রত্যন্ড় অঞ্চলে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা একটি গুর"ত্বপূর্ণ নীতি। প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র ও সরকারকে যত শক্তিশালী দেখা যায় তারা ততটা শক্তিশালী নয়। বিভিন্ন এলাকার পুলিশ ফোর্সকে বলতে শোনা গেছে যে, তাদের লোকবল কম। আসলে লোকবল নয়, প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র সর্বদাই দুর্বল, যদি জনগণের বাহিনী থাকে, জনগণ অস্ত্র হাতে তুলে নেন, তারা গেরিলা আক্রমণের নীতি-কৌশল গ্রহণ করেন এবং তারা জনগণের মাঝে অবস্থান করেন।

৯। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ড়ের যে আবর্তে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে তা থেকে জনগণকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন শাসকশ্রেণির দুটো গণবিচ্ছিন্ন পক্ষকে বিরোধিতার কথা বলে তথাকথিত তৃতীয় শক্তির নামে এই একই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণি, তাদের একই বৈদেশিক প্রভু ও একই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের নতুন কোন পক্ষ আমদানীর ভ্রান্ড়পথে চললেও সমস্যার সমাধান হবে না। সেজন্য একটি প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি গড়া, একটি বিপ্লবী কর্মসূচিকে তুলে ধরা, তার নেতৃত্বে একটি গেরিলা বাহিনী বিকশিত করা এবং সাহসী সংগ্রাম ও গণযুদ্ধ গড়ে তোলার এক স্বতন্ত্র নতুন পথে জনগণকে ও দেশকে পরিচালিত করতে হবে। তবেই চলমান বিষচক্র থেকে জনগণ ও দেশ মুক্ত হবে।

আমরা, সর্বহারা পার্টি, সে পথেই জনগণকে আহ্বান জানাই। ❑

পঞ্চম অধ্যায়

[পার্টির সাংস্কৃতিক পত্রিকা হচ্ছে "সহযোদ্ধা"। এটি অনিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর ক. সম্পাদক লিখে থাকেন। সেই সব লেখা থেকে নির্বাচিত দুটো রচনা পঞ্চম অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। এই সংকলনের প্রথম খ"টি নির্দিষ্ট ফর্মার মধ্যে সমাপ্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকায় এমনটি করতে হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিষয়ে লেখকের আরো অন্যান্য লেখা পরবর্তীতে অন্যভাবে সংকলিত করার লক্ষ রয়েছে।

লেখা দুটো খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। প্রথমটিতে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট এবং সে ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পত্রিকার ভূমিকা সংক্রান্ড়বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ছিল পার্টির সাংস্কৃতিক পত্রিকা "সহযোদ্ধা"-র পুন প্রকাশ উপলক্ষে দিক নির্দেশনামূলক একটি রচনা। আর দ্বিতীয়টি বাংলাদেশের আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শাসক শ্রেণি রবীন্দ্রনাথের লেখা যে সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করেছে তার আলোচনা ছাড়াও খোদ রবীন্দ্র-চেতনাকেও কিছুটা আলোচনা করেছে, যা আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে পথ দেখাতে পারে।

– সম্পাদনা বোর্ড]

সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ ও আমাদের সাংস্কৃতিক পত্রিকা

(১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০)

পার্টির সাংস্কৃতিক পত্রিকা হিসেবে "সহযোদ্ধা"-র প্রকাশ যখন পুনরায় হচ্ছে তখন পার্টির সাংস্কৃতিক কাজের প্রশ্নটিতে কিছুটা আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের পার্টিতে শুধু নয়, সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ খুবই দুর্বল ছিল ও রয়েছে, সেটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি বিগত চল্লিশ বছরের আন্দোলনের সারসংকলন করে যে "নতুন থিসিস" গ্রহণ করেছে, এবং যা এখন সমগ্র আন্দোলনে আলোচনা ও বিতর্কের জন্য পেশ করা হয়েছে, তাতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এটি হতে পেরেছে? তা-কি এজন্য যে বিপ্লবে শিল্প-সংস্কৃতির গুরুত্বকে 'আন্দোলন' বুঝতে পারেনি?

সমস্যাটি এমন সরল নয়। প্রথমত একটি বিপ্লবী পার্টি, যে নাকি গণযুদ্ধের পার্টি, তার জন্য পার্টি-গঠন, বাহিনী গঠন, জনগণকে সংগঠিত করা, লাইন বিনির্মাণ, যুদ্ধ সৃষ্টি, যুদ্ধকে টিকিয়ে রাখা ও তার বিকাশ সাধন– এ সমস্ত প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর বাস্তবতার মাঝে সাংস্কৃতিক কাজের গুরুত্ব অবশ্যই পরবর্তী সারির। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরও বিপ্লবকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লাইন বিনির্মাণ, অর্থনৈতিক কাজ এবং বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র মোকাবেলাসহ মৌলিক কাজগুলো প্রথম সারির গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। আমাদের মত একটি গোপন বিপ্লবী পার্টির পক্ষে সাংস্কৃতিক প্রশ্নে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া, সেজন্য নেতা ও কর্মী বিনিয়োগ করা খুব কঠিন। যেহেতু আবার মাওবাদী আন্দোলন এদেশে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিকাশমান শক্তিশালী ভিত্তিতে কখনই দাঁড়াতে পারেনি। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে মাওবাদী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজের দুর্বলতাকে মূল্যায়ন করতে হবে। নতুবা আমরা নেতিবাদী ও বিলোপবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমালোচনার খপ্পরে পড়বো।

কিন্তু একইসাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক কাজ ও সাংস্কৃতিক কাজের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে আমরা যথেষ্ট গভীরতার সঙ্গে আয়ত্ব করতে পারিনি। ফলে সাংস্কৃতিক কাজটি পার্টির একজন দু'জন উৎসাহী কমরেডের আগ্রহের বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হলো এই যে, সাংস্কৃতিক কাজটিকে যুক্তফ্রন্টের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এর মূল কারণ হলো এই যে, খোদ যুক্তফ্রন্টের কাজটিকেই খুব ভালভাবে আয়ত্ব করা হয়নি।

সাংস্কৃতিক কাজটি বিশেষ যোগ্যতা, দক্ষতা, অনুশীলনের বিষয় যা বিশেষ মনোযোগ, অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা ছাড়া অর্জন করা যায় না। সেকারণে, বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, যারা যুদ্ধ বা সংগঠন অথবা অর্থনৈতিক নির্মাণ– এ ধরনের অন্য জটিল, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কাজের সাথে যুক্ত, তাদের পক্ষে সাংস্কৃতিক কাজের অনুশীলনকে ও যোগ্যতাকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে নেয়াটা প্রায় অসাধ্য কাজ। নতুবা একজন মার্কস বা লেনিনই বড় ধরনের কবি হতে পারতেন। তাদের প্রতিভা বা অধ্যবসায়ের ঘাটতি ছিল না। মাও বা হোচিমিনকে আমরা আংশিক কবি হিসেবেই পাই, বড় আকারে নয়। বিশেষত তাদেরকে ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার হিসেবে পাই না, কারণ, কবিতা বা গান যাও-বা অল্প সময়ের মনোযোগে রচনা করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতির অন্য অনেক কিছুই সেভাবে সম্ভব নয়। এমনকি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্টি এগোলেও বড় উপন্যাস, উচ্চমানের বড় নাটক, বড় সিনেমা, চিত্রশিল্প বা উচ্চমানের নৃত্য– এ জাতীয় অনেক বিষয়ে পার্টির পক্ষে ব্যাপক কোন শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয় বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের পূর্বে। এ থেকেই আসে যে, আমরা কোন কোন জায়গায় এখন জোর দিতে পারি সে বিষয়টি।

কবিতা অনেকটাই ব্যক্তিগত চিন্তার বলয়ে রচনা করা যায়। মূলত এর মাধ্যমে উদ্দীপনাও ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত। কিন্তু কবিতাকে যদি আমরা গানে রূপান্তরিত করি তাহলে ব্যাপক মানুষকে আমরা তাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। তাই, কবিতার পাশাপাশি প্রধানভাবে গানের উপর আমাদের গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

তেমনি উপন্যাস রচনা, প্রকাশ, অধ্যয়ন– এ সবই বড় আয়োজন। সে চর্চাতেও আমরা মদদ দেব অবশ্যই, কিন্তু এখন আমাদের ভারকেন্দ্র হবে ছোট গল্পের উপর, বিশেষত ছোট নাটকের উপর। ছোট নাটককে কেন্দ্র করে ছোট ছোট নাট্যদল, এবং ছোট ছোট সংগীত গোষ্ঠী– এবং জনগণের মাঝে তাদের সাংস্কৃতিক তৎপরতা– এগুলো গড়ে তোলা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সাধারণ জনগণের মাঝে সেসবের আবেদন অনেক ব্যাপক। তাই, এখন এসবেই আমাদের জোর দিতে হবে।

এখানে এসে আমরা যুক্তফ্রন্টের কাজের প্রশ্নটিকে বুঝতে পারবো। অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক কাজ করতে হলে সাংস্কৃতিক সংগঠন লাগবে। তাই, গান ও ছোট নাটকের জন্য ছোট ছোট সাংস্কৃতিক টিম বা দল গঠন করতে হবে। প্রকাশ্যে গণফ্রন্টের কাজে এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলা উচিত, যাকিনা অগ্রসর শ্রমিক ও ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদেরকে টেনে আনবে বিপ্লবী কাজের সহায়ক হিসেবে, যা বহুদিন কাজ করতে পারবে। তবে গণযুদ্ধের মধ্যেই পৃথক গুরুত্বে সাংস্কৃতিক দল গড়ে না তুললে আমরা মধ্যবিত্ত ও শহুরে পরিমণ্ডল থেকে বেরুতে পারবো না এবং ব্যাপকতম সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবো না।

পার্টির নেতা, সংগঠক বা যোদ্ধা– যারা অন্য ফ্রন্টে নিয়োজিত তারাও সাংস্কৃতিক চর্চা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক চর্চা করতে গিয়ে তাদের প্রধান কাজ বিস্মৃত হয়ে পড়লে পার্টি-বিপ্লবের লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই বেশি হবে।

সেজন্যই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের জন্য পৃথক নেতা, কেডার, উদ্যোগ প্রয়োজন। আমাদের এখনকার কাজ, যেমন, এই পত্রিকাটিও সেভাবে হচ্ছে না। মূলত অন্য বিপ্লবী কাজে নিয়োজিত কমরেডদের উদ্যোগে এটা করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যকে সিসি এই কাজটি পরিচালনা করার জন্য পার্ট-টাইম দায়িত্ব দিয়েছে। ব্যস, এ পর্যন্ড়ই। সুতরাং, এটা কোন পূর্ণাঙ্গ উদ্যোগ নয়। তবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজকে গুর"ত্ব দিয়ে শুর" করার স্বীকৃতির একটা প্রকাশ এটা। আমরা কাজ শুর" করতে চাচ্ছি। পার্টির সামগ্রিক বিকাশের সাথে সাথে ফ্রন্টটি বিকশিত হবে। যার একটা প্রাথমিক ভিত্তি, বিশেষত রাজনৈতিক-মতাদর্শিক গাইড ও পথ তৈরিতে এই পত্রিকাটি ভূমিকা রাখবে।

সাংস্কৃতিক কাজের একটা গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় হলো পত্রিকা। পত্রিকা আমাদের জন্য প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা, তার পুনর্গঠন করার মাধ্যম। একইসাথে পত্রিকা কবিতা, গল্প, বিশ্লেষণ– এগুলোকে বিকশিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলনে যে পার্টিজান চেতনা রয়েছে তাকে কাটাতে হবে। বিশুদ্ধ বিপ্লবী চেতনাকে অনুমোদন, আর বাকি সবকিছুকে নিষিদ্ধ করা, অথবা তাকে এড়িয়ে চলার সমস্যা আমাদের আন্দোলনে মজ্জাগত। বিশেষত সাংস্কৃতিক কাজে এটা গুর"তর সংকীর্ণতা বিকশিত করেছে। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ঐতিহ্যকে আমাদের ধারণ করতে হবে। বিশেষত সাংস্কৃতিক কাজে সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি করতে হবে, যার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী স্ট্যান্ডার্ড বিকশিত হবে। যেমন, সুকান্ড় সম্পর্কে পার্টির সংকীর্ণতাবাদী সমালোচনা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নীরবতা, তেভাগা আন্দোলন ও আদি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বহু প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কাজ সম্পর্কে এড়িয়ে চলা, নকশাল আন্দোলনের সময়কার ও পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় ভারতে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক কাজ সম্পর্কেও অজ্ঞতা, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গুর"তর ডান মূল্যায়ন, নজর"ল আলোচনা না করা, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম মূল্যায়নে সুগভীর গবেষণা ও নির্দিষ্ট সমালোচনার অভাব– ইত্যাদি বহু প্রশ্নে পুন-আলোচনা ও মূল্যায়নের জন্য ব্যাপক বিতর্ক বিকশিত করা প্রয়োজন। সেজন্য পত্রিকারও পৃথক ফ্রন্ট ও কাজের প্রয়োজন হবে। আমাদের 'সহযোদ্ধা' এখন শুধু সে কাজগুলোকেও উদ্বোধন করতে পারে মাত্র।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে বহু ব্যাপক কাজকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যখন লক্ষ্য ও পথটা পরিষ্কার করে রাখা যায়, তখন কাজটিও এগোতে থাকে। আমরা আশা করবো 'সহযোদ্ধা'-র মাধ্যমে আমরা সে কাজে অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হবো। ❑

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ

(মার্চ, ২০১১)

রবীন্দ্রনাথের দেড়শ'তম জন্মবার্ষিকী মহাসাড়ম্বরে পালন করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। যাকে শুদ্ধ ভাষায় ডাকা হচ্ছে "সার্ধশততম" বলে। আওয়ামী লীগ সরকার নিজেকে বেশি বেশি করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের রক্ষক, এবং কাজে কাজেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা বলে প্রমাণ করার জন্য যেন বেশি করে এই জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। সেজন্য তারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে একত্রে যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই গণবিরোধী শাসকদের জন্য বেশ প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বিরাট সাহিত্যিক। বলা চলে এখনো পর্যন্ড় প্রধানতম ব্যক্তি। তিনি বেঁচে ছিলেন প্রায় ৮০ বছর, যার মাঝে ৬০ বছরের বেশি সময় তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন। তদুপরি তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্ড়ান এবং নিজে জমিদার। ফলে নির্বিঘ্ন সাহিত্য চর্চার পথে দারিদ্রের কোন সমস্যা তাকে মোকাবেলা করতে হয়নি। এ কারণে তার পক্ষে আরো ব্যাপক আকারে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তিনি ছিলেন মূলত কবি, সঙ্গীতকার। অসংখ্য কবিতা এবং প্রায় ৩ হাজার সঙ্গীত তিনি রচনা করেন। কিন্তু এছাড়াও প্রচুর ছোটগল্প, বেশ কিছু উপন্যাস এবং বহু নিবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। সুতরাং তার এই বিরাট বপুর সাহিত্য, তার দীর্ঘ জীবন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সার্বিক আলোচনা বা মূল্যায়ন করা শুধু বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই সম্ভব। তদুপরি বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম পুর"ষ হবার কারণে ভাষা, সাহিত্য, শিল্পরূপ ইত্যাদিতে তার যে বিরাট অবদান সেটাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতির নির্মোহ মূল্যায়নের পথে একটা বড় বোঝা হিসেবে সামনে আসে। প্রায় সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের ঐসব ভূমিকার ইতিবাচক দিকগুলো তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বাস্ড়বতাকে আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়।

সুতরাং এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপে শুধু একটিমাত্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা আলোচনা করা, যাকিনা বর্তমান বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে সংগ্রাম করার সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত। সেটা হলো বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ।

বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ এটা প্রায় সবাই জানেন। দেশের শাসকশ্রেণি, রাষ্ট্র ও বিশেষত আওয়ামী লীগ সরকার ও সেই ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলতে আবেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর সেই রকম আবেগ নিয়ে আসে জাতীয় সঙ্গীতটির ও তার রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ আলোচনায়।

জাতীয় সঙ্গীত বুর্জোয়া জাতি-রাষ্ট্রে জাতির আবেগের সাথে জড়িত। সেই আবেগ খুব একটা ভাল জিনিস নয়, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ক্ষেত্রে-তো বটেই। কারণ বাস্ড়বে জাতির আবেগের আড়ালে এটা বুর্জোয়া শ্রেণির আবেগকে ধারণ করে। বর্তমানের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও এই জাতীয়তাবাদী আবেগ প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল নয়। তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই জাতির সংগ্রামের ইতিহাস, শৌর্য-বীর্য, অহংকারগুলো জাতীয় সঙ্গীত ধারণ করে যার কিছু কিছু অন্ড়ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জনগণের মননে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের বির“দ্ধে ইতিবাচক ভূমিকাও রেখে থাকে।

কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সেরকম কিছুকেই ধারণ করে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদির ইতিহাস যেমন শাসক শ্রেণি বিশেষত আওয়ামী লীগ মিথ্যা দিয়ে ভরে রেখেছে, তেমনি এর জাতীয় সঙ্গীতটিকে ঘিরেও তারা করেছে এক জঘন্য প্রতারণা।

রবীন্দ্র সাহিত্যের শ্রেণি চরিত্র অনুযায়ীই এই সঙ্গীতে শুধু আকাশ-বাতাস-গাছপালা ব্যতীত অন্য কিছু নেই; মানুষ নেই। সাহিত্যে, মানুষের আবেগ ও মননে, প্রকৃতির অবশ্যই গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেসবই মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষ না থাকলে, তার সংগ্রাম না থাকলে, সেসবকে ঘিরে না হলে প্রকৃতি-সংক্রান্ড় আবেগ অর্থহীন। প্রকৃতি ও মনুষ্য জাতির শত্র“ বা বন্ধু, মানুষের সমাজ ও উৎপাদন প্রভৃতির বির“দ্ধে বা সেগুলোর জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে। মানুষের বা জাতির থাকে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের এ সঙ্গীতে সেসব নেই। ফলে এটা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকেও জীবন-ঘনিষ্ঠ কোন জাতিগত আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম নয়। এটা উৎপাদন বিচ্ছিন্ন, ব্যাপক জনসাধারণের জীবন ও সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন, আয়েশী জমিদার নন্দনের নিরাপদ বড়লোকী দেশপ্রেম ছাড়া আর কিছুকেই ধারণ করে না। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব এই গানকে যে জাতীয় সঙ্গীত করেছে সেটা তাদের গণবিরোধী শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যথার্থই এসেছে।

এই সঙ্গীতের ইতিহাসটা যদি কিছুটা আলোচনা করা যায় তাহলে বোঝা সম্ভব যে এর জাতীয়তাবাদ বর্তমান বাংলাদেশের বাঙালী জাতীয়তাবাদকেও কোনক্রমেই ধারণ করে না। শাসকরা যে এটা চালিয়ে যাচ্ছে সেটা একটা প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

বৃটিশ ভারতে ১৯০৫ সালে বৃটিশরা বিবিধ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে তৎকালীন বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা বানাতে চেয়েছিল। যা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। কিন্তু সেটা তারা অব্যাহত রাখতে পারেনি। কারণ, কলকাতা-কেন্দ্রীক মূলত হিন্দু বাঙালী উঠতি বুর্জোয়ারা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তার তীব্র বিরোধিতা করে। সেসময় বাঙালী মুসলমানরা তেমন একটা শিক্ষিত ছিল না। শিক্ষিত বাঙালী বলতে হিন্দুদেরকেই বোঝাতো। তারাই বঙ্গভঙ্গের বির“দ্ধে আন্দোলনের প্রথম সারির লোক ছিল।

প্রশ্ন হলো তারা কেন বাঙলা বিভক্তিকে এত বিরোধিতা করেছিল? এর আর্থ-সামাজিক কারণকে গভীরভাবে বুঝতে হলে পৃথক গবেষণা প্রয়োজন। তবে একটি কারণ

এটা ছিল যে, পূর্ব বাংলায় বুর্জোয়া বিকাশকে বিরোধিতা করা। পূর্ব বাংলাভিত্তিক বুর্জোয়া বিকাশের অর্থ ছিল কোলকাতা-কেন্দ্রীক উঠতি বুর্জোয়া, জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের– যারা মূলত ছিল হিন্দু, তাদের বিকাশের একচেটিয়াত্ব ভেঙে পড়া। বিপরীতে ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে পৃথক বিকাশ হওয়া, যাকে প্রতিনিধিত্ব করছিল ঢাকা-কেন্দ্রীক মুসলিম সামন্ড়-জমিদাররা। রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর প্রধান অংশ ছিল পূর্ব বাংলায়। তাই পৃথক প্রদেশ হলে তাতে তার নিজের জমিদারী স্বার্থেরও অসুবিধা হতে পারতো। সেটাও হয়তো তিনি চাইতেন না, আরো সব কলকাতা ভিত্তিক শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীদের মতোই।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ চক্রান্ড়ে এবং প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যোগসাজশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে বাংলা বিভক্তির বেদনাদায়ক ও মর্মান্ড়িক ঘটনাপ্রবাহের একটা সম্পর্ক ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ঘটনার সাথে থাকতে পারে বটে। কিন্তু ১৯৪৭-এর বাংলা বিভক্তির প্রতিক্রিয়াশীলতা, আর ১৯০৪ সালের বঙ্গভঙ্গ একই রকম ব্যাপার ছিল না।

যাই হোক না কেন, আমরা যা আলোচনা করতে চাচ্ছি তাহলো এই জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ। যখন বৃটিশের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার চলছে কলকাতাইয়্যা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, সেসময়ই রবীন্দ্রনাথ এই সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। এটা দ্বারা তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার জন্য অখ“ বাংলার বাঙালী জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরেছিলেন, যা সেসময়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের একটা আবেগকেও অবশ্য তুলে ধরে।

প্রশ্ন হলো অখ“ বাঙালী জাতীয়তাবাদের এই সঙ্গীত কীভাবে বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়? বর্তমান বাংলাদেশের সংবিধানে এরা জাতীয়তাবাদ যুক্ত করেছে। প্রশ্ন হলো কোন জাতীয়তাবাদ?

আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব বোঝাতে চেয়েছে বাঙালী জাতীয়তাবাদ। "সবাই বাঙালী হয়ে যাও"– পাহাড়ের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশ এ থেকেই এসেছিল। কিন্তু যেহেতু বাঙালী জাতিকে সেই ১৯৪৭ সালেই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, তাই বাংলাদেশ রাষ্ট্র যদি কোন বিশেষ জাতীয়তাবাদ তুলে ধরেই সেটা হতে পারে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদ, অখ“ বাঙালী জাতীয়তাবাদ নয়। এই বিপদে পড়ে শাসকশ্রেণি জিয়ার নেতৃত্বে নিয়ে এলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। কিন্তু বাংলাদেশীরা তো কোন একক জাতি নয়। বাংলাদেশের নাগরিকরা বাংলাদেশী পরিচয় দিতে পারে বটে, কিন্তু জাতিসত্তা পরিচয় তো প্রতিদিন বদলে যেতে পারে না। ৬৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী একজন লোকের জাতিসত্তা কি রাষ্ট্রের বদলের সাথে সাথে তার জীবনে তিনবার বদলে যেতে পারে? (বৃটিশ আমলে ভারতীয়, পাকিস্ড়ান আমলে পাকিস্ড়ানী, আর এখন বাংলাদেশী?!)

যাহোক আমাদের আলোচনা ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। তার এই সঙ্গীতটি অখ“ বাংলাকে তুলে ধরেছিল, তাই তার অন্ড়র্নিহিত জাতীয়তাবাদ ছিল অখ“ বাঙালী জাতীয়তাবাদ। ১৯৪৭ সালেই যার পরিসমাপ্তির শুর“ হয়েছিল। সেই জাতিভিত্তিক

জাতীয়তাবাদের কথা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরাও কেউ এখন আর বলে না– না ভারতীয় বাঙালী, না বাংলাদেশের বাঙালী। ফলে সেই মৃত আবেগসম্পন্ন সঙ্গীতকে কেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করা হলো? হলো আর কোন পথ না পেয়ে, রবীন্দ্রনাথকে গৌরবান্বিত করার জন্য, রবীন্দ্র-ভাবমানসের প্রতিক্রিয়াশীলতা দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য, যাকিনা এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণির কাজে লাগে।

বর্তমান বাংলাদেশে বাঙালী ছাড়াও যে অন্যান্য অনেক সংখ্যালঘু জাতিসত্তার বাস তাদেরকে এই 'জাতীয়' সঙ্গীতে পাওয়া যাবে না। জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শে এটাই স্বাভাবিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিদের মাটি গাছ আকাশ বাতাস রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় সঙ্গীতের মতো মোটেও নয়। তারা কেন এ গান গাইবেন?

◈ আবারো আসতে হবে রবীন্দ্রনাথে। সেটাই আমাদের আলোচনার আরেকটি মূল বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, তিনি নিজে বাঙালী ছিলেন, তিনি বাংলায় থেকেছেন আজীবন, তাই বাংলা ও তার মানুষ তার লেখায় এসেছে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি নির্ভেজাল বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারক ছিলেন? যেমনটা এদেশের বাঙালী বুর্জোয়া শাসক ও বুদ্ধিজীবীরা বোঝাতে চান?

সেটা ভাবলে ঠিক হবে না। একটা উদাহরণই যথেষ্ট। সবাই জানেন যে, বর্তমান ভারতের জাতীয় সঙ্গীতটির রচয়িতাও রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ কি এক? দুটো দেশের জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এক হয় কিকরে? সেটা অসম্ভব। তাহলে রবীন্দ্রনাথ আসলে কোন জাতীয়তাবাদকে ধারণ করতেন?

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ছিল ভারতীয়। কিন্তু সেটা বাস্ড়ব নয়, কারণ, ভারত মোটেই এক-জাতিভিত্তিক দেশ নয়। ভারতকে ভিত্তি করে একটা দেশপ্রেম, অখ- ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এসবের একটা ভিত্তি থাকলেও যখনই কেউ জাতীয়তাবাদে যেতে চাইবে তখনই তাকে স্বীকার করতে হবে যে, ভারত ছিল একটি বহুজাতিক দেশ। বহু জাতির দেশের জাতি-জনগণ একত্রে স্বাধীনতার জন্য অভিন্ন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম করেছেন এবং দীর্ঘ ঐতিহাসিক বন্ধন ও সম্পর্কের কারণে সেসময়ে একটি অখ- স্বাধীন ভারতের চিন্ড়া করেছেন– এটা বহু জাতির অস্ড়িত্ব ও জাতিভিত্তিক বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে বাতিল করতে পারে না। শুধুমাত্র জাতিগত সমতার ভিত্তিতে এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিপরীতে আন্ড়র্জাতিকতার ভিত্তিতে জাতিগুলো একত্রে থাকতে পারে, নতুবা সেগুলোকে একত্রে রাখার জন্য কৃত্রিম কোন আদর্শ উপর থেকে চাপাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরোধী, শোষণহীন সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক আন্ড়র্জাতিকতাবাদের ধারক ছিলেন না। ফলে তিনি অখ- ভারতের জন্য প্রাচীন হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করতে চেয়েছেন। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে এই হিন্দুত্ববাদকে আমরা ব্যাপকভাবেই পাবো। যে বাঙালী জাতির প্রধান অংশ ছিল মুসলিম, তাদের সংস্কৃতি রবীন্দ্র সাহিত্যে খুবই কম, নেই বললে চলে। এটাও প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জাতীয়তাবাদকে প্রতিনিধিত্ব করতেন না।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ মূলত ছিল সর্বভারতীয় হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ। আর সাহিত্যচর্চায় তারই আওতায় মাঝে মাঝে এসেছিল অখ- বাঙালী জাতীয়তাবাদ। নিশ্চয়ই এ দু'য়ের মাঝে দ্বন্দ্ব ছিল যার ভাল আলোচনা হতে পারে এ বিষয়ে গভীর গবেষণার মধ্য দিয়ে। তবে এটা তো আজ পরিষ্কার যে, বর্তমান ভারতে যারা উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি করছে সেই বিজেপি রবীন্দ্রনাথকে উর্ধ্বে তুলে-যে ধরে তা বিনা কারণে নয়।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবেই বোঝা সম্ভব যে, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদকে সাংবিধানিক আদর্শ করে শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্র যে গোঁজামিল চালিয়ে যাচ্ছে তার মাঝে একটা বড় অঙ্গ হলো রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রকাশিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় জায়গাতেই তিনি গণশত্র- শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রের কাছে স্মরণীয় বরণীয়। ভাষা ও শিল্প-সাহিত্যের রূপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বড় অবদান থাকলেও সেসবও বিরাটভাবে কিভাবে শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবী-দরিদ্র মানুষ নয়, বরং সুখে থাকা মানুষদের সংস্কৃতিকে প্রকাশিত ও প্রতিনিধিত্ব করে তার ভাল বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ভবিষ্যতে বিপ্লবীদেরকে অবশ্যই করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বিশাল বৃক্ষ, তাই তার প্রভাবও বড় এবং তাকে আলোচনা করাটাও বিরাট কাজ। কিন্তু সে কাজকে শুর- করা যায় অল্প থেকেই– শুধু যদি তার অচল হয়ে পড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদটিকে আমরা বুঝি তাহলেই। প্রথমত বাংলাদেশী জাতীয় সঙ্গীতের এই গোঁজামিলের জাতীয়তাবাদকে এবং সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদকে বর্জন করার মধ্যেই এক্ষেত্রে একটা বড় অগ্রগতি ঘটতে পারে। ❑

সমাপ্ত

আনোয়ার কবীর রচনা সংকলন

প্রথম খণ্ড

আনোয়ার কবীর রচনা সংকলন
প্রথম খণ্ড

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০১৪
প্রকাশক ঃ নবদিগন্ড় প্রকাশনী,
২৫, মোগলটুলী, ঢাকা।

দাম ঃ চার শত টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা/৫

প্রথম অধ্যায়

১. ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক পর্যালোচনা
মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা ও প্রথম পর্ব/১০
২. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মালে)-এর সংগ্রাম ও সমস্যা/৫৯
৩. বাংলাদেশে মাওবাদ অনুশীলনের অভিজ্ঞতা এবং
মাওবাদ রক্ষা ও বিকাশের সমস্যা/১৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪. ২১-শতককে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার শতকে পরিণত করুন!/১৪৬
৫. নেপাল পার্টির লাইন ও নেপাল পরিস্থিতির উপর কয়েকটি দলিল ঃ
(১) নেপাল ও ভারতের মাওবাদী পার্টির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত
আন্তর্জাতিক সেমিনারে নেপাল পার্টির দ্বারা
উত্থাপিত পেপারের উপর কিছু প্রাথমিক মন্তব্য/১৫৪
(২) নেপাল পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু মূল পয়েন্ট/১৫৬
(৩) নেপাল-নির্বাচনে মাওবাদীদের বিজয় সম্পর্কে বিবৃতি/১৬৮
৬. কেন্দ্রীয় কমিটি, সিপিআই (এমএলএম)-এর প্রতি চিঠি/১৭৫
৭. আন্তর্জাতিক নতুন লাইন-বিতর্ক এবং আমাদের কিছু অবস্থান সম্পর্কে/১৮৭
৮. বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের মাও-পরবর্তী সিকি শতাব্দী/২০৪

তৃতীয় অধ্যায়

৯. সশস্ত্র সংগ্রামের অঞ্চলে বিপ্লবী গণসংগঠন গড়ার সমস্যা/২২২
১০. গণযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে
আমাদের অনুশীলনের কিছু সমস্যা সম্পর্কে/২২৫
১১. পুনরায় "লাল বই" অধ্যয়নের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তুলুন/২২৯
১২. আমাদের কমরেডদের মৃত্যু এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত সংঘাত/২৩১
১৩. মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন মহাবিতর্ক
সকল প্রকৃত বিপ্লবীকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেই হবে/২৩৫
১৪. শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণি লাইনকে আঁকড়ে ধরুন/২৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

১৪. পার্বত্য "শান্তি চুক্তি" সম্পর্কে/২৪২
১৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আত্মঘাতী হামলা সম্পর্কে/২৫০
১৬. ২১ আগষ্ট বোমা হামলা সম্পর্কে/২৫৩
১৭. দেশব্যাপী বোমা হামলা সম্পর্কে/২৫৬
১৮. জরুরী অবস্থা ও পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে/২৬১
১৯. চলতি রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু বিষয় সম্পর্কে/২৬৮
২০. বর্তমান পরিস্থিতির উপর কিছু প্রয়োজনীয় পয়েন্ট/২৭২
২১. নির্বাচনের ফলাফলের উপর বিবৃতি/২৮০
২২. বিডিআর-বিদ্রোহ সম্পর্কে– ১/২৮৫
২৩. বিডিআর-বিদ্রোহ সম্পর্কে– ২/২৮৮
২৪. শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায় সম্পর্কে/২৯২
২৫. "অপারেশন গ্রিন হান্ট"-কে নিন্দা করুন .../২৯৭
২৬. ইসলামের নবীর উপর সিনেমা প্রসঙ্গ/২৯৯
২৭. এই মৃত্যুপুরী ভেঙ্গে ফেলুন/৩০২
২৮. শাহবাগ-আন্দোলন সম্পর্কে/৩০৬
২৯. বর্তমান পরিস্থিতির উপর কয়েকটি পয়েন্ট/৩১৫

পঞ্চম অধ্যায়

৩০. সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ ও আমাদের সাংস্কৃতিক পত্রিকা/৩২৪
৩১. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ/৩২৭

সম্পাদনা বোর্ডের ভূমিকা

'৬০-এর দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক মহাবিতর্ক ও গণচীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাবে পূর্ব বাংলায় কয়েকটি কেন্দ্রের নেতৃত্বে মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে। কেন্দ্রগুলোর মাঝে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার-এর নেতৃত্বে '৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত "পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন" ছিল অন্যতম। এটা ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ (তৎকালে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা বলা হতো)-এর ভিত্তিতে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রস্তুতি সংগঠন। এই সংগঠনের নেতৃত্বে '৭১-এর যুদ্ধকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে ৩ জুন "পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি" গড়ে ওঠে। এই পার্টি ও অন্যান্য মাওবাদী পার্টির নেতৃত্বে '৭০ সাল থেকে যে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তা '৭৪ সালের মধ্যে দেশজুড়ে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পৃথিবীর আরো অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও এই বিপ্লবী সংগ্রাম বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

'৭৫ সালের ১ জানুয়ারি রুশ-ভারতের দালাল ফ্যাসিস্ট শেখ মুজিবের "বাকশাল" সরকার কমরেড সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এবং ২ জানুয়ারি বন্দী অবস্থায় তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

কমরেড সিরাজ সিকদার শহীদ হবার পর পার্টি বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং অস্তিত্ব-সংকটে পড়ে। তিনটি কেন্দ্রে পার্টি বিভক্ত হয়। প্রতিটি কেন্দ্র একে অপরের বিরুদ্ধে বৈরী সংগ্রামের আত্মঘাতী লাইন গ্রহণ করে। এভাবে পার্টির নেতৃত্বে সংগঠন-সংগ্রামের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

এমনি পরিস্থিতিতে কমরেড আনোয়ার কবীরের ওপর পার্টির প্রধান নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব আকস্মিক অর্পিত হয়। তিনি পার্টি-ইতিহাসের অত্যন্ত জটিল, কঠিন ও বৈরী পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। কমরেডদের সহযোগিতা ও জনগণের অনুকূল শর্তে সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্রমশ উজান ঠেলে তিনি পার্টিকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। প্রসঙ্গত কমরেড আনোয়ার কবীর সত্তরের দশকের প্রথমদিকে পার্টিতে যোগদান করেছিলেন।

তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের মৌলিক শিক্ষার আলোকে সংগঠন-সংগ্রাম গড়ে তোলা ও পার্টির মৌলিক লাইনগত সারসংকলনের অব্যাহত প্রক্রিয়াকে আঁকড়ে ধরেন। '৭৯-তে অনুষ্ঠিত তৎকালীন পার্টি-কেন্দ্র সবিপ (সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ)-এর বর্ধিত অধিবেশনে তিনি পার্টি-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সারসংকলনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা লাইনের আলোকে '৮৭-'৮৮ সালে পুনরায় দেশব্যাপী গণযুদ্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু লাইনগত সমস্যার কারণে এ সংগ্রাম আরো এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, বিপর্যস্ত হয়। এ অবস্থায় লাইনের সারসংকলনকে পার্টি আরো এগিয়ে নিতে থাকে। ইতিমধ্যে পার্টি '৮৪ সালে গঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিকের ভ্রূণ কেন্দ্র "বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন" (আর.আই.এম–রিম)-এর প্রতিষ্ঠা-সদস্য হয়। এবং রিম-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কমরেড আনোয়ার কবীর পার্টির ২য় জাতীয় কংগ্রেস (১৯৮৭), ৩য় জাতীয় কংগ্রেস (১৯৯২) ও ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে নির্বাচিত পার্টি-সম্পাদক। তিনি প্রায় সাড়ে তিন দশকব্যাপী পার্টির বিপ্লবী সংগ্রামের উত্থান-পতনে ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক নেতৃত্ব। পার্টির ইতিবাচক বিপ্লবী অবদান ও ঐতিহ্যকে তিনি রক্ষা করেছেন। এবং তার ভুল-ত্রুটি-সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে তোলার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। একুশ শতকের প্রথম দিকে তিনি পার্টি-অভিজ্ঞতার সারসংকলনের ধারাবাহিকতায় এদেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন। যার সর্বশেষ সংশ্লেষিত দলিল হচ্ছে "নতুন থিসিস", যা ২০১১ সালের জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে পূর্ব বাংলার মাওবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের অনুশীলনে কমরেড আনোয়ার কবীর বহু তাত্ত্বিক, লাইনগত, বাস্তব কাজের গাইড জাতীয় দলিল রচনা করেছেন। এ ছাড়া অসংখ্য নিবন্ধ, প্রচারপত্র বা চিঠিপত্র তিনি লিখেছেন, যা এখন বিভিন্ন কারণে সবই প্রকাশ করা সম্ভব নয়, করা যাবে না, করা সঠিকও হবে না। এই গ্রন্থটি তাঁর রচনাসমূহ থেকে ক্ষুদ্র একটি নির্বাচিত অংশের একটি সংকলন।

"নতুন থিসিস"-এর সারসংকলনমূলক অংশ এবং একইসাথে থিসিসে'র লাইনগত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলিলাদির একাংশ বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজকের বিকশিত নতুন একটি সামগ্রিক লাইনের আলোকে অতীতের দলিলপত্রে বিবিধ দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এ রকম বহু দলিল সে সময়ের জন্য অগ্রসর ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও আজকের অগ্রসর অবস্থান ও অনুশীলনকে সামগ্রিকভাবে ধারণ করে না। তাই বর্তমান সময়ের অনুশীলনের প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে রচনাবলীর এই প্রথম খণ্ডে পার্টির সর্বশেষ লাইনগত বিকাশকে ধারণ করে এমনসব দলিলই শুধু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটির পরিকল্পিত কলেবরের দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। পরবর্তীতে পার্টি ও বিপ্লবের প্রয়োজন অনুযায়ী পুরনো দলিলপত্রও বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশের লক্ষ্য রয়েছে।

এই প্রথম খণ্ডে যে ধরনের দলিলপত্র রয়েছে তাহলো– এদেশের চার দশকের মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সারসংকলন, আন্তর্জাতিক পরিসরে লাইনগত সংগ্রাম, পার্টি-গঠন ও সংগঠন-সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য গাইডমূলক রচনা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির উপর বিবৃতিসমূহ, সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন লেখা। এছাড়া কিছুটা পুরনো হলেও 'পার্বত্য "শান্তি চুক্তি" সম্পর্কে' দলিলটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা তথা পাহাড়ী আদিবাসীদের সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমরেড আনোয়ার কবীর রচিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিল– "নতুন থিসিস"-এর অন্যান্য অংশ, পার্টির সংবিধান, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি, সাংগঠনিক দলিল এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এগুলো পৃথকভাবে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা পাওয়া যায়।

পার্টির নামে প্রচারিত রচনা ছাড়াও ক.আনোয়ার কবীর আরো বহু বিভিন্ন ফোরামে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখেছেন। সেগুলো এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হলো না।

* গ্রন্থটি সম্পাদনা করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ড সম্পাদনা সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করে।

* এতে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো বৈশিষ্ট্যভেদে সর্বমোট ৫টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** রয়েছে পূর্ব বাংলার মাওবাদী আন্দোলন, বিশেষত আমাদের পার্টির চার দশকের সারসংকলনমূলক মৌলিক দলিলাদি। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে লাইনগত সংগ্রামের দলিলগুলো রয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চলতি অনুশীলনে বাস্তব সমস্যাকে ঘিরে গাইডমূলক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সংগ্রাম সম্বলিত লেখাগুলো। **চতুর্থ অধ্যায়ে** স্থান পেয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সংঘটিত রাজনৈতিক নানা ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন সম্বলিত লেখাসমূহ। শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দুটো লেখা স্থান পেয়েছে **পঞ্চম অধ্যায়ে**।

* রচনাবলীর এই খন্ডটি প্রকাশের সময় লেখক তাঁর রচনাগুলোর কোন কোনটিতে অল্প কিছু ভাষাগত/শব্দগত সংশোধন/সংযোজন করেছেন।

* কোনো কোনো লেখার অংশবিশেষ বর্তমানের লাইন/দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় নয় বিধায় তা উহ্য রাখা হয়েছে। যা ... ... দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

* প্রথম অধ্যায়ের রচনাগুলোতে পাদটীকাগুলো লেখকের মূল লেখাতেই ছিল– যা অব্যাহত রাখা হয়েছে। পরের অধ্যায়গুলোর কিছু রচনাতে পাদটিকা দেয়া হয়েছে সম্পাদনা বোর্ডের পক্ষ থেকে– যা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনায় পৃথক পৃথক নোট, লেখাগুলোর সূচনায় তার প্রেক্ষিত/পরিচিতিমূলক নোট এবং সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি-নোটগুলো সম্পাদনা বোর্ডের।

পার্টি, মাওবাদী আন্দোলন ও বৃহত্তর বাম আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও জনগণ ছাড়াও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক শক্তি এই গ্রন্থের মাধ্যমে কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে আমাদের পার্টির লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা বুঝতে পারবেন– এটাই আমরা আশাকরি।